প্রবন্ধ সমগ্র

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা

ধীমান দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

তারুণ্য

প্রবন্ধ সমগ্র—১

তারুণ্য ধর্ম

রোজ সকালে উঠে আমাদের এই অতি পুরাতন প্রকৃতি সুন্দরীর সজ্জাটা যখন দেখি তখন একবারো কি মনে হয় ইনি আমাদের বড়ো প্রাচীনা বড়ো প্রবীণা বড়ো মাননীয়া ঠাকুমা'টি? চুপি চুপি বলছি, বরং মনে হয় ইনি ঠাকুমার নাৎবৌ বুঝি বা! এই প্রথম এঁর সঙ্গে শুভদৃষ্টি ঘটল, শ্রীঅঙ্গে এঁর নব বধূর সাজ।

আজকের এই ষোড়শী প্রকৃতির দিকে চেয়ে চোখে আর পলক পড়ে না। চোখের অপরাধ কী, বলো? চোখ তো নিত্য নূতনের প্রেমিক। যে তার প্রেমের মূল্য বোঝে সে আপনাকে নিত্য নূতন করে দেখায়। আমাদের এই প্রকৃতি ঠাকরুণ সেই সংকেতটি জানেন বলে এঁর কোটি মন্বন্তরের বয়সটাকে এমন বেমালুম কাঁচাতে পারেন যে আমাদের তো কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ইনি আমাদের চেয়ে একটা দিনেরও বড়ো। এই চিরযৌবনা উর্বশী একদিন বিক্রমের সমবয়সিনী ছিল, আজ অর্জুনের সমবয়সিনী। এর কাছে পূর্বপুরুষ উত্তর-পুরুষ সমানই, চিরকাল এ পুরুষের প্রেয়সী।

যা সনাতন তা যুগে যুগে নূতন। পুরোতনত্বের জাঁক সে করে না। তার বয়স কতো সে পরিচয় তার মুখে লেখা নেই, সে পরিচয়ের জন্যে মাটি খুঁড়তে হয়, পাথর মাপতে হয়, ভূ-তত্ত্ব খ-তত্ত্বের পাঁজি পুরাণ ঘাটতে হয়। এত করেও প্রমাণ হয় না এই অনাদি কালের অসীমা প্রকৃতির বয়স কতো, যার বয়সের হিসাব চলে সে এর এক এক প্রস্থ সাজ, এক একটা দিনের বহির্বাস। কোটি গ্রহতারার কোটি বৎসর পরমায়ু অখণ্ড সৃষ্টির অনাদ্যন্ত আয়ুর তুলনায় তুচ্ছ।

যা সনাতন তা নূতনের মধ্যে ফিরে ফিরে সত্য, ফিরে ফিরে স্বপ্রকাশ। মিথ্যা কেবল ঐ পুরাতনটা, ঐ ছাড়া শাড়ীখানা, ঐ ঝরাপাতা মরা পাতার রাশ। ও যখন নূতন ছিল তখন সত্য ছিল, তখন সনাতন ছিল। ওর দিন ও নিঃশেষে ভোগ করেছে, ওর জীবনের একটাও দিন ও বাদ দেয়নি। এখন তবে ও কিসের অধিকারে ভূত হয়ে চেপে বসতে চায়, চিরদিনের হতে চায়? যে বারে বারে নূতন হয়, জন্মে জন্মে বাঁচে সে তো পুরাতন পাতা নয়. সনাতন সজ্জা, সে তো যৌবনান্তিম জরা নয়, যৌবনায়মান প্রাণ। প্রকৃতিরই ষোড়শী হবার অধিকার আছে, আমাদের ঠাকুমার নেই। তবু যখন ঠাকুমা অবুঝের মতন আব্দার ধরেন, "নাতির মধ্যে আমি বাঁচব", তখন সে আব্দারকে আমরা অধিকার বলিনে, সে অনধিকার চর্চাকে আমরা উৎপাত বলি। আমরা বলি, "বড়ো দুঃখিত হলুম, ঠাকুমা। কিন্তু নিজেদের জীবনটাকে আমরা নিজেরাই বাঁচাব ঠিক করেছি। আমরা চিরপুরুষের নব অবতার, আমরা পূর্বপুরুষের পুনর্মুদ্রণ নই, ঠাকুমা।"

অনাদি অনন্ত কালের শাখায় যে পাতাগুলি এক-বসন্তে ধরেছিল তারা যখন বলে, "আর-বসন্তের পাতাগুলোর আমরা পূর্বপুরুষ, তাদের মধ্যে

আমরা নিজেদের দেখ্‌বো ; ন হি পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি ; তাদের আর কোনো কর্ম নেই ; কেবল আমাদেরি প্রীত্যর্থে প্রাণধারণ ; তাদের আর কোনো ধর্ম নেই, কেবল পিতা স্বর্গঃ আর জননী স্বর্গাদপি" তখন নূতন পাতাদের হাসি পায়। তারা বলে, "তোমাদের সঙ্গে আমাদের কিসের সম্বন্ধ ? শুধু পরম্পরাগত সম্বন্ধ বই তো নয় ! তোমরা আগে বেঁচেছ, আমরা পরে বাঁচছি। অনাদিকালের অনুপাতে আগে বাঁচার মূল্য যা অনন্তকালের অনুপাতে পরে বাঁচার মূল্য তাই। তোমাদের মধ্যে যদি আমরা না বেঁচে থাকি তো আমাদের মধ্যে কেন তোমরা বাঁচবে ? আমাদের ফরমাস যদি তোমরা না খেটে থাকো, আমাদের প্রত্যাশা যদি তোমরা না পুরিয়ে থাকো, আমাদের সাধ যদি তোমরা না মিটিয়ে থাকো তবে তোমাদের ফরমাস কেন আমরা খাট্‌তে যাবো, তোমাদের প্রত্যাশা কেন আমরা পুরাতে যাবো, তোমাদের সাধ কেন আমরা মেটাতে যাবো ? আমাদের হাতে মাত্র একটি বসন্ত, একটু বর্তমান। এটুকু জীবনক্ষণ আমরা নিজেদেরি ইচ্ছামতো নিজেদেরি সাধ্যমতো বাঁচতে চাই, আমরাই আমাদের কাছে সকলের চেয়ে সত্য। যা যায় তা পুরাতন, তা প্রাণ-নিঃস্ব। যা রয় তা সনাতন, তা চিরপ্রাণ। আমাদের মধ্যে পূর্বপুরুষের কিছুই রইলো না, চির পুরুষের সকলি রইলো।"

"কিন্তু আমরা যে তোমাদের প্রাণ দিয়েছি, জ্ঞান দিয়েছি, সমাজে স্থান দিয়েছি !—"

"দিয়ে, দেবার আনন্দ উপলব্ধি করছো। পিতা হবার, গুরু হবার, সমাজসেবী হবার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করছো। সে উপলব্ধি ও সে লাভ আমাদের কাছ থেকে লব্ধ। ঋণ গ্রহণ করেই আমরা ঋণ শোধ করেছি, পিতৃঋণ ঋষিঋণ দেবঋণ থেকে আমরা মুক্ত।"

"তোমাদের যে আমরা ভালবাসি, সে ঋণ থেকে !"

"সে ঋণ দুই তরফা। তা বলে ভালবাসার নামে অনধিকার চর্চা চলবে না। আগে স্বাধীনতা, তারপরে প্রেম।"

নূতন পাতারা বলে বটে এ কথা, কিন্তু বৎসর না ঘুরতেই ভুলে যায়। পরের বসন্তে তাদেরও মুখে সেই প্রাচীনতম বুলি। এমনি করে যুগের পর যুগ যায়, যুগের আগে যুগ আসে। কিন্তু জরা যৌবনের সেই অনাদি কালের দ্বন্দ্বটা অনন্তকালেও থামবার নয়। সেটাও নিত্য সনাতন।

মৃত্যুর চেয়ে জরা ভীষণ। অনবচ্ছিন্ন যৌবনপ্রবাহের মৃত্যু একটা বাঁক, জন্ম তার উল্টোপিঠ। কিন্তু জরা তার চড়া, তাকে তিলে তিলে শোষণ করে, নিঃস্বত্ব করে। মৃত্যুর পরেও যৌবন আছে, কিন্তু জরার মধ্যে যৌবন নেই। যৌবন যেন ঠাস্‌-বুনন, মৃত্যু তাকে যেখান থেকেই ছিঁড়ে নিক—সে অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ। আর জরা যেন জাল-বুনন, যত দীর্ঘই হোক ফাঁকে ফাঁকা। "One crowded hour of glorious life" হচ্ছে যৌবন, "an age without a name" হচ্ছে জরা।

সেই জন্যে যৌবনের সত্যিকার বিপদ মরা নয় জরা, বদ্‌লানো নয় বন্ধ

হওয়া, ভাঙা নয় বাঁকা, নষ্ট হওয়া নয় স্বভাব-ভ্রষ্ট হওয়া। প্রতি বৎসর বিশ্ব-জরার সঙ্গে বিশ্ব-যৌবনের দ্বন্দ্ব বাধে, যৌবন আক্রমণ করার দ্বারা আত্মরক্ষা করে, জরা আত্মরক্ষার আশায় হট্‌তে হট্‌তে যায়, যৌবন আপনাকে বাড়াতে গিয়ে বাঁচে, জরা আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে মরে। শীতের শুষ্কপাতা ঝরিয়ে দিয়ে বসন্তের কিশলয় দেখা দেয়, জ্যৈষ্ঠের জীর্ণ মাটি ভাসিয়ে নিয়ে শ্রাবণের বন্যা তাজা মাটি বিছিয়ে যায়। একের মরণ, অপরের জন্ম। কিন্তু উভয়ের ভিতর দিয়ে একই যৌবনের উষ্ণ রক্তপ্রবাহ।

এই উষ্ণ রক্তপ্রবাহ না হলে যৌবন বাঁচে না। তার বাঁচা তো কায়ক্লেশে বেঁচে-বর্তে থাকা নয়, ক্ষীণজীবীদের পিণ্ডার্থে ক্ষীণতরজীবীদের বংশান্বয় রক্ষা নয়, বালুকাগ্রস্ত ফল্গুপ্রবাহের মতো জরাগ্রস্ত অস্তিত্বটুকুকে অতি সন্তর্পণে টিকিয়ে রাখা নয়। তার বাঁচা আপনাকে প্রবলভাবে জাহির করা—দিকে দিকে, প্রগাঢ়ভাবে বইয়ে দেওয়া—স্রোতে স্রোতে। তার প্রতিভার আত্মপ্রকাশ সর্বতো-মুখী, তার প্রেমের আত্মোপলব্ধি সর্বরসে। এমন বাঁচায় বিঘ্ন আছে, বিপদ আছে, মরণ আছে, কিন্তু পরোয়া নেই, হিসাব নেই, আফ্‌সোস নেই। যার প্রচুর আছে সে প্রচুর উড়িয়ে দিতে পারে, জীবন খোয়ালেও তার জীবনের অভাব হয় না। প্রাণহানি নয় প্রাচুর্যহানিই তার মৃত্যু, প্রাণ রক্ষা নয়, প্রাচুর্য রক্ষাই তার সমস্যা।

Struggle for existence যার সমস্যা সে নিছক প্রাণী, প্রাণের উপরে উদ্বৃত্ত তার নেই। সে বৃদ্ধ, তার বৃদ্ধি পরিমিত, তার ভাবনা অভাবাত্মক। সে নিজেকে বাঁচাবে বলে নিজেকে ত্যাগ করতে করতে চলে, কচ্ছপের মতো আকাশকে ছাড়ে আপনাকে ঢাকে, অর্জনের উপরে নয় সঞ্চয়ের উপরে বাস করে। সে যতটুকু চলে তার বেশী দ্বিধা করে, যতটা দ্বিধা করে তার বেশী সন্দেহ করে, যতটা সন্দেহ করে তার বেশী ভয় করে। জীবনের জারক-রস তার ফুরিয়ে এসেছে, সে গ্রহণ করতে, পরিপাক করতে পারে না; আত্মসাৎ করতে, বৃদ্ধি পেতে পারে না। সন্ধান করবার অক্লান্ত উৎসাহ তার নেই, জয় করবার উন্মাদ সংকল্প তার নেই। সে শেখানো মন্ত্র নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করে, পায়ের চেয়ে লাঠির পরে ভর করে বেশী।

তার সত্য নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত সত্য, যে সত্য মায়ামৃগের মতো ধরাছোঁয়ার নিত্য অতীত নয়, যে সত্যে নিত্য অভিসারের অসহ্য শ্রম, অসহ্য ব্যর্থতা ও অসহ্য কলঙ্ক নেই, যে সত্য সদ্যফলপ্রদ স্বপ্নাদ্য মাদুলীর মতো সস্তা এবং বুড়ো-ভোলানো। তার প্রেমের আদর্শে প্রেমাস্পদকে অর্জন করবার জন্যে তপস্যার দরকার করে না, রক্ষা করবার জন্যে পুনর্তপস্যার তাগিদ নেই, সমৃদ্ধ করবার জন্যে তপস্যারও যা অধিক সেই সৃষ্টিশীল প্রতিভার নব-নবোন্মেষ নেই। সর্বাগ্রে জাতি কুল বিত্ত প্রতিপত্তি, তারপরে কর্তৃজনের সুখ সম্মান সুবিধা, তারপরে নিজের রূপগুণের পছন্দ। তারপরেও যদি এতটুকু ফাঁক থাকে তবে অত্যন্ত নিরাপদ একান্ত ভ্রমপ্রমাদহীন সম্পূর্ণ ট্যাঁকসই বেড়া-দেওয়া চিহ্নিত-করা সাধুসম্মত প্রেম! সতর্কতার আর অন্ত নেই! পৃথিবীসুদ্ধ তার

প্রতিকূল। গায়ে একটু বাতাস লাগলে হাড় ক'খানা পর্যন্ত এমন খটাখট্ আওয়াজ করে ওঠে যে চৌচির হয়ে খুলে পড়বে বুঝি বা! গেল! গেল! গেল! প্রাণ গেল! মান গেল! ধর্ম গেল! সমাজ গেল! এবং ইদানীং শোনা যাচ্ছে, সাহিত্য গেল! যদি বলি, গেল তো আপদ গেল, কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ, আবার আসবে, তবে অক্ষমের না আছে ক্ষমতা, না আছে বিশ্বাস, না আছে আশা, আছে কেবল হা-হুতাশ আর অভিশাপ।

Struggle for intense living তার সমস্য যে প্রাণী নয় প্রাণবান, জীব নয় যুবা। দুই হাতে বিলিয়ে দেবার মতো ঐশ্বর্য, দুই ধারে ছড়িয়ে দেবার মতো বীর্য, দশদিক আলো করবার মতো আভা, এরি জন্যে তার ভাবনা; এ ভাবনা অভাবাত্মক নয়, ভাবাত্মক। সে চায় ঘনীভূত জীবন, আরো আরো আরো প্রাণ। সে চায় প্রাচুর্যান্বিত বৈচিত্র্যান্বিত সাহসান্বিত জীবন, যার অপর নাম যৌবন। সে চায় অজরত্ব, নিছক অমরত্ব তার কাছে তুচ্ছ।

পরের হাত থেকে অমনি সে কিছু নেয় না। সেই জন্যে পিতৃজনের দেওয়া জীবনটাকে হাজারো বার বিপন্ন করে সে আপনার করে নেয়, পিতৃগণের দেওয়া সত্যকে সে ভেঙেচুরে পুড়িয়ে গলিয়ে পুনসৃষ্টি করে। কিছুই তার কাছে অতি প্রাচীন বলে অতি পবিত্র নয়, লক্ষ বার পরীক্ষিত সত্যকেও সে লক্ষ বার পরীক্ষা না করে মানে না, বিনা যুদ্ধে সে সূচ্যগ্র পরিমাণ প্রতীতি দেয় না। প্রতিভার ক্ষুধায় সে যেখানে যা পায় তাই কাজে লাগায় আর সৃষ্টির সুধায় তাকে অনির্বচনীয় রূপ দেয়। প্রেমের বাহু বাড়িয়ে সে আকাশের চাঁদ পেড়ে আনে আর হৃদয়ের শক্ত মুঠায় তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে ছিনিয়ে রাখতে থাকে।

তবু আসক্তিতে তার সুখ নেই। একদিন যা প্রাণভরে কামনা করে, অন্যদিন তা হাতে পেয়েও রাখে না। হারাতে হারাতে কী যায় কী থাকে সেদিকে তার খেয়াল নেই, তার খেলা খেলনাভোলার খেলা, খেলা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই তার তপস্যা। নিজের জন্যে সে চরম সৌভাগ্যকেও চরম মনে করে না, দেশের জন্যে সে উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎকেও যথেষ্ট উজ্জ্বল জ্ঞান করে না, জগতের জন্য সে যে আনন্দ আকাঙ্ক্ষা করে সে আনন্দের সংজ্ঞা হয় না। ক্রমাগত সীমা ছেড়ে চলাই তার দেহ-মনের ধর্ম, কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরলেই তার মনে মরচে ধরে, দেহে কুঁড়েমি বাসা বাঁধে। কতদূর যে তার অধিকার কত প্রশস্ত তার পরিধি আগে হতে কেউ তা ঠিক করে রাখেনি, নির্ভুল ভাবে কোনো গুরুই তা ঠিক করে দিতে পারে না। নিজেকে কেবলি বিস্তীর্ণ, কেবলি বিচিত্র করতে করতে তার কতজনের সঙ্গে কত প্রথার সঙ্গে বিরোধ বাধে, সন্ধি হয়, পুনরায় বিরোধ বাধে, মরার আগে শেষ মীমাংসা হয় না, মরার পরেও শেষ মীমাংসা নেই।

এহেন যে যুবা তার প্রতি বৃদ্ধের সহানুভূতি অসম্ভব। একের সমস্যা অপরের অবোধ্য। বৃদ্ধ কখনও ধারণা করতে পারে না যুবা কী চায়, বিশ্বাস করতে পারে না সে চাওয়া ভালো, স্বীকার করতে পারে না সে চাওয়া সত্য।

বৃদ্ধ এসে সীমায় ঠেকেছে, তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, চলৎশক্তি আড়ষ্ট, কল্পনাশক্তি ক্লান্ত, কেবল আতঙ্কবোধ তীব্র। ভালো মনে কিন্তু ভীতু মনে কখনো তার পায়ে শিকল পরিয়ে কখনো তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে কখনো তার মনে সংস্কার প্রবেশ করিয়ে বৃদ্ধ যুবাকে বাধাই দিতে ব্যগ্র, অনুগত করতে ব্যস্ত, মনোমত করতে উৎকণ্ঠিত। পাঠশালায় বৃদ্ধই শিক্ষা দেয়, যুবা শিক্ষা পায়, সমাজে বৃদ্ধই শাসন করে, যুবা শাসিত হয়। শিক্ষা ও শাসন ধাতুগত ভাবে একই; তাকে ভালোবেসে নিতে হয় না, মেনে নিতে হয়; তার মধ্যে এক পক্ষের আত্মসম্মানের চেয়ে অপর পক্ষের আত্ম-প্রেস্টিজ বেশী। Superiority complexএ গর্বান্ধ হয়ে অবশেষে আর্টকেও শিক্ষার বাহন শাসনের যন্ত্র বানাতে চায় ইস্কুল মাস্টার পাহারাওয়ালার দল। প্রতিভাকে ভারাক্রান্ত ও প্রেমকে পাশবদ্ধ করে তাদের শঙ্কা কমেনি, সৃষ্টিতেও তারা ফরমাস খাটাবে, মানবাত্মাকে তার শেষ আনন্দ থেকে, স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ থেকে, art for art's sake থেকে নিরস্ত করবে, নিরুদ্দেশ্য লীলার উপরে আর্টে তাদের কৃপণ মনের উদ্দেশ্য চাপাবে। এই তাদের মনস্কামনা।

বৃদ্ধ হচ্ছে ভূতের চেয়ে ভয়াবহ। ভূত তবু আপন জীবনটুকুর ভূত, পরের জীবনটুকুর উপরে তার লোভ। বৃদ্ধ কিন্তু আপন যৌবনটার ভূত, পরের যৌবনটার সঙ্গে তার বাদ। জীবনের চেয়ে যৌবনের মূল্য বেশী। জীবনকে যে হরণ করে, সে সামান্যই হরণ করে, যৌবনকে যে হরণ করে সে সর্বস্ব হরণ করে। কাঁচা চুলকে উপড়ে দিলে বাজে কিন্তু বাধে না, কাঁচা চুলকে পাকিয়ে দিলে সর্বনাশ। মরার বাড়া গাল নেই, কিন্তু মরার বাড়া দুর্গতি আছে, সে দুর্গতি জরা। এ দুর্গতির অনেক ছদ্মবেশ, অনেক ছদ্মনাম, অনেক ছদ্ম-লক্ষণ। যৌবনের তপোভঙ্গের জন্যে জরা যে সব চর পাঠায় তারা শনির মতো কোন্ ছিদ্র যে ভিতরে প্রবেশ করে আর ভিতর থেকে মেরুদণ্ডটিকে ক্ষয় করে আনে, প্রথম থেকে তা বোঝা যায় না এবং অনেক পরে যখন বোঝা যায় তখনো আসল ব্যাধিটার চিকিৎসা না করে চিকিৎসা করা হয় আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলোর। এবং ভিতর থেকে বলাধান না করে বাইরে থেকে করা হয় উত্তেজক প্রয়োগ। ফলে হয়তো রোগী বাঁচে, কিন্তু সে বাঁচা রোগকে নিয়ে বাঁচা, একটার পর একটা উপসর্গকে নিয়ে চিকিৎসকের মুখ চেয়ে টিঁকে থাকা, দৈবের দেওয়া মুষ্টিভিক্ষার প্রত্যাশায় কাঙালের মতো ধন্না দিয়ে পড়ে থাকা। এর মতো মরণ আর নেই, এ কেবল শ্বাসটুকু ছাড়া বাকী সমস্তটার পলে পলে মরণ।

(১৯২৮)

এই জরাই হয়েছে আমাদের দুর্গতি। আমরা এত পুরাতন জাতি যে আমাদের বয়সের গাছপাথর নেই, গাছপাথর খুঁজতে হলে মহেঞ্জোদারোর মরুভূমি খুঁড়তে হয়। আমরা যে এতকাল টিঁকে আছি এইটেই এত বড় একটা অষ্টম আশ্চর্য যে, এই দর্পে আমরা ভুলে বসে আছি গাছপাথরেরও অধম হয়ে টিঁকে থাকার দাম কত এবং মিশরের mummyর মতো টিঁকে থাকার দরকারটা কী। প্রাচীন ভারত যদি তার ভরা ঐশ্বর্য নিয়ে কালসাগরে ডুবতো তবে সেই ভরাডুবি এই শতচ্ছিন্ন নৌকাখানার শতকলঙ্কের চেয়ে শ্রেয় হতো। অকাল মরণে গ্লানি নেই, জীবন্ত মরণেই গ্লানি।

আমাদের এই দেড়সহস্র বৎসরের ইতিহাস কেবল আত্মরক্ষার ইতিহাস। আত্মরক্ষা বৃদ্ধের ধর্ম, মুমূর্ষুর ধর্ম। যুবার ধর্ম দিগ্বিজয়। নিজেকে বাঁচাতে ব্যাপৃত থাকলে বাঁচবার সময় থাকে না, নিজেকে বাঁচিয়ে চললে চলাই হয় না। মরণ বাঁচন তুচ্ছ করে দশ দিকে দশ অশ্ব ছুটিয়ে দেওয়া, মাঝখানে সূর্যের মতো জ্বলতে থাকা, এরি নাম বাঁচা, এরি নাম চলা। কিন্তু এই দেড় সহস্র বৎসর আমরা শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পুঁটলি বেঁধে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছি, কাঁকড়ার মতো নিজের গর্তে নিজেকে তলিয়ে দিয়েছি, আক্রমণের বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়াইনি, পাল্টা আক্রমণ করিনি, খেদিয়ে নিয়ে যাইনি, নিজের গণ্ডীকে ক্ষুদ্রতর না করে পরের গণ্ডীর আধখানা দখল করে নিইনি। আমরা পর্বত লঙ্ঘন করে রাজ্য জয় করিনি, সমুদ্র পেরিয়ে উপনিবেশ গড়িনি, দেশে দেশে আমাদের যে ন্যায়সঙ্গত দেশ ছিল সেই দেশ বুঝে নিইনি, সব ঠাঁই আমাদের যে ন্যায়সঙ্গত ঘর ছিল সেই ঘর খুঁজে নিইনি। পাছে আমাদের কেউ ছুঁয়ে ফেলে, পাছে আমাদের কষ্ট করে গঙ্গাস্নান করতে হয়, পাছে আমাদের সারাজীবনের তপস্যা অন্যের ছায়া লাগলেই ব্যর্থ হয়ে যায়, পাছে আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের সভ্যতার পাকা ঘুঁটি পরের এক আঘাতে কেঁচে যায়, সেই ভয়ে আত্ম-অবিশ্বাসী আত্মঘাতী প্রচ্ছন্ন জড়বাদী আমরা দেড়সহস্র বৎসর কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি, নিজেদের অধিকারকে খর্ব হতে খর্বতর করে নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেঁটে ফেলেছি ও ধড়টাকে অপরের অনধিগম্য করতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছি, অপরে ধর্মনাশ করবে ভেবে রাজপুত রমণীর মতো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করাকে বলেছি আত্মরক্ষা, অপরকে নির্বিবাদে বস্ত্রহরণ করতে দিয়ে নিঃসহায়া দ্রৌপদীর মতো প্রায় বিবস্ত্র হওয়াকে বলেছি সতীত্ব, অপরের প্রতি অহিংস থাকবার অটল সংকল্পে নিজেদের প্রতি হিংসার ইয়ত্তা রাখিনি, নিজেদের দেহের প্রতি নিগ্রহ নিজেদের স্বভাবের প্রতি repression, নিজেদের প্রবৃত্তির প্রতি তাড়না এই হয়েছে আমাদের মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি এবং গ্রহণহীন বর্জন, ভোগহীন ত্যাগ, আনন্দহীন কৃচ্ছ্রসাধনা—এই হয়েছে আমাদের আত্মহিংসার আদর্শ।

তবু এও তুচ্ছ, এ তবু বাইরের দুর্গতি। এর তলে তলে রয়েছে আমাদের দুর্গতির প্রতি আসক্তি, জরার প্রতি শ্রদ্ধা, পাকাচুলের অতুল প্রতিপত্তি, সে যাই বলে তাই গ্রাহ্য, সে যাতে সুখ পায় তাই কর্তব্য, সে শ্রদ্ধার যোগ্য নাই হোক

তবু তার পায়ের ধুলো মাথায় নেওয়া চাইই। জরার প্রতি এই অহেতুক শ্রদ্ধা আমাদের জরার চেয়েও মেরেছে। ইচ্ছা করলেই আমরা এক লাফে সেরে উঠতে পারি, কিন্তু ইচ্ছাটাকে পর্যন্ত আমরা বেহাত করে পাকাচুলের কাছে চিরনাবালক সেজেছি। না জানি কত শত বৎসরের জরা যার ব্যাধি এবং ব্যাধির চেয়ে ব্যাধির প্রতি আসক্তি যার শত্রু তার গায়ে সমাজ সংস্কারের ইঞ্জেকশানই দাও আর রাষ্ট্রবিপ্লবের অস্ত্রোপচারই করো, পৃথিবীর জোয়ান জাতিগুলোর সঙ্গে সব বিষয়ে পাল্লা দিয়ে চলবার সামর্থ্য কি তার হবে? বীর্য কি কখনো বাইরে থেকে আসে? বড়জোর তাকে আরো ক'হাজার বৎসর বাঁচিয়ে রাখতে পারো এবং গর্ব করতে পারো যে জোয়ান জাতিগুলো জরতে না পেরে গ্রীস রোমের মতো মরেছে, কিন্তু এ জাত জরেছে তবু মরেনি। কী গৌরব! নাতিগুলো গেছে মরে, ঠাকুমা আছেন সশরীরে!

কিন্তু আমাদের এই ঠাকুমা-তন্ত্র রাজ্যে টিঁকে থাকা যদি বা সহ্য হয়, টিঁকে থাকার গ্লানি যে অসহ্য! পুরুষের পক্ষে পিতৃনামা হওয়ার মতো গ্লানি আর নেই, এ যে তারো অধম, এ যে ঠাকুমানামা হওয়া! স্বনামা হবার স্বাধীনতায় পদে পদে বাধা, পদে পদে নিষেধ, পদে পদে সন্দেহ। জন্মমাত্রেই আশীর্বাদ, "অমুকের মতো হও।" জ্ঞান হলেই আদেশ, "অমুকের মতো হও।" বয়স হলেই উপদেশ, "অমুকের মতো হও।" এই অমুকেরা তবু দু'এক পুরুষ আগের নন, এঁরা 'সনাতন আদর্শ'! অতীতের ঘানিগাছের চারিদিকে কলুর বলদের মতো একটা জাতি কেবল পাকই দিচ্ছে, পাকই দিচ্ছে, পাকই দিচ্ছে। একবার ভাবতে চাইছে না, পাক দেবো কেন? পরের ছাঁচে নিজেকে ঢালবো কেন? সীতা সাবিত্রীকে নকল করবো কেন? শাস্ত্র থেকে নজীর দেখাবো কেন? আমাদের আদর্শ আমরাই, আমাদের নজীর আমাদের শুভবুদ্ধি, আমাদের কৈফিয়ৎ আমাদের মানবসুলভ ভুলভ্রান্তি।

আমাদের দাস-মানসিকতার জড় আর কোথাও নয়, এইখানে। মানুষের যেটা সকলের বড়ো অধিকার—ভুল করবার অধিকার—সেই অধিকারটাকে আমরা পাকাচুলের শ্রীচরণকমলেষু গছিয়ে দিতে শিখেছি। আমাদের ভাবনা তাঁরা ভেবে রাখবেন, আমাদের কাজ তাঁরা করে দেবেন, আমাদের ভালোবাসা তাঁরা ঘটিয়ে তুলবেন। আমরা অর্বাচীন, আমরা কী বুঝি আমাদের ভালো-মন্দ? তাঁরা প্রবীণ, তাঁরা আমাদেরকে আমাদের চেয়েও ভালো বোঝেন। তাঁরা যা করেন তাতেই আমাদের মঙ্গল, আমরা যা করি তাতে কেবল বিশৃঙ্খলা, কেবল বিপৎপাত, কেবল অশান্তি। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ঠাকুমার আঁচল ধরে হাঁটতে শেখা, ঠাকুমার চশমা পরে জগৎটাকে চেনা। তারপর আমরা যখন ঠাকুমার বয়সী হবো তখন আমরাও অভ্রান্ত হবো, যখের মতন সমাজের উপরে পাহারা দেবার যোগ্য হবো, নাতিগুলোকে পিটিয়ে পাহারাওয়ালা বানাবো।

দাস-মানসিকতার এই যে হাতেখড়ি এ আমাদের পরের ইস্কুলে হয় না, হয় ঘরের লোকের কোলে কাঁখে। দু'দশ ঘা বেতের চেয়ে দু'দশটা চুমুর জুলুম বেশী। ভালোবাসার অত্যাচার বড়ো নিগূঢ় অত্যাচার। ধমক দিয়ে

করানো আর খোসামোদ করে কাজ করানো, রক্তচক্ষুর হুকুম আর সজল চক্ষুর মিনতি, স্পষ্ট গলার ফরমাস আর নীরব মনের প্রত্যাশা, একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। সে-জিনিসটা আর-কিছু নয়, এই যে গুরুজনের প্রতি আমাদের একটা জবাবদিহির দায় আছে, তাঁদের অমান্য করাটা একটা ছোটোখাটো রাজদ্রোহ, একটা petit treason! গুরুজনের তালিকাটি কিন্তু ছোটোখাটো নয়, সে তালিকায় নারীপক্ষে পতি দেবতাও আছেন। এবং শূদ্রপক্ষে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ। আমাদের সমাজময় ধাপের পর ধাপ, প্রতি ধাপ উপরের ধাপকে খাজনা দেয়, নীচের ধাপ থেকে আদায় করে, আমাদের সমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেকেই এক একটি বৌ-কাট্‌কী শাশুড়ী ও নির্যাতিতা বধূ, একাধারে প্রভু ও দাস। কিন্তু নীচের ধাপটা আছে বলেই উপরের ধাপটা আছে, দাস না থাকলে প্রভু থাকত না। প্রভুর দোষ তো স্পষ্ট, কিন্তু দাসেরও দোষ কম নয়।

নিজের পায়ে চলতে লজ্জা বোধ ক'রে যে শিশু অতি হিতৈষী গুরুজনদের সনাতন কাঁধে চড়ে চলে সে শিশু যখন অন্যদের সঙ্গে বাজী রেখে দৌড়তে পারে না তখন দোষ ধরে অন্যদের। এতখানি চিনির ভিতরে এত তিক্ত কুইনিন গোপন থাকে যে বেচারা শিশু তা টেরও পায় না এবং স্বভাব যাকে আপনি আরোগ্য করতো ঔষধের অভ্যাস তার ধাত বিগ্‌ড়ে দেয়, সে দোষ ধরে রোগের। রোগা ছেলের একে তো বারো মাসে তেরো অসুখ, সেই যথেষ্ট দুর্গতি। পরন্তু যদি অসুখের উপরেই তার সমস্ত মন পড়ে থাকে তবে সে হয় তারো বাড়া দুর্গতি। প্রতি দিনের জগৎটাকে সে বিস্ময়ের চোখে দেখতে পারে না, আনন্দের সুরে সাড়া দিতে পারে না, সৌন্দর্যের তুলি বুলিয়ে সুন্দরতর করতে পারে না। সর্বক্ষণ কেবল "ম'লুম", "ম'লুম", "গেলুম", "গেলুম", আর অভিসম্পাত আর আস্ফালন। ভুলেও একবার সন্ধান নেয় না কী অমিত বল তার আপন বাহুতে সুপ্ত, কী রসের উৎস তার আপন হৃদয়ে রুদ্ধ। একটুকু আত্মবিশ্বাস যদি তার থাকতো তবে তার ব্যাধি তো সারতোই তার স্বাস্থ্য হতো সংক্রামক, তার স্বাস্থ্যে জগৎ হতো সুস্থতর। সেই আত্মবিশ্বাসটুকু নেই বলে সে হয়েছে ব্যাধির দাস আর দৈবের দাসানুদাস। কিন্তু যে অসামান্য যৌবনশক্তিতে মানুষকে দিগ্বিজয়ী করে তাকেই সে হেলাভরে অবিশ্বাস করলে বিধাতারও সাধ্য নেই তার সখা হন্‌, বিধাতাও নিজের নিয়মে বাঁধা। বিধাতা তারি সারথি হয়ে সুখ পান যে রথীর ক্লৈব্য নেই।

যৌবনকে আমাদের দেশে অতি বিষম কাল বলে সন্দেহ করা হয়ে থাকে। সেই জন্য যৌবনাগমের পূর্ব হতেই যৌবনকে শায়েস্তা রাখবার জন্যে আমাদের স্থবিরতন্ত্র সমাজ দুটি উপায় করেছে। একটি, জাতিপ্রথা। অন্যটি, বাল্য-বিবাহ। জাতিপ্রথার উদ্দেশ্য ছিল পিতার পেশা পুত্র পাবে। বাল্যবিবাহের উদ্দেশ্য ছিল পিতার নির্বন্ধে পুত্র বিবাহ করবে। ইদানীং অবশ্য পিতার পেশার বদলে হয়েছে পিতার বাঞ্ছিত পেশা আর পিতার নির্বন্ধের বদলে হয়েছে পিতার বাঞ্ছিত বিবাহ। কিন্তু হরেদরে দাঁড়ায় ঐ একই—পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।

এ দু'টি ব্যবস্থার ফলে সমাজের আপাত সুবিধা কী হয়েছে, আমাদের কালো কালির ইতিহাসে লেখা, কিন্তু এ দু'টি আমাদের যৌবনের গোড়ায় গিয়ে বেজেছে। যৌবনের একেবারে গোড়াকার কথা, প্রতিভা ও প্রেম। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করবার যে শক্তি তার নাম প্রতিভা। আর অপরের প্রতিভার সহিত সংযুক্ত হয়ে ফলবান হবার যে প্রেরণা তার নাম প্রেম। বয়স না হতেই যৌবনের এই দু'টি পায়ে যদি চৈনিক ধরনের দু'টি লোহার জুতো পরিয়ে দেওয়া যায় তবে সমাজরক্ষীদের আর ভাবনা থাকে না, তারা সেই আয়ার মতো নিশ্চিন্ত হয় যে আয়া শিশুকে আফিং খাইয়ে বেহুঁশ করে আপনি ঝিমোয়। দুরন্তপনার পরিসর হারিয়ে শিশুটা যদি বা গুড্ কন্ডাক্ট প্রাইজ পাবার যোগ্য হয় তবু মানুষের মতো মানুষ হবার পরিসরকেও হারায়। খালিপায়ের দল যখন তাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলে যায় তখন সে টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। এই ঠুঁটো জগন্নাথের পক্ষে সেকালের ভারতবর্ষ ছিল মন্দিরের বেদীর মতো নিভৃত, অতএব নিরাপদ। কিন্তু একালের ভারতবর্ষের সে প্রাচীর ভেঙে গেছে, জগন্নাথ জীউকে মাটিতে নামতে হয়েছে, পৃথিবীর বিরাট কর্মক্ষেত্রে তাঁকে ঠেলা দিয়ে মাড়িয়ে যাবার লোক একটি নয় অসংখ্য, এখন তাঁকে বাঁচায় কিসে ? দেড়সহস্র বৎসরের লোহার জুতো এতদিনে পায়ের সঙ্গে মিশে গেছে, জরার বীজাণু রক্তের সঙ্গে সঙ্গে শিরায় শিরায় ঘুরছে, ভয় দখল করেছে হৃৎপিণ্ডের নির্জনতম দুর্গ !

প্রতিভার উদ্বোধনে পুরুষকারের উদ্বোধন। প্রতিভার উৎসমুখে পৈতৃক বৃত্তির জগদ্দল পাষাণ চাপিয়ে দিনে দিনে যে মানুষের পুরুষকারকে পক্ষাহত করা হোলো সে মানুষ কেবল মৌমাছির মতো নিখুঁত একটি চাক বাঁধতেই জানলে। না জান্‌লে বৈচিত্র্য না জানলে বৃদ্ধি না উদ্ভাবন না পরিবর্তন। অন্যেরা যখন উদ্যোগিতার দ্বারা এরোপ্লেনে উড়লো তখনো সে গরুর গাড়িতে চড়ে। কেন তার এ দশা ? কারণ শৈশব থেকে তাকে এমন করে আফিং খাওয়ানো হয়েছে যে সে তার সকল উদ্যোগের মূল মনটাকে ওড়াতে পারে না, ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠির পরে ভর দিয়ে হাঁটায়। নিজের গড়া কলকারখানায় অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়, অনেক লোকসান দিতে হয়, অনেক তার হাঙ্গামা, একটা দিনও নিশ্চিন্ত হবার যো নেই, প্রবল প্রতিযোগিতায় সমস্তক্ষণ উদ্‌ভ্রান্ত থাকতে হয়। অত গোলমালে যায় কে ? জগতের প্রতি দেশে প্রতিনিয়ত সমস্যা লেগে রয়েছে। যতই তারা একটার পর একটা সমস্যা অতিক্রম করছে ততই একটা না একটা নূতন সমস্যা তাদের পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। তবু তারা এমনি রুখে চলেছে যে তাদের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য ? সমস্যাই পথ ছেড়ে দেয় পুরুষকারকে, কিন্তু পুরুষকার যার গোড়া থেকেই আড়ষ্ট তার এক্তা জঞ্জাল।

প্রেমের উদ্বোধনে পৌরুষের উদ্বোধন। প্রেমের চাঁপা না ফুটতেই কীটের ভয়ে তার কোরকটিকে যারা ফুলদানীর ভিতরে রেখে নির্ভয়ে ফোটাতে চাইলে তারা পৌরুষকে ছেড়ে ক্লৈব্যকেই বরণ করলে ; তাদের কৃত্রিম চাঁপাতে উগ্রতা রইলো না বটে কিন্তু তেজও রইল না। চাষের কাজে লাগাবার জন্য যখন

গরুকে বলদ বানানো হয় তখন চাষের সুবিধা হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু যে গরু-টাকে নির্বীর্য করা হয় তার দ্বারা সৃষ্টিলীলা চলে না। "ভারতবর্ষীয় বিবাহ"ই ভারতবর্ষের পুরুষকে হরধনু ভঙ্গের পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দিয়ে কাপুরুষ বানিয়েছে। এ বিবাহে পিতৃজনের জাত-কুল-পদমর্যাদা তো বাঁচলো, কিন্তু সন্তানের হৃদয়কে যে ওড়বার আকাশ দেওয়া হোলো না, খাঁচায় বাস করতে বাধ্য হয়ে যে সে নীড়ের স্বাদ পেলে না, সেই দুঃখে সে যে বৈরাগী হয়ে বনে বেরিয়ে গেলো। সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্তি থেকে বঞ্চিত করে যাকে সৃষ্টির হুকুম করা হোলো সে বেঁকে বসে বললে, "গৃহের তপস্যায় আমার পৌরুষের পরীক্ষা নেই, দেখি যদি বনের তপস্যায় তা মেলে।" এমনি করে ভারতবর্ষের পৌরুষ প্রকৃতিকে ছেড়ে বিকৃতিকে ভাবলে মার্গ, হরধনুকে ছেড়ে লোটাকম্বলকে করলে সম্বল, যে নারীকে অর্জন করবার সুযোগ পায়নি সে নারীকে বর্জন করাটাকে বললে সন্ন্যাস, যে সংসারকে সুন্দর করবার প্রেরণা পায়নি সে সংসারকে শ্মশান করাটাকে বললে মুক্তি।

গোড়া কাটবার পরও আগায় কিছুকাল ফুল ফোটে, তাই এতদিন চলে এসেছে বলে আমরা ধরে নিয়েছি এইটেই নিয়ম। ঘরে বাইরে যখন দুর্গতির অবধি নেই তখনো আমাদের দৃষ্টি পড়ছে কেবল শাখার দিকেই, মূলের কথা আমরা ভুলেই রয়েছি। কিন্তু সংস্কার তুচ্ছ, বিপ্লব তুচ্ছ, আগায় জলসেচন করে মূলে রস যোগানো যায় না, মূল থেকে রস না পৌঁছলে শাখায় ফুল ফুটতে থাকে না, ফলগুলো বেঁটে খাটো হতে হতে কবে একদিন কুঁড়িতে মরে যায়। ভবিষ্যৎ মানে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর, ভারতবর্ষ যদি বা টিঁকে রয় তবু উঠ্‌তি দেশগুলোর মতই ষড়ৈশ্বর্যময় হবে তো? সৃষ্টির পুষ্পিত ঐশ্বর্যের জন্যে চাই মজ্জাগত স্বাধীনতা-রস, প্রতিভার স্বাধীনতা, প্রেমের স্বাধীনতা। প্রতিভাকে ও প্রেমকে আমাদের জরা-নীয়মান সমাজ নখদন্তহীন জরদ্গব বানিয়ে নিজেই ঠকে গেছে, সেই জন্য সে সমাজ এমন নিরানন্দ, এমন অচরিতার্থ, এমন বন্ধ্যা। সে জানেও না অপরাপর সমাজের তুলনায় কত দীনহীন তার দশা!

সৃষ্টির স্বাধীনতাই মানুষের মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ডটাকে যদি মুরুব্বিয়ানা করে শৈশব থেকে বেঁকিয়ে দেওয়া যায় তবে মাথাটা আপনি নুয়ে আসে, আগে গুরুজনদের পায়ের তলে, তারপরে বিশ্বজনের পায়ের তলে। সুবোধ বালকে ও সস্তা সতীতে সমাজ ভরে যায়, কিন্তু মানুষের মতো মানুষ 'লাখে না মিলিবে এক।' হাজার হাজার বৎসর আমাদের সুপুত্রের ও সুপত্নীর দল অপরের অবাধ্য হওয়াটাকে পরম অধর্ম ও নিজের উপরে আস্থাবান হওয়া-টাকে বিষম ভয়াবহ জ্ঞান করে এসেছেন। স্বাধীনতার চর্চাই আমাদের সমাজে নেই, স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত অবিশ্বাস করি, আমরা হাড়ে হাড়ে কর্তাভজা। স্বাধীনতার জন্য পরের তৈরি রাষ্ট্রে আমরা লম্ফঝম্প করি কিন্তু ঘরের তৈরি সমাজে যে যার গদীতে গদীয়ান, তখন পণ্ডিতের ছেলের জন্য মাকড়ের অর্থ হয় ধোকড়, স্বাধীনতার ব্যাখ্যা হয় স্বৈরাচার। অত্যন্ত অভ্রান্ত

গড্ডলিকাই যে-সমাজের ইষ্ট, স্বনিষ্ঠ পুরুষের তিলেক ভুলভ্রান্তিও সে সমাজের চোখে তালপ্রমাণ উচ্ছৃঙ্খলতা।

স্বাধীনতার স্বয়ং সংশোধিকা শক্তিতে যে আমাদের বিশ্বাস নেই তার একটা আধুনিকতম নমুনা আমাদের অত্যাধুনিক সাহিত্যের নির্জলা নিন্দা। সে সাহিত্যে বাড়াবাড়ি কিছু আছে, যৌবনের লক্ষণই হচ্ছে বাড়াবাড়ি। অন্য কোনো দেশ হলে এজন্যে কারুর মাথাব্যথা পড়তো না, প্রবহমান সাহিত্যের যা থাকে একদিন ফেনা তাই হয় একদিন তলানি। তাকে নাড়াচাড়া করলেই বরং তাকে উপরে রাখা হয়।

(১৯২৮)

সৃষ্টির দিশা

আমাদের একাধিক এক সহস্র সমস্যার কেন্দ্রগত সমস্যা তো এই। আমাদের যৌবন--প্রবাহ এত মন্থর যে প্রায় বন্ধ। সেইজন্যে যেটুকু আবিলতা ভরা গঙ্গাকে বৈচিত্র্য দেয় সেটুকু আবিলতা গঙ্গাজলের বোতলটাকে দূষিত করছে। অতি প্রাচীন সাহিত্যে যখন সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে অহল্যা দ্রৌপদীও ঠাঁই পেয়েছিলেন সে সাহিত্যে তখন আদর্শবৈচিত্র্য কেন, আদর্শবিরোধও ছিল। সত্যিকার আর্ট্ সম্বন্ধে নীতি দুর্নীতির প্রশ্নই ওঠে না, সে সম্বন্ধে একমাত্র প্রশ্ন সে আর্ট কিনা। গঙ্গা নদীতে পাঁক আছে না পদ্ম আছে এ প্রশ্ন অবান্তর, আসল কথা ওটা নদী কিনা। ওটা যদি distilled waterএর কাচে-ঘেরা চৌবাচ্চা হয় তবে ওতে স্নান করে শুচি হওয়াও চলবে না, ওতে সাঁতার দিয়ে ওর বেগ সর্বাঙ্গে অনুভব করাও চলবে না, ওর স্বাদ নিয়ে তৃপ্ত হওয়াটাও অসম্ভব হবে। কেবল ওর চারদিকে পাহারা দিয়ে ফেরা ছাড়া অন্য কোনো চরিতার্থতা থাকবে না। বলা বাহুল্য, কোটালের চরিতার্থতা কোটালের পক্ষে যতই উপাদেয় হোক, তস্করবহুল রাজ্যেও এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা লক্ষবিধ চরিতার্থতা চায়, তাদের ঘরে পাছে কেউ আগুন লাগায় এই ভয়ে তারা ঘরে বসে থাকবে না, বাইরেকে তাদের বড়ো দরকার।

যে সমুদ্রে অমৃত থাকে সেই সমুদ্রে গরলও থাকে। সেজন্যে দেবতারা একটুও চিন্তিত হয় না; তাদের মধ্যে এমন প্রাণবান পুরুষের অভাব হয় না যিনি গরলটাকে কণ্ঠে ধারণ করতে প্রস্তুত। তেমন পুরুষ না থাকলে ভাবনার কারণ ঘটত সন্দেহ নেই। তখন গরলের ভয় অমৃতের আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখতো। নিরাপদপন্থীরা পরামর্শ দিতেন, "অমৃতে কাজ কী বাপু? যেমন আছো তেমনি থাকা শ্রেয়।" কিন্তু তেমন থাকাটা যে ভয়ে ভয়ে থাকা, ভয় যে মরণেরো অধিক, কিমহং তেন কুর্যাম্?

জরাগ্রস্ত অস্তিত্বের মহৎ ভয় থেকে আমাদের ত্রাণ করতে পারে একমাত্র যৌবন-ধর্ম। সে ধর্ম যদি স্বল্পমাত্রও হয় তবু সে অমৃত, সে অজর করে।

তার আস্বাদ যদি পাই তো ঔষধ পথ্য মুখে রুচবে না, মাদুলী কবচ ছুঁড়ে ফেলে দেবো, ডাক্তার কবিরাজকে দূর থেকে নমস্কার জানাবো। ভিতর থেকে আমরা এত আনন্দ পাবো যে সেই আনন্দে আমাদের ব্যাধি তো যাবে সেরে, আমরা আনন্দ বিচ্ছুরিত করবো, জগৎকে আনন্দময় করবো। আমরা কৃপণের মতো আপনাতে নিবদ্ধ থাকবো না, আমরা বিশ্বসংসারের সঙ্গে যোগ দিয়ে সকলের ভার ভাগ করে নেবো। কঠোরতম তপস্যাকেই তো আমরা ভালোবাসি, সহজকে আমাদের একটুও ভালো লাগে না, সমস্ত জীবনটাই যদি একটা অসাধ্যসাধন না হয় তবে জীবনকে আমাদের কিসের দরকার? সুলভ সিদ্ধিকে ধিক্ থাক, দুর্লভ সিদ্ধিকেও আমরা চাইনে, সুসাধ্য নয় দুঃসাধ্য নয় অসাধ্যেরি উপরে আমাদের লোভ, সিদ্ধিমাত্রেই আমাদের অলভ্য। যে পথের শেষ আছে সে পথ আমাদের নয়, আমরা তো লক্ষ্য মানিনে, আমরা মানি অক্লান্ত চলার আনন্দ। আমরা যুবা, যতক্ষণ আমরা দুঃখের আগুন নিয়ে খেলা করি ততক্ষণ আমরা সুখে থাকি, আরাম আমাদের উষ্ণ রক্তকে শীতল করে দেয়। যতক্ষণ জ্যোতি ততক্ষণ জ্যোতিষ্ক, জ্বালা নিবে গেলে গ্রহ। তখন তার মাথায় দেখা দেয় পাকাচুলের মতো সাদা বরফ, সে বরফ তার একার নয়, সমগ্র সৌরজগতের আতঙ্ক। সে তো আভান্বিত করে না, কম্পান্বিত করে, নিজে তো জরেই, সকলকে জরায়।

নিজেদের যৌবনের উপরে যদি অটল বিশ্বাস রাখি তো যৌবনই আমাদের পথ দেখাবে, সে আমাদের যে পথে নিয়ে যাবে সেই আমাদের পথ, স এব পন্থাঃ। আমাদের পথ আমাদের চলবার আগে তৈরি হয়ে রয়নি যে পথনির্মাতার সাহায্য না নিলে পথ হারাবো, যা তৈরি হয়ে রয়েছে তা পূর্বপুরুষের পথ, সে পথ হারানোটাই ভাগ্য। সত্যের কোনো বাঁধা পথ নেই, যে পথ আমরা চলতে চলতে বাঁধি সেই আমাদের সত্যের পথ, পূর্বযাত্রীদের পথের সঙ্গে তার কোথাও যোগ কোথাও বিয়োগ; যোগ দু'জন স্বনিষ্ঠ পুরুষের হাত ধরাধরি, বিয়োগ দু'জন স্বনিষ্ঠ পুরুষের হাত ছাড়াছাড়ি। পূর্বপুরুষ উত্তরপুরুষকে দেয় আপন সত্যের স্মৃতি, উত্তরপুরুষ পূর্বপুরুষকে দেয় আপন সত্যের আভাস, কিন্তু সত্যকে কেউ কারুকে দিতে পারে না, সত্যকে আপনি উপলব্ধি করতে হয়। Self education ছাড়া education নেই, education-এর নামে যা চলছে তা আমাদের ভাবতে দেওয়া নয়, আমাদের জন্যে ভেবে রাখা, আমাদের চলতে দেওয়া নয়, আমাদের চালানো। তার দ্বারা আমাদের উপকার হতে পারে, স্বপ্রকাশ হয় না। ইউরোপের আধুনিকতম ইস্কুলেরও উদ্দেশ্য শিশুকে গড়ে তোলা, মানুষ করা, তাকে একটা বিশেষ প্রভাবের মধ্যে বাড়তে দেওয়া। কিন্তু প্রতিভা যে আগুনের মতো, উৎকৃষ্টতম ইস্কুলও তার পক্ষে কাঁচের ঝাড়ের মতো কৃত্রিম, সে যখন দিব্য তেজে জ্বলে তখন কাঁচকে ফাটিয়ে খান্‌খান্ করে। যে মানুষ হয় সে আপনি মানুষ হয়, সে নিজেই নিজেকে গড়ে, সে সব প্রভাব অতিক্রম করে। যাকে মানুষ করা হয়, গড়ে তোলা হয়, স্পষ্ট প্রভাবিত করা হয় সে একটি পোষা বাঘের মতো

স্বভাবভ্রষ্ট, সে একটি breeding farm-এর ফসল, তাকে দিয়ে সমাজের শান্তিরক্ষা হয়, কিন্তু সৃষ্টিরক্ষা হয় না, সৃষ্টি যে কেবলি আঘাত খেয়ে কেবলি চেতনা লাভ, কেবলি অপ্রত্যাশিতের সাক্ষাৎ, কেবলি প্রত্যাশিতের গাফিলি। যারা বলে ভাবী বংশধরদের আমরা উন্নত করবো তাদের শুভাকাঙ্ক্ষার তারিফ করতে হয়, কিন্তু তাদের সত্যিকার কর্তব্য নিজেদেরি উন্নত করা। ভাবী বংশধরেরা নিজেদের ভার নিজেরা নিতে পারবে এটুকু শ্রদ্ধা তাদের পরে থাক। সত্যকে পথের শেষে পাবার নয় যে বয়েসের যারা শেষ অবধি গেছে তারাই পেয়েছে। পথের শেষ নেই, বয়সের শেষ নেই, সত্যকে পদে পদে পাবার, দিনে দিনে পাবার। শিশুর কাছে শিশুর অভিজ্ঞতাই সত্য, যতদিন না সে বৃদ্ধ হয়েছে ততদিন তার পক্ষে বৃদ্ধের অভিজ্ঞতা হচ্ছে অকালবৃদ্ধতা।

কিন্তু শিশু যখন নিজের পায়ে চলতে গিয়ে পড়ে তখন সেই পতন কি তার পক্ষে ভয়াবহ নয়? নিশ্চয়। কিন্তু ততোধিক ভয়াবহ হিতৈষীর কাঁধ। নিধনে আর কিছু না বাঁচুক স্বধর্ম তো বাঁচে। ভ্রান্তি থেকে আর কিছু না পাওয়া যাক সত্যকে তো পাওয়া যায়। মানুষের ছ'টা রিপু ছাড়া আর একটা রিপু আছে, সপ্তম রিপু, সে রিপুর নাম ভয়। আশ্চর্য এই যে ছয় রিপুর বিরুদ্ধে আমাদের দেশে অনুশাসনের অন্ত নেই, কোন আদিকাল থেকে আমরা এদেরি সঙ্গে বজ্র আঁটুনি এঁটে আসছি, অথচ এদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ও সকলকে জড়িয়ে বিরাট যে ভয়রিপু তাকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি।

আমরা ভীরু নই, আমরা প্রেমিক, আমাদের যৌবনধর্ম আমাদের অন্তরের ধন, আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। মুক্তি যদি ভয়ের থেকে মুক্তি না হয় তবে মুক্তি আমরা চাইনে, আমাদের একমাত্র মুক্তি জন্ম থেকে মুক্তি নয়, মৃত্যু থেকে মুক্তি নয়, ভয় থেকে মুক্তি—জরা থেকে মুক্তি। কামক্রোধাদি রিপু এর তুলনায় নগণ্য; ভয়কে যদি জয় করতে পারি তো তাদের পায়ে দলতে পারবো। ভয়ই তো শয়তান, স্রষ্টার শত্রু, সৃষ্টির পতনকামী, পাপের মন্ত্রদাতা। আমরা যৌবনের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে ভয়ঞ্জয় হবো, আমরা দিগন্তগ্রাসী তামসিকতার মাঝখানে আলোকনিষ্ঠ প্রদীপের মতো জ্বলবো। অপরিমেয় শূন্যের মাঝখানে সূর্য যেমন যুগযুগান্তকাল জ্যোতি বিকীরণ করছে, সে জ্যোতি কত সামান্য দূর পৌঁছোয় মনেও আনছে না, চির সমস্যাময় দেশে আমরাও তেমনি চিরজীবনকাল আভা বিকীরণ করবো, সে আভায় কোন্ সমস্যা কতটুকু ঘুচলো হিসাব করবো না। সমস্যা প্রতি দেশে ও প্রতি যুগে আছে এবং সমস্যা সর্বত্র ও সর্বক্ষণ একসহস্র-এক। সুদূরতম ভবিষ্যতেও এর অন্যথা হবার নয়। লক্ষ বর্ষ পরেও এ পৃথিবী—যদি থাকে তো—এমনি সমস্যাময় থাকবে, সেকালের মানুষের সেকেলে মন একে এমনি অমনোমতো ভাববে, সেকালের আদর্শবাদীদের কাছে এর অপূর্ণতা এমনি অসহনীয় বোধ হবে। **সমস্যা দূর করবার জন্যে মানুষ নয়, সমস্যাকে ছাড়িয়ে ওঠবার জন্যেই মানুষ।**

সমস্যাসত্ত্বেও কী করে উঠতে পারি, কী হয়ে উঠতে পারি এই আমাদের ভাবনা। সমুদ্রকে সেঁচে ফেলার চেষ্টা বৃথা, সমুদ্রের উপরে ভেসে চলতে পারি কি না দেখতে হবে।

সমস্যা আছে বলেই ভাবিনে। ভাবি, সমস্যার দ্বারা যাতে অভিভূত না হই। দুঃখ আছে বলে দুঃখ নেই। দুঃখ, পাছে শেষ পর্যন্ত খাড়া না রই। বাইরের প্রতিকূলতাকে ভয় করিনে, ভয় করি আপন অন্তরের ভীরুতাকে। ভূতের ভয়ে মানুষ ভগবানকে ভক্তি করে, আপনার ভয়ে আমরা আপনাকেই ভক্তি করবো। আত্ম-অবিশ্বাস মানে আত্মঘাত। যৌবনের পদে পদে বিপদ, সারাটা পথ অনিশ্চিত। প্রতিদিন পরীক্ষা, চিরকাল হতাশা। অপরিসীম কষ্টস্বীকার, অপরিসীম ধৈর্যধারণ, অপরিসীম উৎসাহরক্ষা। অবিশ্রাম গতিবেগ, অবিরাম পরিবর্তন, অনাসক্ত ত্যাগভোগ। যৌবন যে সৃষ্টিকাল, সৃষ্টি যে চির প্রসব-বেদনা, সেই বেদনায় যাকে টানলো তার কেন শান্তিস্বস্তির প্রত্যাশা? সেই বেদনাই তার সৌভাগ্য।

তার জন্যে দুঃখের শেষে সুখ নেই, কেননা দুঃখের শেষ নেই। মর্ত্যের শেষে স্বর্গ নেই, কেননা মর্ত্যের শেষ নেই। তপস্যার শেষে বর নেই, কেন না তপস্যার শেষ নেই। চলতে চলতে যখন যা আসে তাই তার সুখ, কাঁটায় কাদায় ধুলোয় ভরা চলার পথই তার স্বর্গ আর চলতে পারাটাই তার বর। যৌবনকে যে অন্তরে ধারণ করলে সেই তো ব্রহ্মচারী, তার ব্রহ্ম যৌবনময় ব্রহ্ম। তার সন্ন্যাস বড়ো কঠিন সন্ন্যাস, কেননা মোক্ষ তার নেই। যে বেদনায় সূর্যতারাকে অবিশ্রান্ত ঘোরাচ্ছে, সেই বেদনা তাকে অবিশ্রান্ত পথে চলায়, জীবন থেকে জীবনে নিয়ে চলে, অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে। নির্বাণ? জ্যোতির্লোকের কি নির্বাণ আছে? নিজেকে নির্বাপিত করে সে-লোক থেকে যে দূরে সরে গেল সেই বিগতজ্যোতি চন্দ্রকেও ঘুরে মরতে হচ্ছে। সেই নির্বাণ কি কারুর কাম্য? মুক্তি? যতদিন না জগতের কণামাত্র বস্তু সৃষ্টিচক্র থেকে মুক্তি পায় ততদিন মহামানবেরও মুক্তি নেই, যে বাঁধনে পরমাণুকে বেঁধেছে সেই বাঁধনে তিনিও বন্ধ। শেষ দিন কোনো দিন আসবার নয়, সৃষ্টির শেষ নেই। নিজেরও শেষ খুঁজে পাবার নয়, শেষ পেয়েছি ভাবলেও পাওয়াটা সত্য নয়, ভাবনাটাই মিথ্যা। আত্মঘাতী যখন জীবনকে শেষ করেছি ভাবে তখনো সে বেঁচে। মরণ কেবল এক জীবন থেকে মুক্তি, আরেক জীবনে বাঁধা পড়া। বিশ্বসংসার থেকে পালাবার পথ যখন নেই তখন মানবসংসার থেকে পালাবার প্রয়াস কেন? এ সংসারে যদি আনন্দ না থাকে তো কোন্ সংসারেই বা আছে?

নির্বাণের তপস্যা আত্মহত্যার তপস্যা, মুক্তির তপস্যা পলায়নের। আমাদের তপস্যা সৃষ্টির তপস্যা, আমরা বিশ্বস্রষ্টার সহস্রষ্টা, তাঁর সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য সাহচর্য। আমাদের পদে পদে মোহভঙ্গ, তবু আমরা চিরপদাতিক। আমাদের চোখে নিদ্রা থাকবে না, তবু আমরা খোলা চোখের স্বপ্ন দেখবো। আমাদের বাহু নেতিয়ে পড়বে, তবু আমরা আনন্দলোক সৃষ্টি করতে থাকব। ভারতবর্ষের তরুণ তাপসের কতো দায়িত্ব! যে সৃষ্টি তার জন্যে অপেক্ষা

করছে সে কি সামান্য সৃষ্টি ! সে কি এত তুচ্ছ যে একটু আধটু জোড়াতালির সাপেক্ষ ! দু'দশটা সংস্কার বিপ্লবের ব্যাপার ! কঠিনতম বলেই তো তার দ্বারা পৌরুষের আত্মপরীক্ষা, প্রতিভার নব নবোন্মেষ, প্রেমের দেশব্যাপী প্লাবন। লক্ষ বর্ষ পরেও সাধের ভারতবর্ষ সৃষ্টি হতে থাকবে, সৃষ্ট হয়ে উঠবে না, উত্তরোত্তর পুরুষের পৌরুষকে প্রতিভাকে প্রেমকে এমনি সৃষ্টিতৎপর রাখবে, ছুটি দিয়ে বন্ধ্যা করবে না। আমাদের কয়েক সহস্র বর্ষের ইতিহাস তো ইতিহাসের ভূমিকা, এখনো আমাদের সকল হওয়াই বাকী, আমাদের হয়ে-ওঠা অনন্তকালে চলবে। ভারতবর্ষের তরুণ তাপসকে প্রতিমুহূর্তে সতর্ক থাকতে হবে, পাছে কখন মার এসে বলে "আমি ভানুমতীর ম্যাজিক জানি, চোখের সামনে ফল ফলিয়ে দেবো, আমার scheme সদ্যফলপ্রদ।" যা কিছু তপস্যাকে সরল সংক্ষিপ্ত করে দেয় তাই তপস্বীর প্রলোভন। তপস্যার অন্তক তপস্বীরও অন্তক। সফলতা যার কাম্য নয় তাকে ফলের লোভ যে দেখায় সেই তো কাম, তাকে ভস্ম করতে হবে। ফল আপন সময়ে আপনি আসে, তার জন্যে উদ্‌গ্রীব আগ্রহে ফুল ফোটানো ফেলে রাখবো না, ফুলের ঋতুতে ফুটে উঠে ফলের ঋতুতে ফলবো ! একটি ঋতুকে বাদ দিলে কোনোটিরই স্বাদ পাইনে। দশমাস গর্ভে না ধরে যাকে পাওয়া যায় তাকে পাওয়ার চেয়ে মৃতবৎসা হওয়া বরং আনন্দের। জীবনের কোনো অনুভূতিকেই পরবর্তী অনুভূতির খাতিরে লাফ দিয়ে অতিক্রম করা চলে না, পরিপূর্ণ দাম্পত্যের পরে পরিপূর্ণ বাৎসল্য।

সংস্কার ও বিপ্লব বাইরের জিনিস, সুস্থ সমাজে ও দুটো আপনা-আপনি হতে থাকে, সুস্থ দেহে যেমন ত্বক বদলায়। ওদের চেয়ে বড়ো কথা সমাজের স্বাস্থ্যবিধান, রক্তের জোর অটুট রাখা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অবিকল রাখা। এর জন্যে চাই অন্তরের উদ্বোধন, অন্তরের দিক থেকে বাইরেকে সৃজন। এ ক্রিয়া যখন পূর্ণ তেজে চলে তখন ভাত কাপড়ের ভার নিতে একটুও বাজে না, বরং সে ভার বইবার আনন্দ হয় স্বতঃস্ফূর্ত। অন্তর যখন প্রাণোচ্ছল হয় তখন দেহধারণের অসীম আনন্দ মানুষকে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর সীমা ভুলিয়ে দেয়, মানুষ কঠিন কিছু করতে পেলে বেঁচে যায়, সাধ্য সাধনা তাকে পীড়িত করে, হাতে হাতে ফল লাভ তার পক্ষে demoralisation—চরিত্রভ্রংশ। সেই জন্যে তরুণ-ভারতকে নিতে হবে অন্তরের দিক থেকে সৃষ্টি করবার ব্রত। বাইরের দিক থেকে বদলে যাওয়া তা হলে আপনা-আপনি হতে থাকবে, দম দিলে ঘড়ির কাঁটা আপনা-আপনি চলে, সারাক্ষণ হাতে ধরে চালিয়ে দিতে হয় না। আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকারী অন্তরের মধ্যে যৌবনকে অনুভব করা। দেহ মনের স্তর ভেদ করে আত্মা থেকে যৌবনরস উৎসারিত করতে হবে, যেমন মাটি পাথরের স্তর ভেদ করে artesian well থেকে জল উদ্ধার করা হয়। এই খনন কার্যে শ্রান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই, শেষ নেই। সেই জন্যে এই কার্যই তরুণ ভারতের আত্মসম্মানের উপযুক্ত। এর চেয়ে সহজ কাজ তার পক্ষে অপমানকর। সে তো ফাঁকি দিতে চায় না, সে কাজই দিতে চায়। কিন্তু সে কাজ যদি কঠিনতম না হয় তবে তার পৌরুষ লজ্জা পায়, তার অন্তর সায় দেয় না, সে

বেগার খাটতে খুঁৎ খুঁৎ করে ও প্রেরণার অভাবে বেকার বসে রয়। স্বতঃস্ফূর্তির কাজ তো কেবল কাজ নয়, সে খেলা। খেলার আনন্দ যখন কাজের আনন্দের সঙ্গে মিতালি পাতায় তখন বেদনার থেকে ভার চলে যায়, দুঃখের থেকে হুল চলে যায়, কাজও হয় অকাজের বহুগুণ। তখন একে একে দেশের সবই হয় এবং যা সকলের কল্পনারও অতীত তাও কেমন করে হয়ে উঠে আশ্চর্য করে দেয়।

ঘর ছেড়ে যদি বাহির হই তো আমরা সুলভ অভিসারে বাহির হবো না, আমরা তাঁরি অভিসারে বাহির হবো যাকে সর্বস্ব দিয়েও কেউ কোনো দিন পায়নি ও পাবে না, আমরা চাই পূর্ণ পূর্ণতম অমৃতধন চির কৈশোরকে। Rolland-র এই মন্ত্রটি যেন আমাদের মন্ত্রণা দেয়—"Always to seek, always to strlve. NEVER to find, never to yieid".

(১৯২৮)

প্রচ্ছন্ন জড়বাদ

বহুসহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের যখন যৌবন ছিল তখন সে যৌবন কোনো দিকে কোনো সীমান্ত মানে নি। সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে শিল্পে ও বাণিজ্যে রাজ্যবিস্তারে ও ধর্মপ্রচারে বামনদেবের পায়ের মতো স্বর্গমর্ত্যপাতাল জুড়তে গিয়ে সে নিরাপত্তিতে মেনে নেয়নি যে পূর্ব হতে যেটুকু তার ছিল সেই পদতল-গত ভূমিটুকুর বাইরে সে পা বাড়াতে পারবে না। নিজের সীমা জানবার জন্যে নদীকে বার বার কূল ছাপিয়ে পাড় ধ্বসিয়ে জনপদ দখল করতে হয়, তাতে যার লোকসান সে পারে তো পাথরের বাঁধ দিয়ে ঠেকাক, না পারে তো ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চোখের জলে বুকের রক্ত লোকসান দিক। কিন্তু নদী তো খাল নয় যে বাঁধের শাসন মেনে ঘোমটা পরে বৌয়ের মতো জড়সড় হয়ে পা গুণে গুণে চলবে। নদীকে দুকূল ভাসিয়ে দুকূল আবিষ্কার করতেই হবে, নইলে তার আপনাকে জানা হবে না। আত্মানং বিদ্ধি।

মানুষের ইতিহাসে যখন যে জাতির মধ্যে যৌবনের বন্যা নেমেছে তখনি সে জাতি দুই কূল ভাসিয়েছে। অন্তর্জগৎ বা বহির্জগত আধ্যাত্মিক বা আধি-ভৌতিক দেহ বা মন কোনো একটা কূলের প্রতি তার একান্ত পক্ষপাত ঘটেনি। গ্রীস রোমের যখন যৌবন ছিল তখন তারা দুইদিকে সাম্রাজ্য জিনেছিল, মাটির উপরে ও মনের ভিতরে। আধুনিক ইউরোপ আপন আত্মার গুহা থেকে যৌবনের তত্ত্ব উদ্ধার করেছে, তাই পৃথিবীর অর্ধেক ছাপিয়েও সে আপনার কূল পায়নি, মার্সকে পর্যন্ত ছাপাবার অদম্য উদ্যমে লেগেছে। কিন্তু ইউরোপের বাইরের সাম্রাজ্য তো তার দুই কূল নয়, তার অন্তরের সাম্রাজ্যও তার একটি কূল। সেদিকেও তার বিস্তারের সীমা নেই, ঐককেন্দ্রিক বৃত্তাবলীর মতো সে তার অন্তরের পরিধি বাড়িয়েই চলেছে, তার আর্ট তার বিজ্ঞান তার দর্শন—সবসুদ্ধ তার কালচার—প্রতিদিন খোলস ছেড়ে নূতন হয়ে উঠছে, প্রতিদিন

যুগান্তর সৃষ্টি করছে। ইউরোপের যদি অন্তরের ঐশ্বর্য না থাকতো তবে তার বাইরের ঐশ্বর্যও থাকতো না। যে কারণে মানুষ অন্তরে ঈশ্বর হয়, সেই কারণেই মানুষ বাইরেও ঈশ্বর হয়। একই যৌবন দেহকে ও মনকে একবৃন্তে দুই ফুলের মতো ফোটায়।

ভারতবর্ষের যৌবনকালে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার বড়াই করেনি, আধিভৌতিকতার জন্য লজ্জিত হয়নি। তার ভিক্ষুরা চীনে জাপানে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রেমের সীমানা বাড়িয়েছেন, তার ভাগ্যান্বেষীরা জাভায় গিয়ে সুমাত্রায় গিয়ে ভারতবর্ষের বলের সীমানা বাড়িয়েছেন, তার বণিকেরা রোমে মিশরে গিয়ে ভারতবর্ষের ধনের সীমানা বাড়িয়েছেন। তার মনু ধর্মশাস্ত্র সংকলন করেছেন, তার কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র সংকলন করেছেন, তার বাৎস্যায়ন কামশাস্ত্র সংকলন করেছেন। তার রাজারা প্রতি শরৎকালে দিগ্বিজয়ে বাহির হয়েছেন, তার ঋষিরা চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রমটাকেই সর্বস্ব করেননি। তার নারীরা স্বয়ম্বরা হয়েছেন, তার পুরুষেরা স্ত্রীরত্নের জন্য জাতকুল মানেননি। পরিপূর্ণতম যৌবনের বিচিত্রতম আত্মপ্রকাশ তখনকার সমাজকে বিশৃঙ্খল করেছে, কিন্তু সেই বিশৃঙ্খলতার শতসহস্র ডালপালার মূলে রয়েছে যৌবনরসের ঐক্য। যৌবনরসের যখন কমতি ঘটে তখন শত সহস্রকে ছেঁটে কেটে বিশপঁচিশটিতে পর্যবসিত করলেও পুষ্পিত রাখা যায় না। আর যৌবনরসের যখন বাড়তি ঘটে তখন শতসহস্রের স্থলে লক্ষকোটি হলেও ফুলে ফলে ভরে যায়। সুস্থ সমাজের পক্ষে বিশৃঙ্খলার প্রশ্নই ওঠে না, একমাত্র প্রশ্ন সে সমাজ সুস্থ কি না। আর রুগ্ন সমাজের পক্ষে সুশৃঙ্খলা কিছুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্যকর নয়, মাথার চুল খাটো করলেও মাথাব্যথা থাকে। ভরা নদীতে পাঁক আছে কি না এ প্রশ্ন হাস্যকর, শুকনো চড়াতে যে পাঁক নেই এটা মরা নদীর পক্ষে বড়াই করবার কথা নয়।

ইউরোপে এত দেশ এত ভাষা এত সম্প্রদায় এত দল। মারামারি হানাহানি দলাদলির না আছে সংখ্যা না আছে সীমা। তবু ইউরোপের শিরা-প্রশিরার তলে তলে এমন একটি রক্তপ্রাচুর্য আছে যে প্রাচুর্য জ্ঞাতিবিরোধ সত্ত্বেও জার্মানকে ইংরাজকে, মতবিরোধ সত্ত্বেও ক্যাথলিককে নাস্তিককে, স্বার্থবিরোধ সত্ত্বেও ক্যাপিটালিস্টকে কম্যুনিস্টকে, দৃষ্টিবিরোধ সত্ত্বেও প্রবীণকে তরুণকে প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি যোগায়। বিরোধ যত বড়োই হোক বিরোধে যে শক্তির পরিচয় সে শক্তি তারও বড়ো। সেই জন্যে গত মহাযুদ্ধের অকল্পনীয় রক্তক্ষয়ের পরেও ইউরোপের রক্তাল্পতা ঘটলো না, গভীরতম ক্ষতের চিহ্ন মলিনতম হয়ে এলো এবং দেখতে দেখতে ইউরোপ নবকলেবর ধারণ করলে। যৌবন কত প্রবল হলে এমনটি সম্ভব হয় তা আমরা কত শত বৎসর হতে ভুলেছি বলে ইউরোপকে বলি জড়বাদী। আর অধ্যাত্মবাদী নাকি আমরা যাদের অনটন শুধু অন্নবস্ত্রের হলে তো ভাবনা ছিল না, অনটন একেবারে যৌবনের, যে যৌবন মানুষকে সাহসে সংকল্পে উদ্যোগিতায় ঘরে স্থির থাকতে দেয় না, বাইরে ঠেলে নিয়ে বিশ্বজয়ী করে দেয়, জ্ঞানে প্রেমে পরাক্রমে শুধু সচ্ছল করে না

উচ্ছল করে। হায়! আমাদের কি কেবল অন্নের দুর্ভিক্ষ! আমাদের দুর্ভিক্ষ যে অমৃতের! অমৃত থাকলে অন্ন আপনি আসে, না থাকলে যদি বা আসে তবে যেতে বিলম্ব করে না। তবু জড়বাদীর মতো আমরা ভাবছি কোন্যেমতে যদি একবার আমরা দু'মুঠো খেতে পাই তবে আমাদের আর ভাবনা নেই, আমরা আমাদের পিতৃপিতামহের মতো নিশ্চিন্তমনে হরিনাম করতে করতে নশ্বর জড়পিণ্ডটা ত্যাগ করে শাশ্বত অমৃতলোকে প্রস্থান করতে পারব! কিন্তু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবার জন্যে যে কত বড়ো আত্মার কতখানি উদ্বোধন দরকার ইউরোপকে দেখলে তা বুঝতে পারি।

দুঃখ ইউরোপেরও আছে, আমাদের চেয়ে বেশি বই কম নয়। মাটি জল হাওয়ার সঙ্গে মানুষের যেন হন্তা-হন্যমান সম্পর্ক। শীতে বর্ষায় বরফে কুয়াশায় প্রাণ হাতে করে বাঁচতে হয়, একমুঠো অন্নের জন্যে কলা-কৌশলের এক মুহূর্ত ক্ষান্তি নেই। তবু মানুষ এখানে চক্রবর্তী সম্রাট। সে যে কেবল পঞ্চভূতের ফণার উপর খড়ম রেখে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, সে বাঁশি বাজাচ্ছে। তার কোটি দুঃখের চেয়েও সে বড়ো, সে দুঃখের কোটিপতি, সে দুঃখকুবের। ইউরোপের জীবনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, এ যেন বন্যার মতো জোরালো এবং ঘোরালো, এতে সর্বক্ষণ নৌকাডুবি সর্বক্ষণ নৌচালনার গৌরব। ইউরোপ মানবজাতির মান রেখেছে। ইউরোপের মধ্যে মানুষ নিজের রাজরাজেশ্বর মূর্তি দেখছে। এই যেন প্রাচীন ভারতের সত্যিকার উত্তরাধিকারী। এত বিশৃংখলা বুঝি কোনো দেশের কোনো সমাজে নেই, ভালোমন্দ সুন্দর কুৎসিত শুচি অশুচি সব এক সঙ্গে একই বন্যায় নৌকা ভাসিয়েছে, এক-একটি মানুষ যেন এক-একটি চরিত্র। এই যে মানুষ ফি ঘণ্টায় আকাশে ওড়ার রেকর্ড বাড়াতে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে, মোটর সাইকেলের গতি বেগ বাড়াতে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে, ব্যাধি-বীজের স্বরূপ আবিষ্কার করতে প্রাণ দিচ্ছে—এ মরণ সুখের মরণ নয়, ডাবা হুঁকোটি হাতে করে শীতলপাটির উপরে দেহত্যাগ নয়, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে সতী সাধ্বীর মতো স্বর্গযাত্রা নয়। মেয়েপুরুষ মিলে এই যে সহমরণ এ কখনো আকাশের শেষ খুঁজতে গিয়ে, কখনো পাতালের তল খুঁজতে গিয়ে, কখনো অকারণে কখনো কুকারণে। দারিদ্র্যেরও অবধি নেই—প্রতিদিন পুরানো যন্ত্রকে নাকচ করে নতুন যন্ত্র উদ্ভাবিত হচ্ছে, পুরানো যন্ত্রীদের অন্ন যাচ্ছে, বেকার সমস্যা বাড়ছে বই কমছে না। পাপেরও পরিসীমা নেই, অতি অপর্যাপ্ত পাপ। তবু এত লোকসান দিয়ে মানুষ নিজের বিচিত্র রূপ দেখছে, ফিরে যাবার নামও করছে না।

সংসারে দুঃখ দ্বন্দ্ব বিশৃংখলা চিরদিন ছিল, চিরদিন থাকবে। সংসারোহয়মিব অতীব বিচিত্রঃ। যে সব খণ্ডকে নিয়ে বিচিত্রের অখণ্ডতা তাদের কারোরই সীমা নির্দিষ্ট নেই, নিজের নিজের সীমা লঙ্ঘন করে তারা নিজের সীমা খুঁজতে যায়, পরস্পরকে আঘাত করে ও পরস্পরের দ্বারা আহত হয়, পরস্পরকে আত্মসাৎ করে বা পরস্পরের আত্মসাৎ হয়। এই সীমা খোঁজবার দুর্নিবার আগ্রহে তথাকথিত জড় কেমন করে জীব হয়ে উঠলো, জীব কেমন করে যুবা হয়ে উঠছে। তথাকথিত জড়ের দুঃখ যদি এত, জীবের দুঃখ তবে কত! আর জীবের

দুঃখ যদি অসীম হয়, যুবার দুঃখ তবে কী অপরিসীম! যার যত চেতনা তার তত বেদনা। সীমা জানবার আগ্রহ যার যত প্রগাঢ় বাধা সরাবার দায় তার তত প্রচুর। যুবার বাধা কখনো বহিঃপ্রকৃতির দেওয়া, কখনো অন্তঃপ্রকৃতির দেওয়া, কখনো অপরের দেওয়া, কখনো আপনার দেওয়া। বাইরে-ভিতরে সমষ্টিতে-ব্যষ্টিতে মিলিয়ে বিরাট বিশ্বসংসারে কি বিরুদ্ধতার ইয়ত্তা আছে! পরমাণু থেকে পরমজ্ঞানী পর্যন্ত কেউ জানে না কত দূর কার সীমা, ভিড়ের মধ্যে সকলেই সকলকে ঠেলে, ধাক্কা খায়, ধাক্কা দেয়। তুমি যদি নিষ্ক্রিয়ই হও তবু ধাক্কাটি তো খাবে এবং খেয়ে অপরের ঘাড়ে তো পড়বে। নিষ্ক্রিয়ই হও সক্রিয়ই হও দুঃখ পেতেই হবে, দিতেই হবে। যদি বলো, 'কোনোটাই হবো না, একেবারে নির্বাণ চাই, আদপেই থাকবো না' তবু নিস্তার নেই, তুমি ছাড়তে চাইলেও কম্‌লী নেহী ছোড়তী, বিশ্ব তোমাকে ছাড়বে না, সামান্যতম কণাটুকুকে পর্যন্ত সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরবে। যা-কিছু আছে তার রূপ রূপান্তর আছে, কিন্তু তার নাস্তিত্ব নেই। শূন্যেও শূন্য নয়। অনিত্যও সত্য।

টিঁকে থাকতে হলে নিষ্ক্রিয় হলেও চলে, কিন্তু বাঁচতে হলে সক্রিয় হতে হয়। সে বাঁচা শতং সমাঃই হোক, আর একটি ঘণ্টাই হোক। তথাকথিত জড় যথেষ্ট সক্রিয় ভাবে বাঁচে না, প্রকৃতির কোলে পুতুলটির মতো ঘুমায়, তাই তার ভিতর-কার পুরুষ আড়মোড়া দিলে, দিয়ে জীব হলো! জীবও সক্রিয় ভাবে বাঁচে না, প্রকৃতির দোলনায় শিশুর মতো ঝিমায়, তাই তার ভিতরকার পুরুষ চোখ রগ্‌ড়ে লাফ দিয়ে উঠলো, উঠে যুবা হতে লাগলো। প্রকৃতির আওতা ছাড়িয়ে যতই সে বাড়ে প্রকৃতি ততই তাকে কোলপোঁছা করতে প্রাণপণ করে। কিন্তু সে তো পুতুল নয়, শিশু নয়, সে যুবাপুরুষ। সে প্রকৃতির স্বামী, তার স্বামীত্বের মধ্যেই প্রকৃতি নিজের সেবিকাত্বের সার্থকতা পায়। তার কাছে হার মেনেই প্রকৃতির আনন্দ, সেইজন্যে প্রকৃতি তাকে হার মানাবেই বলে পণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতি তাকে যত দুঃখই দেয় কোনো দুঃখ তাকে নিচু করতে পারে না, দুঃখেরই উপরে পা রেখে সে উঁচু হয়ে ওঠে, মাথার বোঝাকে করে পায়ের আসন। বহিঃ-প্রকৃতিকে ভোগে লাগিয়ে সে দেহ ধারণ করে, অন্তঃপ্রকৃতিকে যোগে লাগিয়ে সে মন ধারণ করে। সে মাটিকে দিয়ে ফসল ফলায়, আগুনকে দিয়ে রান্না করায়, জলকে দিয়ে নৌকা টানায়, আগুন জলকে বাষ্প করে যন্ত্র চালায়। সে কামকে করে তোলে প্রেম, ভয়কে করে তোলে ভক্তি, অহংকারকে করে তোলে আত্মজ্ঞান, ঈর্ষাকে করে তোলে উপচিকীর্ষা। তাকে অভিভূত করতে পারে এত সাধ্য কারুর নেই, environmentকে বশ করতে করতেই সে বিবর্তিত হলো, heredityকে কাটিয়ে উঠতে উঠতেই সে হয়ে উঠলো, না প্রকৃতি না পূর্বপুরুষ কেউ তাকে সীমানির্দেশ করতে পারলে না, অসীম দুঃখকে আত্মসাৎ করে সে অসীমতর আপনাকে জানতে জানতে চললো।

লক্ষ লক্ষ cellকে নিয়ে তার দেহ, লক্ষ লক্ষ প্রবৃত্তিকে নিয়ে তার মন, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে নিয়ে তার সমাজ। সবাই আপন আপন সীমা জানবার জন্যে সীমা ছাড়াতে চায়, অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী, জটিলতা অনিবার্য। সামনে আরো

লক্ষ লক্ষ বৎসর, দিন দিন দুঃখ আরো দুঃসহ হতে থাকবে, জটিলতার অঙ্ক চক্রবৃদ্ধি হারে এমন দুর্বোধ্য হতে থাকবে যে কোনো-একজন মানুষকে বোঝবার ক্ষমতা বা অবসর কোনো-একজন মানুষের থাকবে না। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ভবিষ্যৎ ভাবতে বসলে কূলকিনারা মেলে না। প্রতি মানুষের গণপ্রকৃতিকে খর্ব করতে করতে প্রতি মানুষের ব্যক্তিপ্রকৃতি যতই বৃহৎ হতে থাকবে মানুষ মাত্রেরই দুঃখ ততই সূক্ষ্ম হতে থাকবে এবং একের সূক্ষ্ম দুঃখের সঙ্গে অপরের সূক্ষ্ম দুঃখের সহানুভূতি ততই দুঃসাধ্য হতে থাকবে। যেসব যুগকে আমরা পিছনে ফেলে এলুম সেসব যুগের দুঃখগুলো এর তুলনায় শিশুসুলভ। মানুষকে Socrates-মতো প্রশান্তবদনে বিষপান করতে হবে, কাপুরুষের মতো পালিয়ে বেড়ালে চলবে না। বিষকে যদি ফাঁকি দিই তবে অমৃত আমাদের ফাঁকি দেবে। অথচ বিষকে ফাঁকি দিলে যে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারবো এমন ভরসাও নেই। বিশ লাখ বৎসর পরে এ পৃথিবীর তাপ নিবে যাবে, বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি একে বাসযোগ্য রাখতে পারি কিংবা গ্রহান্তরে না উড়ে যাই তবে ততদিনে পশু পাখি গাছপালার সঙ্গে আমরাও বরফ হয়ে থাকবো। কত শত প্রাণী নির্বংশ হয়ে গেলো, মানুষ যে কোটি কোটি বৎসর থাকবে এতটা আশা করা যায় না। মার্স-ভিনাসে উপনিবেশ করবার পরেও একদিন নির্বংশ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কত বিরাট কত অসীম কেমন অনাদ্যন্ত এ জগৎ! এর ভিতরে যা-কিছু আছে তার রূপ-রূপান্তর আছে, কিন্তু নির্বাণ কোথায়! মানুষ অন্যরূপে থাকবেই, কিন্তু যতক্ষণ এই রূপে থাকে ততক্ষণ যেন সে এই রূপের মান রাখে, সীমা খোঁজে, দুঃখ সয়, বিচিত্র হয়!

ভারতবর্ষের মানুষ যেদিন সব মানুষের নেতা ছিল সেদিন সব মানুষের চেয়ে যুবাও ছিল। তার দুঃখের দিকটাও ছিল সেই অনুপাতে বিপুল। যুদ্ধ মহামারী দুর্ভিক্ষ যে তার অজানা ছিল এহেন সত্যযুগে সে ছিল না। এগুলো যদি নাও ছিল তবু ঋষিকে সত্যের ধ্যানে বীরকে মঙ্গলের প্রচেষ্টায় শিল্পীকে সৌন্দর্যের অভিসারে অক্লান্ত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। সে কষ্টের কোনো বাঁধা অভ্যাস ছিল না বলে সে ছিল ইতর সাধারণের সংসারকষ্টের চেয়ে নব নব আঘাত প্রতিঘাত সংকুল। তখনকার ভারতবর্ষের সেই বেদনার সৃষ্টিকে আমাদের গত দেড় সহস্র বৎসরের পূর্বপুরুষেরা ভাঙিয়ে খেয়েছেন, তাই নিয়ে তাঁদের যা-কিছু গর্ব। তাঁরা নিজেরা যা সৃষ্টি করেছেন তা এত সামান্য যে এক কালিদাসের কালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের লোক তার বেশি সৃষ্টি করেছিলেন। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতবর্ষ যেন সূর্যবিরহিতা রাত্রির মতো অন্ধকারে ছিল, তারার মতো ঝিকমিক করছিলেন কেবল চৈতন্য কবীর তানসেন তুলসীদাসেরা। গত এক শতাব্দীর পুনর্জাগরণের উষাকালেই আমাদের নিকট পূর্বপুরুষেরা তার পূর্বের দেড় সহস্র বৎসরকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন, কিন্তু আমরা মানুষের নেতা হতে পারিনি, আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বমানব তার সীমার সন্ধানী হয়নি, আমাদের ঘরোয়া তপস্যাটুকু সমগ্র মানব জাতির বৈচিত্র্যের তপস্যা নয়।

এর কারণ বহু শতাব্দীর সংস্কারবশত আমরা আত্মায় কৃপণ রয়েছি, আত্ম-

অবিশ্বাসী না হই, আত্ম-অল্পবিশ্বাসী। এখনো আমরা আধ্যাত্মিকতার নাম করে নিজেদের অজ্ঞাতসারে জড়বাদ কপ্‌চাই। সেইজন্যে যন্ত্রের প্রতি আমাদের বিরাগ, দেহ সম্বন্ধে আমাদের বৈরাগ্য, সমাজকে সরল করবার জন্যে আমাদের প্রয়াস, সমস্যাকে চিরকালের মতো মীমাংসা করে ফেলতে আমাদের প্রবৃত্তি, দুঃখকে দূর করবার দিকে আমাদের অভিযান। জড়বাদ বলতে আমি বুঝি বাইরের দ্বারা অন্তরের নিয়ন্ত্রণ, আবেষ্টন কর্তৃক আত্মার উপর প্রভাব, প্রকৃতির কাছে পুরুষের পরাভব। জড়বাদীরা ভাবেন বাহিরকে বদলালে অন্তর বদলাবে, অভাব দূর করলে স্বভাব নষ্ট হবে না, জটিলতা ছেঁটে ফেললে সারল্য ফিরে আসবে। কিন্তু বাহিরকে বদলাতে হলে অন্তরেরই সাহায্য নিতে হয়। আর অন্তরেরই সাহায্য নিতে হয় যদি, তবে বাহিরকে কেনই বা বদলাতে চাওয়া, বাহিরটা আপনিই বদলাক না! অন্তরকে কেন লীলা করতে ছেড়ে দাও না, কেন একটা উদ্দেশ্যের বেগার খাটাও? একটা উদাহরণ দিই। সাধুরা বলেন কামিনীকাঞ্চন পরিহার না করলে সাধনাই হয় না। অথচ পরিহার করতে গেলেই পরিহার করা শক্ত হয়, কেননা যাকে পরিহার করতে চাই সে পিছু নেয়। সারা জীবন এমনি চলে, শেষ পর্যন্ত ভয় ছাড়ে না। না-মন্ত্রের সাধনামাত্রেই এরকম। প্রশ্ন হচ্ছে, যিনি না-মন্ত্রের দুরূহতম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারেন তিনি কি হাঁ-মন্ত্রের দুরূহতম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না? অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চন সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ হতে পারেন না? না যদি পারেন তবে তাঁর অক্ষমতা থেকেই গেল। আমাদের ছুঁৎমার্গী আচারনিষ্ঠদেরও সেই দশা—ঠুন্‌কো কাঁচের মতো একটু ছোঁয়া লাগলে চুরমার।

আঁধার নিঃশেষ করবার প্রয়াস বৃথা, নিজে উজ্জ্বল হয়ে সকলকে উজ্জ্বল করো, দেয়ালী অমাবস্যার রাত্রে একটি দীপের শিখা সকল দীপে সঞ্চারিত হোক। চাই জ্ঞানের আলো, প্রেমের আলো, শক্তির আলো। দুঃখ এতে একটুও কমবে না, মানুষকে সুখের আশা দিয়ে ভোলানো পাপ। কিন্তু দুঃখকে বহন করবার গৌরব বাড়তেই থাকবে, অসাধ্যসাধনের ব্যর্থতা বহন করতে শেখানো পুণ্য। মানুষকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা যেন তাকে উল্টো না বোঝেন, সে সুখ শান্তির কাঙাল নয়, সে চায় বিচিত্রতম উপলব্ধি। সে তো দুর্বল নয়. যাঁরা তাকে দুর্বল বলে বলে তাকে ভিতর থেকে দুর্বল করে তোলেন তাঁরা তার দয়াময় শত্রু, যারা তাকে দ্বন্দ্বে ডাকে তারাই তার নিষ্ঠুর মিত্র। মানুষ তো দয়া চায় না, চায় শ্রদ্ধা। মানুষকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন তাঁরা তার দুঃখে এতই ব্যথিত হন যে তার দুঃখ লাঘব করতে চান না, তাকে বজ্রকণ্ঠে ডেকে বলেন, "I have not come to give you peace. I have come to give you the sword!" (যীশু)। তাঁরা বলেন, "নয় এ মালা নয় এ থালা গন্ধজলের ঝারি! এ যে ভীষণ তরবারি।" জ্ঞানের তরবারি, প্রেমের তরবারি, বীর্যের তরবারি। এই তরবারিই তো মানুষের গ্রহণযোগ্য, এর যোগ্য না হতে পারলে মানুষকে শত ধিক্!

(১৯২৮)

একলা চল্ রে

যে নাচতে জানে সে উঠানের দোষ দেয় না। উঠানটা যেমনি হোক নাচটাই আসল, নাচের অবহেলা করে একটাও মুহূর্ত যদি উঠানকে দেওয়া যায় তবে নাচের তাল কেটে যায়। নাচের তাগিদটা এত প্রবল যে নিখুঁত একটা উঠানের সন্ধানে বাহির হতে গেলে নাচের তর সয় না এবং যে উঠানে থাকা গেছে সেইটাকেই ঝাঁট দিয়ে তারপরে তাতে নাচবার প্রস্তাবেও চরণ সায় দেয় না। সুতরাং উঠানের ভাবনা ছেড়ে নাচের ভাবনাই ভাবতে হয়, সমুদ্রের ভাবনা ছেড়ে নৌচালনার, অমাবস্যার ভাবনা ছেড়ে দীপের। নাচতে গিয়ে যদি উঠানটারও সম্মার্জনা হয়ে যায় তো ভালোই, নইলে সম্মার্জনা সম্বন্ধে নাচবার লোকের কোনো দায়িত্ব নেই।

যে বাঁচতে জানে সে সংসারের দোষ ধরে না। সংসারটা যেমনি হোক বাঁচাটাই আসল, বাঁচার অবহেলা করে একটাও মুহূর্ত যদি সংসারকে দেওয়া যায় তবে বাঁচার ঠাসবুননে জাল দেখা দেয়। বাঁচার তাগিদটা এত প্রবল যে নিখুঁত একটা পরলোকের বা পরজন্মের সন্ধানে বাহির হতে গেলে বাঁচার তর সয় না এবং যে-সংসারে থাকা গেছে সেইটাকেই মনের মতো করে তারপরে তাতে বাঁচবার প্রস্তাবেও মন সায় দেয় না। সুতরাং সংসারের ভাবনা ছেড়ে বাঁচার ভাবনাই ভাবতে হয়, দেশকালের ভাবনা ছেড়ে নিজের, দশজনের ভাবনা ছেড়ে একার। বাঁচতে গিয়ে যদি সংসারটারও দুঃখ দূর হয়ে যায় তো ভালোই, নইলে দুঃখ দূর করা সম্বন্ধে বাঁচবার লোকের দায়িত্ব নেই।

কিন্তু উঠানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার দায় নাচবার লোক নিজে না মানলেও উঠান তাকে মানাতে চায়। উঠান বলে, 'তুমি যখন আমার উপরে দাঁড়িয়ে নাচছ তখন আমার প্রতি তোমার এই দায়িত্বটুকু মানতে হবে যে তুমি আমার ধুলো ঝাঁট দেবার জন্যেই নাচছ।' নাচবার লোক বলে, 'সর্বনাশ! নাচতেই আমি জানি, ঝাঁট দেওয়ার আমি কী বুঝি! আর ধুলো কি তোমার অল্প, না, আজকের! ঝাঁট দিতে বসলে যুগ যুগান্তরেও শেষ হবে না, মাঝখান থেকে আমার নাচটাই মারা যাবে। না, ভাই উঠান, ধুলো ঝাড়বার জন্যে নয়, নাচবার জন্যেই আমি নাচছি।' উঠান এ কথা শুনে রাগ করে এমন শোধ তোলে যে নাচবার লোকের পদে পদে মনে হয়, ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি। কিন্তু সে যদি শৌখীন নটী না হয়ে থাকে তো কিছুতেই নাচ বন্ধ রাখে না, তার নাচের তাগিদ এত প্রবল যে বার বার পা পিছলে পড়লেও সে বার বার উঠে দাঁড়িয়ে নাচে।

বাঁচবার লোককে সংসার কোটি কণ্ঠে বলে, 'আমার অনেক দুঃখ, অনেক অভাব, অনেক সমস্যা। তুমি কেন আমার প্রতি এই দায়িত্বটুকু স্বীকার কর না যে, তুমি আমার দুঃখ দূর করবার জন্যেই বাঁচছো?' বাঁচবার লোক বলে, 'হায়! বাঁচতেই আমি জানি, দুঃখ দূর করার আমি কি-বুঝি! আর দুঃখ কি তোমার দুটো-একটা, না, দু-এক যুগের! দুঃখ দূর করতে বসলে কল্প-কল্পান্তরেও

শেষ হবে না, মাঝখান থেকে আমার বাঁচাটাই মাটি হয়। না ভাই সংসার, দুঃখ দূর করবার জন্যে নয়, বাঁচবার জন্যই আমার বাঁচা।' সংসার একথা শুনে অভিমান করে এমন যন্ত্রণা দেয় যে বাঁচবার লোকের বার বার মনে হয়, মরণ হলেই বাঁচি। কিন্তু সে যদি শক্ত পুরুষ হয়ে থাকে তো কিছুতেই লীলা বন্ধ রাখে না, তার লীলার তাগিদ এত প্রবল যে, সে বার বার বাধ্য হয়ে দাসত্ব করলেও বার বার ছুটি নিয়ে লীলা করতে লেগে যায়।

সে আপত্তিও করে না, কৈফিয়ৎও দেয় না। সে বিষও নেয়, অমৃতও ছাড়ে না। সে আপনার আশপাশকে আত্মসাৎ করতে করতে আশপাশের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে থাকে, সেই বড়ো হয়ে ওঠাতেই তার সকল কর্মের সার্থকতা। সেই আনন্দে সে যা-কিছু পায় তা গ্রহণ করে, যা-কিছু পায় না তা অর্জন করে এবং সব কিছুকে নিজের অঙ্গীভূত করে নিজেকে যে-রূপটি দেয় সেই রূপটিই হয় তার দেওয়া, তার দান। তার ব্যক্তিত্বটাই হয় সংসারের প্রতি তার উপহার। এ ছাড়া কোনো কর্তব্য কোনো দায় কোনো দেনা তার নেই। ত্যাগ বলতে সে বোঝে তার বিকচ ব্যক্তিত্বের সৌরভ বিতরণ, তার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের জ্যোতি বিকীরণ, তার উচ্ছল ব্যক্তিত্বের রসে উর্বরীকরণ। ত্যাগ মানে ভোগের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠা। ভোগকে বাদ দিয়ে নয়, ভোগকে রূপে পরিণত করে। রূপটাই ত্যাগ।

দেখতে গেলে সংসারের এতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। পূর্ণ প্রস্ফুট পদ্মের মধ্যে যেমন পঙ্কবহুলা পুষ্করিণী নিজেরই সৌন্দর্যরূপ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়, বিচিত্রতম ব্যক্তিত্বের মধ্যে তেমনি সমস্যাময় সংসার নিজেরই ঐশ্বর্যরূপ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়। সে যে কেমন করে সম্ভব হলো এইটেই তখন রহস্যের মতন লাগে, সে যে কী কী নিয়ে সম্ভব হলো এর তখন কোনো হিসাব খুঁজে পাওয়া যায় না, কেবল সে যে হয়ে উঠেছে এই সত্যটা তার সাত খুন আড়াল করে তাকে অনির্বচনীয় রূপবান করে দেখায়। রূপ মাত্রেরই পিছনে একটি লোকসানের ইতিহাস, একটি খরচের তালিকা আছে। তার চরণ রাঙাবার জন্যে কীট প্রাণ দেয়, তাকে মুক্তা পরাবার জন্যে মানুষ সাগরে ডোবে, তাকে বেণী বাঁধাবার জন্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধে। খরচের দিক থেকে খতিয়ে দেখলে অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না, মনে হয় নিছক বাবুয়ানা, ইচ্ছা হয় বন্ধ করে দিই খরচ, কিংবা খরচের পরিমাণ বেঁধে দিই। বিরক্ত হয়ে বলি, 'শা-জাহানের প্রজারা দুর্ভিক্ষে উচ্ছন্ন না হলে যদি তাজমহল গড়বার কোটি কোটি টাকা না ওঠে তবে বন্ধ করো তাজমহল গড়া। আগে দুর্ভিক্ষ দূর হোক তারপরে টাকা থাকে তো ছোটোখাটো দরগা বা মাদ্রাসা গড়া যাবে যাতে দশজনের উপস্থিত স্পষ্ট কিছু উপকার হয়, যা শত শত বৎসর ধরে শত শত রসপিপাসুকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরস যোগাবার জন্যে শা-জাহান বাদশার বিরহে-বিগড়ে-যাওয়া ধাতের মর্মরীভূত প্রলাপ নয়।' কিংবা উত্ত্যক্ত হয়ে বলি, 'হাজার হাজার সৈনিককে মিশরে কচু-কাটা হতে ফেলে পালিয়ে এসে ফ্রান্সের সিংহাসন অধিকার না করলে, বৎসরের পর বৎসর নিযুত নিযুত লোককে মেরে কেটে নিরন্ন নিরাশ্রয় করে ইউরোপের

স্বাধীন দেশগুলোকে পদানত না করলে, নিরপরাধ যোসেফিন্‌কে তালাক দিয়ে অনিচ্ছুক মেরিয়া লুইসাকে জোর করে বিবাহ না করলে যদি নেপোলিয়ন না হয় তো নাই হোক নেপোলিয়ন, তাকে নিয়ে নাই রচিত হোক শত সহস্র কথা কাহিনী গাথা ও কিম্বদন্তী। এত লোকসান দিয়ে চাইনে আমরা এত বড়ো personality, আরো সস্তায় যদি আরেকটু মাঝারি গোছের বীর পুরুষকে পাই তো সেই আমাদের যথেষ্ট।'

কিন্তু সংসারের ফরমাস মানবার পাত্র নয় তারা, যারা সংসারের মুখের কথার চেয়ে মনের কথাকে ঢের বড়ো সত্য বলে জানে। তারা জানে বসুন্ধরার প্রাণ চাইছে বীরকে ; যে বীরকে চোখে দেখবে বলে সে কত প্রাণীকেই লোকসান দিলে ; কত Dionosaur, Diplodocus Archaespteryx ; কত গাছ কত পাখী কত পশু ! তার পরে মানুষ। তার পরে পুরুষোত্তম। লোকসান সে বড়ো সহজে দিতে চায়নি, সে প্রাণপণে খরচ বাঁচাতে চেষ্টা করেছে, সে একটু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখলে মূর্ছা গেছে, কিন্তু যার হাতে সে পড়েছে সেও কি বড়ো সহজ পুরুষ ! সে জানে তাকে দেখতে প্রকৃতির প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, তাই সে জোর করে বার বার তার লজ্জা ভাঙিয়ে তবে ছেড়েছে।

প্রকৃতির মধ্যে একটা হিসাবিয়ানা আছে, একটা কঞ্জুসপনা। পুরুষও যদি তার প্রশ্রয় দেয় তবে কেবল মোটা ভাত ও মোটা কাপড় কেন, হাওয়া খেয়ে বনে জঙ্গলে বাস, এই হবে তার শ্রেয় ! ভাত খাওয়া মানে উদ্ভিদ্‌ হত্যা, কাপড় পরা মানেও উদ্ভিদ্‌ হত্যা। উদ্ভিদের চোখে দেখলে অতি বড়ো নিরামিষাশীকেও হিংস্র মনে হতে পারে এবং অতি বড়ো ত্যাগী পুরুষকেও ঘোর বিলাসী ও পরম স্বার্থপর ভেবে বসা অসংগত নয়।

আমাদের যা আবশ্যক তা আমরা অর্জন করবো, আমাদের যা আবশ্যকাতিরিক্ত তাই আমরা বর্জন করবো। আবশ্যকের থেকে বর্জন করলে আত্মহত্যা করতে হয়, যদিও সংসার নানা ছলে ঐ পরামর্শই দেয়। কী কী বাদ দিতে হবে এ সম্বন্ধে সংসারের অতি পরিষ্কার জ্ঞান, সংসার যে বড়ো টানাটানির সংসার। কিন্তু কী কী উদ্বৃত্ত দিতে হবে এ সম্বন্ধে সংসার নিরুত্তর, এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের নিজেদের দিতে হয়। আমরা কী হয়ে উঠছি তা আমরাই ভালো বুঝি, হয়তো আমরাও ভালো বুঝিনে, বোঝেন আমাদের নিজ নিজ অন্তরাত্মা, কিন্তু সে বোঝা আমাদেরই ঘরোয়া ব্যাপার, সংসারের সে ক্ষেত্রে প্রবেশ নিষেধ। সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এই যে, সংসার আমাদেরকে মালমশলা যোগাবে ও আমাদের কাছ থেকে তৈরি জিনিসটি নেবে। তৈরি করা সম্বন্ধে কোনো ফরমাস করবে না।

চিরকাল এই চলে আসছে। শূন্যের দারিদ্র্যকে পিছনে রাখছে একের ঐশ্বর্য। তাতে শূন্যের দর বাড়ছে, সে বলতে পারছে, আমি নিতান্তই শূন্য নই, আমি একের পিঠে শূন্য ! বসুন্ধরা শূন্যের সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে একের সন্ধানে চলেছে, আর শূন্যেরা নিজেদের দর বাড়াতে বাড়াতে একের পিঠে সওয়ার হয়ে বসছে। কিন্তু তাদের দুঃখ যে কিছুমাত্র কমছে এমন নয়। শোনা

যায় মহাপুরুষরা নাকি সংসারের দুঃখ দূর করবার জন্যে আবির্ভূত হন। মিথ্যা কথা। তাঁরা সংসারের দুঃখ বাড়িয়েই দিয়ে যান, তাঁরা বড়ো হয়েই প্রমাণ করে দিয়ে যান যে বড়ো হওয়া সম্ভব, তখন বড়োত্বের অভাবে সংসার কাঁদে আর ভাবে আবার কবে একটি বড়ো-মানুষ দেখব। কিন্তু বড়ো যে হয় সে নিজের বড়ো হওয়ার তাগিদে হয়, সংসারের অভাব দূর করবার তাগিদে নয়। সংসার তো ক্রুশে না বিঁধ্‌লে, আগুনে না পোড়ালে সোনাকে সোনা বলতে চায় না। সংসার তো বিশৃঙ্খলা কমাতে পারলেই খুশী হয়, ঝঞ্ঝাট এড়াতে পারলেই বাঁচে, পুরাতনকে ও পরীক্ষিতকেই নিয়ে তার সুবিধা। সে যে অসংখ্য প্রাণীর সংসার, সকলের সুবিধার দিকেই তার দৃষ্টি, তলার দিকেই তার টান, নিম্নতমের সুবিধার জন্যে উচ্চতমকে সে বলে 'নেমে এসো'। কিন্তু সকলের সব সুবিধার চেয়ে বড়ো একজনের বড়ো-হয়ে-ওঠা। সেই একজনেরই মধ্যে সকলে পায় আপনার চেয়ে বড়ো আপনাকে। মানুষের মধ্যে Dinosaur পায় তার মরণের অর্থ। মহামানবের মধ্যে হয় সর্ব মানবের জয়জয়কার।

সেইজন্যে সংসারের দুঃখকে উপেক্ষা করে সংসারের মতামতকে অগ্রাহ্য করে সংসারের বাধাকে বাহন করে সংসারের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠাই সংসারের প্রতি আমাদের চরম দায়িত্ব। আমাদের হয়ে-ওঠা সর্ব জগতের সর্ব কালের হয়ে-ওঠা, আমরা কেবল তার উপলক্ষ মাত্র। আমরা না হলে আর কেউ উপলক্ষ হবে, মানুষকে না পেলে আর-কোনো প্রাণীকে ডাক পড়তো, ভারতীয়কে না পেয়ে ইউরোপীয়কে ডাক পড়েছে। যারা পরার্থপর হয়ে নিজেদের বিকাশ পেছিয়ে দেয় তারা পরকেও পেছিয়ে রাখে। নিজেদের দুর্বল করলে দুর্বলদের বল দেওয়া হয় না, সবাই মিলে চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে থাকে। 'এগোতে হয় সকলে এক সঙ্গে এক এক ইঞ্চি করে এগোবো, এক জন দশ ক্রোশ এগিয়ে দশ জনকে দশ ক্রোশ পিছনে রাখবো না' এমন করলে এক ইঞ্চিও এগোনো হবে না, কেন না প্রকৃতির টান সর্বদাই পিছনের দিকে, মাধ্যাকর্ষণের টান সর্বদাই পাতালের দিকে। নেতার কাজ আপন মনে এগিয়ে যাওয়া, নীয়মানেরা যদি পাল্লা না দিতে পারে তো নেতা ফিরেও তাকাবে না। যুধিষ্ঠিরকে শেষ পর্যন্ত একলাই চলতে হবে, একে একে অপর পাণ্ডবেরা পড়ে মরলেও প্রাণাধিকা পাঞ্চালী চলতে না পারলেও সকলের হয়ে একা এগিয়ে যেতে হবে, সকলের সাধ অন্তত একজনের মধ্যে পূর্ণ করতে হবে।

একজনের নৃত্যের হিল্লোলে নাটবেদীর ধুলো লুপ্ত হবার নয়, কিন্তু পবিত্র হবার। একজনের যৌবনের সৃষ্টিতে সংসারের দুঃখ দূর হবার নয় কিন্তু সার্থক হবার। দেশের একজনও লোক যদি সমস্ত শক্তির সহিত বাঁচে তবে তারই বাঁচায় দেশের ত্রিশ কোটি লোক বাঁচার স্বাদ পাবে, দেশের সব দুর্দশাকে ম্লান করে তারই রূপ হবে দেশের যৌবনরূপ। একটি ভগীরথ ষষ্টি সহস্র সগরসুতকে উদ্ধার করেছিলেন, একটি মহামানব ত্রিশ কোটি বাল-খিল্যকে আড়াল করবেন।

(১৯২৮)

যতি ও সতী

কোন সমাজ ক'জন মাঝারি মানুষকে সুখ সুবিধা দিয়েছে তা নিয়ে সে সমাজের বিচার হয় না, ক'জন বড়ো মানুষকে আনুকূল্য করেছে ও কোন দরের বড়ো মানুষকে, তাই নিয়ে তার শ্রেষ্ঠতা নিকৃষ্টতা। পঁচিশ লাখ মানুষের সমাজ নরওয়ে আর পাঁচ কোটি মানুষের সমাজ বাংলাদেশ। চার কোটি মানুষের সমাজ ফ্রান্স আর ত্রিশ কোটি মানুষের সমাজ ভারতবর্ষ। কিন্তু বড়ো মানুষের সংখ্যা ও দর কোন সমাজে কত তা আমরা হয়তো মানী দুর্যোধনের মতো মানবো না, পৃথিবীসুদ্ধু সভাসদ্ কিন্তু শত কৌরবকে তাচ্ছিল্য করে পঞ্চপাণ্ডবকেই সভার পুরোভাগে বসাবে। অত বড়ো প্রকাণ্ড একটা দেশে গান্ধী রবীন্দ্রনাথ জগদীশ অরবিন্দ ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্ভ্রম পাবার মতো মানুষ নেই, এই ক'টি সবে ধন নীলমণিকে নিয়ে আমাদের যা-কিছু গৌরব। গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে এরকম আরো কয়েকটিকে পেয়েছি—রামমোহন রামকৃষ্ণ বঙ্কিম বিবেকানন্দ। কিন্তু দেড় শত বৎসরের পরাধীনতা, ত্রি-খণ্ডতা ও অসচ্ছলতা সত্ত্বেও অতি ক্ষুদ্র পোলাণ্ডে এঁদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসবার মতো মানুষ বড়ো অল্প জন্মান নি।

বড়ো মানুষেরা অবশ্য সমাজের হুকুমে জন্মান না। কিন্তু যারা জন্মায় তাদের কেউ কেউ যদি বড়ো মানুষ হতে গিয়ে দুরতিক্রম্য বাধা পায়, যদি জন্মমাত্রেই তাদের আফিং ধরানো হয় ও বয়স না হতেই তাদের লাঙলে জোতা হয় তবে তারা প্রাণান্তিক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত যেটুকু সৃষ্টি করবার স্বাধীনতা পায় সেটুকু অন্য সমাজের মানুষের পক্ষে নগণ্য এবং তারা কোনো গতিকে একবার যদি দাঁড় ছেঁড়ে তো উর্ধ্বশ্বাসে এত দূর দৌড় দেয় যে সমাজের ত্রিসীমানার বাইরে চলে যায়। আমাদের দেশে গত দেড় সহস্র বৎসরে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের অধিকাংশই সন্ন্যাসী ও যাঁদের দ্বারা দেশের চারুকলা রক্ষিত হয়ে এসেছে তাঁরা বেশ্যা। এঁদের বলিষ্ঠ প্রকৃতিকে সমাজ না দিয়েছে প্রতিভার পরিসর, না দিয়েছে প্রেমের পরিসর। তার ফলে এঁরা সমাজকে একেবারে ছেড়ে গিয়ে একেবারে বঞ্চিত তো করেছেনই, যাবার সময় সমাজের উপরে poison gas প্রয়োগ করে গেছেন, সে বিষবাষ্প সমস্ত সমাজটার শ্বাসরোধ করেছে। তাঁদের পরাক্রান্ত ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়াবশত সমাজ যতিত্বকে ভেবেছে পৌরুষের চরম, সতীত্বকে ভেবেছে নারীত্বের সব কথা।

গৃহী নিজেকে মনে করেছে সন্ন্যাসীর তুলনায় অধম ঘৃণ্য হতভাগ্য। তার দেহ পড়ে থাকে গৃহে, মন পড়ে থাকে মঠে। সে ভাবে, যে দারাসুত নিয়ে সংসার-সাগরে ডুবে মরছে সে-ই নিতান্ত ঠকে গেছে, আর যে কৌপীনবন্ত হয়ে বেলাভূমির বালুকা চষে বেড়াচ্ছে তার সুখের সীমা নেই। সংসার-সাগরে ডুবে মরা সসন্তান প্রেমিক-প্রেমিকারও অদৃষ্টে ঘটে, কিন্তু সে মরায় এমন নির্লজ্জ কাপুরুষতা নেই—এ যেন দুই নৌকায় পা রেখে ডুবে মরা, দুটোরই লোভে দুটোকেই খোয়ানো এবং দুর্বলের ভগবানের দ্বারে মড়াকান্না কাঁদা। যে বিবাহে

স্বোপার্জিত প্রেমের কৃতিত্বময় আত্মসম্মান নেই সে বিবাহের উপরে প্রতিষ্ঠিত গৃহধর্ম কোনোমতে আচরিত জৈবধর্ম মাত্র, তাতে মানুষকে বড়ো করে না, তাতে মানুষের নিজের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে দেয়। ঘৃণার সৃষ্টি ঘৃণ্যই হয়।

গৃহিণী নিজেকে মনে করেছে গৃহত্যাগিনীর তুলনায় দেবী, অপাপবিদ্ধা, ভাগ্যবতী। তার সমস্ত সত্তা পড়ে থাকে নিজের সতী নামটুকু বাঁচানোর দিকে। সেটুকুতে এতটুকু টোকা লাগলে কাঁচের বাসনের মতো ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে পড়বে। তখন তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া কোনোরকম সৎ কাজে লাগাতে পারা যাবে না। সতীত্বের জন্যে নারীকে এত দাম দিতে হয় যে নারীত্ব দেউলে হয়ে যায়। এত সন্ত্রস্ততা, এত অন্যায়সহিষ্ণুতা, এত পরমুখাপেক্ষিতা, দৈবাৎ পাছে পরপুরুষের ছোঁয়া লাগে এই ভয়ে দৈবের মুখ চেয়ে সারা জীবন কাটানো, দৈবাৎ যদি পরপুরুষে এসে প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বে ছোঁয়া লাগিয়ে যায় তবে বিনা অপরাধে চরম দণ্ড, বিনা বিচারে নির্বাসন—এ সকলের পরিণাম দেহ ছাড়া বাকী সমস্তটার বন্ধ্যাত্ব। মধ্য যুগের ভারতনারী কোটি কোটি সন্তানের মুগ্ধা জননী হয়েছে, কিন্তু যে-ক'টিকে মানুষ করেছে তাঁদের আঙুলে গোনা যায় এবং সেই ক'টিকেও সংসারে বাঁধতে পারেনি। মধ্যযুগের ভারতনারীর সবচেয়ে বড়ো অক্ষমতা এই যে, সে পুরুষকে এমন একটি সংসার দেয়নি যে সংসারকে সে শ্মশানের চেয়ে শ্রদ্ধা করতে পারত। সেই জন্যে পুরুষ হয় মনের সঙ্গে দেহকে টেনে নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, নয় দেহের সঙ্গে মনকে টেনে রেখে ঘরে ছট্‌ফট্‌ করেছে। সতী নারীকেও পুরুষ কামিনী বলে ঘৃণা করেছে, নারীর এর বাড়া অপমান কী হতে পারে!

প্রেমকে যারা জীবন থেকে বাদ দিয়েছে তাদের যেমন সন্ন্যাস তেমনই গার্হস্থ্য—এক ভস্ম আর ছার। কোনোটাই সৃষ্টিক্ষম নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজ কেন এমন করে প্রেমকে জীবন থেকে বাদ দিলে? কারণ জীবন থেকে যৌবন চলে গিয়েছিল, বৃদ্ধের পক্ষে অস্তিত্বটুকু ছাড়া আর কিছু রক্ষা করবার ছিল না। বৃদ্ধের সাধনা minimumএর সাধনা, বৃদ্ধ বলে ভূমায় সুখ নেই, অল্পে সুখ। তার ধর্মের সাধনা নিকৃষ্ট অধিকারীর প্রতিমাপূজা—ভগবানকে যেমন তেমন করে হাতে হাতে পেয়ে যাওয়া। তার অর্থের সাধনা কোনমতে পেটে ভাতে পড়ে থাকা—একখানা কটিবস্ত্র এক মুঠো অন্ন। তার প্রেমের সাধনার শেষ কথা পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। তার মোক্ষের সাধনার প্রথম কথা পুত্র ও ভার্যাকে পরিত্যাগ করে সংসার থেকে প্রস্থান। তার সব সাধনাই যখন minimumএর সাধনা, তখন তার চরিত্রের সাধনাও যে minimumএর সাধনা হবে এর সন্দেহ নেই। তাই পৌরুষের চূড়ান্ত যতিত্ব, নারীত্বের চূড়ান্ত সতীত্ব। দুটোই দেহগত, দুটোই দৈবনির্ভর। পুরুষ তার দেহটাকে যত রকমে পারে নিগ্রহ করে তার চরিত্র বাঁচায় এবং শেষ পর্যন্ত যদি বাঁচাতে না পারে তবে তার বারো বৎসরের তপস্যা এক মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যায়। নারী তার দেহটাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে যতই অসংযত হোক তার সতীধর্মে বাধে না, এমন কি সে স্বামী যদি অপর নারীরও স্বামী হয়ে থাকে। কিন্তু সে

নিজে অপর পুরুষের স্ত্রী হওয়া দূরের কথা, আপন অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি অপর পুরুষের দ্বারা স্পৃষ্টা বা দৃষ্টা হয় তবে তৎক্ষণাৎ হাঁড়ির ভাতের মতো ঘর থেকে ফেলা যায় নর্দমায়। মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত সতী নামটা বাঁচিয়ে রাখা নারীর কীর্তি নয়, ভাগ্য। তবে এ নিয়ে এত জাঁক কেন? কারণ যে দৈবের উপর হাত খাটে না সেই দৈবের প্রসাদ পেলে জাঁক করাটা অতিবৃদ্ধের অভ্যাস। সে যা কিছু পায় ভাগ্যক্রমে পায়, গায়ের জোরে পায় না। সতীপনা নিয়ে যাঁর এত জাঁক তাঁর স্বামীটিকেও তিনি ভাগ্যক্রমে পেয়ে সধবা হবার জাঁক করেন এবং পাছে দুর্ভাগ্যক্রমে বিধবা হয়ে যান এই ভয়ে সেটিকে এমন আঁচলবাঁধা করেন যে সহমরণ উঠে যাবার আগে বিবাহিতা পুরুষের পক্ষে দুঃসাহসিক কাজ করা যদি বা সম্ভব ছিলো, সহমরণ উঠে যাবার পর থেকে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারত যখন মহাভারত ছিলো, তখন ভীষ্ম চিরকুমার ছিলেন; তাঁর মাতা গঙ্গাদেবীর পূর্বে আর-এক বিবাহ ছিলো; তাঁর বিমাতা সত্যবতীর ব্যাসদেব ছিলেন কানীন পুত্র। সত্যবতীর বৈধ পুত্রদ্বয়ের অকালমৃত্যু ঘটায় তাঁদের পত্নীদের পুত্র দেবার জন্যে ভীষ্মকে আহ্বান করা হয়। তিনি অসম্মত হলে ব্যাসদেবকে ডাক পড়ে। তাঁর দয়ামায়া ছিলো; সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করলেন। পাণ্ডুপত্নী কুন্তী মাদ্রী ও কৌন্তেয় মাদ্রেয়দের যৌথপত্নী দ্রৌপদী ইত্যাদির বৃত্তান্ত স্বয়ং ব্যাসদেব অতি হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করে গেছেন, আমি সে চেষ্টা করছিনে! আমি শুধু দেখাতে চাই যে মহাভারতের যুগে চিরকুমার সন্ন্যাসী ছিলেন না, বহুভর্তৃকা বেশ্যা ছিলেন না। সন্ন্যাসী বা বেশ্যা আদৌ ছিলেন না এমন বলছিনে, ঐ দুই উপদ্রব থেকে কোনো সমাজই কোনো কালে মুক্ত ছিলো না, কিন্তু মহাভারতে এঁরা সমাজ থেকে একেবারে আলগা হয়ে সমাজকে বিকল ও বিকৃতি করেননি এবং সারা সমাজটার চারিত্রিক আদর্শকে প্রতিক্রিয়ামূলক করেননি। মহাভারতে এঁরা সমাজের ভিতরে থেকে ব্যক্তিগত আদর্শ উদ্‌যাপন করেছিলেন এবং ভিতরে থাকবার দ্বারা সমাজকে, বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ নয়, সুস্থ ও স্বাভাবিক রেখেছিলেন। যতিত্ব সে কালের পুরুষের পক্ষে চরিত্রবত্তার শেষ কথা ছিলো না, বিবাহ করলে পুরুষ নিজের চোখে নিজেকে ছোট বোধ করতো না, সংসার করলে নিজেকে ভারাক্রান্ত বোধ করতো না। সতীত্ব সে কালের নারীর সর্বস্ব ছিলো না, সতীত্বের চেয়ে ঢের ব্যাপক ছিলো তার নারীত্ব। যে কারণে এ কালের নারীকে বেশ্যা বানিয়ে সমাজ ভারি একটা বাহাদুরি করল ভাবে, সেই কারণে সে কালের নারীকে সতী বলে নিত্য স্মরণ করতো। মহাভারতে এত রকম এত নারীকে দেখি, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই জীবন্ত ও বিচিত্র। এক দল এক ছাঁচে ঢালা সতী নন, অন্য দল এক ছাঁচে ঢালা অসতী নন।

মৃচ্ছকটিকের সমাজেও বসন্তসেনা সম্ভব হতেন, তাঁকে বিবাহ দিয়ে সমাজ ধনী হতো। কিন্তু চণ্ডীদাসের সমাজে দেখি রামীর সঙ্গে বিবাহ দূরের কথা, সাক্ষাৎ পর্যন্ত সমাজের চক্ষুঃশূল। বুঝতে পারা যায় সমাজের বিষম পরিবর্তন

ঘটে গেছে। সমাজ বর্ধনশীলতাকে ছেড়ে রক্ষণশীলতাকে ঠাওরেছে ধর্ম। সমাজ কোনও বিষয়ে কাউকে লেশমাত্র স্বাধীনতা দিতে চাইছে না, জাতকুলের দড়িদড়া দিয়ে সবাইকে কষে বেঁধেছে, একান্নবর্তী পরিবারের অন্ধকূপে একান্নজনকে ঠেসে পুরেছে এবং ব্রহ্মচর্য আরম্ভ না হতেই গার্হস্থ্য চাপিয়ে দিচ্ছে বালকবালিকার উপরে। কিন্তু ক্ষুধাসঞ্চারের পূর্বে আহার যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর, প্রেমসঞ্চারের পূর্বে বিবাহ তেমনি চরিত্রের পক্ষে অহিতকর। চরিত্র তো যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়নিরোধসাপেক্ষ বা স্পর্শপ্রতিরোধসাপেক্ষ নয়, চরিত্র মানে বল, চরিত্র মানে সাহস, চরিত্র মানে সংকল্প, চরিত্র মানে আত্মাভিমান। মানুষের চরিত্র মনুষ্যত্ব, পুরুষের চরিত্র পৌরুষ, নারীর চরিত্র নারীত্ব, ব্যক্তির চরিত্র ব্যক্তিত্ব। চরিত্রের না আছে সীমা, না আছে শেষ, না আছে চিরনির্দিষ্ট আদর্শ। চরিত্র যৌবনধর্মী, তাকে বাঁচাতে ব্যস্ত হলেই বাঁচানো শক্ত হয়, তাকে ক্রমাগত বাড়াতে থাকলে আপনি বাঁচে। আমাদের আধ্যাত্মিক দেশে চরিত্রকে দেহগত করে দেহের আটঘাট বন্ধ করে মনকে বুভুক্ষু ও আত্মাকে আত্মপ্রকাশহীন করাটা চরিত্র রক্ষা বলে কথিত, কিন্তু অমন করে যাকে রক্ষা করা সম্ভব তা চরিত্রের অন্তঃসার নয়, চরিত্রের খোলস। চীনা মেয়েদের মতো লোহার জুতো পরে পদদ্বয়কে রক্ষা করতে গেলে কঙ্কালদ্বয়কেই রক্ষা করা হয়, রক্ত মাংস ঝরে পড়ে। চরিত্রের উৎকর্ষ হয় প্রেমের জন্যে নব নব তপস্যা স্বীকার করে, প্রেমকে ছেড়ে গৃহধর্মের চুনকামের নিচে জৈবধর্ম আচরণ করে নয়, তাও ছেড়ে প্রবৃত্তির সঙ্গে রাত্রিদিন সংগ্রাম করে নয়।

প্রেমসঞ্চারের পূর্বে বিবাহ চরিত্রের পক্ষে অহিতকর। তাতে পুরুষের পৌরুষ ও নারীর নারীত্ব সচেতন হবার পূর্বেই সচেতন হবার তাড়না হারায়, উদ্‌যোগী হবার পূর্বেই উদ্‌যোগের সীমা পায়, দুষ্প্রাপ্যকে চাইবার পূর্বেই অযাচিতের অধিকারী হয়। কিন্তু সমাজের তখন অন্টম দশা উপস্থিত। প্রেমকে সমাজ অবিশ্বাস ও অসম্মানের চোখে দেখছে। জাতকুলের বিশুদ্ধতা ও একান্নবর্তী পরিবারের সুখস্বস্তিই তখন তার কাছে বড়ো। পারিবারিক প্রয়োজন ব্যতিরিক্ত সব প্রেমই পাপ এবং পুরুষপক্ষে যতিত্ব ও স্ত্রীপক্ষে সতীত্বই চরিত্রবত্তার শেষ সীমা। প্রেমস্ফূর্ত তপস্যায় যে চরিত্রের উৎকর্ষ সে চরিত্র ছিলো অর্জুনের, সে চরিত্র প্রতিবারের প্রেমে প্রতিবার সমৃদ্ধতর সুন্দরতর সবলতর হয়েছিলো। সে চরিত্র ছিলো উমার—সে চরিত্র দীর্ঘকালের তপস্যার দ্বারা কামের ফেনিলতাকে প্রেমের প্রগাঢ়তায় ঘনীভূত করেছিলো। কিন্তু সমাজ যে দিন প্রাণের ভয়ে জাতকুলের দরজা বন্ধ করে একান্নবর্তী পরিবারের একান্নটা কুঠুরিতে লুকিয়ে বেড়াতে শুরু করলে সেদিন থেকে স্থির হয়ে গেলো অর্জুন বা উমা হবার সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না, ব্রহ্মচর্য ভাসিয়ে দিয়ে অল্প বয়সের ছেলে অল্প বয়সের মেয়েকে বিয়ে করে আনবে এবং ঐ দুটি পুতুলের বিয়ের সম্বন্ধ ওদের পক্বপ্রবীণ পিতামাতারা নির্ণয় করবেন। গৌরীকে তপস্যার সুযোগ না দিয়ে অন্টমবর্ষে দান করবার কথা উঠলো, সাবিত্রীকে পতি মনোনয়ন করতে না দিয়ে সতী হবার উপদেশ দেওয়া গেলো। এবং রামের মতো সুবোধ

ছেলে হতে যাকে বলা হলো রামের মতো প্রেমের তপস্যা থেকে তাকে মূলেই বঞ্চিত করা হলো। পুরুষের পক্ষে তখন একমাত্র adventure গৃহ ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়া, নারীর পক্ষে তখন একমাত্র adventure গৃহ ছেড়ে পথে বিপণি সাজানো।

কিন্তু adventure-এর দাম যারা দিতে পারে তারা তো মাঝারি স্ত্রী পুরুষ নয়, তারা আর সকলের চেয়ে ঢের বড়ো শক্তিসম্পন্ন। কিছু একটা অসম্ভবকে সম্ভব না করলে এত বড়ো শক্তি তৃপ্তি মানে না। সমাজের দশজনের যদি সুবুদ্ধি থাকে তো তারা অসুবিধা সয়েও এদের সমাজে রাখতে রাজি হয়, সমাজের একেবারে বাইরে যেতে দিয়ে নিজেদের আরো বড়ো সর্বনাশ করে না। সেই জন্যে মহাভারতের যুগে পুরোদস্তুর সন্ন্যাসী বা পুরোদস্তুর বেশ্যা যদি বা ছিলো তারা এত নগণ্য ছিলো যে মহাভারতকার তাদের উল্লেখযোগ্য মনে করেননি অথচ এমন সব স্ত্রী পুরুষকে নিয়ে গল্প জমিয়েছেন যাঁরা আমাদের এখনকার সমাজে জন্মালে ও এখনকার সমাজে স্থান পেলে সমাজরক্ষীদের আতঙ্ক সঞ্চার করেন। বিবেকানন্দের মতো পুরুষসিংহ গুরুজনের সুখস্বস্তির খাতিরে খুকী বৌটি নিয়ে পুতুল খেলার সংসার পাতবার পাত্র ছিলেন না। সমাজে যদি স্বোপার্জিত প্রেমের স্বল্পতম সুযোগ ও লেশমাত্র প্রসিদ্ধি থাকতো তবে তাঁর এত বড়ো চরিত্র তাঁর নিজের দিক থেকে এমন অচরিতার্থ ও সমাজের দিক থেকে এমন ব্যর্থ হয়ে যেতো না, প্রেমের মধ্যে পুষ্পিত হয়ে বাৎসল্যের মধ্যে মধুময় হয়ে ঋষির জীবনে পরিণতি পেতো। শঙ্কর সম্বন্ধেও সেই কথা। দেড় হাজার বৎসর ধরে আমাদের সমাজ লাখ লাখ মাঝারিকে বহিষ্কৃত করে দুর্বল হয়ে গেছে বলে হাহাকার করা একটা ফ্যাসান ও অন্য সমাজের মাঝারিদের শুদ্ধিপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করা সেই ফ্যাসানের অঙ্গ। কিন্তু দেড় হাজার বৎসর ধরে আমাদের সমাজ যে শঙ্কর বিবেকানন্দের মতো কত বিরাট পুরুষকে বীরলভ্য প্রেমের সুপ্রশস্ত পরিসর না দিয়ে আরো বিরাট হতে দেয়নি এবং তাঁদের জীবনকে সর্বরসে পূর্ণ করতে না দিয়ে তাঁদের অকালমৃত্যু ঘটিয়েছে, সে কথা চিন্তা করলে দারুণ দুঃখ হয়। যে শর্তে আমাদের সমাজ গৃহী হতে বলে সে শর্তে মাঝারিরা অতি আহ্লাদে সম্মতি দেয়। কিন্তু সমাজকে যাঁরা কৃতার্থ করকে পারতেন তাঁরা সম্মত হন না। কারণ তাঁরা পরের চাপানো সংসারদায়ের মধ্যে নিজের আনন্দের দায়িত্ব খুঁজে পান না, একান্নবর্তী পরিবারের বিপুল বন্ধনের মধ্যে অনুরাগ-সাধনের মুক্তি খুঁজে পান না, যে সীতার অর্জনে বীরত্ব নেই, রক্ষণে বীরত্ব নেই, সে সীতাকে নিয়ে ভোগের জীবনে বীরত্ব খুঁজে পান না। রামমোহন রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ব্যতিক্রম, কিন্তু ইউরোপে জন্মালে এঁরা এই প্রতিভা নিয়ে আরো বিচিত্র হতে পারতেন। আর আমাদের বেশ্যাদের মধ্যে যেসব মহীয়সী মহিলা দেহনিবন্ধ সতীত্বের অত্যাচারে সমাজছাড়া হয়ে প্রেম ও সম্মানের অভাবে অসার্থক হচ্ছেন ইউরোপে জন্মালে তাঁরা কীর্তি রেখে যেতে পারতেন। 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মীকে স্বামী না দিয়ে, অভয়াকে সন্তান না দিয়ে ও উভয়কে সম্মান না দিয়ে সমাজ নিজেই ঠকে গেলো। কিন্তু এই ঠকে যাওয়া

আজকের নয়, হাজার দেড়েক বৎসর এই সব চলে আসছে। কে কার খবর রেখেছে!

মাঝারি মেয়েদের জন্যে তৈরি সমাজে সতীত্ব একটা আস্ফালনের বিষয়। সে জন্যে তাঁরা সারা জীবন আর কিছুই করবার অবসর পাননি, শুধু দেহটিকে একাধিক পুরুষের ছায়া থেকে সভয়ে বাঁচিয়েছেন। সেই একটি পুরুষকেও তাঁরা অর্জন করেননি, বর্জন করতে পারেন না এবং সেই একটি পুরুষ যদি আর-এক জনের হন, তবু আর-এক জনের সঙ্গে ভাগ করে স্বামী সেবা করেন। যে কারণে পুরুষকে স্ত্রৈণ বলে অবজ্ঞা করা হয় সেই কারণে নারীকে সতী বলে গগন বিদীর্ণ অর্থাৎ বক্তৃতামঞ্চ (তথা রঙ্গমঞ্চ) বিদীর্ণ করা হয়। চরিত্র বলতে যত কিছু বোঝানো উচিত, যেমন যতির বেলা তেমনি সতীর বেলা, সমাজ তাদের কোনোটারই বিচার করে না, বিচার করে কেবল কার দেহে কার ছায়া পড়েছে। এই ছায়াটুকু এড়াবার জন্যে বস্ত্র-আটুনির অন্ত নেই, এজন্যে আস্ত নারীটিকে ছেঁটে ফেলে তার "untouched by hand" দেহটিকে মেলিন্স্ ফুডের মতো অন্তঃপুরে প্যাক করা হয়েছে, সে দেহের মধ্যে জলীয় বাষ্পটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই, সে না করে বিদ্রোহ, না দেখায় চাঞ্চল্য, না করে সৃষ্টি, না দেয় স্বাদ। সে দেহ নিয়ে নিতান্ত শবসাধক ছাড়া আর কারুর কোনো আনন্দ নেই। যে সমস্ত নারীটিকে পেতে ভালোবাসেসে এই প্রাণলেশহীন সতীটিকে কাঁধে ঝুলিয়ে শিবের মতো কত কাল ঘুরবে! এ যে মনে পর্যন্ত কোনও দিন একটা পাপ করতে পারে না, এত প্রাণহীন! চরিত্র হারাবার সাহস যার নেই চরিত্র তার কোথায়! উন্মুক্ত ক্ষেত্রে যার অগ্নিপরীক্ষা নেই কোথায় তার সৌন্দর্য, কোথায় তার তেজ, কোথায় তার সংযম! ঠুলি পরে যে ঘোড়া গাড়ি টানতেই জানে তার সওয়ার হয়ে যুদ্ধে নেমে সুখ নেই। আমাদের সতীদের নিয়ে আমরা কোন অসাধ্যসাধনে বল পাইনে, তাদের ভীরুতা আড়ষ্টতা ও শুচিবাতিক-গ্রস্ততার চোরাবালিতে পা দিয়ে কর্মক্ষেত্রে তলিয়ে যাই, তাদের দাসী-মানসিকতার দ্বারা সংক্রমিত হয়ে দেশসুদ্ধ পুরুষ কত রকম দাসত্ব করি। দেহটিকে লজ্জাবতী লতা করে আমাদের সতীরা স্বামীটিকে ছেড়ে এক পা চলতে পারেন না, দশজন পরপুরুষের সঙ্গে এরোপ্লেনের পাইলট বা সিনেমার অভিনেত্রী হবেন এমন কথা স্বপ্নে ভাবলে স্বপ্নে জিভ কাটেন এবং এমন ঘন ঘন অপহৃতা হন যে পৃথিবীর অপরাপর দেশের মেয়েরা ভাবে ভারতের মেয়েরা কি পেড়ী-পুঁটলি, না ছাতা-ছড়ি যে টুপ করে তুলে নিলেই উঠে আসেন এবং অচিরেই ভাঙা-ছেঁড়া অবস্থায় ফিরে পাওয়া গেলে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা যান।

পুরুষের চরিত্র তার ঐশ্বর্যে, নারীর চরিত্র তার মাধুর্যে। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সর্বগুণের সমন্বয়। চরিত্রের মূল প্রেম। যার প্রেম যত স্বতঃস্ফূর্ত, যত প্রবল যত গভীর, তার চরিত্র তত ঐশ্বর্যময়, তত মাধুর্যময়। নাই বা হলো সে যতি, নাই বা হলো সে সতী। মানুষ বহুবার বহুজনকে ভালোবেসে শত রূপ উপলব্ধির দ্বারা শতদলের মতো ফুটবে। তার দেহ সে কাকে দেবে তার মন সে কাকে দেবে, সে-ই তা একবার নয় দু'বার নয় শতবার স্থির করবে। তার

প্রীতি-ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা সে শতজনের স্পর্শন দর্শন মননের সুধায় তৃপ্ত করতে পারবে না তো সিক্ত করবে। তার চরিত্র সম্বন্ধে তার অন্তর্যামীর একটি আইডিয়া থাকতে পারে, সেই আইডিয়াকে সে সমাজের দশজনের দেওয়া সাজা সয়েও নিত্য নব রূপ দিতে থাকবে। প্রেমমূলক চরিত্র নিজের নিয়ম নিজেই ঠিক করে নেয়। কিন্তু সমাজের নিয়মের সঙ্গে সে নিয়ম সব সময় তাল রাখে না বলে সমাজকে সে স্পষ্টত আঘাত করে অলক্ষ্যে ঘাতসহ করে। যে সমাজের যত অন্তর্দৃষ্টি, প্রেমকে সে সমাজ তত বড়ো পরিসর দেয়, চরিত্রকে সে সমাজ তত কম ছাঁচে ঢালাই করে। ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ডের সমাজ প্রেমকে বিশ্বাস ও সম্মান করে সবচেয়ে বড়ো পরিসর দিয়েছে। ইংলণ্ডে সন্ন্যাসীর প্রভাব নেই, বেশ্যার প্রতিপত্তি নেই, গৃহস্থ ও যতির মধ্যে সতী ও অসতীর মধ্যে ব্যক্তিগত উনিশ বিশ আছে, শ্রেণীগত ভেদরেখা নেই। ফ্রান্সের সমাজে প্রেমের পরিসর ইংলণ্ডের চেয়ে কম, সন্ন্যাসীর প্রভাব ও বেশ্যার প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু আমাদের এখনকার সমাজের মতো নয়, তখনকার সমাজের মতো যখন বসন্তসেনা ও চারুদত্ত ছিলেন। ফ্রান্সে demi-mondeরা বিবাহ করলে সমাজে স্থান পায়, বিবাহ না করলেও সমাজের আশ্রয় হারায় না; সমাজের স্বনিষ্ঠ পুরুষদের তারাই প্রেরণা দেয়, কীর্তিমানদের তারাই সখী-সচিব। ইউরোপের সর্বত্র আমাদের এখনকার সমাজের তুলনায় প্রেমের স্বাধীনতা ও প্রেমিকের দায়িত্ব বেশী এবং কোথাও পর্দা নেই। সমাজের নারীমাত্রেরই কাছে সমাজের পুরুষমাত্রেই দৃষ্টিসূত্রে এক প্রকার মাধুর্য পায় যা পর্দাগুণ্ঠিত দেশে পুরুষের ভাগ্যে জোটে না। নারীর মাধুর্যই পুরুষের শক্তি। ইউরোপের পুরুষ কোথা থেকে এত শক্তি সংগ্রহ করে, এমন ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে, দূর থেকে আমাদের কাছে তা অভাবনীয় এবং ইউরোপের এত দেশ থাকতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যে কেন এত দিকে এত কৃতী হয়েছে, দূর থেকে তারও আমরা দিশা পাইনে। বলা বাহুল্য passionএর সঙ্গে painএর সোদর-সম্বন্ধ। ইউরোপের লোক আমাদের তুলনায় ঢের অসুখী। কিন্তু এত অসুখী বলেই এত সৃষ্টিশীল। বড়ো মানুষের জন্ম বড়ো বেদনায়।

পুরুষের ঐশ্বর্য ও নারীর মাধুর্য এরই প্রকৃষ্ট অনুশীলনের পথে আমাদের চলতে হবে। শ্রীকৃষ্ণই সৎ, শ্রীরাধাই সতী। সমাজ যদি এঁদের স্থান না দেয় তা হলেও সমাজের মধ্যেই এঁদের স্থান করে নিতে হবে, সমাজের বাইরে চলে গেলে চলবে না। একজন হতে হলে দশজনের একজন হতে হয়, দশজনের বাধা কাটিয়ে উঠে, দশজনের মাথা ছাড়িয়ে উঠে!

(১৯২৮)

প্রতিমাভঙ্গ

আমাদের সমাজে পুরুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মতো ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠা যদি বা সম্ভব, নারীর পক্ষে শ্রীরাধার মতো মাধুর্যময়ী হয়ে ওঠা গোড়াতেই অসম্ভব।

আমাদের মেয়েরা জন্মাবধি স্বামী নামক একটি আইডিয়াকে পুতুলের মতো লালন করতে শেখে, যখন স্বামীপদ প্রাপ্ত মানুষটিকে পায় তখন সেই মানুষটিকে মানুষ ভাবতে পারে না, ভাবে সে একটি বিগ্রহ, সেই বিগ্রহটিকে অবলম্বন করে তাকে আইডিয়ার সাধনা করতে হবে। সেটি যদি একটি গাছও হয় তবু আমাদের মেয়েরা পরম সন্তোষের সঙ্গে বলে, "এই গাছই আমার প্রাণেশ্বর। এ কি যেমন তেমন গাছ! এর সঙ্গে আমার জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ, মৃত্যুর পরেও সে সম্বন্ধ কাটবার নয়, ছায়ার মতো এর অনুগত হওয়াই আমার ধর্ম।" স্বামীটি যদি একটি সদ্যোজাত শিশুও হয় তবু আমাদের মালঞ্চমালারা তাকেই পেয়ে ধন্য। যদি একটি অশীতিপর বৃদ্ধও হয় তবু আপত্তি নেই। যদি স্ত্রীর প্রতি তার এক বিন্দু প্রেম না থাকে, যদি তার একাধিক স্ত্রী থাকে, যদি তার দেহময় ব্যাধি মনোময় পাপ ও চরিত্রময় কলঙ্ক থাকে, তবু সে স্বামী অর্থাৎ বিগ্রহ। স্ত্রীর আইডিয়ায় সে পরম রূপগুণবান্ দেবতা।

ভগবানকে আমরা আপন মনের আইডিয়া দিয়ে চমৎকার সরল করে এনে সাপ ব্যাঙ কাঠ পাথরের উপর আরোপ করতে অভ্যস্ত। আমাদের সেই প্রতিমাপূজার ধাতটিকে আমাদের মেয়েরা আরেকটু পরিণতির দিকে নিয়েছে। তারা আপন মনের দেবতাটিকে অমানুষেরও উপর আরোপ করে ভাবে এই আমার দেবতা! ধর্ম বিষয়ে আমরা যেমন নিকৃষ্ট অধিকারী, প্রেম বিষয়ে আমাদের মেয়েরাও তেমনি নিকৃষ্ট অধিকারী। প্রতিমাপূজার একটা মস্ত সুবিধা এই যে তাতে মানুষকে অনেক দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। আমি যদি বলি, এই ফাউণ্টেন পেনটিই আমার ভগবান, একেই সহায় করলে আমি মাউণ্টেন লঙ্ঘন করতে পারি, তবে কার এত সাধ্য কে আমাকে বুঝিয়ে দেবে যে এই ফাউণ্টেন পেনটি আমার ভগবান নয় বা এটিকে পকেটে নিয়ে আমি আল্‌প্‌স্ মাউণ্টেনে হাওয়া খেয়ে আসতে পারিনে। কেবল সাধকরা একটু হেসে বলবেন, "নিশিদিন যাঁর বিরহে নয়নে অশ্রু বহে, সর্বস্ব পণ করেও যাঁকে পাইনি, পাবার আশা পর্যন্ত রাখিনে, তাঁকে তুমি কত সহজে পেয়ে গেলে দেখে হিংসা হয় কিন্তু।" আমাদের মেয়েরাও অনেক দুঃখ থেকে বেঁচে গেছে। অন্য দেশের মেয়েরা সারাজীবন পথ চেয়েও ভালোবাসার জনকে পায় না, যাকে পায় তাকে ভালোবাসতে পারে না বলে কাঁদে, ভালো না বাসলেও যাকে নিয়ে যথা লাভ ভাবে, তাকেও বেশী দিন ধরে রাখতে পারে না। জন্মজন্মান্তর! তারা নিজের স্বামীটিকে নিজে অর্জন করতে পারে তো করে, নিজে রক্ষণ করতে পারে তো রাখে, নিজে বিসর্জন দিতে পারে তো দেয়। প্রেমসংক্রান্ত সমস্যা এক একটি মেয়ের এক এক রকম, সমাজ তাদের নিয়ে নিজে তো জ্বলে পুড়ে মরেই, তাদেরও জ্বালা পোড়া দূর করতে পারে না, সমাজের উপর তাদের ও তাদের উপর সমাজের নালিশের ইয়ত্তা নেই। অন্য দেশের মেয়েদের তুলনায় আমাদের মেয়েরা এমন কী দুঃখিনী!

আমাদের মেয়েদের দশজনকেও যদি একসঙ্গে বেঁধে একটা কুষ্ঠরোগীর গলায় লটকে দেওয়া যায় তো দশজনেই পালা করে এমন পতিপূজা করবে যে পৃথিবীর কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সুদেআসলে বাড়তে থাকবে, দশজনেরই জন্ম-

জন্মান্তরকাল সেই একজনই যে ইষ্টদেবতা এ সন্দেহ তাদের একজনেরও জাগে না এবং পতিটি জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করলে সতীরা কে আগে জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করবে তাই নিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে দেবে। সহমরণ উঠে যাওয়ায় আমাদের বিধবাদের দুঃখ বেড়েই গেছে। একদিনে মরে গেলেই সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে যেত, প্রতিদিন লাঞ্ছনা গঞ্জনা উপবাস ও বিরহ কাঁহাতক পোষায়! তবু তাদের আশ্বাস এই যে বিগ্রহটি স্থানান্তরিত হলেও আইডিয়াটি তো মনের অন্তর হয় না, সেটিকে রোমন্থন করতে কবতে বাকী জীবনটা কোনোমতে কেটে যায়। কোনোমতে টিকে থাকাটা যাদের জাতীয় আদর্শ তাদের যেমন সধবাত্ব তেমনি বৈধব্য। স্বামী জীবিত থাকলেও কি স্বামীর প্রেম পাবার কোনো নিশ্চয়তা থাকে? দৈবাৎ যদি পাওয়া যায় তো সৌভাগ্য, না পাওয়া যায় তো দুর্ভাগ্য। দৈবের উপরে তো মানুষের হাত খাটে না। আমাদের মেয়েরা দৈবকেই সার বলে জেনেছে বলে একটি দুঃখে সকল দুঃখ ভুলেছে—সেটি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোর দুঃখ। সেইজন্যে তাদের একমাত্র প্রার্থনা, "হে ঠাকুর, আর যেন মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে না হয়!" তাদের দেশের মেয়ে তো তারা! দেশের সকলেরই প্রার্থনা, আর যেন জন্মাতে না হয়!

বিবাহ আমাদের সমাজে ধর্মের অঙ্গ। না করলে ধর্মহানি—বিশেষ করে মেয়েমানুষের পক্ষে। ধর্মের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ কিসের! শ্রেয় ও প্রেয় কখনো কি এক হতে পারে। বিবাহেব সময় কেউ প্রেমের প্রত্যাশা মনেও আনে না, প্রেম না দিয়ে ও না পেয়ে যদি সারাটা জীবন কেটে যায় তবু কেউ একটু আশ্চর্যও হয় না। সতী স্ত্রীর যথানির্দিষ্ট কর্তব্য করে গেলেই হলো— স্বামীকে সর্বতোভাবে সুখী করাই সতী স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য। স্বামীর বিয়োগে স্বামীকুলকে। নিষ্কাম ধর্ম যদি বলো তো আমাদের মেয়েরাই তা আচরণ করে থাকে বটে। এমনটি পৃথিবীর কোথাও নেই, তা সত্যি। স্বামী নামক একটি আইডিয়ার কাছে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি আত্মসমর্পণ—তার মধ্যে না আছে সে নিজে না আছে স্বামীপদপ্রাপ্ত মানুষটি। দু'পক্ষের কোনো পক্ষই মানুষ নয়— একটি কল, অন্যটি কল্পনা। 'নৌকাডুবি'র কমলা রমেশ মানুষটিকে কোনো দিন ভালোবাসেনি, ভালোবেসেছিলো রমেশকে বিগ্রহ করে স্বামীকে। যেই জানলে বিগ্রহটি আসল নয় নকল, অমনি তার ভালোবাসার বিগ্রহ বদলালো, এত দিনের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ এক নিমেষে মিথ্যা হলো দুঃস্বপ্নের মতো। একটা বন্ধ পর্যন্ত মনে স্থান পেলো না। সে তো মানুষ নয়, সে হিন্দু নারী! সে তো মানুষকে ভালোবাসতে পারে না, সে মূর্তিকে ভালোবাসে। কমলা যদি রমেশকে ভালো-বেসে তার সঙ্গে থাকত তবে নিজেকে কলঙ্কিনী মনে করে ঘৃণায় একশেষ করত এবং রমেশকেও কলঙ্কের সাথী বলে ঘৃণা করতে ছাড়ত না, অথচ সে সেই রমেশ যে ছিলো একদিন তার দেবতা। ভারতের মেয়ে স্বামী ছাড়া অপর পুরুষকে যদি ভালোবেসে ফেলে তো অপর পুরুষকে স্বামী ভেবে শ্রদ্ধা করতে পারে না, পূর্ব স্বামীকে পরপুরুষ বলে উড়িয়ে দিতে পারে না, বিবাহছেদ ও পুনর্বিবাহের কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না, সমাজকে তার এত শ্রদ্ধা যে সমাজের ভিতরে

থেকে সমাজের প্রথা দাবী করবার ভাবনা মনেই আনতে পারে না।

তাই কমলা যদি রমেশকে ভালোবেসে থাকত তবে আপনা হতেই বেশ্যা হয়ে যেত। অবশ্য একনিষ্ঠ বেশ্যা। বেশ্যা হয়ে যাওয়া সব সমাজেই আছে, কিন্তু বেশ্যা হয়ে যাওয়া বলতে যে কতখানি বোঝায় তা আমরা যেমন বুঝি কেউ তেমন বোঝে না। ইউরোপের মেয়ে যদি অপর পুরুষকে ভালোবাসে তবে সে সমাজের দণ্ড স্বীকার করে কলঙ্ক মাথায় নিয়ে সমাজকে আঁকড়ে ধরে, ছেড়ে যাবার প্ররোচনাকে কিছুতেই আমল দেয় না, স্বামীর ঘর ছেড়ে যার ঘর করে তাকে সমাজের চোখে তার স্বামী করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে, সমাজের চোখের সঙ্গে নিজের চোখকে এক করে নিজেকে পাপীয়সী ও প্রিয়কে পাপের সাথী বলে ঘৃণা করে না। কমলা যদি ইউরোপে জন্মাত রমেশকে ভালোবেসে ভালোবাসার সাজা সইত, বিবাহের উপায় না থাকলে কেঁদে ব্যর্থ হয়ে যেত, কিন্তু নলিনাক্ষের ঘর করতে রমেশের ঘর ছাড়ত না কিংবা রমেশের জন্যে বেশ্যা হয়ে যেত না। শুধু সধবাদের পক্ষে কেন, আমাদের বিধবাদের পক্ষেও পুনর্বিবাহ বেশ্যা হয়ে যাবার শামিল পাপ। স্বামী তো তাদের কাছে মানুষ নয় যে একটি মানুষকে হারালে বা ভুলে গেলে আরেকটি মানুষকে বিবাহ করবে। স্বামীটি তাদের আপনার মনের কল্পনা, সে কল্পনা কেবল একটি উপলক্ষকে আশ্রয় করবার, সে উপলক্ষটির বিনাশে বা বিচ্ছেদে অন্য উপলক্ষের কথা উঠতেই পারে না, উঠলে কল্পনার মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা এসে পড়ে। স্বামী কেবল একজন, বিবাহ কেবল একবার, কল্পনা কেবল একাশ্রয়ী।

স্বামী কেবল একজন বটে, কিন্তু 'এক' কথাটি যত বড়ো 'জন' কথাটি তত বড়ো নয়। অর্থাৎ জনটি রমেশ নলিনাক্ষ রাম শ্যাম তালগাছ শালগাছ শালগ্রাম-শিলা মাটির ঢেলা যেই হোক এক হলেই হলো। আমাদের স্ত্রীরা যে বিশেষ করে আমাদেরকেই ভালোবাসে এমন নয়। বিশ বছর একসঙ্গে বাস করবার পর হঠাৎ যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে আমরা তাদের স্বামী নই, তাদের স্বামী নৌকাডুবিতে হারিয়ে গেছে তবে তৎক্ষণাৎ তারা বিধবা হয়ে যাবে, তাদের ভালোবাসা পাত্রান্তরিত হবে। যে ভালোবাসা পাত্রান্তরিত হতে পারে সে ভালোবাসা যে কোন দরের তা তলিয়ে দেখে কাজ নেই। নিখিলের সঙ্গে ন'বছর ঘর করবার পর বিমলা যদি জানত যে বিয়ের রাত্রে নৌকাডুবি হয়ে সমস্ত উলটপালট হয়ে গেছে, নিখিল তার কেউ নয়, সন্দীপই তার স্বামী, তবে বিমলা সন্দীপের পায়ের ধুলো নিয়ে 'ঘরে বাইরে' শেষ করত, নিখিলের কী দশা হবে ভুলেও ভাবত না, মৃত্যু-শোকহীন নিখিলকে মরতে রেখে যেত। তা যখন সত্য নয় তখন বিমলা ঘুরে ফিরে নিখিলেরই হতে বাধ্য। নিখিল যে সন্দীপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা সন্দীপের চেয়ে তাকে বেশী ভালোবাসে এটা আকস্মিক। নিখিল যদি তার দাদাদের মতো মাতাল ও বেশ্যাসক্ত হতো আর সন্দীপ হতো সাক্ষাৎ যীশুখ্রীষ্ট ও বিমলা-গত প্রাণ তবু বিমলা শেষ পর্যন্ত নিখিলেরই থাকত এবং পরপুরুষকে কিছুকাল মনে মনে ভালোবেসেছিলো বলে হয়তো কঠিন আত্মনিগ্রহ করত। আমাদের আধ্যাত্মিক দেশে মন যদি পাপ করে তো দেহ পায় সাজা, সুতরাং আত্মনিগ্রহ

মানে দেহনিগ্রহ।

'ঘরে বাইরে' বইখানার শেষ যে ওরকম হবে তা নিয়ে গোড়া থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। বিমলাকে হারাবার ইচ্ছা বা আশঙ্কা নিখিলের একেবারে নিরর্থক, হিন্দু নারী কখনো হারায় না। এবং যদি হারায় তো এমন হারায় যে তাকে হৃদয়ে ফিরে পেলেও ঘরে ফিরে পাওয়া অসম্ভব—সে নিজেই রাজি হয় না। বিমলাকে নিখিলের হারাবার প্রশ্নই ওঠে না, বিমলা তো কোনো দিন নিখিলের ছিলো না, সে তার স্বামীর। 'ভারতবর্ষীয় বিবাহের' মূল তত্ত্ব এই যে, সমাজ নারীর জন্মাবধি তার মনে স্বামী নামক একটি আইডিয়াকে বীজ থেকে লতা করে তুলবে, তারপর একদিন সেই কল্পলতাটিকে ব্যক্তিনির্বিশেষে যে কোনো পুরুষমহীরুহের প্রতি উন্মুখ করে দেবে, তারপর লতাটি তাকে জড়াতে জড়াতে চলবে ও তার মৃত্যু হলেও তাকেই আশ্রয় করে থাকবে। সেই ফাঁকে যদি একটু প্রেম হয় তো ভালোই, নইলে প্রেমের জন্যে সমাজের মাথাব্যথা পড়েনি, স্ত্রীপুরুষের একত্র হওয়াটাই সমাজের পক্ষে আবশ্যক, তাদের প্রেমটা সমাজের পক্ষে অবান্তর। সমাজ একনিষ্ঠতা দাবী করে, প্রেম দাবী করে না।

দুটি মানুষকে একত্র করে দিলে তাদের মধ্যে প্রেম জন্মানো স্বাভাবিক, অন্তত নারীর দিক থেকে। প্রেম জন্মায়ও, কিন্তু সে প্রেমের মধ্যে ব্যক্তির স্থান নেই। তাই নিখিলের আত্মাভিমানে বাধে। সে ভাবে বিমলা নিজের মনের স্বামী-প্রতিমাটিকেই ভালোবাসছে, সেই প্রতিমাটির আড়ালে নিখিল পড়েছে ঢাকা। নিখিল চায় বিমলা তাকে নিখিল বলেই ভালোবাসুক, বিশ্বের স্বয়ম্বর সভায় তাকে নিখিল বলেই বরণ করুক। এক হাতে তাকে ত্যাগ করবার স্বাধীনতা রেখে অন্য হাতে তাকে গ্রহণ করুক। কিন্তু বিমলা যে হিন্দু নারী, সে যে সমাজের হাতে গড়া কল, তার গায়ে সন্দীপকে লেলিয়ে দিয়ে ফল নেই। আর যদি একবার বিগড়ে যায় তো একেবারে ছারেখারে যাবে। সুতরাং নিখিলকে যাবজ্জীবন প্রতিমার আড়ালে ঢাকা পড়তে হবে, এই তার বিমলাকে বিবাহ করার শাস্তি। নিখিল যে নিখিল বলেই একজনের প্রিয়, এ উপলব্ধি তার কোনো দিন হবার নয়। মায়ের ভালোবাসাতে, বোনের ভালোবাসাতে, মেয়ের ভালোবাসাতে পক্ষপাত নেই বলে পুরুষ স্ত্রীর ভালোবাসাতে পক্ষপাত খোঁজে ; কিন্তু এমনি আমাদের স্ত্রীরা যে তাদের ভালোবাসাতেও পক্ষপাত নেই, তারা স্বামীকে ভালোবাসে ব্যক্তিনির্বিশেষে, তাদের কাছে রমেশ নলিনাক্ষ রাম শ্যাম কাঠ পাথর সবাই 'হইলে হইতে পারিত' স্বামী।

কিন্তু বিমলা যে বিমলা বলেই একজনের প্রিয় এ উপলব্ধি তার হবার। কেননা পুরুষকে আমাদের সমাজ আইডিয়া-বাহী কল করেনি, নিখিল ইচ্ছা করলেই তার দাদাদের মতো স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্যের হতো বা আরেকটি বিয়ে করে সুয়ো রাণীটিকে বিশেষ করে ভালোবাসতে পারত। তা যে সে করেনি এরই থেকে প্রমাণ হয় সে বিমলাকে বিমলা বলেই ভালোবেসেছে, নিজের মনের প্রতিমার আড়ালে ঢাকেনি। এটা অবশ্য সোজা প্রমাণ নয়, বাঁকা প্রমাণ, তবু মোটের উপর এটা মিথ্যা নয় যে আমাদের সমাজে পুরুষই পক্ষপাতী প্রেম জেকে

বঞ্চিত, পুরুষই দুঃখী, নারী নয়। পুরুষের এই একটি দুঃখের কাছে নারীর সকল দুঃখই তুচ্ছ। ব্রাহ্মসমাজের মহিম যে সৌভাগ্য পেলো হিন্দু সমাজের কোনো স্বামীই সে সৌভাগ্য পায় না, কারণ হিন্দু সমাজের অবলারা সবাই এক একটি মৃণাল, প্রত্যেকেই এক একটি প্রতিমা পূজারিণী। মাটির ঢেলাকেও তারা পুরুষশ্রেষ্ঠের মতো ভালোবেসে পূজা করবে। পুরুষের পৌরুষের উপর তাদের এতোই সামান্য দাবী যে আমাদের সমাজে পুরুষমাত্রেরই স্ত্রী জোটে, তার সব অযোগ্যতা উপেক্ষিত হয়, সে যদি পাগল অন্ধ ভিক্ষুক হয়ে থাকে—না, যদি মাতাল লম্পট হত্যাকারী হয়ে থাকে—তবু তাকে দেবতা জ্ঞান করবার একটি মানুষ থাকবেই, সে তার মৃণাল। 'শ্রীকান্তে'র অন্নদাদিদির স্বামীদেবতাটি যদি ব্যক্তিবিশেষ বলে ব্যক্তিবিশেষের প্রিয় হয়ে থাকত তবে কথা ছিলো না, কিন্তু সে তা নয়, সে তার স্ত্রীর আইডিয়ার প্রতীক মাত্র এবং তার স্ত্রী সমাজের দম-দেওয়া কল-ই, হোক না কেন সে যতোই উঁচুদরের কল। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে এইখানে আমাদের তফাৎ যে আমরা আবালবৃদ্ধ যেমন ভগবান বলে আমাদের আপন মনের অনড় প্রতিমাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ভগবানের উপর আমাদের দাবীকে ছোটো করি, আমাদের বনিতারাও তেমনি তাদের আপন মনের অনড় প্রতিমাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আমাদের উপর তাদের দাবীকে ছোটো করে। দাবী ছোটো হলে পাওনাও ছোটো হয়, যে ভগবানের আভাস আমরা পাই ও যে পৌরুষের নমুনা আমাদের মেয়েরা দেখে দুই সমান খর্ব, দুই সমান অধম। এবং দাবী ছোটো হলে যে দাবী করে তারও বৃদ্ধি হয় না, নিকৃষ্ট অধিকারী নিকৃষ্ট থেকে যায়, আমাদের পৌত্তলিক সাধকরা ঋষি হন না, আমাদের পৌত্তলিক প্রেমিকারা উমা-সাবিত্রী হয় না। আমাদের মেয়েদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারাও নেহাৎ লক্ষ্মীটি, তাদের প্রেম কলমী গাছের ফুল, তাদের প্রেমাস্পদরা পোষা ভ্রমর, তাদের সৃষ্টি স্বাদু কিন্তু স্বাদ-বৈচিত্র্যহীন। অন্নদাদিদি বা মৃণাল প্রাচীন ভারতে জন্মালে ব্যক্তিবিশেষকে ভালোবাসবার বা পূজা করবার সুযোগ পেত। নির্বিশেষকে ভালোবেসে ও পূজা করে যত মাধুর্যময়ী হলো তখন হতে পারত তার বেশী মাধুর্যময়ী। আমাদের মেয়েরা ব্যক্তিবিশেষকে ভালোবেসে স্বামী করবার সুযোগ পায় না, এইটেই তাদের পরম দুর্ভাগ্য, পেলে তাদের মাধুর্যের সীমা থাকত না, তারা জগতের মাঝে কত বিচিত্র বিচিত্ররূপিণীই হতো, কেবল আমাদের ঘরের কোণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র হয়ে নারীজন্মকে ব্যর্থ করত না।

মধুর প্রেমের সাধনায় প্রতীককে নয় ব্যক্তিকে করতে হয় উপলক্ষ। কিন্তু প্রেমকে নারীপক্ষে নৈর্ব্যক্তিক করবার জন্যে আমাদের সমাজ নারীমাত্রকেই জন্মা-বধি পক্ষাহত করেছে। অবরোধ ও অশিক্ষার চেয়ে এই ব্যাধিই তাদের বৈরী, মৃত্যুর আগে এর কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই তাদের। একজনেরও সাধ্য নেই নিষ্কৃতি পায়, এইটে আরো বড়ো দুর্ভাগ্য। শিক্ষাসত্ত্বেও না, স্বাধীনতাসত্ত্বেও না। সেই জন্যে 'শেষ প্রশ্নে'র কমলকে শরৎচন্দ্র অর্ধ ইংরেজ করলেন জন্মত। 'গৃহদাহে'র অচলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়নি, ব্রাহ্ম সমাজ যে হিন্দু

সমাজেরই সন্তান, প্রতিমাপূজোর ধাত তারও যায়নি। 'শেষ প্রশ্নে'র কমল ব্রাহ্ম সমাজে কেন, ভারতীয় খ্রীষ্টান সমাজেও সম্ভব হতো না। আশ্চর্য শরৎচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি। যেমন ভগবান সম্বন্ধে তেমনি প্রেম সম্বন্ধে—যে বলে আমি পেয়ে গেছি, সে ঠকে গেছে। যে বলে আমি পাবার আশা রাখি সেও নিজেকে ঠকায়। পাবার জন্যে অবিরাম সাধনাটাই যা পাওয়া। সেই পাওয়াতেই সাধককে সুন্দর করে, তেজস্বী করে, আনন্দময় করে, তপস্বিনীকে তপ্ত কাঞ্চনের আভা দেয়। সাধনা যার যত দুর্বল, পাওয়া তার তত নগণ্য। সমাজের চিরকালই দুর্বলতার দিকে টান, কেবল আমাদের সমাজের নয়, সব সমাজের। কিন্তু সাধকের গতি দুর্বলতার থেকে প্রবলতার দিকে, মৃত্যুর থেকে অমৃতের দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে। আমাদের সমাজে সাধকের সংখ্যা ও দর অল্প বলেই আমাদের দুর্গতি। আমাদের সমাজে প্রেমের সাধনা করবার দুঃসহ ব্রত যে কমলরা নেবে তারা যেন নিজের মনের মরীচিকাকে দিয়ে প্রাণভরা তৃষা মেটাবার ভান করে না, তারা যেন রসের সন্ধানে ছুটে প্রাণ দেয়, তবু ঢিল দেয় না, তারা যেন এক প্রেমের স্বাদ থেকে আর-এক প্রেমের স্বাদে যায়, কোনোটাতেই আসক্ত হয় না। প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠ হওয়াই তো যথার্থ একনিষ্ঠতা, প্রেমিকের প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া সোনা নয়, সোহাগা। একজনের কাছে যদি সব স্বাদ মেলে তো একজন, নইলে 'এক' কথাটা অবান্তর, 'জন' কথাটাই আসল। নিখিলের কাছে যত দিন বিমলা অমৃত পাবে নিখিলই ততদিন তার প্রিয়, তার স্বামী; তার পরে সন্দীপ, তারপরে আর কেউ; তারপরে নিখিলই যে আবার তার প্রিয় হবে এমন মাথার দিব্যি নেই; নিখিল হয়তো আর কারুর প্রিয় হবে, নয়তো কারুরই না। কান্না এড়াবার জন্যে তো প্রেম নয়, কান্না সার্থক করবার জন্যেই প্রেম। নিখিল কাঁদবে, তবু তার এই গৌরব খোয়াবে না যে, সে প্রতিমার দ্বারা ঝাপসা হয়নি, সে পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে। সে বিমলার মনগড়া স্বামীদেবতা নয়, সে নিখিল, সে যা সে তাই। বিমলা যদি নিজের প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে নিখিলকে প্রিয় করে তো ভালোই, নইলে বিমলার মনের প্রতিমার প্রতি বিমলার একনিষ্ঠতা বিমলাকেও বড়ো করবে না, নিখিলকেও না।

(১৯২৮)

আমরা

ক্ষয় ও পতন

রোমক সভ্যতার ক্ষয় ও পতন সম্বন্ধে বিরাট গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ভারতীয় আর্য সভ্যতার ক্ষয় ও পতন সম্বন্ধে তেমন কোনো গ্রন্থ নেই, কিন্তু থাকা উচিত। না থাকার কারণ আমরা ইদানীং যে-অবস্থায় আছি তাতে আমাদের মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া হচ্ছে কোনোমতে আত্মসম্মান বজায় রাখা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কত বড় ছিলেন সেইটে স্মরণ ও প্রচার করা আমাদের দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের প্রধান চিন্তা। আর আমাদের সংস্কারকদের তো বিশ্বাস আমরা সেই আর্যই আছি, সেই ভীমার্জুনের বংশধর, সকালবেলা কাঁচা ছোলা চিবোলে সেই পরাক্রম আবার ফিরবে।

সব ছিল, কিছুই নেই, এর মাঝখানের রহস্যটুকুর একটা সুলভ নিরাকরণ হচ্ছে ইংরাজের দোষ, তার আগে মুসলমানের। পরকে দোষ দিতে যাঁদের লজ্জা করে তাঁরাও দোষ ধরেন নিজের। কিন্তু দোষটা যে ভারতীয় আর্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত হতে পারে, হতে পারে মহাজন যে-পথে গেছেন সেই পন্থার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার হতে পারে, হতে পারে গোঁজামিলকে সমন্বয় জ্ঞান করার—এদিক দিয়ে ভাবতে আমাদের আন্তরিক আপত্তি। পূর্বপুরুষের বিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমরা এতটা নিঃসংশয় যে দোষ আর-সকলের হতে পারে, কালচক্রের আবর্তনের হতে পারে, বিধাতার হতে পারে, বরাতের হতে পারে, কিন্তু ত্রিকালদর্শী ঋষিদের ? নহে, নহে, নহে।

গত এক শতাব্দীতে আমাদের মধ্যে যত অবতার ভূমিষ্ঠ বা ভূঁইফোড় হয়েছেন, তার আগের তিন হাজার বছরে তত নয়। গত এক শতাব্দীতে আমাদের দেশে যত আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, সমগ্র বর্ণাশ্রম যুগে তার সিকিও নয়। আমরা যে অপ্রকৃতিস্থ তা এমন স্বতঃসিদ্ধ যে আমাদের দ্বারা আর যাই হোক ইতিহাসের থেকে শিক্ষালাভ হবে না। আমরা ভাঙা দেউল দেখে উচ্ছ্বসিত হব, মাটি খুঁড়ে ইট-পাথর পেলে আনন্দে মাথা খুঁড়ব, সন তারিখ ও হিজিবিজি নিয়ে থীসিস ফাঁদব, গীতার তেতাল্লিশটা সাবেক ভাষ্য উদ্ধার করে সাতান্নটা নয়া ভাষ্য জুড়ব, সেগুলো হবে গন্ধমাদনের চেয়ে ওজনে ভারী ও বিশ্বকোষের চেয়ে সবজান্তা। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় কী করে ফাটল ধরল, কেন ও কবে—এর অনুসন্ধান করলে হয়তো আমাদের আধ্যাত্মিক নিশ্চয়ের ভাব লেশমাত্র দোলা খাবে, কণামাত্র সংশয় আমাদের অহোরাত্র অতিষ্ঠ করবে, কোথাও কোনো সান্ত্বনা না পেয়ে আমরা সত্যি সত্যি চিন্তা করব, পরীক্ষা করব, চোখ চেয়ে দেখব, নতুন একটা সভ্যতা বিরচনের দায়িত্ব নেব। আত্মবিশ্বাস ছাড়া সম্বল আমাদের থাকবে না, পুরুষকার ছাড়া সহায় আমাদের থাকবে না। হয়তো হারব, হয়তো হাস্যাস্পদ হব, হয়তো পাগল হয়ে যাব।

একথা সত্য যে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ভারতের যোগসূত্র যেমন অবিচ্ছিন্ন, গ্রীস রোম ও মিশরের তেমন নয়। কিন্তু এর থেকে এই সিদ্ধান্তে ঝাঁপ দিলে চলবে না যে আমরা হিন্দুরা এক সনাতন জাতি, আমাদের সভ্যতা অবিনশ্বর। আজকের পৃথিবীতে অন্তত আরো চারটি জাতি আছে, তারাও তাদৃশ দাবী করতে পারে। ইহুদী, পার্সী, চীনা ও জাপানী প্রায় সমান

সনাতন। আফ্রিকার কাফ্রিদের আর্ট যে ঠিক বর্বর নয়, ওর যে এক আশ্চর্য ক্রমপরিণতি আছে, ওর পশ্চাতে যে অন্য একরকম সভ্যতা রয়েছে এমন জল্পনাও সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে। কাজেই আমাদের আত্মপ্রসাদের শরিক অনেক।

বস্তুত অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র থেকে বিপরীতটাই প্রমাণিত হয়। প্রতিপন্ন হয় আমাদের পরিবর্তনক্ষমতা। মুসলমানরা এসে আঘাত না করলে আমরা স্বেচ্ছায় পরিবর্তিত হতুম কি-না বলা শক্ত, তবে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমরা পরিবর্তিত হয়েছি। এই পর্যন্ত মেনে নিলে প্রশ্ন ওঠে, পরিবর্তনের প্রয়োজন কী ছিল ও কতটা ছিল এবং তারও পরে জিজ্ঞাসা জাগে, পরিবর্তনের প্রয়োজন যতটা ছিল ততটা কি মিটেছে এই সহস্রাধিক বৎসরে? অর্থাৎ পুরাতনত্ব কি আমরা সর্বথা পরিহার করেছি, পুরাতনকে আমরা সসম্মানে বিদায় দিয়েছি?

প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে এই যে কোনো জিনিস যেমনি হয়ে উঠল অমনি তার প্রস্থানের ঘণ্টা পড়ল। তৈরি জিনিসকে প্রকৃতি নিজ হাতে ভাঙে। সনাতন হচ্ছে সে স্বয়ং, অন্য কেউ নয়। পুরাতনকে সনাতনের স্থান দিলে পরিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়। রক্ষণীয় যদি থাকে তবে তা যোগসূত্র, তা অন্বয়। তার বেশী রাখবার নেই। তার বেশী রাখতে চাওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তার সাজা পরের দ্বারা বলপ্রয়োগে পরিবর্তন। প্রথমে মুসলমানকে দিয়ে; তাতেও যথেষ্ট হলো না, তারপরে ইংরাজকে দিয়ে। কিন্তু বলপ্রয়োগে তো অন্তঃ-পরিবর্তন ঘটে না, আন্তরিক পরিবর্তনের উপায় প্রকৃতির অভিপ্রায় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। ইতিহাস যদি ঠিকমতো পড়তে জানি তবে প্রকৃতির অভিপ্রায়ও উপলব্ধি করব।

পরাধীনতার একটা মস্ত দোষ এই যে মানুষের নজর যায় পরের দিকে। আবার সেই পরমুখাপেক্ষিতার প্রতিক্রিয়াবশত আত্মসম্মানবোধ এমন প্রখর হয় যে নজর পড়ে হারিয়ে-যাওয়া ছাড়িয়ে-ওঠা ছাড়া খোলসের উপর; সামনে যে ভবিষ্যৎ রয়েছে, তার জন্যে যে দায়িত্ব রয়েছে, সামনে যে-অশ্ব রয়েছে, তার যে বল্গা ধরতে হবে স্বহস্তে—এটুকু সহজজ্ঞান জন্মাতে কয়েক শতাব্দী লাগে। বাঁচা মানে ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফেরানো। অতএব অতীতের দিকে পিঠ ফেরানো। যারা প্রবলভাবে বাঁচে সেইসব ধাবমান ঘোড়সোয়ার পিছনে চাইবার অবসর পায় না, দু'দিন আগের ঘটনাও দু'শ যোজন দূরে পড়ে থাকে। বাল্যের স্মৃতি নিয়ে যৌবনের যে পরিমাণ অংশ অতিবাহিত হয় সে অতি অসহ্য অপচয়।

আমরা যদি সত্যি সত্যি বাঁচতে চাই তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের অতীত হ্রস্ব, ভবিষ্যৎ দীর্ঘ। আমাদের ইতিহাস হচ্ছে ইতিহাসের ভূমিকা, আসল ইতিহাসের সমস্ত বাকী। আর মনে রাখব যে আমাদের পূর্বপুরুষদের সভ্যতা বহুদিন নিঃশেষ হয়েছে, তার ধ্বংসাবশেষ যেন এক প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ি, তার মেরামতির মজুরি পোষায় না। সেকালের ইট হয়তো আমাদের কাজে লাগবে, কাঠ হয়তো জ্বালানি কাঠ হবে, ব্যবহার বলতে এই অর্থে। কিন্তু ওর মধ্যে বাস করবার মতো পিতৃভক্তি না থাকাই শ্রেয়।

অমন ভক্তি যে আমাদের সংস্কারকদের আছে তাও নয়। তাঁরাও বাস করেন একালের ভাড়াবাড়িতে, ছুটির দিনে ওকালের পিতৃপুরুষের ভিটা মাড়িয়ে আসেন। তবে তাঁদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, অমন বাড়ি আর হয় না, ওরই একটু জীর্ণসংস্কার করলে ভারতবর্ষের দুর্দশা ঘুচল।

এই যে মোহ একে দূর করবার প্রশস্ত প্রক্রিয়া হচ্ছে ভারতীয় আর্য সভ্যতার ক্ষয় ও পতনের হেতুনির্ণয়। মগজ থেকে ভূতলোকের ভূত না নামলে মগজ বিশেষ কার্যকর হবে না।

সভ্যতা দেউলে হয় তখন, যখন নিজের বিবর্তনের সঙ্গে নিজে দৌড় দিতে অক্ষম হয়, যখন তার পদে পদে দ্বিধা, মর্মে মর্মে ভয়, আরামের প্রতি টান, পরিচিতের প্রতি আসক্তি, অনাগতের প্রতি সন্দেহ, স্বীয় ক্ষমতায় অনাস্থা। আমরা ব্যক্তির জীবনেও লক্ষ করি কেমন করে একজন প্রথম বয়সে প্রতিভার চমক দেখিয়ে ক্রমে ক্রমে নিবে যায়। তারপরে যে বেঁচেও থাকে, নামও করে, বাড়িও বানায়, ব্যাংকেও মোটা আমানত রেখে যায়। কিন্তু সে কি সেই ব্যক্তি? না, সে তার প্রথম বয়সের ভূত। এর কারণ সে নতুন করে প্রেমে পড়তে, দুঃখ পেতে, নতুন করে চিন্তা করতে, স্বপ্ন দেখতে, নতুনের ডাকে ঘর ছাড়তে, জীবিকায় জলাঞ্জলি দিতে, নতুনের জন্যে সর্বস্ব পণ করতে কুণ্ঠিত হয়, দ্বিধা বোধ করে, দিনযাপনের স্রোতে ভেসে যায়, মনকে ভাঁড়ায় নানা আজগুবি গোঁজামিলে, ভাবে সেই স্রোতই নিত্য স্রোত আর সেই ভাসমানতাই পুরুষার্থ। এমন মানুষ সোয়াস্তির জন্যে স্বাধীনতায় ইস্তফা দেয়, পরের পায়ে দাসখৎ লিখে নিজের গর্বে নিজের গর্তে জাঁকিয়ে বসে। প্রথম বয়সের কাব্য শোনায় স্ত্রীকে, আর নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, এমন কবিতা আজকাল কেউ লিখতে পারে না, যত সব বাজে লেখক।

আমার মনে হয় প্রাচীন ভারত ক্রমবর্ধমান জটিলতার সব ক'টি গ্রন্থি হাতে রাখতে পরেনি, শক্ত করে ধরেছে একটিমাত্র সূত্র, সেটি ব্রহ্ম সত্য জগৎ মায়া। চরিত্রবল যেমন প্রতিভার বিকল্প নয়, ব্যক্তির বেলায় যেমন চরিত্রবল থাকলেও প্রতিভা চলে যায়, জাতির জীবনে তেমনি কোনো এক তত্ত্বের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা যৌবনোল্লাসের অভাব পূরণ করে না। আত্মা বৃদ্ধেরও আছে, কিন্তু যৌবন বৃদ্ধের নেই।

মানুষের বিবর্তন তার জীবনযাত্রাকে, মানুষের ইতিহাস তার জীবন-স্বপ্নকে অনুক্ষণ আহ্বান করছে নব নব বিপথে, পরীক্ষা করছে নব নব সংকটে। আজ ইউরোপের এক সন্ধিক্ষণ, ব্যাপকভাবে মানবজাতিরও। এমনি এক সন্ধিক্ষণে প্রাচীন ভারত কালের বাণী কানে শুনতে পেলো না, বার্ধক্য তাকে বধির করেছিল। কাল তাকে অতিক্রম করল।

(১৯৩৬-৩৭)

আমাদের মধ্যযুগ

জীবন আছে অথচ জীবন সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ নেই। এরই নাম পতন। পতন থিয়েটারের পতন ও মূর্ছা নয়। ব্যক্তির বেলায় যেমন জাতির বেলায় তেমনি জীবনযাত্রা মোটের উপর অব্যাহত থাকে, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যতিক্রম ঘটে না, বরং সমৃদ্ধি বাড়ে, সাফল্য থেকে আসে মেদবৃদ্ধি।

আমাদের দায়িত্বহীনতার সূচনা মুসলমান আক্রমণের পরে নয়, পূর্বে। রাজপুত নামক যে গোষ্ঠীর প্রশংসায় আমরা শতমুখ তাদের গোষ্ঠীসুদ্ধের প্রধান কাজ ছিল কলহ, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কলহ। এই বৃহৎ গোষ্ঠীর খোরাক যোগাতে হতো সমাজের আর দশজনকে। এরা ছিল ভারতের ফিউডাল ব্যারন, এক-একটা দুর্গের চারধারে ছোট ছোট রাজ্য রচনা করে এরা থাকত সামন্ত-রূপে, যার ক্ষমতা বেশী তাকে নজর দিত। রক্তে এরা শক হূন কুশান। ক্ষত্রিয়শূন্য দেশে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু এদের 'রাজপুত' এই নাম থেকে মনে হয় এদেরকে পুরাপুরি ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করতে সমাজের দ্বিধা ছিল।

যতদিন ভারতে ক্ষত্রিয় ছিল ততদিন ব্রাহ্মণের পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বেদ উপনিষদের অনেকাংশ ক্ষত্রিয়ের রচনা। পরশুরাম বাস্তবিক দেশকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন কি-না বলতে পারিনে, কিন্তু ব্রাহ্মণের অভিলাষ ছিল তাই। বৌদ্ধদের প্রতি বিদ্বেষের অন্যতম হেতু ক্ষত্রিয় রাজন্যদের অনেকে ছিলেন বৌদ্ধ। বুদ্ধ স্বয়ং ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিবাদ যে একদা ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা ছিল তার সন্দেহ নেই। ক্রমে ব্রাহ্মণ জয়ী হয়। কী করে হলো তার দুটি কারণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত মৌর্য সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরলে কয়েকটি রাজ্য ব্রাহ্মণবংশীয়দের দখলে আসে। দ্বিতীয়ত শক ও কুশানরা যেসব রাজ্য পায় সেসব রাজ্যে ব্রাহ্মণ গিয়ে তাদের দক্ষিণ হস্ত হয়। নকল সূর্য-বংশী ও নকল চন্দ্রবংশী সেজে তারা মহা খুশি। ব্রাহ্মণদের সাহায্যে তারা লোকচক্ষে উন্নত হলো, সুতরাং ব্রাহ্মণদের মান্য করতে তাদের বাধলো না। বৌদ্ধদের গর্ব খর্ব করে ব্রাহ্মণরা নিষ্কণ্টক হলো। গুপ্ত সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা হ্রাস পেলো না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলো। ততদিনে তারা সংস্কৃত সাহিত্যের ও শাস্ত্রের অনুশীলন প্রায় একচেটে করেছে। তারাই পুরোহিত, তারাই গুরু, তারাই উপদেশক, তারাই উপাধ্যায়। উপরন্তু মন্ত্রী তারা, বিদূষক তারা, কখনো কখনো সেনাপতিও তারা। সভাকবি তো তারাই, সংগীতকার তারা, নটরাজ তারা, যাত্রার দলের অধিকারী তারা, রাজবৈদ্যও তারাই। সভ্যতা ততদিনে যথেষ্ট জটিল হয়ে উঠেছে, বাহুবলের চেয়ে কূট-বুদ্ধির প্রয়োজন পদে পদে। ঋষিরা অদৃশ্য হয়েছেন, অরণ্য উৎসাদিত, আশ্রম হিমালয়ে অন্তরিত। নগর আর গ্রাম মিলে দেশকে ভাগ করে নিয়েছে। লোকে আর শিকার খুঁজে পায় না, কসাই হতেও প্রস্তুত নয়, অগত্যা অহিংসাবাদী। বড় বড় গোঘ্ন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ অপ্রচলিত হওয়ায় গোমাংসের স্বাদ হারিয়েছেন, তাঁদের অনুকরণে দেশসুদ্ধ গোমাতার ভক্ত। গো-ব্রাহ্মণ এক পর্যায়ভুক্ত হলেন।

ইতিমধ্যে কোন-এক সময় মন্দিরে দেশ ছেয়ে গেছে, ব্রাহ্মণ তার পূজারী হয়ে নিষ্কর ভূমি ভোগ করেছে। ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবতারা অস্তমিত। বিষ্ণু শিব ও তাঁদের শক্তিস্বরূপিণীরা মন্দিরে ও বৃক্ষতলে অধিষ্ঠিত। অবশ্য বৃক্ষতলবর্তীরা আবহমানকাল ছিলেন—আদিমদের ফেটিশ। অভিজাত দেবতাদের থেকে যে তাঁরা অভিন্ন নন এইটে প্রতিপন্ন করে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের সমন্বয়শালিনী প্রতিভার ও বিবর্ধনশালিনী নিষ্কর ভূমির সামঞ্জস্য ঘটালেন।

ওদিকে ইউরোপেও একই ব্যাপার চলছিল। ফিউডাল ব্যারন ও তার দক্ষিণহস্ত ক্লার্জি আপোসে দক্ষিণা-আদায় কার্যে ব্যাপৃত। এমন সময় রসভঙ্গ করল মরক্কোর মূর ও তুরস্কের তুর্ক। ভূমধ্যসাগরের দুই প্রান্তে যে-দুটি প্রণালী ছিলো ও আছে সেই ছিদ্র দিয়ে তাদের প্রবেশ। এদেশেও উত্তর-পশ্চিমের খিড়কি খোলা ছিলো। বললে বিশ্বাস করবেন না, যখনি যে ও-পথ দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে সে-ই কপাট দিতে ভুলেছে। একবার নয়, দুবার নয়, কতবার যে ভারতের ভোলানাথরা ভুল করলেন তার সুমারি নেই। আর্যরাও এসেছিলেন ঐ পথে, শক কুশান হুনরাও, পাঠান তুর্কিস্থানী মুঘলরাও। এ ছাড়া সাময়িকভাবে এসেছে ইরানী গ্রীক গান্ধার বক্তিয়ে পার্থিয় এবং আরো অনেকে। এইখানে বলে রাখতে চাই যে মুসলমান বলে কোনো জাতি এদেশে আক্রমণ করেননি। যাঁরা করেছিলেন তাঁরা পাঠান ইত্যাদি জাতি ও খালজি ইত্যাদি উপজাতি। তাঁরা নিজেদের মধ্যে অবিকল রাজপুতেরই মতো মারামারি করতে করতে পরবর্তীদের দ্বারা কাবু হলেন। ঠিক তেমনি নির্বোধের মতো খিড়কি খোলা রাখলেন, হাতীর পিঠে চড়ে লড়াই করতে নেমে হস্তীমূর্খতার পরিচয় দিলেন। পাঠানে তুর্কে, তুর্কে তৈমুরে, মুঘলে পাঠানে, নাদিরে মুঘলে যতবার যত যুদ্ধ ঘটেছে হিন্দু রাজায় মুসলমান সুলতানে ততবার তত নয়। হয়েছে যখন, তখন হিন্দু-মুসলমানে হয়নি, হয়েছে রাজপুতে পাঠানে, রাজপুতে মুঘলে, মরাঠায় মুঘলে। আওরংজেবের আমলে কতকটা ধর্ম সংঘর্ষের ভাব এলো, সেও শিয়া মুসলমানকে বাদ না দিয়ে। এবং বাপকে ও ভাইকে সরিয়ে। আওরংজেবের মুসলমানত্ব মুসলমানকেই আঘাত করল বেশী। গোটাকয়েক রাজপুত সামন্ত বশ্যতা মানল, হিন্দুর ক্ষতি এই পর্যন্ত। ওদিকে বিনষ্ট হলো দুই বনেদী শিয়া রাজবংশ। আর কাবুলে অভিযান কাবুলকে যত না কাহিল করল সাম্রাজ্যকে করল ততোধিক।

রাজপুতদের সময় থেকে যে ফিউডাল ব্যবস্থার সূত্রপাত মুসলমান আমলেও তার জের চলল। মুসলমান রাজাদের দায়িত্ববোধ যে রাজপুতের সমতুল্য তার নমুনা তাঁদের খিড়কি ও হাতী। তাঁরাও নির্বিঘ্নে খাজনাটি পাবেন বলে দেশটাকে ভাগ করে দিলেন সামন্ত সুবাদার মনসবদার জমিদারের মধ্যে। এঁরা প্রজাকে সমঝালেন যে এঁদেরই সঙ্গে তার রাজাপ্রজা সম্বন্ধ। ভূমির উপর প্রজার যে স্বত্ব ছিল এঁরা সেটাকে আত্মসাৎ করলেন। অর্থাৎ জমি হলো জমিদারের। নবাবদের দক্ষিণহস্ত ছিলেন জমিদারগণ, নবাবদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীদের যখন লড়াই বাধত তখন হিন্দু জমিদার ছিলেন তাঁদের সহায়। তেমনি বাদশাহদের

সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিবাদে হিন্দু সামন্তরা তাঁদের পক্ষ নিতেন।

ইউরোপেরও এমনি করে দিন কাটত, কিন্তু ইউরোপ আমাদের মতো প্রকৃতির বরপুত্র ছিল না। মরিচের জন্যে, মশলার জন্যে, বিলাসসামগ্রীর জন্যে সে ছিল ভারতের মুখাপেক্ষী। ভারত বলতে সে বুঝত ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জকেও। স্থলপথ তুর্কের আয়ত্তে আসায় কলম্বস চললেন জলপথে ভারত খুঁজতে। আবিষ্কার করে বসলেন যে ভূভাগ তার নাম পরে দেওয়া হয় আমেরিকা। আমেরিকার ধন-দৌলতে ইউরোপ সমৃদ্ধ হয়। আর ভারতেও ভাস্কোডা গামা পৌঁছলে পরে পর্তুগীজ ওলন্দাজ ইংরাজ ফরাসী ও দিনেমার আসে। আমাদের সমুদ্রতীরে পাহারা ছিল না। যেমন আমাদের খিড়কি, তেমনি আমাদের সদর। তারপরে যা ঘটল তা দু' কথায় বলা যায়। বিদেশীরা তিন-দিক থেকে জাল গুটিয়ে এনে ভারতকে ছেঁকে তুলল। সামুদ্রিক বলে ইংরাজ ছিল অন্যদের চেয়ে বলীয়ান। তাই ইংরেজ পেলো সিংহের অংশ। ওলন্দাজ ও দিনেমার আপন আপন অংশ বেচে ফেলল। ফরাসী ও পর্তুগীজ মাথা গুঁজে রইল। তাসের কেল্লার মতো ধ্বসে পড়ল রাজপুত মুঘল মরাঠার কেল্লা।

তাতেও খুব বেশী পরিবর্তন হতো না। হলো, যখন ইউরোপের কলকার-খানা থেকে তৈরি মাল এসে ভারতের বাজার জুড়ল। কেন যে ও-ব্যাপার ইউরোপে ঘটল, কেন যে বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতি ভারতে উদ্ভাবিত হলো না, কেন যে ব্রাহ্মণ এবং মৌলানা লাখ লাখ বিঘা লাখেরাজ জমি খেয়েও চুলোর হাঁড়ির ভিতর থেকে উঠতে-থাকা ধোঁয়া সম্বন্ধে একটুও ভাবলেন না, এর হেতু আকস্মিক নয়। জেম্স্ ওয়াটের আগে বহু বৈজ্ঞানিক জন্মেছিলেন। আরো আগে বহু জিজ্ঞাসু চার্চের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন। ভারতের টিকি ও দাড়ি যখন ন্যায়ের তর্ক ও হেকিমী দাওয়াই উদ্ভাবন করছিল ইউরোপের মন তখন প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনরত। অতি দীর্ঘ সেই মহাসাধনার ইতিবৃত্ত। ইউরোপ আপনাকে যোগ্য করে তুলছিল পৃথিবীর দায়িত্ব নিতে। আর আমাদের যেটুকু দায়িত্ববোধ ছিল সেটুকু পরলোকের জন্যে। নানক কবির চৈতন্যের সাধনায় আমাদের মধ্যযুগের সাধনা পর্যবসিত।

মধ্যযুগের ইউরোপেও সাধুসন্তের অভাব ছিল না। আমাদের শিল্প-গৌরবের সমকক্ষ ছিল ওদেশের রেনেসাঁস। তার অভিব্যক্তি সর্বমুখীন। যেসব সূক্ষ্ম কাজ ইউরোপের লোক জানত না, তার জন্যে অবশ্য আমরা বিখ্যাত ছিলুম এবং সে-খ্যাতি আমাদের প্রাপ্য। আমাদের শ্রেষ্ঠতা আমাদের ঐশ্বর্যে আর আমাদের ঔদার্যে। এই দুই কারণে আমাদের মধ্যযুগ সবিশেষ স্মরণীয়। ঐশ্বর্য জনসাধারণের কাজে লাগেনি, অন্ধকার ছিল প্রদীপের নিচে। সুতরাং ঐশ্বর্যের স্মৃতি বিশুদ্ধ প্রীতিকর নয়, পীড়াকরও বটে। কিন্তু ঔদার্য ছিল সার্বজনীন। ধর্মের জন্যে মানুষ মানুষকে ইউরোপে জ্বালিয়েছে। কেবল জ্বালাতন করে নিরস্ত হয়নি, দাহ করেছে। ভারতে ইন্‌কুইজিশনের অনুরূপ ছিল না। যেখানে উৎপীড়ন বাস্তবিকই ঘটেছে সেখানে ধর্মের ভান ছিল, কিন্তু কারণটা রাজনৈতিক। অর্থাৎ দারাকে হত্যা করা হলো তাঁর সিংহাসনটির লোভে,

তিনি গোঁড়া মুসলমান হয়ে থাকলেও তাঁর প্রাণ যেত। শিখরা যতদিন রাজশক্তিকে তুচ্ছ করেনি ততদিন তাদের সঙ্গে মোটের উপর সদ্ব্যবহার করা হয়েছে, ইউরোপে তারা রাজার সঙ্গে মানিয়ে চললেও চার্চ তাদের পোড়াত।

আমাদের ইদানীন্তন দাঙ্গাহাঙ্গামা থেকে অনুমান করলে মস্ত ভুল হবে যে ভারতে কোনো দিন নিছক মতভেদের দরুন মানুষ মানুষকে মেরেছে। জিজিয়া ইত্যাদির উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। লঘিষ্ঠসংখ্যকের প্রাধান্যকে বিনা অস্ত্রে ও বিনা ব্যয়ে অক্ষয় করতে হলে একটা সুলভ উপায় হচ্ছে ভেদনীতি। কৌটিল্য থেকে মেকিয়াভেলি পর্যন্ত প্রত্যেক কূটনীতিবিদ্ এর বিধান দিয়ে গেছেন, সব দেশে ও সব কালে হ্রস্বদৃষ্টি শাসকরা এর সুযোগ নিয়ে এসেছে। এর জন্যে মুসলমানকে নয়, মুসলমানধর্মী জনকয়েক সুলতানকে দায়ী বলা যেতে পারে। তবে তারা স্বজাতিকেও এমন কষ্ট দিয়েছে যে জ্যান্ত মানুষের গায়ের ছাল ছাড়িয়েছে। হেতু রাজনৈতিক। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা থেকে রাজপুত পাঠান তুর্কিস্থানী মুঘল মরাঠা ও শিখ নিঃক্ষত্রিয় হলো। এই আমাদের মধ্যযুগের 'মরাল'।

(১৯৩৬-৩৭)

সংস্কারমুক্তি

আমাদের দেশের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক পর্তুগীজ আগমনের সময় থেকে। প্রায় আড়াইশ বছর ধরে আমাদের উপকূলে পর্তুগীজ ওলন্দাজ ফরাসী ইংরাজ মিলে নৌবহরের রঙ্গ দেখাল, দেশী লোকের হাতে বন্দুক ধরিয়ে তাদের সেপাইগিরি শেখাল। আমরা দেখেও দেখলুম না, শিখেও শিখলুম না। অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অপরাপর বিদেশীদের পরাস্ত করে ও কর্ণাটবঙ্গের বিজেতা হয়ে ইংরাজ যখন রাষ্ট্র রচনা করতে আরম্ভ করে, তখন জনকয়েক দেশীয় রাজার চৈতন্য হয়। তাঁরা ইউরোপীয় ছাঁদে সেনা সংগঠন করেন। কিন্তু না জানতেন তাঁরা ইউরোপীয় ডিপ্লোমেসি, না ছিল তাঁদের ইউরোপীয় স্ট্রাটেজীর জ্ঞান। জ্ঞানের প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করলেন না। বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণ করারও প্রশ্ন উঠল না। বহু সমুদ্র অতিক্রম করে বিদেশীরা তাঁদের দেশে এলো, কিন্তু সমুদ্রযাত্রা করতে তাঁরা আতঙ্কে অজ্ঞান হলেন। জাত যাবে যে! গোমাংস খেতে হবে যে!

ইউরোপীয়রা আমাদের আড়াইশ বছর সময় দিল। তারপরেও মরাঠা ও শিখরা পঞ্চাশ থেকে একশ বছর সময় পেয়েছে। তথাচ আমাদের মাথায় ঢুকলো না যে ইউরোপের লোক স্লেচ্ছ বর্বর নয়, তারা এই দেশে বসবাস করে শুচি ও সভ্য বনতে আসেনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের সঙ্গে সমান নয় আমাদের পদ্ধতি প্রকরণ। সময়োচিত কাণ্ডজ্ঞানের অভাবকে পরবর্তীকালে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক স্বভাব বলে ঘোষণা করেছি ও প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। সুবিধা অনুসারে ভুলে গেছি যে প্রত্যেকটি যুদ্ধে আমাদের পক্ষের সৈন্যসংখ্যা

ছিল অপর পক্ষ হতে অধিক। জয় করার দাবী রেখেই প্রত্যেকবার আমরা ক্ষেত্রে নেমেছি, আধ্যাত্মিক আত্মত্যাগের বাজি দেখাতে নয়।

ইংরাজ শাসনের আইন ও শৃংখলা, রাজস্ব আদায়ের প্রণালী, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে পাঞ্জাব অযোধ্যা প্রভৃতির চক্ষু ও কর্ণ-গোচর ছিল। তথাপি তাদের প্রবৃত্তি হয়নি যে, দেখে শিখি ও শিখে কাজে লাগাই। ঐ একই আতঙ্ক তাদের পক্ষাঘাত ঘটিয়েছিল—ওরা যে ম্লেচ্ছ, ওরা যে কাফের। ওরা গোরু খায়, শুওর খায়। ওদের মেয়ে-পুরুষে একসঙ্গে নাচে। ওদের ক্লাবে গেলে মদ্যপান করতে হবে। ওদের রীতি ধরলে রসাতলে যাবে।

আর আমরা যারা ইংরাজ শাসনে বাস করলুম আমরাও অন্তত একশ বছর সময় পেলুম ওদের কাছে হাতে-কলমে ওদের সাফল্যের ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করার। কিন্তু আমাদের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। আমাদের মধ্যে যাঁরা জমিদার তাঁরা শাসকদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েও মিশতে সাহস পেলেন না। সাহেবী ধরনে এক-একখানা বাগানবাড়ী বানালেন, তাকে সাজালেন বিলিতী আসবাবে তসবিরে, তাতে ব্যাণ্ড বাজল, সাহেবমেম খানা খেলেন, মহারাজ হাজিরা দিয়ে খানার সময় ছুটাছুটি করলেন, পিনার সময় দূরে গিয়ে বসলেন, নাচের সময় বাইরে থেকে তদ্বির করলেন, শিকারের সময় সঙ্গে গেলেন, বিদায় দিয়ে হাঁফ ছাড়লেন। মধ্যবিত্তদের জীবনে মেলার সুযোগ দৈবাৎ জুটল। হয়তো মিশনারীর স্কুলে পড়ে, হয়তো উপরিস্থ কর্মচারীর প্রিয়পাত্র হয়ে, হয়তো ব্যবসার বাজারে দালালী করতে করতে। কিন্তু সেসব সুযোগ বরবাদ হলো সামাজিকতার অভাবে। আমরা খানিক ইংরাজি শিখে নিয়ে মনে করলুম ঢের শিখেছি, এখন দেশী লোকদের তাক লাগিয়ে দিই গিয়ে। খবরের কাগজ ফাঁদলুম, বক্তৃতা দিলুম, থিয়েটারও খাড়া করলুম। গোড়াতে সবই ইংরাজিতে, তারপর বিকট বাংলায়। সামাজিক পরিবর্তন যথাকালে ঘটাতে না পারায় যে-সুযোগ করামলকের মতো ভ্রষ্ট হলো তার অভাব কি হাজার ইংরাজি বই পড়ে চোস্ত কোটেশন আওড়িয়ে দু'হাজার হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মেটে ?

অবশেষে আমরা ইউরোপে ছেলে পাঠালুম। যদিও তারা আইন পড়তে বা পরীক্ষা পাশ করতে গেল, তবু শাসক জাতির সঙ্গে মেশবার অবসর পেলো। ইংলণ্ডে যে-অবসর পেলো দেশে ফিরে যখন সেই অবসর পেলো না—ততদিনে সুয়েজ কেনাল হয়েছে ও ইংরাজ মেশবার জন্যে লালায়িত নয়—তখন জন্মালো অভিমান ও সেই অভিমান থেকে এলো কংগ্রেস। গোড়ায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশীর সঙ্গে দেশের শাসনে অংশীদার হওয়া। তারপর উঠল স্বরাজের দাবী। সেটা অবশ্য জাপানের দৃষ্টান্তে। ছেলেরা চলল বিজ্ঞান শিখতে, ব্যবসা শিখতে, সর্ববিভাগে বিদেশীর স্থান পূরণ করতে। এতদিনে প্রায় সকল বিভাগেই ভারতীয় প্রবেশ পেয়েছে। এই সিদ্ধির সংকেত কী ? কতক অবশ্য আন্দোলন। কিন্তু অনেকটা সংস্কারমুক্তি। ভারতীয় তরুণ বিদেশে যেতে ডরায় না, দরকার হলে গোমাংস খেতেও তার আপত্তি নেই, বিদেশীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে দুর্লভ তথ্য উদ্ধার করতে হলে যে-পরিমাণ বৈদেশিক সাজতে হয়, সে-পরিমাণ সাজতে

সে প্রস্তুত। দেশে ফিরেও ব্যবসায়ের খাতিরে সে সাহেব। সামঞ্জস্যের জন্যে তার গৃহিণীকেও ইউরোপীয় সামাজিকতাদুরস্ত হতে হয়।

আমাদের সঙ্গে জাপানীদের তুলনা করা যাক। ষোড়শ শতাব্দীতেই ইউ-রোপীয়রা জাপানে বাণিজ্য করতে ও ধর্মপ্রচার করতে যায়। প্রথমে তাদের কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে একমাত্র ওলন্দাজদের সঙ্গেই তাদের যৎসামান্য আদান-প্রদান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভে হঠাৎ এক ইংরাজ জাহাজ ওলন্দাজের পশ্চাদ্ধাবন করে নাগাসাকিতে উপনীত হয়। তাতে জাপানীদের আত্মগত জীবন বিচলিত হয়। এর পর থেকে ক্রমেই বিদেশীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটতে থাকল, আর ক্রমেই তারা বুঝতে থাকল আজকের সংঘর্ষ যত তুচ্ছ হোক না কেন, কালকের সংঘর্ষ মারাত্মক হতে পারে। চীনের কাছ থেকে ইংরাজরা যখন হংকং নেয়, জাপানীরা তখন থেকেই হুঁসিয়ার হয়। অবশেষে আমেরিকান কমোডোর পেরী চারখানা জাহাজ ও পাঁচশ লস্কর সমেত উরাগা বন্দরে হানা দিলে জাপানীদের যেটুকু দ্বিধা ছিল সেটুকু গেল।

চোখ বুজে থাকলে বিপদ থেকে পরিত্রাণ নেই। সন্ধান করতে হবে বিপদের সম্ভাবনা কোথায়, সাপের গর্ত কোনখানে। অক্ষমতাই বা তাদের কতটা, পরস্পরের সহিত তাদের কী সম্পর্ক। কার সঙ্গে মৈত্রী করা চলে, কার সঙ্গে শত্রুতা। কার কী পরিমাণ নৌ-বল, স্থলসেনা, অর্থবল, প্রতিপত্তি। কার কাছে কী আছে শিক্ষণীয়। জাপানের এই নব মনোভাবে ঘৃতাহুতি দিল বিদেশীরা ১৮৫৩ ও ৫৪ সালে যুদ্ধ-জাহাজ থেকে গোলাবৃষ্টি করে। এর পর আর দেশ-ব্যাপী উদ্দীপনা বিলম্ব সয় না। স্বয়ং সম্রাট হলেন নব-প্রযত্নের সারথি। অসভ্য জাপান রাতারাতি সুসভ্য হলো। তখনো আমাদের কংগ্রেস হয়নি। তবে সেই সময় জাতীয় মেলা, জাতীয় গান প্রভৃতি আবির্ভূত হয়। কিন্তু জনসাধারণ তখনো গভীর তিমিরে এবং জমিদার ও বণিক শ্রেণী তন্দ্রামগ্ন। কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনকতক যুবক বাধাবিঘ্ন সরিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেন। জমিদারদের মধ্যে একমাত্র ঠাকুরবংশেরই নাম করতে পারা যায় এবং বণিকদের মধ্যে পার্সীদের।

জাপানের কৃতিত্বকে অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করার চেষ্টা বৃথা। জাপান পেরেছে, আমরা পারিনি, এর কারণ এমন নয় যে, জাপান জড়বাদী, আমরা অধ্যাত্মবাদী ; অথবা জাপান ক্ষুদ্র দেশ, আমরা বৃহৎ মহাদেশ। জাপান গত শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি যা করেছে নেপাল ও তিব্বত আজও তাই করছে—বিদেশীকে পরিহার। যেই হৃদয়ঙ্গম করল যে বিদেশীকে পরিহার করলে বিদেশ পরিহার করে না, কমলিকে ছাড়লে কমলি ছাড়ে না, অমনি জাপান বিপরীত নীতি অবলম্বন করল। এখনকার দিনে নেপাল এবং তিব্বতও ক্রমে উপলব্ধি করছে স্থলসৈন্যের পথ রোধ করলেও আকাশসৈন্যের গতিরোধ করা অসম্ভব। তাই তাদের বৈদেশিক নীতিও ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে শুনতে পাই। আর জাপান যদি ক্ষুদ্র দেশ হয় তবে সিংহল ক্ষুদ্রতর দেশ, বর্মাও বড় নয়। আমরা এই নিয়ে

খুব গর্ব করে থাকি যে বাংলাদেশ ভারতের অপরাপর প্রদেশের থেকে চিরকালই বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট। তা যদি হয় তবে জাপানের সঙ্গে বাংলার তুলনায় আপত্তি কী?

চীনের উপকূলে বিদেশীরা বাণিজ্যের অনুমতি পেয়েছিল ষোড়শ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে। কিন্তু চীনারা তাদের করদরাজ্যের প্রজার মতো গণ্য করত, সমান বলে স্বীকার করত না। তাদের সম্বন্ধেও কৌতূহল ছিল না. তাদের শক্তির সম্বন্ধেও। ১৮৩৯ সালের যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা হংকং পায়। ইংরাজদের সাফল্য দেখে অন্যান্য বিদেশীরাও আব্দার জানায় ও তেমনি সব সুবিধা আদায় করে। এতেও চীনাদের চেতন্য হলো না। আবার বিরোধ বাধল ১৮৫৬ সালে ও তার অন্ত হলো রাষ্ট্রের ভিতর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। চীন যেন তার টানা টানা চোখ মেলে একবার চাইল। বিদেশে দূত পাঠাল. ছাত্র পাঠাল। পাঠিয়েই তার মনে হলো কাজটা ভালো হয়নি, বিদেশী প্রভাব সেই সূত্রে ঘরে ঢুকবে। ১৮৯৪ সালে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল, চীন গেল হেরে। ইউরোপীয়দেরই জুটে গেল দাঁও। চীনারা এত দুর্বল তা কি তারা আগে জানত? চীনের উপর চাপ দিয়ে কালনেমির লঙ্কা-ভাগ করে নিল। এক জনা এক অঞ্চলের উপর উত্তরাধিকার-স্বত্ব লিখিয়ে নিল। চীনের যুবক সম্রাট ভাবুকদের পরামর্শে দেশের সংস্কারে ব্রতী হলেন। কিন্তু বর্ষীয়সী সম্রাটজননী সম্রাটকে বন্দী করে ওসব ম্লেচ্ছ ব্যবস্থা রহিত করলেন। বিদেশীদের হত্যা করার বিধান দিয়ে জাগিয়ে তুললেন বকসার বিদ্রোহ। অষ্টবজ্র-সম্মিলনের দ্বারা বিদেশীরা চীনকে টিকি ধরে টান মেরে নাজেহাল করল। এর পর কিনারা না দেখে চীনারা জাহাজ বোঝাই করে জাপানে ও আমেরিকায় চলল চেলা হতে। শুরু হলো সান ইয়াৎ সেনের যুগ।

এই যে জরদ্গব চীন, যাঁর পতন হলো অতি বিপুল মূঢ়তায়, ইনিও পেড়ে থাকেন আধ্যাত্মিকতার দোহাই, ঠিক আমাদেরই মতো। মানুষের একটা সান্ত্বনা চাই তো। এঁর রাজকর্মচারীরা ছিল ঘুষখোর, জমিদাররা উৎপীড়ক, বণিকরা মহাচোর। ইনি ডিপ্লোমেসি আয়ত্ত করবেন না মিত্রের অন্বেষণ করবেন না, সৈন্যদের চরে খেতে বলবেন, তাদের হাতিয়ার পুরোনো হলে পাল্টে দেবেন না। যুদ্ধ করার সখ ষোলো আনা, কিন্তু বার বার হেরেও শত্রুর চাল শিখবেন না। ইনি নাকি পরম শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রাচ্য জাতি।

আধুনিক টেকনিক সত্বর হোক বিলম্বে হোক প্রত্যেককেই গ্রহণ করতে হয়েছে। যাদের দ্বিধা ও কুণ্ঠা যত বেশী তাদের পণতাতে হয়েছে তত বেশী। বোধ হয় সকলের পশ্চাতে আমাদের স্থান। তাই, অনুশোচনাও আমাদের সর্বাধিক।

(১৯৩৬-৩৭)

পশ্চিম না আধুনিক

বাণিজ্য করতে এসে পশ্চিমের লোক যেদিন এদেশে রাজ্যলাভ করে সেদিন আমরা যাকে দেখলুম সে হচ্ছে পশ্চিম। তার যে আরো একটা পরিচয় থাকতে পারে সেকথা আমাদের জানা ছিল না, কেননা আধুনিক বলে যে কোনো জিনিস থাকতে পারে তাই আমাদের জানা ছিল না। আমরা পুরাতন, সুতরাং সংসার-সুদ্ধু সবাই পুরাতন। ইতিহাস নেই, আছে পুরাণ। এবং কোরান।

আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা তো পশ্চিমকে দেখে পশ্চিমদিকে মুখ ফেরালেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার উপর তাঁদের ঘোর বিরাগ। আমাদের মধ্যেও যে-অনুরাগ লক্ষিত হলো তাও পশ্চিম সম্বন্ধে নিছক কৌতূহল থেকে, আধুনিক সম্বন্ধে গভীর জিজ্ঞাসা থেকে নয়। কৌতূহল যেই নিবৃত্ত হলো অমনি শুরু হলো প্রতিক্রিয়া। শিখলুম বটে ইংরেজি, কিন্তু তাতে হিন্দুইজম বিষয়ক বক্তৃতা দিতে, আগড়ুম বাগড়ুম প্রবন্ধ লিখতে। পশ্চিমের কোনো-কোনো গুরুমারা চেলা পশ্চিমে চললেন প্রচার করতে। তাঁদের চেলারা পশ্চিম থেকে এসে আমাদের সার্টিফিকেট দিলেন যে আমরা একটা আশ্চর্য জাতি ও আমাদের সভ্যতা হলো গিয়ে আধ্যাত্মিক। জাপানকে ও-কথা বললে জাপান দুই গালে দুটি ঠোনা মেরে বলত, পকেট থেকে বার কর যুদ্ধজাহাজের নকশা আর যন্ত্রপাতির নাম দাম। আমরা মুখে পান পুরে এক গাল হেসে বললুম, তা তো বটেই, তা তো বটেই, আমাদের গোটাকয়েক বড় বড় চাকরি দাও, আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে অধ্যাত্মচর্চা করি।

বাস্তবিক এ অতি অদ্ভুত যে রামমোহন রায়ের মতো সজাগ পুরুষও অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করলে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। গ্রীক হিব্রু পড়লেন খ্রীষ্টধর্ম ব্যাপারটা কী বুঝতে। আধুনিক ভারতের যে তিনিই আদিপুরুষ তা ঠিক, কিন্তু তাঁর মনের ঝোঁক ধর্মের দিকে হওয়ায় দেশের লোক তাঁকে ধর্মসংস্কারক বলে গণল ও আমাদের উনবিংশ শতাব্দী কাটল ধর্ম-সংস্কারে। কেউ হলেন খ্রীষ্টান, কেউ ব্রাহ্ম, কেউ আর্য, কেউ নব্য হিন্দু। তাঁদের জীবনের প্রধান কাজ হলো তত্ত্বানুসন্ধান। তথ্য সম্বন্ধে সেই পরিমাণ সজাগ হলে তাঁরা এদেশের মধ্যযুগীয় আবহাওয়া বদলে দিয়ে যেতেন, আমরা অন্য বিষয়ে মন দিতুম। আমাদের মুশকিল হয়েছে এই যে, একে তো আমাদের অন্যান্য আধুনিক দেশের সঙ্গে পাল্লা দেবার দায়, তার উপর দেশকে আধুনিক করে তোলার দায়িত্ব। একে তো আমাদের চলতে হবে সব দেশের অগ্রগামীদের অগ্রভাগে, তার উপর দেশের লোককে শেখাতে হবে চলি চলি পা পা। এদের পড়াতে হবে অ আ ক খ, ওদের শোনাতে হবে অভিনব আবিষ্কার।

পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে তেমন কোনো ব্যবধান নেই যেমন আছে প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝখানে। আমরা প্রাচীন আছি আর ওরা আধুনিক হয়েছে বলে যে ব্যবধান রয়েছে সেইটেকে আমরা ঠাওরাই পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান। বয়সের ব্যবধানকে দিকের ব্যবধান বলে জানলে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যতা বোঝায়। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সত্যিকার যে ব্যবধান তা হচ্ছে ঐতিহ্যের। তার মধ্যে

ধর্মবিশ্বাসও পড়ে। আর পড়ে তাদের স্বাধীনতা, আমাদের পরাধীনতা। দুইয়ের সংঘর্ষে সহজেই মনে আসে, ওরা খ্রীষ্টান আমরা তা নই, ওরা স্বাধীন আমরা তা নই। এই সংঘর্ষ থেকে এলো একদিকে ব্রাহ্ম সমাজ আর্য সমাজ নব্য হিন্দুত্ব, অন্য দিকে ন্যাশনাল কংগ্রেস। সংঘর্ষ এখনো চলেছে, তার আরো দশটা ফ্যাকড়া আছে। কিন্তু তার দরুন যেন আমরা ভুলে না যাই যে ওরা আধুনিক ও আমরা প্রাচীন, আর আধুনিক হবার প্রয়োজন আমাদের সর্বপ্রধান প্রয়োজন। বয়সের এই মুখোসখানা খুলতে হবে টেনে।

এও চোখের সুমুখে রাখতে হবে যে ওরা আধুনিক বলেই এদেশে আসতে পেরেছে, নইলে ইউরোপ থেকে আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়ে অত দূরে এসে ওরা সুবিধা করতে পারত না। যে-তিনটি শক্তি ওদের সহায় হয়েছে সে-তিনটি আধুনিকতার তিনটি স্তম্ভ—কোম্পানি, রাষ্ট্র ও বিজ্ঞান। এখনো আমরা কোম্পানি গড়তে ভয় পাই, গড়লেও আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে বোঝাই করি, অনাত্মীয়কে আমরা তেমন বিশ্বাস করিনে। আর ষোড়শ শতাব্দীতেও ওদের কোম্পানি গড়ে কারবার চলত। আমাদের বণিকদের উদ্যোগিতা পরিবারে আবদ্ধ হওয়ায় তার পরিধিও ছিল সংকীর্ণ। তাঁরা বিশ্বাস করতেন বড়ো জোর তাঁদের স্বজাতকে, তাই তাঁদেরকেও বিশ্বাস করত না কেউ স্বজাত ভিন্ন। ইংরাজের রাষ্ট্র ইংরাজকে সাহায্য করত, ইংরাজ নাবিক ইংরাজের স্বার্থ দেখত, ইংরাজ সৈনিক ইংরাজের জান বাঁচাত। আমাদের রাজা বণিক নাবিক সৈনিক সব বিভিন্ন জাত।

তারপর রাষ্ট্র। রাষ্ট্র বলতে ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপে যা বোঝাত ষোড়শ শতাব্দীর ভারতে তা নয়। ওদের ফরেন পলিসি বলে একটা বস্তু ছিল, প্রত্যেক রাষ্ট্রই বিদেশে প্রতিনিধি মোতায়েন রাখত। তাঁরা সংবাদ আদানপ্রদান করতেন, সন্ধিশর্ত স্থির করতেন। ডিপ্লোমেসি ছিল আমির-ওমরাহের ব্যক্তিগত দলাদলির ঊর্ধ্বে। রাজা মরলে তাঁর সিংহাসন নিয়ে শেয়াল-কুকুরের মতো কাড়াকাড়ি ছিল না। সৈন্যরা মাইনে পেত, চরে খেত না। রাজস্বের আয়ব্যয় নিয়ম-অনুসারে চলত, মর্জি-অনুসারে নয়। সেই নিয়মানুবর্তিতাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এদেশে সূর্যাস্ত আইন নামে হৃৎকম্প জাগায়। যে-কোনো সমসাময়িক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সহিত যে-কোনো ভারতীয় রাষ্ট্রের তুলনা করলে মালুম হবে ওদের রাষ্ট্র অটোক্রিসিই হোক ডেমক্রেসিই হোক, রাষ্ট্র। আর, আমাদের রাষ্ট্র রাষ্ট্রই নয়, রাজ্য। তার মানে জমিদারী। ইংরাজের ফুঁ লেগে তাসের কেল্লার মতো ধূলিসাৎ হবেই তো। ইংরাজের কেন, ইংরাজ না থাকলে ফরাসীর, ফরাসী না থাকলে ওলন্দাজের, ওলন্দাজ না থাকলে পর্তুগীজের।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলন্ডে যখন রয়াল সোসাইটি স্থাপিত হয় তার দু'শ বছর আগে বিজ্ঞানের নবযুগ সূচিত হয়েছিল। ততদিনে আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞানের নামগন্ধ অবশিষ্ট ছিল না, নব্য বিজ্ঞানের বিন্দুবিসর্গ ছিল না কারও কল্পনায়। একপ্রকার বিজ্ঞানবুদ্ধি চিরকাল সব দেশেই ছিল, নতুবা জলে যে নৌকা চলে ও হাঁড়িতে যে ভাত সিদ্ধ হয় এর জন্যে ভগবানের প্রত্যাদেশ

প্রতীক্ষা করতে হতো। বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি তথ্য থেকে সত্য উদ্ধার ও তথ্য দিয়ে সত্য যাচাই। এমন যে বিজ্ঞান একে মানুষের কাজে লাগানো যায়, কিন্তু মানুষের ঘরের আঁধার দূর করার চেয়ে মনের আঁধার দূর করায় এর মূল্যবত্তা। বিজ্ঞান আমাদের কুশল করে, এর চেয়ে বড়ো কথা বিজ্ঞান আমাদের বিজ্ঞ করে। আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর কর্তারাও বিজ্ঞানের প্রয়োজন মেনেছিলেন, কিন্তু সে কেবল দেশের সমৃদ্ধির জন্যে, অভ্যুদয়ের জন্যে। বিজ্ঞান যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের নাস্তিক করে তুলতে পারে সে আশঙ্কা তাঁদের ছিল, বিজ্ঞানের অ্যান্টিডোট হিসাবে ধর্মের আবশ্যকতায় প্রগাঢ় ছিল তাঁদের নিষ্ঠা। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই-যে দ্বিধা এ হচ্ছে সত্যিকার আধুনিকতা সম্বন্ধেও দ্বিধা। এবং এই দ্বিধা আজও আমাদের ছাড়েনি। তাই দেখা যায় সামাজিক হিসাবে যাঁরা আধুনিক তাঁরাও অতিপ্রাকৃতের সন্ধান পেলে বর্তে যান। যা বুঝি না, যা বুদ্ধির ধোপে টেকে না, তার প্রতি এক পতঙ্গসুলভ আকর্ষণ আমাদের রক্তে নিহিত। তার জন্যে ধর্মের টীকা নিতে হয় না। বরং তারই বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের টীকা আড়াই বছর বয়সের আগে বলবৎ হওয়া উচিত।

আধুনিকতাকে পাশ্চাত্ত্য আখ্যা দিয়ে বর্জন করা যেন কুকুরকে বদনাম দিয়ে ফাঁসিতে লটকানো। আধুনিকতা প্রাচ্যও নয় পাশ্চাত্ত্যও নয়। তাকে যাঁরা বর্জন করতে চান তাঁরা সোজাসোজি বলুন যে আধুনিকতা পাশ্চাত্ত্য বলে নয়, প্রাচ্য হলেও বর্জনীয়।

আধুনিক উৎপাদনপদ্ধতির মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে পাশ্চাত্ত্য বলে ঠেলতে পারি। আর ঠেলতে চাইলেও যে পারব তার সম্ভাবনা কম। ইউরোপেও একদা কারখানাকে শয়তানের ঝাড় ভেবে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা চলেছিল। আমরা যদি তেমন চেষ্টায় সফল হই তবে এই হবে যে কলকারখানা অন্য দেশের মাটিতে স্থিতি লাভ করে এ দেশের কুটীরশিল্পের বৈরিতা করবে, আর শেষ পর্যন্ত এদেশ হবে কাঁচা মালের যোগানদার। পক্ষান্তরে এদেশে যদি কলকারখানার বিস্তার হয় তবে কুটীরশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চাই-কি নাও ঘটতে পারে। দুইয়ের আপোস দুঃসাধ্য নয়। উপরন্তু কাঁচা মালের কামধেনু হবার দুর্ভাগ্য থেকে দেশ মুক্ত হয়। আধুনিক পৃথিবীর অধিকাংশ কলহ কাঁচা মালকে ঘিরে। আমাদের কাঁচা মাল যদি আমাদের ব্যবহারে না লাগে তবে অন্যের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকবেই। আর কুটীরশিল্পে যে সবরকম কাঁচা মালের ব্যবহার চলে না, সুতরাং কুটীরশিল্প সম্বল করে যে কাঁচা মলের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব নয়, এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

আমাদের দেশ মধ্যযুগে এক পা রেখে আধুনিক যুগে আরেক পা রেখে দুই নৌকার দোটানায় টাল সামলাতে পারে না, এই অপরূপ সার্কাস তার পক্ষে প্রাণান্তকর। পুরোপুরি আধুনিক না হয়ে নিষ্কৃতি নেই। আর আধুনিকতার অ আ ক খ হচ্ছে উৎপাদনপদ্ধতির আধুনিকতা। অবশ্য অ আ ক খ-তেই আমরা থামব না। মনটা আধুনিক না হলে আমরা কেবল পরের কাছে পাঠ নিতে থাকব, পরকে শেখাতে পারব না। তাতে আমাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হতে

থাকবে ও তার প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের প্রাচ্যতার অভিনয় করতে হবে। মনের আধুনিকতাই আমাদের আধ্যাত্মিকতার মোহমুদ্গর। যে আধ্যাত্মিকতা মানুষকে সৃষ্টিছাড়া করে সেটা একটা অনাসৃষ্টি। আমরা একটা সৃষ্টিছাড়া জাতি নই। আত্মসম্মানের খাতিরেও সে-অনাসৃষ্টির প্রশ্রয় দেওয়া ভুল। আমরা দশজনের মতো সহজ মানুষ, জাতি হিসাবে আমরা অন্য সকলেরই মতো ভালোয় মন্দে গড়া।

(১৯৩৬-৩৭)

দেশরক্ষা

যে দেশের তিনদিকে সমুদ্র সেই দেশে একদিন সমুদ্রযাত্রা বারণ হলো। আমদানী-রপ্তানীর লাভ গেল বিদেশীর তহবিলে, উপনিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচল, দেশরক্ষার ভার পড়ল ভগবানের উপর। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আহাম্মকীর রেকর্ড আছে, কিন্তু এ হচ্ছে রেকর্ড ভঙ্গ।

এর আসল কারণ কোথাও লেখা নাই। আমার অনুমান, কারণটা গোমাংস-ঘটিত। কেউ সমুদ্রপারে গেলে এই বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের প্রথম চিন্তা, তাই তো, গোমাংস খাবে না তো ? ফিরলে বিশ্বাস হয় না যে গোমাংস খায়নি। খানিকটে গোময় গিলিয়ে তার যে প্রায়শ্চিত্ত করানো হয়, কে জানে তার পিছনে কোনো ক্ষতিপূরণতত্ত্ব রয়েছে কি-না !

গোমাংসভীতি থেকে যদি সমুদ্রযাত্রা রহিত হয়ে থাকে, যদি আমার অনুমান যথার্থ হয়, তবে স্বীকার করতে হবে যে একটা দেশ একটি সংস্কারের জন্যে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিসর্জন দিয়ে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছে এবং পরের বাণিজ্যস্থল হতে হতে পরকীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে জগৎকে একটা নূতন গৎ শুনিয়েছে।

তারপর হিন্দু সৈনিক যখন লড়াই করতে যেতেন তখন নাকি হাঁড়িকুড়ি-সমেত যেতেন. স্বপাক খেতেন। এখনো যেসব জাতীয় সৈনিক জেলখানায় যান তাঁদের কারও কারও আত্মীয়েরা বাড়ী থেকে খাবার সরবরাহ করেন, নইলে লড়াই করা কঠিন হয়। যেক্ষেত্রে জয়পরাজয় ব্যতীত তৃতীয় প্রশ্ন ওঠে না সেক্ষেত্রে খাদ্যাখাদ্যবিচার ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদ হয় প্রথম সমস্যা। সংস্কারকে ধর্মের স্তরে তুলে মনকে বোঝানো হয় যে হেরেছি বটে, কিন্তু ধর্মপথে চলেছি।

আমাদের ধারণা আমরা ভারতীয় আদর্শে অবিচল থাকায় অন্যায় যুদ্ধে পরাভূত হয়েছি। সত্য আর অহিংসা এই আমাদের ঐতিহ্য। এরই সুযোগ নিয়ে বিদেশী আমাদের বেদখল করেছে। আমাদের স্বধর্মে আমরা অটল থাকলে ধর্মের জয় একদিন হবেই।

এই ধারণার সঙ্গে তথ্যের গরমিল। আজও ভারতবর্ষে প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজা। ইংরাজ-অধিকারের গোড়ায় আরো বেশী ছিল। প্রত্যেকটি রাজ্যের জঙ্গী ফৌজ ছিল, যেমন প্রত্যেক জমিদারের ছিল বরকন্দাজ-বাহিনী। কোনো রাজ্যের

নৌবহর ছিল বলে জনশ্রুতি নেই, তবে শিবাজীর মতো চক্ষুষ্মান পুরুষের চক্ষে তার অভাব প্রতিভাত হয়েছিল, আর উপকূলবাসী কোনো কোনো দুর্গেশ্বরের রণপোত ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ রাজায় রাজায় অষ্টপ্রহর না ঘটলেও সাধারণ ঘটনা ছিল। সত্য আর অহিংসা যে আমাদের ঐতিহ্য তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে উচ্চারণ করবার উপলক্ষ্য ছিল না। প্যারামাউণ্ট পাওয়ার বাধা না দিলে আজকেই রাজায় রাজায় সীমান্ত নিয়ে রক্তারক্তি বাধত। কার খাতিরে কয়বার তোপের আওয়াজ হবে এই নিয়ে তাদের মন-কষাকষির সীমা নেই, আয়তনের তারতম্য থেকে তাদের মান-অভিমানও তীব্র।

ব্যাপার এই যে, সমুদ্রপথ দিয়ে যে সকলের সাধারণ শত্রু আসতে পারে ভারতীয় রাজন্যদের এটুকু খেয়াল ছিল না। তাঁরা সমুদ্রের দরুন নিরাপদ, সমুদ্রই তাঁদের স্বভাবরক্ষী। একচক্ষু হরিণের মতো চক্ষু ছিল তাঁদের স্থলসীমান্তে। তাও সকলের সাধারণ সীমান্ত যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তার দিকে নয়, প্রত্যেকের স্বকীয় সীমান্তে। ঠিক এই সাধারণ সীমান্তজ্ঞানের অভাব থেকে মুসলমান আক্রমণ এবং তারও আগে শক হূন কুশান আক্রমণ— এক কথায় রাজপুত আক্রমণ—সম্ভব হয়। তফাৎ এই যে রাজপুতরা হিন্দু হয়ে যায় আর মুসলমানরা হিন্দু না হলেও ভারতীয় হয়ে যায়, কিন্তু ইংরাজরা কোনোটাই হয় না। আরো তফাৎ এই যে ইংরাজদের দূরদৃষ্টি বহুগুণ বেশী, তারা সমুদ্রপথ আটক করল নানাস্থানে ঘাঁটি বসিয়ে আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে এগিয়ে গিরিসংকট রোধ করল। পূর্ব সীমান্ত সম্বন্ধেও তারা অবহিত হলো এবং উত্তরে হিমালয়ের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হলো না। এই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দেশরক্ষা পলিসি। বিদেশীর দ্বারা এ-জিনিস সম্ভব হয়েছে বলে আমরা সত্য আর অহিংসার বয়েৎ আওড়াবার অবসর পেয়েছি ও দেশরক্ষার জন্যে কোনো বিজ্ঞানসম্মত পলিসি ভেবে বার করবার আগেই বিদেশীকে বিদায় দেবার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হয়েছি।

ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় ইউরোপের অনেকগুলি স্বাভাবিক বিভাগ আছে, আর সেই বিভাগগুলির স্বাভাবিক সীমান্ত আছে। গ্রেট ব্রিটেনের চারদিকে সমুদ্র। ফ্রান্সের একদিকে পিরিনিজ, আরেক দিকে আল্প্স্। অন্যান্য দিকে সমুদ্র। ফাঁক যা থাকে তার জন্যে দুর্গ নির্মাণ করে পাহারা মোতায়েন রাখা যেতে পারে। ইটালির তিনদিকে সমুদ্র ও একদিকে পর্বত। এমনি আরো দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

অথচ ভারতবর্ষের তেমন কোনো স্বাভাবিক বিভাগ নেই। ভারত নিজেই এশিয়ার একটা বিভাগ, এর তিনদিকে সমুদ্র, একদিকে পর্বত ও পর্বত-প্রাচীরের স্থানে স্থানে রন্ধ্র। পাঞ্জাব, অযোধ্যা, আগ্রা, বিহার, বাংলা ইত্যাদি যে-প্রদেশই ধরা যাক কোনোটার স্বাভাবিক সীমান্ত নেই। এমন কি বিন্ধ্য পাহাড়ও দুর্গম নয়, কাজেই সীমান্ত হিসাবে অচল। পশ্চিমঘাট পাহাড় কতকটা দুর্ভেদ্য হওয়ায় মহারাষ্ট্রকে কোনো ইউরোপীয় বিভাগের সঙ্গে তুলনা করা চলে এবং হিমালয়ের কল্যাণে নেপালকেও।

বস্তুত ভারতবর্ষকে প্রকৃতি অবিভাজ্য করে সৃষ্টি করেছে। নিজের নিজের সুবিধার জন্যে, সেন্টিমেন্টের জন্যে একে বিভক্ত করা একপ্রকার আত্মঘাত। এই আত্মঘাতী নীতি আবহমানকাল অনুসৃত হয়ে এসেছে, তাই এখনো ছয়শত রাজ্য। মুসলমান রাজত্বকালেও কয়েকশত ছিল। মনে রাখতে হবে যে মুঘল সাম্রাজ্য ছিল সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্য রাজ্য নয়। রাজ্যগুলো সম্রাটকে নজরানা দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। তাদের অস্তিত্বহানি ঘটেনি, ঘটেছিল মর্যাদাহানি। আর মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্নেও বহু রাজ্য ছিল সাম্রাজ্যের বাইরে। অশোক সমুদ্রগুপ্ত আকবর আওরংজেব এ দেশকে অবিভাজ্য আকার দিতে পারেননি, ইংরাজরাও দেয়নি। ডালহাউসীর বোধ হয় সেই মতলব ছিল, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরাজরা সাব্যস্ত করে যে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা বা আয়তন কমানো যাবে না। সুতরাং ভারতবর্ষ এক রাজ্য হলো না, হলো এক সাম্রাজ্য।

তবে সুফল হলো এই যে দেশরক্ষার দায়িত্ব একজনের উপর ন্যস্ত হলো, বহুজনের মধ্যে বিভক্ত হয়ে আত্মঘাতের পথ প্রশস্ত করল না।

দেশের কর্তৃত্ব পরের হলেও দেশ-সম্পর্কীয় দায়িত্ব যে আমাদের তা আমাদের মানতেই হবে। পরের উপর অভিমান করতে পারি, কিন্তু নিজের দেশের নিরাপত্তা পরের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। দেশরক্ষায় আমাদের স্বার্থই চরম, যদিও অন্যের স্বার্থ কম নয়।

দেশরক্ষায় যাঁদের আপত্তি নেই তাঁদের অনেকের ধারণা অপ্রতিরোধের দ্বারা শত্রুর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারা সম্ভব। শত্রু জয়ী হবে বটে, কিন্তু সহযোগ পাবে না। ঠিক জনক না হলেও টলস্টয় এই মতবাদের বিশিষ্ট উদ্‌গাতা। তাঁর কাছ থেকে গান্ধী পেলেন এর সংকেত। এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে রুশীয়ত্বও আছে, আছে মার্কিনত্ব, চৈনিকত্ব, ইহুদীত্ব। যীশু বলেছেন, মন্দির প্রতিরোধ করো না। তাঁর পূর্বগামীরা কেবল ভারতে কেন অন্যান্য ভূখণ্ডেও সেই উপদেশ দিয়েছেন। খাঁ আবদুল গফর খাঁ-র বিশ্বাস, মহম্মদেরও এই বাণী। কাজেই এর উপর ভারতীয় ছাপ নেই। ব্যক্তিগত প্রয়োগ ভারতেও হয়েছে, দেশান্তরেও হয়েছে। সমষ্টিগত প্রয়োগ ইতিহাসে এই প্রথম। এই প্রয়োগও আক্রমণকালীন নয়, সুতরাং কোনো স্বাধীন দেশকে, যথা ফ্রান্সকে, পরামর্শ দিতে পারিনে যে জার্মান-আক্রমণের ভয়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে রণসজ্জা করো না, রুশের সঙ্গে পোলাণ্ডের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করো না, আপৎ-কালে অসহযোগ করো, না হয় ঘরে বসে মরবে, কিন্তু মারতে গিয়ে মরলে মৃতের সংখ্যা কম হবে না। যে-সব দেশ আত্মরক্ষার দায়িত্ব চিরকাল বহন করে এসেছে তারা জানে সশস্ত্র আক্রমণের সশস্ত্র প্রতিরোধে জয়পরাজয় আছে, মৃত্যুমহামারী তো আছেই। কিন্তু নিরস্ত্র প্রতিরোধে আছে সমস্ত জীবনকে ঢেলে সাজবার তাগিদ, সরল ও শুদ্ধ করবার সংকল্প। কাজেই পরাজয় সম্ভাবনা পদে পদে। মৃত্যের সংখ্যা কম হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু পরাজয় সম্ভাবনা অত্যধিক। পরাজয়কে ওরা মৃত্যুর চেয়ে শোচনীয় মনে করে।

আমরা পরাজিত। কিন্তু পরাজয়েরও ডিগ্রী আছে; তারতম্য আছে। ভুলে

গেলে চলবে না আমরা পরাজিত হলেও পরাজয় আমাদের ঐক্য দিয়েছে ও আরো বড়ো দুর্গতি হতে রক্ষা করেছে, সে দুর্গতি আত্মবিস্কার। পাঁচ জনে মিলে আমাদের বখরা করে নিত—ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার। কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা গ্রাস করত জার্মানী ও ইটালী। সেই দুর্গতি যে ঘটল না এর কৃতিত্ব আমাদের নয়, কৃতিত্ব ইংরাজের। আমরা যে আত্মঘাতের মার্গ ধরেছিলুম তার থেকে নিস্তার ছিল না, মুঘল থাকলেও না, মরাঠা থাকলেও না। এদের কারো নৌবল ছিল না, বহির্বাণিজ্য ছিল না, শক্তিশালী মিত্র ছিল না। শিখদের সুশিক্ষিত সৈন্য থাকলেও সুশৃংখল রাষ্ট্র ছিল না। রাষ্ট্রের অভাবই সবচেয়ে বড়ো অভাব। রাষ্ট্রের অভাব রাজ্যে মেটে না। রাষ্ট্র যে কী বস্তু তা আজও আমাদের দেশীয় রাজাদের শিক্ষা হয়নি, দুটি-একটি বাদে। ওদের ধারণা কর্মচারীদের গালভরা নামে ডাকলেই অমনি রাজ্য পরিণত হলো রাষ্ট্রে। প্রাইম মিনিস্টার ফরেন মিনিস্টার তো যে-কোনো জমিদারেরও থাকতে পারে, নাম যদি বা অন্য। ব্যক্তিনিরপেক্ষ ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক হলে রাজ্যকে বলি রাষ্ট্র।

আমরা যে পরাজিত হয়ে রাষ্ট্র লাভ করলুম এও আমাদের সান্ত্বনা। এতে আমাদের অধিকার পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু যতদিন আমাদের স্বাধীনতা ছিল ততদিন আমাদের দেখে শেখা হয়নি রাষ্ট্র কী। আরো কিছুকাল থাকলে যে আমরা দেখে শিখতুম তা আমার বিশ্বাস হয় না। ঠেকে শেখা ছাড়া গতি ছিল না। রাজত্ব পাবার আগে ইংরাজ ফরাসী পর্তুগীজ আমাদের দুশ বছর সময় দিয়েছে, আমরা ওদের দেশে লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিইনি ওদের ঘরের ব্যবস্থা কেমন। সার-টমাস রো এলেন জাহাঙ্গীরের দরবারে, কিন্তু আমাদের ওমরাহদের কেউ গেলেন না জেম্‌সের সভায়।

আমরা পরাজিত। কিন্তু জাপান জার্মানী ইটালীর পাল্লায় পড়ে বাঁটোয়ারার বিষয় হতে চাইনে। যতদিন না আমরা দেশরক্ষার দায়িত্ব একাকী বহন করতে প্রস্তুত হয়েছি, যতদিন না দেশের অবিভাজ্য আকার অক্ষুণ্ন রাখতে প্রস্তুত হয়েছি ততদিন আমাদের কর্তব্য হবে প্রস্তুত হতে শেখা

(১৯৩৬-৩৭)

ভারতীয় মুসলমান

হিন্দুত্বের সঙ্গে ইসলামের যে অমিল ক্রিশ্চিয়ানিটির সঙ্গে তার চেয়ে কম নয়। তত্ত্বের দিক থেকে ইসলাম যত দূরে ক্রিশ্চিয়ানিটিও তত দূরে। তবু খ্রীষ্টানের সঙ্গে হিন্দুর মনোমালিন্য নেই, মুসলমানের সঙ্গে আছে। এর কারণ কী?

এর কারণ খ্রীষ্টানের সঙ্গে যে-মামলা সে কেবল তত্ত্বের মামলা, সে স্বত্বের মামলা নয়। হিন্দুর মতো খ্রীষ্টানও ভারতীয়, তার আচার সংস্কার বিশ্বাস ভিন্ন, কিন্তু ঐতিহ্য সংস্কৃতি জাতি অভিন্ন। বিশ বছর আগে মধুসূদন দাসকে খ্রীষ্টানদের সভায় ঘোষণা করতে শুনেছিলুম, "I am every inch an

Indian"। ভারতের অতীতকে তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করতেন, কেবল তিনি কেন আরো অনেক খ্রীষ্টান নেতাও। তাঁরা সীতা সাবিত্রীকে তাঁদেরও বলে দাবী করেন, রামায়ণ মহাভারতকে তাঁদেরও বলে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যে কেবল হিন্দুর, তাঁদেরও নয়, এ-কথা কখনো কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা মধুসূদন দত্ত উচ্চারণ করতেন না। বরং হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে যত লোক ইঙ্গবঙ্গ বা নকল ইংরাজ, দেশীয় খ্রীস্টানদের মধ্যে তত নন। আমরাও ভাবতে পারিনে যে মধুসূদন দত্ত বা তরু দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা সরোজিনী নাইডুর চেয়ে কোনো অংশে কম স্বদেশী।

সকলে জানেন যে প্রাচীন গ্রীসের ধর্মবিশ্বাস ও আধুনিক ইউরোপের ধর্মবিশ্বাস এক নয়। এমন এক সময় ছিল যখন রোমের খ্রীষ্টানরা প্রাচীন রোমক মন্দির চূর্ণ করে তাই দিয়ে গির্জা বানাতো। আর প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তিকে শয়তানের বলে ধ্বংস করত। অথচ তাদেরই বংশধর পরবর্তীকালে গ্রীক রোমক পুঁথি আবিষ্কার করে নতুন প্রাণ পায়, তাকে বলে ইউরোপের রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম। প্রাচীন গ্রীসের ও প্রাচীন রোমের সংস্কৃতি হয়েছে এখন ইউরোপের ক্লাসিক সংস্কৃতি। সেই ভিত্তিকে খ্রীষ্টান পুরোহিতরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ছেলের নাম জুলিয়াস কি মেয়ের নাম ডায়েনা হলে নামকরণের সময় আপত্তি ওঠে না। পোপরাও যত্ন করে প্লেটো প্লোটিনাস পড়েন ও প্রাচীন কীর্তি সংগ্রহ করেন। প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের কী অনির্বাণ ঔৎসুক্য! সামান্য একখানা ইঁট উদ্ধার হলেই তারা উদ্ধার হয়ে যায়। একটা আস্ত মহেঞ্জোদারো অনাবৃত হলে কী জানি হয়তো আরো-একবার পুনর্জন্ম ঘটত!

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণকে পূর্বপুরুষ বলে অস্বীকার করা দূরে থাক, অধিকার করতেই ইউরোপীয়দের ব্যগ্রতা। মুসোলিনীর ফাসিস্টরা রোমক গৌরবে আত্মহারা। জার্মানদের আবার গ্রীস রোম ও প্যালেস্টাইনের প্রতি সমান বৈরাগ্য। ওদের একটা নিজস্ব শ্রুতি আছে, ভাগ্‌নারের অপেরায় যার পুনরুজ্জীবন। খ্রীষ্টান বলে তারা কম জার্মান নয়, বরং জার্মান বলে তারা কম খ্রীষ্টান হতেও রাজি।

কাজেই ভারতের খ্রীষ্টানদের ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অভিপ্রায় হিন্দুত্বের প্রতি টান নয়, সাধারণ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আগ্রহ। কয়েক বছর আগে ডরনাকলের বিশপ প্রমুখ খ্রীষ্টান অগ্রণীরা 'ভারতের উত্তরাধিকার' শীর্ষক গ্রন্থমালা প্রকাশ করেন, তাতে ভারতের তত্ত্ব দর্শন সাহিত্য ভাস্কর্য চিত্র সংগীত ইত্যাদি যাবতীয় বিশিষ্টতা কীর্তিত হয়েছিল। রচনা খ্রীষ্টানদের। নির্বাচনও তাঁদেরই। মিশনারীদের মতো নিন্দা করবার ও ত্রুটি উদ্ঘাটন করবার জন্যে নয়। ভারতীয় খ্রীষ্টান যে দেশকালবিহীন ভুঁইফোড় নয়, এইটে তাদের কাছে ও বিশ্বের কাছে প্রতিপন্ন করবার জন্যে। ভারতীয় খ্রীষ্টানরা বিদেশীর কাছে দীক্ষা নিয়েছে বলে তাদের স্বদেশের শিক্ষা কেন ছাড়বে? আর বিদেশীর কাছে মাথা হেঁট কেন করবে?

খ্রীষ্টানদের এই মনোভাব মিশনারী-প্রভাবমুক্ত হলে তাদের হাতে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিরাপদ। হিন্দুরা যদি বিলুপ্ত হয় ও খ্রীষ্টানরা যদি বিদ্যমান থাকে তবে ভারতের আবহমান ধারা তাদের কর্তৃক রক্ষিত হবে, তত্ত্বের বিরোধ সত্ত্বেও। আমরা আধুনিক হিন্দুরাও তত্ত্বের সবটা মানিনে, মানি যত মানিনে ততোধিক। কিন্তু তত্ত্ব মানিনে বলে বিচ্ছেদ চাইনে। খ্রীষ্টানরা সামাজিকভাবে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন বলে আমরা দুঃখিত। সমাজের মধ্যে থেকেও তারা খ্রীষ্টীয়মতে উপাসনা করতে পারত, তার জন্যে আলাদা সমাজ গড়ার আবশ্যক ছিল না। গোঁড়া হিন্দুরা একঘরে করত, কিন্তু তাতে কী আসে যায়, গোঁড়া হিন্দুরা একদা শংকরাচার্যকেও একঘরে করেছিল। বরং খ্রীষ্টীয় উপাসনা হিন্দুসমাজের ভিতরে প্রবেশ করত এতদিনে। চীনদেশের খ্রীষ্টানরা বিচ্ছেদনীতি পরিহার করেছে, সামাজিকভাবে তারা অভিন্ন, তাই অনায়াসে চিয়াং কাই শেক রাজ্য শাসন করেন। চীন নেতাদের অনেকেই খ্রীষ্টান। অথচ খ্রীষ্টান সংখ্যা সেদেশে মুষ্টিমেয়। একান্নবর্তী পরিবারের একজন খ্রীস্টান একজন বৌদ্ধ একজন কনফিউসিয়ান, এই উদারতা অনুকরণযোগ্য। একদিন যে ভারতেও তা ব্যাপক হবে তার সন্দেহ নেই। এদেশের কয়েকটি পরিবারে তা ইতিমধ্যেই সূচিত হয়েছে। কিন্তু তা কেবল হিন্দু শিখ খ্রীষ্টান বৌদ্ধ ও জৈনের মধ্যে। পার্সী ইহুদী ও মুসলমানরা এর থেকে দূরে সরে থাকতে ভালোবাসে।

তার কারণ পার্সী ইহুদী ও মুসলমানরা কেবল তত্ত্বে স্বতন্ত্র নয়। ইহুদী ও পার্সীরা জাতিহিসাবে স্বতন্ত্র। আর মুসলমানদের বিশ্বাস তারাও জাতি-হিসাবে স্বতন্ত্র। কেবল জাতিহিসাবে স্বতন্ত্র হলে কথা ছিল না, মুসলমানদের ধারণা তারা ইংরাজের মতো বিদেশী বিজেতা, ইংরাজের তুলনায় দীর্ঘ দিন আছে বলে তাদের স্বত্ব তামাদি হবে এমন কোনো কথা নেই।

সুতরাং মুসলমানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঠিক খ্রীষ্টান বৌদ্ধ শিখের সমতুল্য নয়, পার্সী ইহুদী আর্মেনিয়ানের সমান নয়। মুসলমান তত্ত্বের সঙ্গে হিন্দু তত্ত্বের বিরোধ কেন, যখন-তখন যত্র-তত্র কথায় কথায় দাঙ্গা বাধায় তার জন্যে যদি উভয়ের ধর্মপুস্তক খুঁজি তবে বৃথা খুঁজব। পৃথিবীতে বহু ক্ষেত্রে তত্ত্বের বিরোধ থেকে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তা কেবল প্রথম পরিচয়ে, তা দুই-এক শতাব্দীর অধিক স্থায়ী হয়নি। কিন্তু এদেশে সাত-আট শতাব্দী কাটল, তবু আজও এদের দুইপক্ষের মাথার খুলি ফাটল। মাথায় এমন কী বহুমূল্য নিধি আছে যা খুলে না দেখলে জিজ্ঞাসু চিত্ত মীমাংসা পায় না, রক্তে এমন কী পরম পদার্থ আছে যার জন্যে এমন অফুরান রক্তপিপাসা ?

যেখানে হিন্দুদের স্বরূপ নিয়ে হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর মিল নেই সেখানে হিন্দুমুসলমান মিলনের নাম গোঁজামিলন। গোঁজামিল কখনো কোনো পক্ষের কল্যাণকর নয়, তাতে জাতিকে দুর্বল করে আর দৌর্বল্য একটা অভিশাপ। তার চেয়ে বিরোধও শ্রেয়। বিরোধও দুর্বল করে সত্য, কিন্তু বিরোধ মানুষকে জাগ্রত রাখে, মিলনের পন্থা অন্বেষণ করায়, আর গোঁজামিলন মানুষকে

মিথ্যা আশা দিয়ে পরিশেষে নিষ্ঠুর বঞ্চনা করে, দেহের দৌর্বল্যের সঙ্গে মেশায় মনের দৌর্বল্য।

আমরা কী চাই তা সোজা। আমরা চাই যে ভারতের মুসলমান যা খুশি বিশ্বাস করুন, যেমন খুশি উপাসনা করুন, কিন্তু হোন ভারতীয়, হোন স্বাদেশিক। তাঁর পক্ষে বোধ করা সহজ হোক যে হাফিজের চেয়ে কালিদাস তাঁর আপন, আল্ হামরার চেয়ে অজন্তা তাঁর আপন। এক কথায় তাঁরা তাঁদের দেশের উত্তরাধিকার বুঝে নিন, যেমন আমরা নিয়েছি। বৌদ্ধ মত কেন, 'সনাতন' হিন্দু মতের সঙ্গেও আমাদের মতের পার্থক্য, তা সত্ত্বে আমাদের সারনাথের ধ্বংসাবশেষ ও ভুবনেশ্বরের মন্দির সমান ভালো লাগে এবং কারো চেয়ে কম ভালো লাগে না তাজমহল ও ফতেপুর সিক্রী। দেশোত্তর সৌন্দর্যের জন্যে নয়, দেশীয় চিত্তের বিচিত্র স্ফূর্তির জন্যে। ভারতে যা-কিছু গড়া হয়েছে রচা হয়েছে লেখা হয়েছে তাতে ভারত মিশে রয়েছে, তার পশ্চাতে রয়েছে অদৃশ্য ধারাবাহিকতা। সৃষ্টি কখনো আরোপিত হতে পারে না, যখন আরোপিত হয় তখন হয় ভূঁইফোড়, যেমন নয়া দিল্লী। আকবর তাঁর প্রথম বয়সের সঙ্গিনীর রুচি, শাজাহান তাঁর মাতাপিতামহীর রুচি নিজের রুচির মধ্যে পেয়েছিলেন, নইলে তাঁদের কীর্তি আমাদের এমন আপন বোধ হতো না।

তুর্ক ইরানের দিকে তাকিয়ে যদি কেবল আধুনিকতা দেখি তবে অর্ধেক দেখব। লক্ষ করবার জিনিস তাদের আধুনিকতার আধার নিবিড় স্বদেশানুরাগ। দেশকে এত ভালোবাসে বলে তারা ইসলামের আনুষঙ্গিক আরবীয়তা থেকে সবলে মুক্ত হতে চায়। আরবী নাম পদবী নিষিদ্ধ হচ্ছে, কোরানের তর্জমা হচ্ছে দেশভাষায়। আরবও তাদের কাছে বিদেশী। ইরানের প্রাক্-মুসলমান যুগ সম্বন্ধে এতদিন তাদের গ্লানি ছিল, গৌরব ছিল না। এখন তারা ঠিক আমাদেরই মতো অতীতের সঙ্গে মধ্যযুগের ও মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের অবিচ্ছিন্ন অন্বয় রক্ষা করতে উৎসুক।

স্বাদেশিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো হয়তো একদিন ভারতের মুসলমানের পক্ষে সম্ভব হবে, সহজ হবে। সেদিনের অপেক্ষা করব। সেই ঐক্য হবে মৌলিক ঐক্য। জুড়ে জুড়ে জোড়াতালি দিয়ে যে ঐক্য তা মৌলিক নয়, যৌগিক। তার দুর্ভোগ অনেক। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান শিখ ইত্যাদিকে আটা দিয়ে আঁটার নাম জাতীয়তা নয়, জাতীয়তা একই ঐতিহ্যের স্বীকৃতি এবং একই ভবিষ্যের অভীপ্সা। আর জাতীয়তার আধার না হলে আধুনিকতা সৃষ্টিতৎপর হয় না। ও বস্তু আকাশকুসুম নয়, ওর ফলনের জন্যে ভূমি চাই।

মুসলমানদের মনের একস্থানে একটি শঙ্কা আছে, তাঁদের ভয় হয় পাছে ভারতের সত্তা তাঁদের স্বকীয় সত্তাকে আত্মসাৎ করে, পাছে নিজের বলে তাঁদের কিছুই না থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীর' তাঁদের চিত্তে আশার পরিবর্তে আতঙ্ক জাগায়, আত্মবিলোপের দুঃস্বপ্নে তাঁরা কখনো হুঙ্কার ছাড়েন, কখনো হতাশ হন। এবং যে শঙ্কা সত্তার, তাকে আরোপ করেন তত্ত্বে, যেন হিন্দু তত্ত্ব অধীর হয়েছে মুসলিম তত্ত্বকে গ্রাস করতে। হিন্দুত্বের

চেয়ে ভারত বড়ো, আর সে-ভারত মুসলমানেরও সৃষ্টি, যেমন সৃষ্টি হিন্দুস্থানী সংগীত। সেই ভারতে মিলিত হতে হিন্দুর যদি ভয় না থাকে, খ্রীষ্টানের যদি ভয় না থাকে, তবে মুসলমানের ভয় থাকে কেন? আসলে ওটা সংস্কৃতির নয়, সংহতির প্রশ্ন।

মুসলমানের কাছে তার সংহতি তার দেশের চেয়ে বড়ো। সব দেশের সব মুসলমান একসূত্রে গ্রথিত, দেশ সে-সূত্রের ছেদ নয়। সেইজন্যে একজন মুসলমান নেতা বলেছিলেন, ন্যাশনালিস্ট ও মুসলিম দুটি স্বতোবিরুদ্ধ শব্দ। রোমান ক্যাথলিক চার্চেরও ঠিক এমনি সংহতির আদর্শ। সে-আদর্শ প্রতি দেশের প্রতি রোমান ক্যাথলিক চার্চকে পোপের এক-একটি ডিপার্টমেন্ট ও প্রতি রোমান ক্যাথলিককে পোপের প্রজা বানিয়েছে। এত বানানো সত্ত্বে তাদের বৈদেশিক বানাতে পারেনি। সকলের ল্যাটিন নামকরণপূর্বক সে চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, ল্যাটিনেই উপাসনা চলত ও তাতে আপত্তি থেকেই প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদ। প্রোটেস্টাণ্টদের উত্থান প্রকৃতপক্ষে ন্যাশনালিজ্‌মের উত্থান। এখন ক্যাথলিকরাও সমান ন্যাশনালিস্ট। মুসলমানদের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটবার হেতু নেই। তা যে নেই তার প্রমাণ দিয়েছেন কামাল ও রিজা শাহ।

আমরা অপেক্ষা করব।

(১৯৩৬-৩৭)

আদিম পাপ

হিন্দু-মুসলিম সমস্যার অদ্যাপি কোনো মীমাংসা হলো না। আমার মতো যাঁরা ভেবেছিলেন যুক্তি দিয়ে ওর সমাধান সম্ভব তাঁরা যুক্তি করে করে ক্লান্ত। এত কাণ্ডের পরেও যাঁদের ক্লান্তি নেই তাঁরা যুক্তি ছেড়ে কটূক্তি ধরেছেন। যে সমস্যা যুক্তির দ্বারা মিটল না কটূক্তির দ্বারা তার প্রতিকার হবে না। ধীরে ধীরে কটূক্তি ও থামবে। কিন্তু সেই যে একটা কথা আছে—'From words to blows', শেষকালে তাই-না ঘটে। কোন্‌দিন ঘুম থেকে উঠে দেখব দৈনিকপত্রে গালাগালির বদলে রাস্তায় রাস্তায় মারামারি বেধে গেছে। তাই যদি হয় আমাদের দৈনিক বরাদ্দ তবে যতদিন মারামারিতে অরুচি না আসে ততদিন মিটমাটের আশা নেই। যুক্তি থেকে কটূক্তি, কটূক্তি থেকে রক্তারক্তি, এইভাবে কে জানে কত কাল চলবে।

এতকাল আমরা বলাবলি করেছি তৃতীয় পক্ষ এর জন্যে দায়ী, কিন্তু অন্তরে ও-কথা বিশ্বাস করিনে আর। তৃতীয় পক্ষ এর থেকে লাভবান হয়েছে ও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে, এর মানে এমন নয় যে তৃতীয় পক্ষ চলে গেলেই আমরা ভাইয়ে-ভাইয়ে কোলাকুলি করব। বরং তৃতীয় পক্ষের প্রস্থানের পরেই এ সমস্যা চরমে উঠবে, এরূপ আশঙ্কা করবার কারণ আছে। কারণ যদি না থাকে তা হলেও আশঙ্কা আছে। আশঙ্কাকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে আশাবাদী তাঁরাও স্বীকার করেন যে তৃতীয় পক্ষ অপসরণ

করলেও এক পক্ষ কালে হিন্দু-মুসলমানের সিভিল ওয়ার সম্ভবপর। এক পক্ষ কাল বড়ো কম সময় নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মাত্র আঠারো দিন স্থায়ী হয়েছিল। সেই আঠারো দিনে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য মরেছিল। সেটাও ভাইয়ে-ভাইয়ে লড়াই।

কাজেই এটাকে লঘু করা উচিত নয়। অনেক সময় চিনতে ভুল করেছি, বুঝতে পারিনি কে হিন্দু কে মুসলমান। চেহারায়, কথাবার্তায়, পোষাকে এত বেশী মিল আছে যে কতবার হিন্দুকে মুসলমান ভেবে, মুসলমানকে হিন্দু ভেবে ফাঁপরে পড়েছি। কৌরবে পাণ্ডবেও এমনি মিল ছিল। তবু তো তাদের মিলন হলো না। মিল থাকলেই কি মিলন হয়?

মিলতে পারেন কারা? যাঁদের রণনৈতিক আদর্শ এক। যেমন মহাত্মা গান্ধী ও খাঁ আবদুল গফর খাঁ। অথবা যাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ এক। যেমন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। অথবা যাঁদের সমাজনৈতিক আদর্শ এক। যেমন কমিউনিস্ট হিন্দু ও কমিউনিস্ট মুসলমান। যাদের আদর্শ এক নয় তারা কোন্ সূত্রে মিলবে? সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে সাধারণ মুসলমানের রক্তের মিল, স্বার্থের মিল, বন্ধনের মিল থাকলেও আদর্শের মিল তো নেই। কোনো-একটা আদর্শে যদি তারা মিলত তবে তাদের সমস্যাটাও কুয়াশার মতো মিলিয়ে যেত।

কিন্তু কোথায় সেই আদর্শ যাতে তারা সমান আস্থাবান? সাধারণ মুসলমান অহিংসার ধার ধারে না, সাধারণ হিন্দু যদি বা ধারে তবে অহিংসা বলতে বোঝে নিষ্ক্রিয়তা। খাজনা বন্ধ করতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পটু, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে হিন্দুও পারে না মুসলমানও পারে না। সুতরাং সত্যাগ্রহী হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সুদূরপরাহত।

তবে কি তারা ভারতীয় হিসাবে, স্বাজাত্যবাদী হিসাবে মিলতে পারে না? কই, তারও তো লক্ষণ দেখছিনে। ভারতীয় স্বাজাত্যবাদীদের একটি ষাট বছরের পুরোনো প্রতিষ্ঠান আছে। নাম ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলেরই তাতে প্রবেশাধিকার আছে। তার আদর্শ, ভারতবর্ষের লোক নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও এক এবং অবিভাজ্য নেশন। বহু শিক্ষিত মুসলমান এ-আদর্শ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বহু বিশিষ্ট মুসলমান গোড়া থেকেই এ-আদর্শের বিরোধী। তাঁদের লক্ষ্য ছিল প্যান ইসলাম, অর্থাৎ আরব তুর্ক আফগানদের সঙ্গে এক রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রসঙ্ঘে গ্রথিত ভারতীয় মুসলমান। প্যান ইসলামের উত্তরাধিকারী পাকিস্তান। পাকিস্তাননের আড়ালে প্যান ইসলাম ঢাকা পড়েছে, প্রকৃতপক্ষে যার নাম প্যান ইসলাম তারই নাম পাকিস্তান। ভারতীয় স্বাজাত্যের সঙ্গে এ আদর্শ একেবারেই খাপ খায় না অথচ এর মতো জনপ্রিয় আদর্শ মুসলমান মহলে আর নেই। এরই অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র নির্বাচন-পদ্ধতি, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। এই একদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল পূর্ববঙ্গ-ও-আসাম-রূপে। বরাবরই ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দুটি চিন্তাধারা পাশাপাশি বয়ে আসছে। একটি আরবাভিমুখ, অপরটি ভারতাভিমুখ। আজকের দিনে

একটির নাম প্যাকিস্তান, অপরটির নাম নিখিল ভারত।

হঠাৎ ইংরাজ বিদায় নিলে যে এ-দুটি চিন্তাধারা অভিন্ন হয়ে ভারতাভিমুখ হবে, এ ভরসা আমার নেই। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি মুসলমানের দোটানা কোনোদিনই ঘুচবে না। আরব ও ভারত তাকে ডান হাত ও বাম হাত ধরে টানতেই থাকবে চিরটা কাল। তবে কিনা ভারত যদি নিজের চেষ্টায় স্বাধীন হয় তবে ভারতের প্রতি তার শ্রদ্ধা জন্মাবে, শ্রদ্ধার পাত্রকে সে খর্ব করতে পারবে না। ক্রমেই আরবের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়ে আসবে, পাকিস্তানের প্রভাব ক্ষীণতর হবে। কিন্তু এখনও সুদীর্ঘকাল প্যান ইসলাম ওরফে পাকিস্তান আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ছায়াচ্ছন্ন করবে। কারণ আরবাভিমুখ মুসলমানদের সংখ্যা কম নয়, বোধ হয় বেশীই। সংখ্যা কম হলেও প্রতিপত্তি যে বেশী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। সে প্রতিপত্তি যে কেবল তৃতীয় পক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে তা নয়। সে প্রতিপত্তি নির্ভর করে ইসলামের কেন্দ্র মক্কার উপর, নামকরণের ও প্রার্থনার ভাষা আরবীর উপর, খেলাফৎ নামক সার্বভৌম আইডিয়ার উপর।

তারপরে কমিউনিস্ট আদর্শ। সাম্যবাদীদের বিশ্বাস জাতীয়তার ভিত্তির চেয়ে আর্থিক বনিয়াদ আরো গভীর। সেখানে হিন্দু-মুসলমান অনায়াসে মিলিত হতে পারে। কিষাণ মজদুর যদি একজোট হয় তবে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ থাকবে না। বাস্তবিক এ-যুক্তি অকাট্য। কিন্তু ম্যাও ধরবে কে? যাঁরা কিষাণ মজদুরকে একজোট করতে উদ্‌যোগী হয়েছেন তাঁরা কি উপলব্ধি করেননি যে হিন্দু শ্রমিকরা আগে হিন্দু, তার পরে শ্রমিক? মুসলমান কৃষকরা আগে মুসলমান, তার পরে কৃষক? যদি না করে থাকেন তবে ধীরে ধীরে করবেন। আমাদের শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে এখনো শ্রেণীচেতনা তেমন তীব্র হয়নি, যেমন তীব্র সাম্প্রদায়িক চেতনা। তার চাইতেও তীব্র স্পৃশ্যা-স্পৃশ্য চেতনা। একজন হিন্দু আর-একজন হিন্দুর ছোঁয়াচ বাঁচাতেই ব্যস্ত, যাদের হরিজন বলা হয় তাদেরও শুচিবাতিক কম নয়। কৃষক কিংবা শ্রমিক বলে দল বাঁধলেও কেউ কারো সঙ্গে খেতে রাজি হয় কি? মুসলমানের সঙ্গে দল পাকালেও পাকঘর সম্বন্ধে আপত্তি যায় কি? সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করে একজোট হওয়া অসম্ভব, সে জোট এক আঘাতেই ভেঙে চৌচির হয়। রাশিয়াতে কোনোকালেই বিবাহের বাধা ছিল না। এদেশে তো হিন্দু-মুসলমানে, হিন্দুতে-হিন্দুতে, আশরাফে-আতরাফে বিবাহ নিষেধ। যেখানে রক্তসম্পর্ক নেই, জলচল নেই, সেখানে একজোট হওয়া মুখের কথাই বটে। কাজের কথা নয়।

ভারতবর্ষের আদিম ব্যাধি হচ্ছে অস্পৃশ্যতা। যতই দিন যাচ্ছে ততই আমার প্রত্যয় হচ্ছে যে অন্যান্য ব্যাধির উৎপত্তিস্থল ঐ ব্যাধি। হিন্দুসমাজে যাদের উচ্চ জাতি বলে গণ্য করা হয় তাদের ভিতরেও অস্পৃশ্যতা আছে। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আরেক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেও হীন মনে করে। জলস্পর্শ করলেও অন্নস্পর্শ করে না। হিন্দু-মুসলিম মনোমালিন্যের অন্যান্য কারণ থাকলেও মূল কারণ কি এই নয় যে হিন্দুরা মুসলমানদের অস্পৃশ্য জ্ঞান করে? এমন

তো হতে পারে যে অস্পৃশ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানদের একাংশ একদম বেঁকে বসেছে। নমঃশূদ্রদের মধ্যেও আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রখর হচ্ছে, তারাও ক্রমে ক্রমে বেঁকে বসছে। কে জানে হয়তো কোন্ সুদূর অতীতে এমনি অতিষ্ঠ হয়ে কত লোক হিন্দুসমাজ ছেড়ে মুসলমান সমাজে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরই অপমানবোধ তাদের বংশধরদের হৃদয়ে জাগরূক রয়েছে বলে মনোমালিন্য দূর হচ্ছে না। কে জানে হয়তো দাঙ্গাহাঙ্গামাও সেই আদি অপমানের প্রতিশোধ। নইলে মসজিদের সামনে বাজনা শুনলেই মুসলমান কেন মারমুখো হয়? প্রতিশোধের প্রবৃত্তিই এর পিছনে কাজ করছে। নমঃশূদ্ররাও হয়তো এমনি কোনো উপলক্ষ আবিষ্কার করবে একদিন। তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। এটা কর্মফল।

ভবিষ্যতে যে সমস্য আসছে তার তুলনায় হিন্দু-মুসলিম সমস্যাও ছেলেখেলা। মুসলমান তো ভারতের সব প্রদেশে প্রবল নয়, কিন্তু হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে যখন অপমানবোধ উগ্র হবে তখন এমন গ্রাম ক'খানা থাকবে যেখানে উচ্চবর্ণের লোক নির্বিবাদে বাস করতে পাবে? শহরের ধাঙড়রাও বাবুদের কাঁদিয়ে ছাড়বে।

তিন চার হাজার বছরের অপমান যাদের মনের পরতে পরতে জমেছে সেই অস্পৃশ্য ইতর ঘৃণিত জাতেরা যখন জাগবে তখন তারা কিষাণ মজদুর এই স্তোকবাক্যে ভুলবে না। যেমন মুসলমানরা ভুলছে না স্বাজাত্যের স্তোকবাক্যে। পরাধীনতার জ্বালার চেয়ে, শোষণের জ্বালার চেয়ে দারুণ—অপমানের জ্বালা। যারা পুরুষানুক্রমে অপমানিত হয়ে এসেছে তারা অপমানের শোধ না তুলে অন্যদিকে দৃক্‌পাত করবে না, যদি তাদের গায়ে শক্তি আসে। সুতরাং করতে হবে সময় থাকতে ঐ আদিম পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত—original sin-এর চিহ্নলোপ। তা যদি করি তবে দেখব হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্য ততটা নেই, কারণ আমাদের আচরণ মুসলমানদের প্রতি সহজ ও সসম্ভ্রম হয়েছে।

(১৯৪২)

মানুষমাত্রেরই জন্মস্বত্ব পরিপূর্ণ জীবন। সে যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন ধরণীর কাছে চায় অন্নজল, আকাশের কাছে আলো-বাতাস, সমাজের কাছে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, স্বজনের কাছে স্নেহ প্রেম, অজানার কাছে জ্ঞান, বিধাতার কাছে অমৃত।

এখন কথা হচ্ছে, এসব সে চায় মানুষ হিসাবে, না ভারতীয় হিসাবে, না মুসলমান হিসাবে, না কৃষক হিসাবে? সোজাসুজি মানুষ হিসাবে দাবী করলে কেমন হতো বলতে পারিনে, কিন্তু আজকের দিনে মানুষ তার পাওনা চাইছে হয় ভারতীয় অথবা ইংরেজ অথবা জাপানী হিসাবে, নয় হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা শিখ হিসাবে, নয় শ্রমিক অথবা মালিক হিসাবে।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ক্ষতি কী? আমার পাওনা যদি আমি হিন্দু হিসাবে চাই তাহলে কি সেটা মানুষ হিসাবে চাওয়া নয়? যদি ভারতীয় হিসাবে চাই সেটা মানুষের পাওনা নয় কি? যদি মধ্যবিত্ত হিসাবে চাই তাহলে কি সেটা অমানুষের হয়? নামে কী আসে যায়? গোলাপফুলকে যে নামেই ডাকো সে তেমনি সুগন্ধ বিলাবে।

কিন্তু বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এ কেবল নামের ইতরবিশেষ নয়। আবদুর রহমান যদি বলেন, 'আমিও বাঙালি, আপনিও বাঙালি, আপনি কেন ইহজন্মের সব আনন্দ পাবেন, আমি কেন কিছুই পাব না', তাহলে আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া শক্ত হয়। তা না বলে তিনি যেই বলতে শুরু করেন, 'আপনি মহাজন, আমি খাতক, আপনি কেন…' অমনি আমার মনে বিরূপ ভাব জাগে। অথবা তিনি যখন বলেন, 'আপনি হিন্দু, আমি মুসলমান, আপনি কেন…' তখন আমি এমন কড়া জবাব দিই যে তার পরে দাঙ্গা ছাড়া প্রতিকার থাকে না।

দেশে যার নাম দাঙ্গা, দেশের চেয়ে বৃহত্তর ভূমিকায় তারই নাম যুদ্ধ। একদল মানুষ জাপানী হিসাবে চাইছে, আর-একদল মানুষ চীনা হিসাবে দিচ্ছে না। একদল মানুষ জার্মান হিসাবে দাবী করছে, আর একদল মানুষ রাশিয়ান হিসাবে বাধা দিচ্ছে। আরো অনেক দল জুটেছে, তাদের কেউ ইংরাজ কেউ মার্কিন কেউ ইটালিয়ান। ভারতীয়রাও বাদ যায়নি।

এই হট্টগোলে সবাই ভুলে যাচ্ছে হাটে সওদা করতে এসে কী তাদের সত্যি-কার পরিচয়। তাদের মনে পড়ছে না তারা সকলেই মানুষ, তাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন মোটের উপর একই। যদি স্মরণ থাকত তবে তারা এমন করে পরস্পরকে পরলোকে পাঠাত না, কিংবা এমন আঘাত করত না যার ফলে অঙ্গহানি আধিব্যাধি পরাজয়ের গ্লানি দীর্ঘকালব্যাপী দারিদ্র্য। পৃথিবীর সম্পদ যদি যুদ্ধের রসদ-রূপে ভস্ম হয়ে গেল তবে রইল কী? বাড়ী ফিরবে মানুষ কোন্ সওদা হাতে? কুরুক্ষেত্রের পরে স্বর্গারোহণ ছাড়া গতি ছিল না পাণ্ডবের। কৌরবের উপর জয়ী হবার গৌরব নিয়ে তো আর জীবন ভরে না।

সেইজন্যে জাতির নামে, সম্প্রদায়ের নামে, শ্রেণীর নামে পরিপূর্ণতার দাবী পেশ করলে পরিণামে মেলে শূন্যতা। অবশ্য শূন্যতাকে মণ্ডিত করে জয়ঃ গৌরব। সেই বিড়ম্বনায় বেশ কিছুকাল কাটে। তার পরে ধীরে ধীরে ধুঁইয়ে ওঠে অভাববোধ।

মানুষের যা কিছু দাবী তা মানুষের নামে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমার এ-দাবী নিয়ে দাঁড়াব কার কাছে? যার কাছে দাঁড়ালে কাজ হয় সে যদি হয় ইংরাজ বা জার্মান তবে তার সামনে আমি ভারতীয়। হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়া অবান্তর। সে পরিচয় বৌদ্ধ খ্রীষ্টানের কাছে, কিন্তু ইংরাজ তো খ্রীষ্টান-রূপে আসেনি, জাপানীও আসবে না বৌদ্ধ-রূপে। ইসলাম-অবলম্বী ইরাক ইরান মিশর তুর্কী এখন মুসলমান বলে পরিচয় দেয় না, দেয় নেশন বলে। সোভিয়েট রাশিয়ার লোক এতদিন বলত তাদের রাষ্ট্র কিষাণ মজুরের, কিন্তু সংকটের

আলোয় দেখা গেল তাদের লড়াই কিষাণ মজুর হিসাবে নয়, রাশিয়ান হিসাবে। অসংকোচে তারা প্রতিপক্ষের কিষাণ মজুর বধ করছে। জার্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে রাশিয়ান না হয়ে চারা নেই।

আজকের দিনে যারা নেশনের মেলায় নেশন নয় তাদের দাবী কেউ কানে তোলে না। এটা বুঝতে পেরে আমাদের মুসলমান নেতারা তাঁদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় ত্যাগ করে নৈশনিক পরিচয় গ্রহণ করেছেন। ছিলেন মুসলিম, হতে চান পাকিস্তানী। একদিক থেকে এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কেননা মুসলমানের মন ন্যাশনালিজমে সাড়া দেয় না সহজে। পাকিস্তানের খিড়কি দিয়ে এই যে ন্যাশনালিজম ঢুকল এর ধাক্কায় একদিন সাম্প্রদায়িকতা হটে যাবে। এই রকমই হয়েছে মিশরে তুর্কীতে ইরানে আফগানিস্তানে। পাকিস্থান মুসলমানকে ন্যাশনালিস্ট করবে। তাতে অবশ্য ভারতের অঙ্গচ্ছেদ। ভারতীয় বলে যারা পরিচয় দেয় তারা বিনাদ্বন্দ্বে সূচ্যগ্রভূমি ছাড়বে না। তবু স্বীকার না করে উপায় নেই যে ন্যাশনালিজমের কুইনিন খাওয়াতে গেলে পাকিস্তানের চিনি দরকার। আর ন্যাশনালিজমের কুইনিন না খেলে সাম্প্রদায়িকতার জ্বর সারবে না।

(১৯৪২)

জনসংখ্যা

মানুষ যে পশু নয় এ-কথা সত্য, কিন্তু পশু না হলেও সে প্রাণী। পূর্ব-পুরুষের কাছ থেকে যে প্রাণ সে পেয়েছে উত্তরপুরুষকে সেই প্রাণ সে দিয়ে যাবে, এ তার অবশ্য কর্তব্য। যদি অপ্রিয় কর্তব্য হতো তাহলে মানুষ তাতে ফাঁকি দিত। হয়তো প্রাণীমাত্রেই ফাঁকি দিত। সেইজন্যে কর্তব্যের সঙ্গে সুখ মিশিয়ে, শ্রেয়র সঙ্গে প্রেয় মিশিয়ে প্রজাসৃষ্টিকে প্রীতিকর কর্তব্যে পরিণত করেছে প্রকৃতি। স্ত্রীপুরুষ যখন সংগত হয় তখন প্রিয় কর্তব্য করে। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। এর জন্যে গ্লানি বোধ করা অস্বাভাবিক। বরং এর জন্যে গৌরব অনুভব করা উচিত। কর্তব্যসাধনের গৌরব, প্রীতিবিধানের গৌরব।

কিন্তু মুশকিল এই যে প্রকৃতি আমাদের প্রজাসৃষ্টির প্রেরণা যে পরিমাণে দিয়েছে অন্নবস্ত্র বাসস্থান ঔষধাদি উৎপাদনের প্রেরণা ও জ্ঞান সেই পরিমাণে দেয়নি। দেশের জনসংখ্যা লাফ দিয়ে বাড়ছে, কিন্তু ধনসম্পদ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না। এ কেবল ভারতবর্ষেই নয়, অল্পবিস্তর সব দেশেই। জার্মানী ও জাপান যে যুদ্ধে নামল ও আর সবাইকে নামতে বাধ্য করল এর মস্ত কারণ জনসংখ্যার স্ফীতি ও ধনসম্পদের অকুলান। আগে তো তারা সাম্রাজ্যবাদী ছিল না, হলো কতকটা দায়ে ঠেকে, কতকটা ইংলণ্ড প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখে। ইংলণ্ড প্রভৃতি একদা সাম্রাজ্যবাদী হয়েছে এমনি দায়ে ঠেকে। সাম্রাজ্যবাদী না হয়ে পারত না তারা। না হলে মন্বন্তরে নির্বংশ হতো। যেমন হতে বসেছি আমরা। আমাদের নেতারা ভাবছেন পঞ্চবার্ষিকী বা দশবার্ষিকী বা পঞ্চদশবার্ষিকী

পরিকল্পনা করলেই এদেশের সকলের ভাগে যথেষ্ট খোরাক পোষাক বাসস্থান ইত্যাদি জুটবে। কিন্তু লোকসংখ্যা যদি লাফ দিয়ে বাড়তে থাকে তো বাড়তি মানুষের ভাগে কী জুটবে? তাদের যদি অংশ দিতে হয় তো কারো ভাগেই যথেষ্ট জুটবে না। তখন এদেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকবে।

কোনো পরিকল্পনাই কার্যকর হবে না, হতে পারে না, যতদিন না আমরা লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করতে শিখছি। লোকসংখ্যার নিয়ন্ত্রণও দশবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কী করে তা সম্ভব তার জন্যে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ হয়তো ব্রহ্মচর্যের বিশেষজ্ঞ, নিজের জীবনে বিশেষজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন। সন্ন্যাসজীবনে নয়, গৃহস্থজীবনে। অবিবাহিত জীবনে নয় বিবাহিত জীবনে। বিপত্নীক জীবনে নয়, সপত্নীক জীবনে। কেউ হয়তো বিন্দুসাধনের বিশেষজ্ঞ। সহজিয়া কি বৈষ্ণব কি তান্ত্রিক কি দরবেশ। কেউ হয়তো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পারদর্শী, চিকিৎসাবিদ্যায় পণ্ডিত। এঁরা সকলে মিলে যে পরিকল্পনা স্থির করবেন দেশ তা মেনে নেবে ও দেশের শাসকরা তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। এখন যা চলছে তার নাম অব্যবস্থা। সাময়িকপত্রে যার খুশি সে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, যার দায় সে কিনছে, ফল পাচ্ছে কি-না সন্দেহ। পেলে কুফল পাচ্ছে হয়তো। যে সব ঘটনার কথা কানে আসছে তাতে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। অকারণে অর্থব্যয়, স্বাস্থ্যক্ষয়, মানসিক অশান্তি। এই বিড়ম্বনার হাত থেকে কবে আমরা উদ্ধার পাব! আইন করে এসব বিজ্ঞাপন বন্ধ করা যায়, কিন্তু হাতুড়ের কাছে লোকে যাবেই, যদি অন্য ব্যবস্থা না থাকে। সুতরাং ব্যবস্থার কথাই ভাবতে হবে ব্যবস্থাপকদের।

কথাটা এত সরল যে আমাদের পরিকল্পনাকারীদের অজানা নয়। তবু তাঁরা আশা করবেন যে দেশের জনসংখ্যা আপনা-আপনি নিয়ন্ত্রিত হবে, এর জন্যে সমাজপতিদের কিছু করতে হবে না, সমাজকে হাতুড়েদের হাতে ছেড়ে দিলেও চলবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচার্যের বোলচাল দিলে লোকে অনায়াসে ব্রহ্মচারী হবে। তার পরেও যদি মন্বন্তর হয় তো সেটা পরের দোষ। স্বরাজের পরে ইংরেজ থাকবে না, দোষ দেওয়া যাবে বড়লোকদের। বড়লোকেরাও সেটা তাঁদের আশ্রিত লেখক ও বক্তাদের সাহায্যে পাত্রান্তরিত করে দেবেন বৈদেশিক রাষ্ট্রদের উপর। তার থেকে আসবে আন্তর্জাতিক মনোমালিন্য, যার পরিণতি যুদ্ধ। যুদ্ধও একটা মহামারী। ওতে বাড়তি লোকসংখ্যা কমতির দিকে যায়, অনেক সময় অতিরিক্ত কমে। যদি কমতির দিকে না যায় তো ওর বিকল্প মন্বন্তর বা আর-একটা যুদ্ধ। এবার জার্মানীতে ও জাপানে মন্বন্তর আসছে। কিন্তু ইংলণ্ডে তো মন্বন্তর ঘটতে দেওয়া চলে না, সেখানে যা আসবে তা তৃতীয় মহাযুদ্ধ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকলে ভারতও সে-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে, না যদি জড়ায় তো মন্বন্তর থেকে রক্ষা পায় কি-না সন্দেহ।

একমাত্র প্রতিকার জনসংখ্যায় পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ। ও জিনিস প্রকৃতির উপর বা হাতুড়েদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

(১৯৪৫)

জীবিকা

জীবিকার দিক থেকে বাংলার জনসমাজকে মোটামুটি এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।—

(১) দিনমজুর। এরা দিন আনে দিন খায়। কোনো-দিন কাজ পায় কোনো-দিন পায় না। এক জোড়া হাত ছাড়া এদের অন্য মূলধন নেই। (২) ভাগচাষী। এদের জমি নেই, হাল-গোরু আছে। অন্যের দখলী জমিতে ফসল উৎপাদন করে এরা ফসলের ভাগ পায়। (৩) চাষী। আপনার দখলী জমিতে ফসল উৎপাদন করে জমির মালিককে খাজনা দেয়। (৪) জমিদার। সেই খাজনার কতক সরকারকে দিয়ে বাকীটা ভোগ করেন। (৫) কারিগর। এদের এক এক দল এক এক প্রকার হাতের কাজ করে, চাষ ছাড়া। এরা তাঁতী ছুতোর কামার কুমোর তেলি ময়রা ধোপা নাপিত দর্জি মুচি কাঁসারি শাঁখারি ইত্যাদি। (৬) ব্যবসাদার। এদের মধ্যে পানবিড়িওয়ালা থেকে আমদানি-রপ্তানিকারক, পাটের ফড়ে থেকে চটকলওয়ালা, গ্রাম্য টাউট থেকে হাইকোর্টের এটর্নি, ছোট বড়ো মাঝারি ডাক্তার, মোক্তার, কনট্রাকটার। মহাজনকেও এই পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। (৭) চাকুরে। সরকারী সওদাগরী জমিদারী আমলা। (৮) কারখানার মজুর। এদের এক দল দিনমজুরেরই মতো সব কাজে হাত লাগায়, কোনোটাই ভালো জানে না। আর-একদল কারিগরের মতো কার্যবিশেষে পারদর্শী।

এখন বেকার বলতে দু'রকম বেকার বোঝায়। একরকম বেকার দিনে এক ঘণ্টাও খাটে না, বছরে এক দিনও খাটে না, ষোল আনা বেকার। আর-একরকম বেকার দিনে বা বছরে যত খাটতে পারত তত খাটে না, সিকি বা আট আনা বা বারো আনা বেকার। ইউরোপের সমাজে ষোল আনা বেকারদের সংখ্যা গণনা হয়ে থাকে, তা কিছু কঠিন নয়, কারণ তারা সাধারণত কারখানার মজুর। আমাদের কারখানার মজুরদের মধ্যে যারা ষোল আনা বেকার হয়, তারা গ্রামে চলে গিয়ে দিনমজুরের শ্রেণীভুক্ত হয়, আর দিনমজুর কখনো ষোল আনা বেকার নয়। আমাদের দেশে ষোল আনা বেকার যদি থাকে, তবে কারখানার মজুরদের মধ্যে নয়, দিনমজুরদের মধ্যে নয়, কারিগরদের মধ্যে তো নয়ই, ভাগচাষী ও চাষীদের মধ্যেও নয়। এদের মধ্যে সিকি বা আট আনা বা বারো আনা বেকার আছে, থাকার কারণ আজকালকার মন্দা এবং চিরকালের অব্যবস্থা। সমাজকে ঢেলে না সাজালে এদের পেট ষোল আনা ভরবে না। এরা আধপেটা খেয়েও মশা মাছির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সন্তান সৃষ্টি করছে। হতভাগারা বোঝে না যে তাতে তাদেরই অন্ন ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তাদের সংখ্যা কম হলে তাদের মজুরিও বাড়ত, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের মজুরি কমেছে। আজকালকার মন্দার যেটুকু দোষ সেটুকু কেটে যাবে। কিন্তু অতিজননের যে দোষ তা যদি স্থায়ী হয়, তবে এইসব শ্রেণীর পেট চরকার উপার্জনেও ভরবে না, কমিউনিজম প্রবর্তিত হলেও ভরবে না। ষোল আনা খাটবার সামর্থ্য এদের হবে না, বেগার খাটার মতো খুব খানিকটা খেটে এরা আধমরা হয়ে বাঁচবে। জাপান প্রভৃতি দেশে এই সব শ্রেণীর লোককে খাটিয়ে নিয়ে এত কম খেতে দেওয়া হচ্ছে যে,

বেকার সমস্যার চেয়ে বেগারসমস্যা গুরুতর হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়াতেও বেগারসমস্যাই প্রবল। এইসব শ্রেণীর লোক যতদিন না সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে শিখছে, ততদিন একটা-না-একটা সমস্যায় এদের দুঃখ পেতে হবে। ইউরোপের সমাজ এদের মাঝে মাঝে ছাঁটাই করবার বন্দোবস্ত করেছে। সেটা হচ্ছে প্রত্যেক দশ পনের বছর অন্তর একবার করে যুদ্ধ। যুদ্ধে পদাতিক সৈন্য হয় এরাই। পরস্পরকে মেরে সাবাড় করে দেয়। যুদ্ধের ঠিক পরে জীবিতদের মজুরি বেড়ে যায়। কিন্তু দুদিন বাদে যথাপূর্বং। তখন আর-একটা যুদ্ধের জন্যে সাজ সাজ রব।

আমাদের সমাজেও এই বন্দোবস্ত ছিল। দেড়শ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকায় দৈবের উপর বরাত দিতে হয়েছে। বছর বছর অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, তাও যথেষ্ট না হলে মড়ক ও ভূমিকম্প, এমনি করে যমরাজ আমাদের এইসকল শ্রেণীকে সাহায্য করেছেন।

বাকী থাকে জমিদার ব্যবসাদার ও চাকুরে। বাংলাদেশে জমিদারীর উপর যতগুলি লোক নির্ভর করছে তার বেশী পারবে না, কারণ জমিদারী এমন জিনিস যে তার আর বাড় নেই। অনাবাদী জমি যা পড়ে আছে তার অনুপাত অল্প। ফসলের দর যদি মন্দার ফলে কমতেই থাকে, তবে দশ বছর পরে জমিদারের প্রাপ্য আইন অনুসারে কমবে, এখন তো অনাদায়ের দ্বারা কমেছে। আমাদের প্রধান ফসল পাট। বিদেশীরাই ওর খরিদ্দার। পরের উপর প্রত্যাশা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুতরাং জমিদারীর মুনাফা যে বেশী লোককে প্রতিপালন করতে পারবে না, বরং দিন দিন জমিদারের ছেলেরা অন্যদিকে ঝুঁকবে, এটা অনিবার্য।

ব্যবসার অবস্থা আমরা কেবল এ দেশে নয়, সব দেশে লক্ষ করছি। টাকা জমে গেছে, কোথাও খাটাতে পারা যাচ্ছে না বলে সুদ দিন দিন কমছে। সুদ ব্যবসায়-জগতের স্তম্ভ। সেই সুদ বুঝি দেখতে দেখতে নিরাকার হয়ে যায়। আজকের এ মন্দা যে ভূতের মতো ছেড়ে যাবে সে সম্ভাবনা অল্প। কোনো-কোনো ইকনমিস্টের মতে এ হচ্ছে ক্যাপিটালিজমের অন্তিম দশা। এর শেষ মানে কলিযুগের শেষ। অথচ নতুন সত্যযুগে যে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হবে এর স্বপক্ষে যা পাওয়া যাচ্ছে তা যুক্তি নয়, তা অভিলাষ। এই এই করলে এই এই হবে। তা মানবজাতি বহুবার শুনেছে। তার পরীক্ষা না দেখে তাকে অন্ধের মতো মেনে নেবে, আজকালকার কোনো দেশ অতটা আদর্শবাদী নয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মায় ভারতীয় বাণিজ্য, কী ব্যাধিতে ভুগছে তার নির্ণয় হয়নি। সে বেচারা মরুক আর বাঁচুক, বৈদ্যেরা চিকিৎসাপ্রণালী যা বাতলাচ্ছেন তা রকমারি। আমরা দেখতে পাচ্ছি বাণিজ্যে এখনো লক্ষ্মীর বাস, কিন্তু বাসাটা তাঁর বাহনে ঠাসা, তাঁর সেবকদের জন্যে ঠাঁই কম। বাহনরা একটু নড়ে তো সেবকদের আরো জায়গা হয়। সোজা ভাষায় মাড়োয়ারি ভাটিয়া পার্সী ইংরাজ ইত্যাদির প্রতিযোগিতা প্রবল না হলে বাঙালির মতো অবলা জাতি বাংলার বাণিজ্যে সর্বেসর্বা হবে। কিন্তু এ-কথা মনে রাখা ভালো যে তাতে

বর্তমান অবস্থার খুব বেশী বদল হবে না। বাংলার শতকরা নব্বই জন হচ্ছে দিনমজুর, ভাগচাষী, চাষী, কারিগর ও কারখানার মজুর। এরা মাড়োয়ারির হাতে না পড়ে বাঙালির হাতে পড়লে বর্তে যাবে এ-কথা অবিশ্বাস্য। এদের বাঁচতে হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, সমিতি করতে হবে, একা একা দরদস্তুর না করে সমিতির মারফৎ দরদস্তুর করতে হবে। সে শিক্ষা এদের নেই। এরা ভালো কাপড় বুনতে শিখেছে, কিন্তু ভালো দামে বেচতে শেখেনি। যারা পাটের উৎপাদক তারা অশেষ প্রকারে ঠকে। বাঙালির কাছে কিছু কম ঠকে তা নয়। যতদিন না এরা সমিতিবদ্ধ হচ্ছে ততদিন এরা সবাইকার কাছে ঠকবে।

পরিশেষে চাকুরেদের কথা। চাকুরে হতে চাইলে বছর দশ বারো লেখাপড়া শিখতে হয়। সেই মূলধনে যাবজ্জীবন মাসে মাসে অর্থাগম। একটা লাখটাকা দামের তালুক কেনা আর একটা পাঁচশ টাকা মাইনের চাকরি জোটানো হরে-দরে সমান। তালুকের মুনাফা ও চাকরির আয় বছরে হাজার ছয়েক। যে লোকটা মাসে বিশ টাকা মাইনে পায় সেও দেখতে গেলে চার হাজার টাকার সম্পত্তির মালিক। অথচ লেখাপড়া শিখতে সে কখনো এত টাকা খরচ করেনি।

কেন যে লোকে চাকরি চায় তা এতক্ষণে বোঝা গেল। এখন খোঁজ নেওয়া যাক কেন লোকে চাকরি পাচ্ছে না। এর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে দোষ দেওয়া বৃথা। দেশে যদি বিশ্ববিদ্যালয় না-ই থাকত, হাই স্কুল না-ই থাকত, তবু চাকুরের বাজারে এমনি ভিড় হতো, গোটাকয়েক লোক ভিড় সরিয়ে সামনে গিয়ে শিকেয় তোলা চাকরিটি দখল করত, অবশিষ্টরা বেকার বসে প্রাইমারী পাঠশালাকে শালা বলত। ব্যাপারটা হচ্ছে বিনা মূলধনে সারাজীবনের সংস্থান। আগেকার দিনে চাকরিই ছিল না বেশী। মোগলযুগে কয়জন মুসলমান বা হিন্দু আমলা মাসের শেষে রাজকোষ থেকে একটা আধুলী বা সিকি পেতেন? কর্মচারীরা যে যা পারে লুঠ করে নিত, রাজস্ব আদায় করে নিজের অংশটি কেটে রাখত। অনেকের ছিল জায়গির, সেই জায়গির থেকে যা আদায় হতো সেই তাদের বেতন। একালে জমিদারের গোমস্তারাও ন' মাসে ছ' মাসে' কাঁচা টাকা উপর থেকে পায়। (অবশ্য নিচে থেকে যা পায় তা ন' মাসে ছ' মাসে কেন?) কাল বদলে গেছে বলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছেড়ে তামলি বারুই বাগ্দী বাউরি বোষ্টম ডোম গোয়ালা মালী এমন কি মেয়েমানষে পর্যন্ত চাকরি চায়, মশাই! শিক্ষাবিস্তার হবে না? হতে বাধ্য। চাকরির সংখ্যা হাজার গুণ করুন, যারা এখনো অশিক্ষিত রয়েছে তারাও, সেই সাঁওতাল কোল ওরাওঁ মুণ্ডারাও, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ ধাপটি পর্যন্ত যাবে। বেচারীরা শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করতে পারবে না বলে হয়তো হরিজনত্বের দোহাই দিয়ে ছাত্রবৃত্তির ও চাকরির একটা নির্দিষ্ট ভাগ আদায় করে নেবে। আসল কথা চাকরি এমন জিনিস যে তার প্রতিযোগিতায় হেরে কেউ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। কংগ্রেস করবে, টেররিজম করবে, সাম্প্রদায়িকতা করবে, আরও কী করবে তা ভাবীকাল জানেন।

চাকরি-প্রার্থীদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। ওরা আজ বিশ্ববিদ্যালয় ডিঙিয়ে

যাচ্ছে, কাল যদি বলেন হিমালয়ও ডিঙাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা প্রাণ দিতে যায় তাদের শেষ চিন্তা, কবে মাইনেটি পাব। প্রাণটা যখন একেবারে বেরিয়ে যায় তখন মনে পড়ে, এই সুন্দর পৃথিবীতে আরও কত কী পাবার ছিল। কিন্তু চেয়েছি কেবল নিশ্চিন্ত অন্নভোগ।

কোনো সমস্যার কথা তুললে প্রশ্ন ওঠে, সমাধান কী? এর উত্তর সমস্যার ভিতরেই সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে। যখন ইংরাজের হাতে রাজ্য যায়নি, যখন চাকরি হাজারকরা একজনও চাইত না, লাখকরা একজনও পেত না, তখনও তো আমাদের দিন কেটেছে। জীবনটাই একটা অনিশ্চিত ব্যাপার, একটা নিরুদ্দেশ যাত্রা। খাস ইংরাজের ছেলে খোদ ইংলণ্ডের কলেজে পাস করে যখন চাকরি পায় না তখন সামনে যে কাজ পায় তাতে হাত লাগায়, বসে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করে না। মাছ ধরে, চাষ করে, নৌকা চালায়, দুধ ফিরি করে। আমেরিকার ছেলেরা করে না এমন কর্ম নেই। বেকার হলে ভদ্রত্বের সংস্কারকে তারা ধামাচাপা দেয়। উপার্জন করতে পারলে সেই ধামাটিকে তুলে ফেলে দেয়। কিন্তু আমাদের অন্যান্য সংস্কারের মতো এটিও একটি জুজু। অথচ এ সংস্কার আমাদের সমাজে বহুদিবসাগত নয়। এটা ইংরাজ আমলের। ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাসাগর মশাই স্বহস্তে পাক করে আপনি খেতেন, বাপকে খাওয়াতেন। বামুনের ছেলে গোরু দুইছে, ক্ষেতখামারে গায়ে গা লাগিয়ে ইতরদের সঙ্গে খাটছে, এ দৃশ্য বিরল ছিল না। যাঁরা উত্তরকালে বড় ব্যবসাদার হয়েছেন এমন অনেকে গোড়ার দিকে মোট বয়েছেন, রাস্তায় শুয়ে রাত কাটিয়েছেন এমনও শোনা গেছে। সে অভিমান কোথায় গেল? কোথায় গেল সেই তেজ? কে আজ বাঙালিকে একান্ত অসহায় করেছে? রাস্তায় শোবার কল্পনা কেবল উপন্যাসে দেখি। আহা, কত করুণ এই গরম দেশে আরাম করে বাইরে রাত কাটানো।

সওদাগরী আপিসের কেরানীগিরি, সরকারী চাকুরিতে পেন্সনের ব্যবস্থা, বাংলার বাইরে চাকুরি করে লাল হয়ে দেশে ফেরা এতেই দেশের আবহওয়া বদলে দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে ধ্যান করি চাকরির। না পেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আর কিছু করতে হাত ওঠে না। কোনোগতিকে একটা চাকরি জুটে গেলে নিরুপদ্রব বংশবৃদ্ধি। বাঙালি বৈদ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যা এই পঞ্চাশ বছরে মুসলমানেরই মতো বেড়েছে। ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সালের ভিতরে ব্রাহ্মণ বেড়েছে শতকরা দশজন, আর কায়স্থ বেড়েছে শতকরা বিশ জন, আর বৈদ্য বেড়েছে শতকরা সাত জন, আর মুসলমান বেড়েছে শতকরা নয় জন। অনেক জাতের লোক কায়স্থ বলে নাম লিখিয়েছে, নইলে কায়স্থদের শতকরা বিশজন বৃদ্ধি মানুষে সম্ভব নয়। তারা বহুবিবাহ করে না, তাদের সমাজে পুরুষ সংখ্যার চেয়ে স্ত্রী-সংখ্যাই কম। আমার মনে হয় সত্যিকার কায়স্থদের সংখ্যাবৃদ্ধি বৈদ্যদের মতো। ব্রাহ্মণ বলেও কতক অন্য জাত নাম লিখিয়েছে অনুমান হয়। ব্রাহ্মণের সংখ্যাবৃদ্ধিও বৈদ্যের মতো হওয়া সম্ভব।

শতকরা সাতজন সংখ্যাবৃদ্ধি বড় কম নয়। অন্যান্য সভ্য দেশে, স্বাধীন

দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বাড়বে কি, বরং কমছে। সভ্যতা ও স্বাধীনতা মানে সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। সন্তানই হচ্ছে ভবিষ্যৎ। সভ্য মানুষ ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ভবিষ্যতের উপর ইচ্ছা খাটায়। অসভ্য মানুষ কালস্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। স্বাধীন মানুষ আপনার ভাগ্য আপনি গড়ে। পরাধীন মানুষ গঠনকার্যে ইস্তফা দিয়ে ভারবহন কার্যে বাহাল হয়। ভবিষ্যতের উপর কর্তৃত্ব করতে যারা ভয় পায় তাদের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ।

(১৯০৪)

সাঙ্গা

সেনসাস্ রিপোর্টে দেখা যায় কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সমাজেই নারীর চেয়ে পুরুষ বেশি। প্রত্যেক নারীর যদি বিবাহ হয় তা হলেও দেশে নারীর অভাব থাকে। মুসলমান সমাজ এ অভাব দূর করে, প্রথমত বিবাহযোগ্য বয়সের বিধবাদের বিয়ে দিয়ে, দ্বিতীয়ত হিন্দু সমাজ থেকে উক্ত বয়সের বিধবা সংগ্রহ করে। মুসলমানদের মধ্যে একজনও পুরুষ অবিবাহিত থাকে না, তাদের ফকিররাও সন্ন্যাসী নয়। এছাড়া মুসলমান সমাজ থেকে আর-এক ব্যবস্থা করেছে, এটি আমেরিকান সমাজেরও ব্যবস্থা। আমেরিকাতেও নারীর সংখ্যা কম। ব্যবস্থাটি আর কিছুই নয়, ঘন ঘন তালাক। ফৌজদারী আদালতে প্রায়ই লেগে রয়েছে এই জাতীয় মামলা। জামাই শ্বশুরের নামে নালিশ করে যে শ্বশুর তার বৌকে অন্য লোকের সঙ্গে নিকা দিচ্ছে। কয়েকবার দৌড়োদৌড়ির পর দুই পক্ষে আপোস হয়। এক পক্ষ দেয় তালাক, অন্য পক্ষ দেয় নিকা। পালা করে সকলেই এক-একবার বিয়ে করে। হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরেও এ ব্যাপার আছে। আমি যেখানে বসে লিখছি সেখানে এই প্রথাকে বলে 'সাঙ্গা'।

প্রত্যেক সমাজকেই কোনো-না-কোনো উপায়ে নারীর অভাব দূর করতে হয়। বাংলার প্রত্যেক দশ-বারোখানি গ্রামে অন্তত একটি বড়ো হাট আছে। বিয়ের ভোজে বড়ো মাছ না পাওয়া গেলে কন্যাকর্তা যেমন মাথায় হাত দিয়ে বসেন, তেমনি হাটে বেশ্যা বাস না করলে জমিদারের নায়েব পৃথিবী অন্ধকার দেখেন। তাঁর হাতে যে সব বদমায়েস ও বরকন্দাজ থাকে তারা সহানুভূতিতে গলে যায়। হরণ করে হোক, ফুসলে হোক, যেমন করে হোক একঘর বেশ্যা এনে বসানো চাই।

তারপর দেশের প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক মাসে কোনো-না-কোনো জায়গায় মেলা হয়। মেলাতে যদি বেশ্যা না থাকল তবে তার অঙ্গহানি হলো। জমিদার নায়েব বদমায়েস বরকন্দাজ সকলের একই ভাবনা—মেলা জমবে না। যেমন করে হোক বেশ্যার বন্দোবস্ত করতে হবে। নইলে দেশে গনোরিয়া সিফিলিসের বিস্তার হবে না। যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী সিদ্ধি। মেলায় হাজার হাজার লোক হয়, তারা পয়সা দিয়ে গনোরিয়া সিফিলিস কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরে। এক ডোবায় সুস্থ মানুষের সঙ্গে স্নান করে, এক ধোবাকে দিয়ে কাপড় কাচায়,

এক নাপিতের কাছে ক্ষৌরী হয়, এক বৈঠকে হুঁকো টানে ও এক নিমন্ত্রণে পাশাপাশি বসে খায়। যারা ম্যালেরিয়ায় মরে তারা তো একেবারে যায়; তাদের সন্তানদের ম্যালেরিয়া নাও হতে পারে। কিন্তু যাকে ভদ্র ভাষায় গরমীর ব্যারাম বলা হয় সে ম্যালেরিয়ার চেয়েও মারাত্মক।

বেশ্যাদের মধ্যে একটা প্রথা আছে, তাদের সকলের নামকরণ হয় হিন্দু। মুসলমান মেয়েরাও বেশ্যা হলে হিন্দু নাম নেয়। কারুর নাম হয়তো কমলা। তার বাপের নাম হাবু শেখ। তার আসল নাম ছমিরন। সেন্সাসে এরা হিন্দু না মুসলমান জানিনে। কিন্তু কেন এদের প্রাত্যহিক পরিচয় এমন ছলনাময়? বোধ হয় হিন্দুরা ভাবতে ভালোবাসে যে, তারা যার ঘরে রাত কাটাচ্ছে, মদ ও মাংস খাচ্ছে, তারা ম্লেচ্ছ নয়, যবন নয়। আর মুসলমানদের হিন্দুতেই বোধহয় অধিকতর অভিরুচি। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এদের মক্কেল বেশির ভাগ হিন্দু।

বেশ্যালয়ে যারা যায় তাদের সুমারির রিপোর্ট নেই, তাই জোর করে কিছু বলা যায় না। তবু উপরে যা লিখেছি তার থেকে অনুমান হয় নারীর অভাব দূর করার যতগুলো উপায় আছে তার মধ্যে এই যে একটি উপায়—এই যে একজনকে দিয়ে দশজনের সেবা—হিন্দুসমাজ একে একটি উত্তম উপায় বলে গণ্য করেছে। দেশে বেশ্যা না থাকলে অন্যান্য সমাজের উপায়ান্তর আছে, হিন্দুর তেমন কিছু নেই। এক রয়েছে ব্রহ্মচর্য। আমি ব্রহ্মচর্যওয়ালাদের জন্য লিখছিনে। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে প্রকৃতি যে ব্যবস্থা করেছে সেই ব্যবস্থা উল্টে দিতে যাঁরা চান তাঁরা প্রকৃতিঠাকুরাণীর দেবর সম্পর্কীয়, তাঁরা পরিহাসের পাত্র।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক দুঃখে বিধবাবিবাহের বিধান দিলেন। তাঁর বীরত্বকে আমরা শ্রদ্ধা করলুম, তাঁর বিধানকে করলুম অগ্রাহ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তো উপহাসই করলেন। চলে গেল অর্ধশতাব্দী। গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক বছর অনেকগুলি বিধবা হয় মুসলমান নয় বেশ্যা হয়ে গেল। তার চেয়ে অনেক বেশি বিধবা রক্ষিতারূপে সমাজের ভিতরে রইল, অন্তঃসত্ত্বা হলো, যারা হিন্দুসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারত তাদের ভ্রূণ অবস্থায় হত্যা করল।

যে সমাজে নারীর অভাব সে সমাজে নারীর এ অপচয় কেন?

এ বিষয়ে একটু তলিয়ে ভাবা ভালো। যারা বিধবার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করছে তারা অধিকাংশ স্থলে বিধবার থেকে অন্য জাত ও উচ্চ জাত। অল্প স্থলেই বিধবার স্বজাত।

অধিকাংশ স্থলের কথা আগে হোক। বিদ্যাসাগর মহাশয় অসবর্ণ বিবাহ কল্পনায় আনেননি। সাধারণ হিন্দু ভিন্ন জাতের সঙ্গে বৈবাহিক আদানপ্রদানের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে। হিন্দুসমাজে যতগুলি জাত আছে সবগুলি যদি সমান মর্যাদা পেত তবে সে ছিল সম্ভবপর। কিন্তু হিন্দুসমাজের এক-একটি জাত যেন এক-একটি ধাপ। কে উচ্চ কে নীচ এই নিয়ে তারা এখনো উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। একজন নাপিত যদি একজন তেলীর বিধবাকে বিয়ে করে তবে দুজনের হাঁড়ি

এক করতে হবে। শ্বশুর শাশুড়ী খাবে সেই হাঁড়ির ভাত। এতে নাপিতনন্দন সপরিবারে জাতিচ্যুত হয়ে তেলীদের কাছে আশ্রয় চাইবে। তারা দেবে ভাগিয়ে। সন্তান হলে সেটির জাত কী হবে? সেটির অন্নপ্রাশনে কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে? বিয়ের সময় হলে কোন্ জাতে তার বিয়ে হবে? সে যদি পিণ্ড দেয় তবে নাপিতের আত্মা কি সে পিণ্ড গ্রহণ করতে পারে?

বিধবাগমনে যে পাপ তার ক্ষালন আছে। নইলে অত কষ্ট করে ভগীরথ কেন মা গঙ্গাকে আনলেন? কিন্তু বিধবা যদি অন্য জাতের হয় তবে তাকে বিয়ে করে ইহলোকে জাত ও পরলোকে স্বর্গ দুই মহামূল্য বস্তু কোন্ মূঢ় হারাবে! যতদিন জাতিভেদ থাকবে ততদিন অন্য জাতের বিধবাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে, তার গর্ভাধান করতে, তার গর্ভস্থ ভ্রূণকে হত্যা করতে পুরুষসিংহরা প্রস্তুত। জাতিভেদ যে যাবে তার কোনো লক্ষণ নেই। এ তো বড় অন্যায়! বিধবাবিবাহ চালাতে হবে বলে জাতিভেদ তুলে দিতে হবে!

তারপর অল্প স্থলের কথা। যে অল্প স্থলে বিধবা ও তার রক্ষক দুই পক্ষই এক জাতের সে স্থলে বিধবাবিবাহ ধীরে ধীরে চলছে। সেও এতটা কুণ্ঠার সহিত যে তাতে সমাজদেহে স্পন্দন জাগছে না। যারা খবরের কাগজ পড়ে না তারা অর্থাৎ দেশের নিরক্ষর সাধারণ তার খবর রাখে না। এদের মধ্যে প্রচার কার্যের আয়োজন নেই। গ্রামে গ্রামে প্রচারক পাঠালে ও দৃষ্টান্ত দেখালে লোকে বিধবাবিবাহ করুক না করুক, করা যে নিষিদ্ধ নয় সেটুকু জানবে।

এহো বাহ্য। আরো তলিয়ে দেখতে হবে। ধরা যাক যে আন্দোলনের ফলে বিধবাবিবাহ করতে পাঁচখানি গ্রামের একশ জন পাত্রের ইচ্ছা হলো। এদের জন্যে দশখানা গ্রাম খুঁজে পাত্রীও হয়তো একশ জন পাওয়া গেল, যদিও স্ত্রী-সংখ্যা কম বলে ততগুলি পাওয়া কঠিন। কিন্তু এই পাত্রীদের অনেকের আগের পক্ষের একটি কি দুটি সন্তান আছে। মুসলমান সমাজে এমন মেয়ের বিয়ে অহরহ হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সমাজে একশত জন পাত্রের নিরানব্বই জন বেঁকে বসবে। রামো রামঃ। সবৎসা ধেনু। অথচ বিবাহ না হয়ে ওটা যদি হতো সমাজসম্মত রক্ষণা-বেক্ষণ তা হলে সকলেই রক্ষিতার ছেলেকে আপনার ছেলের চেয়ে আদর করত।

আরো একটু কথা আছে, বিধবা যেক্ষেত্রে নিঃসন্তানা ও স্বজাতীয়া সেক্ষেত্রেও পাত্রের মনটা কেমন করে ওঠে। সে অক্ষতযোনি না হলে তাকে বিয়ে করি কী করে? রক্ষণাবেক্ষণ অবশ্য অন্য জিনিস। কিন্তু বিবাহ! সে যে কী মহান, কী স্বর্গীয়! স্বামীর সঙ্গে দশ বৎসর বাস করার পর পঁচিশ বৎসর বয়সে যে নারী বিধবা হয়েছে তার যদি সন্তান না হয়ে থাকে ও রূপ গুণ অশেষ থাকে তবু তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাবে কয়জন সংস্কারক দুশো বার মাথা না চুলকাবেন? হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ তা তা তা তা ইদ্যাদি ছাড়া অন্য কথা বলবেন কি?

সমাজসংস্কার কখনো মুখে-এক-মনে-আরেক-ওয়ালাদের দ্বারা হয় না। গোটাকতক বিধবা-আশ্রম খুলে তাতে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেওয়া সোজা। তেমন ব্রহ্মচারিণীদের নিরানন্দ জীবন, তাদের কয়েদখানার আশাহীন দিনযাপন যাদের চোখে পড়েছে তাঁদের চোখ থেকে আগুন ছুটেছে। তবে তাঁদের সান্ত্বনা

এই যে, সধবার জীবনও সব সময় সুখের নয়। শ্বাশুরিক নির্যাতন ব্রহ্মচর্যের চেয়ে ভয়াবহ।

হিন্দু সমাজের আর-একটি উপায় আছে নারীর অভাব দূরীকরণের। এইটিই সেরা উপায়। এ থাকতে বিধবাবিবাহের কী প্রয়োজন?

নারীর অভাব হলে পঁচিশ ত্রিশ বছর বয়সের পুরুষ নয় দশ বছর বয়সের শিশু বিবাহ করছে, হরবিলাস শারদাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। এটা অবশ্য ছোট জাতের মধ্যে। ভদ্র যাঁরা তাঁরা করছেন অপেক্ষা, যতদিন না সেই নয় দশ বছরের মেয়ে তের চোদ্দ বছরের হয়। ততদিনে পাত্রের বয়স পঁয়ত্রিশ হলে ক্ষতি নেই। বয়সের ব্যবধান যে ক্রমে বেড়েই চলেছে তা কি কেউ লক্ষ্য করেননি? নারীর অভাব জীবনের শেষের দিকে না থাকলেই অনেকে সন্তুষ্ট, যৌবনকাল যেমনভাবেই কাটুক। এই হারে যদি বয়সের ব্যবধান বাড়তেই থাকে তবে পঁয়ত্রিশ বছরেও অনেকের বিয়ে হবে না, অপেক্ষা করতে হবে যতদিন না স্ত্রী-শিশু জন্মায়, হামাগুড়ি দেয়, হাঁটে, কথা বলে, ক্রমে চোদ্দ বছরের হয়। ততদিনে পুরুষের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এ এক মন্দ তামাসা নয়। সমাজের নিম্নস্তরে কেউ কেউ গুটি দুই-তিন রক্ষিতা পর পর বিদায় করে পরিশেষে তার স্বজাতে নারী জন্মালে, হামাগুড়ি টানলে, আট নয় বছর বয়সে পা দিলে, তখন করে বিবাহ।

বেকার সমস্যা ভদ্রশ্রেণীর বিয়ের বয়স পেছিয়ে দিচ্ছে। নিম্ন শ্রেণীতে বেকার সমস্যা নেই। যা আছে তার নাম উপার্জন-হ্রাস। তার দরুন তাদের বিয়ে আটকায় না। বিয়ে আটকায় নারীর অভাবে। বলা বাহুল্য স্বজাতের নারী। কোনো-কোনো জাতে নারীস্বাচ্ছল্য আছে। একসঙ্গে বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হলে যেসব নারী রক্ষিতা হয় তারা বিবাহিতা হতো, কতগুলো ভ্রূণ প্রাণে বাঁচত, সমগ্র সমাজে কতকপরিমাণে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যাসাম্য ও বয়ঃসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতো। সবৎসা ধেনু ও বিক্ষতযোনির স্বপক্ষেও প্রচারকার্য প্রয়োজন। নতুবা এরা রক্ষিতা হতে থাকবে, বিবাহিতা হবে না।

একে তো নারী কম, উপরন্তু কুমারী মেয়ের প্রতি কি অপত্নীক কি বিপত্নীক উভয়প্রকার পাত্রের দৃষ্টি। শারদা আইন নিম্ন শ্রেণীতে আর কেউ মানে না। মানতে পারে না। কন্যা জন্মানোর আগে তার জন্যে উমেদার উপস্থিত। তার চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত কে ধৈর্য ধরবে? তাগিদের পর তাগিদ। বায়নার পর বায়না। বিয়ে না দিয়ে রক্ষা আছে? শেষকালে কিডন্যাপিং হবে যে।

(১৯৩৪)

কলকাতা

ছেলেবেলায় কলকাতা দেখিনি। তার স্বপ্ন দেখেছি। রেলপথে বেশী দূরে নয়, মানসপথে মানস সরোবরের মতো সুদূরে। যখন কেউ এসে বলত, 'কলকাতা দেখে এলুম' তখন সেই ভাগ্যবানের প্রতি ভক্তি বোধ করতুম। যখন শুনতুম কেউ বলছে, 'আমরা কলকাতার লোক', তখন তার আভিজাত্যের কাছে মাথা যেন আপনি নুয়ে পড়ত। 'আমরা কলকাতার লোক।' আহা! স্বর্গের লোক।

প্রথম যেদিন কলকাতা দেখি সেদিন প্রথমদর্শনে প্রণয় নয়। নৈরাশ্য। এমন উদাসীন নগরী বা নাগরী আমি কল্পনা করিনি। এক মাস পরে যখন বিদায় নিলুম সে আমার 'স্বর্গ হইতে বিদায়'। কবির ভাষায়—

"থাকো স্বর্গে হাস্যমুখে, করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। হে অপ্সরা,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক ম্লান, লইনু বিদায়।
তুমি কারে করো না প্রার্থনা, কারো তরে
নাহি শোক।"

এর পরে বহুবার স্বর্গে গেছি, কিন্তু স্বর্গীয় হইনি। যতবার গেছি, স্বর্গের আকর্ষণে নয়, স্বর্গত বয়স্যজনের সঙ্গে রসালাপ করতে। এক জায়গায় এতগুলি বন্ধুকে পাই বলেই কলকাতা যাই, তাঁদেরও খরচ বাঁচে, আমারও সময়। বন্ধু-মূল্যেই কলকাতা আমার কাছে অমূল্য।

সেই কলকাতার উপর অবশেষে বোমা পড়ল। দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের বিবাদ পুরাণে প্রসিদ্ধ। স্বর্গের উপর তাদের আক্রোশ আছে। না থাকবেই বা কেন? দেবাদিদেবরা যে পুষ্পক বিমানে চড়ে হানা দিয়ে আসছেন। দেবাসুরের সংগ্রামে নিরীহ উপদেবতাগুলির যা দুঃখ, ইন্দ্র-চন্দ্রের মিত্রাবরুণের ভ্রূক্ষেপ নেই। সুতরাং 'ইহাই নিয়ম'। এইরকমই চলবে। কলকাতার বন্ধুরাও এটাকে নিয়তি বলে মেনে নিয়েছেন।

ইতিমধ্যে দেশের অনেক অংশ দেখা হয়েছে। যে-কারণে বোমা খেয়েও কলকাতার লোক গ্রামে আশ্রয় নেয় না তার কারণটা প্রত্যক্ষ দেখেছি।

পেটে খেলে পিঠে সয়, তাই কলকাতার লোক পিঠে সইছে। কিন্তু গ্রামের লোক পেটে খায় না, খেতে পায় না। গ্রামে অন্ন জন্মায়, কিন্তু থাকে না, চালান যায়। গ্রামের লোক ধরে রাখতে পারে না, তাদের ক্রয়শক্তি নেই। ক্রয়শক্তি বা পারচেজিং পাওয়ার গ্রামের হাত থেকে শহরের হাতে চলে গেছে, যেমন ভারতের হাত থেকে ইংলন্ডের হাতে। আধুনিক যুগে বাহুবল একটা বড়ো বল, সন্দেহ নেই। কিন্তু ধনবল তার চেয়েও বড়ো। ধনবল আছে বলেই ইংরেজ এতগুলি সৈন্যসামন্ত পুষে রণবলে বলী হয়েছে। জাপানী তার জনবল দিয়ে ধনবলই খুঁজছে, তাই যুঝছে। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধটা ক্রয়শক্তি নিয়ে। যে জিতবে তার ক্রয়শক্তি বেশী হবে।

কলকাতার ক্রয়শক্তি সারা বাংলাদেশের খোরাক টেনে আনছে গ্রাম থেকে শহরে। খোরাক বলতে শুধু মাছ ভাত নয়। এক কথায় বলতে গেলে, জীবিকা। বিশ বছর আগেও গ্রামে জীবিকা জুটত। এখন জোটে না। জীবিকার জন্যে মানুষকে শহরে যেতে হয়। শহরে যারা যায় তারা ফিরতে চায় না, সেইখানেই সংসার উঠিয়ে নেয়। কলকাতার কয়েকটি ক্ষুদে সংস্করণ তৈরী হয়েছে। এগুলিও মনে-প্রাণে কলকাতা, যদিও নামে হাওড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম। দেশের ক্রয়শক্তি এক-একটি কেন্দ্রে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। দেশের প্রাণশক্তিও এক-একটি অঙ্গে অতিস্ফীতি ঘটাচ্ছে।

এইসব বিস্ফোটকের উপর বিস্ফোরক নামলে হায় হায় করা বৃথা। প্রকৃতি এইভাবেই তাঁর ভ্রম সংশোধন করেন। কিন্তু শুধুমাত্র বিনাশে কী হবে, যদি নবসৃষ্টির কল্পনা না থাকে? একবার রেলপথে যেতে যেতে দেখলুম একখানা গ্রাম বেবাক পুড়ে গেছে। আশা হলো এবার লোকে ঠেকে শিখবে, গায়ে গায়ে কুঁড়েঘর তুলবে না, বাড়ী বানাবে দূরে দূরে। মাস কয়েক পরে সেই পথ দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ল গ্রামখানি পুড়বার আগে যেমনটি ছিল, পরে তেমনটি গড়ে উঠেছে। খোঁজ নিয়ে জানলুম বেচারিদের অন্য কোথাও জমি নেই, যে যার বাস্তুভিটায় অর্থাভাবে চালাঘর তৈরী করেছে। আবার পুড়বে। পুড়লই বা, আবার গড়বে।

সুতরাং কলকাতা যদি ধ্বংস হয় তবে গ্রামের ক্রয়শক্তি গ্রামে ফিরবে না। কলকাতার ধ্বংসের উপর কলকাতা নির্মিত হবে, প্রকৃতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। পল্লীর জন্যেই হায় হায় করব। নগরীর জন্যে নয়।

(১৯৪৩)

জীবনশিল্পী

প্রবন্ধ সমগ্র—৬

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

এমন অনেক শিল্পীর কথা আমরা জানি যাঁদের হাতের ছোঁয়া লেগে পাষাণ হয়েছে অহল্যার মতো শাপমুক্তা সুন্দরী, কিন্তু যাঁদের নিজেদের জীবনের বেলায় তাঁদের শিল্পিত্ব খাটেনি। সে-ক্ষেত্রে তাঁরা অবস্থার দাস এবং তাঁদের জীবনের আদর্শও দুর্বল। অথচ শিল্পী নন এমন কোনো কোনো মানুষের জীবন এক-একখানি শিল্পসৃষ্টির মতো সযত্নরচিত, সুসংগত, অবান্তরতা-বিহীন।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো করে তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন। সেটি বেশ একটি গোটা জিনিস হয়েছে, ভাঙা ভাঙা বা অসম্বন্ধ হয়নি, অন্তর্বিরোধসম্পন্ন বা অসংগতি-বহুল হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর জীবন। তাঁর অন্যান্য কীর্তি বিস্মৃত হয়ে যাবার পরও তাঁর এই কীর্তিটি জীবিত মানুষের আন্তরিকম যে জিজ্ঞাসা—"কেমন ভাবে বাঁচব?"—সেই জিজ্ঞাসার একটি সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর হয়ে চিরস্মরণীয় হবে।

দেশের অতি বড়ো দুর্গতির দিনে যখন পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শকে লোকে যুগপৎ উপহাস ভয় ও সন্দেহ করছে তখন রামমোহন রায়ের জন্ম। এই মহাপুরুষ শাশ্বত ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করে তাকে একটি বৃহত্তর পরিধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন দেশকালের অতীত হয়ে বাঁচবার দৃষ্টান্ত। আধুনিক ভারতবর্ষের জনক-ঋষি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জনক। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন ঋষি-দৃষ্টি ও মহত্ত্বের প্রতি নিয়ত আকাঙ্ক্ষা। ঠাকুর পরিবারে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক পৃথিবীর সমন্বয় ঘটেছিল। যৌবনারম্ভে মহর্ষি উপনিষদের পৃষ্ঠা কুড়িয়ে পান ও মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তাঁকে Geologyর গ্রন্থ পড়তে দেখা গেছল। এই দুটি ঘটনা থেকে ঠাকুর পরিবারের আবহাওয়া অনুমান করা যায়। ধর্মে ও কর্মে, ত্যাগে ও ভোগে, কলায় ও বিদ্যায়, স্বাজাত্যে ও বিশ্বমানসিকতায় ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল। স্কুল-কলেজের অপেক্ষা রাখেনি। এই পরিবারের কাছে ও মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা।

স্কুল-যন্ত্রের কবল থেকে অক্ষত দেহ মন নিয়ে বেরোতে পারা রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিধর ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব হতো। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, রুটিন ও এগ্‌জামিনের যুগল হস্তের ঘন ঘন চপেটাঘাতে কল্পনাবৃত্তি অসাড় হয়ে যায় ও পাঠ্যপুস্তকে নিবদ্ধ হয়ে পর্যবেক্ষণশক্তি হয় আড়ষ্ট। পাছে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও তার ফলে বিক্ষেপ জাত হয় তার দরুন স্কুল-ঘরের চার-দিকে চার দেওয়াল প্রহরীর মতো খাড়া। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। রবীন্দ্রনাথ স্কুল পালিয়ে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। আজও সে-দায়িত্ব ঢিলে দেননি। তাঁর মতো বহুবিদ্য ব্যক্তি যে-কোনো দেশে বিরল। কিন্তু অধীত

বিদ্যা প্রচার করার চেয়ে বিদ্যার সৌরভ বিকিরণ করাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে রসায়িত করে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন, তা নিয়ে থীসিস লেখেননি। তাঁর লঘুতম রচনাতেও মার্জিত বুদ্ধির যে-দীপ্তি দেখতে পাই সে-দীপ্তি অশিক্ষিতপটুত্বের নিদর্শন নয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমাদের একটা ভ্রান্তি আছে—তাঁরা বিনা সাধনায় সাফল্য লাভ করেন, যেহেতু তাঁরা দৈবশক্তিসম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথ ডায়েরী রাখেননি, কিন্তু তাঁর 'ছিন্নপত্র' থেকে জানি তিনি যেমন সব্যসাচী লেখক তেমনি সর্বভুক পাঠক এবং তাঁর পর্যবেক্ষণশীলতা ও কল্পনাকুশলতা কি প্রকৃতির সংসার, কি মানবের সংসার, উভয়ের অন্তরবাহির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করেছে।

স্কুল-কলেজে না গেলে ভদ্র সমাজে এক-ঘরে হতে হয় এবং জীবিকা সম্বন্ধে অতি বড়ো ধনী সন্তানেরও ভয় থাকে। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে স্কুল ত্যাগ করে তাঁর নিজের দিক থেকে ঠিক করলেও অন্য সকলে নিশ্চয়ই তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন ও তিনি ভুল করলেন বলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। জীবনশিল্পী এমনি করেই নিজের পরিচয় দেন। পশুপক্ষীর ইনস্টিংক্টের মতো শিল্পীপ্রকৃতি মানুষের মধ্যেও ইনটুইশনের ক্রিয়া অমোঘ। কোন্ পথে মহতী বিনষ্টি তা ওঁরা লাভ-লোকসান তোল না করে যুক্তিতর্কের মধ্যে না নেমে আপনার অপ্রবৃত্তি থেকেই উপলব্ধি করেন এবং আত্মহত্যার পথকে সমগ্র শক্তির সহিত পরিহার করেন।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনোদ্গমে বিলাত-যাত্রা তাঁর স্কুল পরিত্যাগেরই মতো একটি অর্থপূর্ণ ব্যাপার। তখনো আমাদের সমাজে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ও অপ্রচলিত ছিল। অথচ বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় কেবলমাত্র বিদেশী গ্রন্থ-পাঠের দ্বারা হবার নয়। পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো না, এর মতো দুঃখের কথা অল্পই আছে। বিশেষত যে-মানুষকে একদিন মানবমাত্রের বন্ধু হতে হবে, প্রতিভূ হতে হবে, মানব সম্বন্ধে তুলনামূলক জ্ঞান তাঁর সাধনার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করবার পূর্বে স্বদেশের সঙ্গে বিদেশকে ও নিকটের সঙ্গে দূরকে মিলিয়ে দেখা, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় মহাদেশের বহুকালীন আদর্শ। তার ফলে মাত্রাজ্ঞান জন্মায়, অহংকার ও মোহ কিছু কমে এবং নিজের ও পরের মাঝখানকার সত্যকার সীমারেখাটি আবিষ্কৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শোনা গেছে যে, তিনি জমিদার হিসাবেও বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ জমিদার হবার দরুন তাঁর বাণী তিক্ত, উদ্ধত বা বিষয়ীসুলভ হয়নি। পরন্তু বিচক্ষণ জমিদার হবার দরুন তাঁর রচনা রুগ্ন আদর্শবাদ ও গলদশ্রু ভাবালুতা থেকে মুক্ত। পরোপকার করতে চাইলেও করা উচিত নয়, যদি তার ফলে পরের আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা হয় বিড়ম্বিত। আমাদের দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, কাঙালীভোজন ইত্যাদি আদর্শ এমন অস্বাস্থ্যকর যে, যথার্থ করুণা ও লোকপ্রীতির পৌরুষ তাতে নেই।

প্রাচীন ভারতবর্ষের গার্হস্থ্যের আদর্শই হচ্ছে সর্ব দেশের সর্ব কালের

পূর্ণবয়স্ক মানুষের আদর্শ। তার মধ্যে ভোগ ও ত্যাগ, আনন্দ ও সংযম পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। কেবল বিপন্নকে অভয়দান ও আতুরের সেবা নয়, অন্যায়কারীকে আঘাত ও অশিষ্টকে শাসনও তার অন্তর্গত। বিষয়সম্পত্তিকে উক্ত আদর্শ বিষের মতো পরিহার করতে বলেনি, বৃদ্ধি করতে রক্ষা করতে ও বিজ্ঞের মতো ব্যবহার করতে বলেছে। এই সম্পূর্ণতার আদর্শ সেকালে তথা একালে বহু মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই সেকালে লোকে সন্ন্যাসী হয়ে যেত, একালে সোশ্যাল সার্ভিস নিয়ে মাতে। বিচিত্র সংসারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্তব্যগুলোর প্রত্যেকটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাতে চরিত্রের প্রতি অঙ্গের চালনা হয়। এই চালনাই স্বাস্থ্যকর। দুনিয়ার দুঃখদৈন্য দূর হলো কি-না সেটা ভাবতে যাওয়া অস্বাস্থ্যকর।

রবীন্দ্রনাথের গৃহস্থাশ্রমের দৃশ্য আমরা তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পত্র-বিনিময়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই। ক্রমে ক্রমে যখন অন্যান্য চিঠিপত্রের বাতায়ন-দ্বার মুক্ত হবে তখন পূর্ণ দৃশ্যটি উদ্ঘাটিত হবে। সেটির এটা-ওটা করে অনেক রেখা ও রঙ আমাদের অপছন্দ হলেও আমাদের কাছে সমগ্র চিত্রখানির মূল্য কমবে না। রবীন্দ্রনাথ কাঁচা বা পাকা যা-কিছু লিখেছেন, হাতের লেখার দিক থেকে প্রত্যেকটি সুন্দর এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রত্যেকটি স্বকীয়। এর থেকে অনুমান হয় যে, তুচ্ছ বা মহৎ কোনো কাজই তাঁর পক্ষে হেলাফেলার যোগ্য নয় এবং তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি সর্বমুহূর্তে সতর্ক থাকে পাছে তাঁর বহিঃপ্রকৃতিতে কিছুমাত্র কুশ্রীলতা বা মামুলিয়ানা প্রকটিত হয়ে পড়ে।

একালের মানুষ দিন দিন পল্লীকে ছেড়ে নগরে জুটছে। নগরের প্রধান আকর্ষণ তার নিত্য নতুন চমক, নিত্য নতুন খবর, নিত্য নতুন শিক্ষা, নিত্য নতুন সঙ্গ। এ আকর্ষণকে উপেক্ষা করা যায় না। কত অঞ্চলের কত দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। তাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের অভ্যস্ত আচার ও মনগড়া বিচারকে আমরা আর-একটু উদার করি। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র চরিতার্থ-তার জন্যে পল্লীই ছিল ভালো এবং পল্লীতে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা-নদী-পর্বতের বৃহত্তর সমাজে ছিলুম। নগর যেমন নিত্য নতুন, পল্লী তেমনি চিরন্তন। দুটোই সত্য এবং দুটোকে জড়িয়েই সত্য। রবীন্দ্রনাথ পল্লীর প্রতি পক্ষপাত করলেও নগরকে বর্জন করলেন না। প্রকৃতির সুধা ও জনসংঘাত-মদিরা পান করে তিনি উভয় সত্যের স্বাদ গ্রহণ করলেন। পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসের দিনগুলি আধুনিক যুগের নাগরিক মানুষের কাছে কেমন রোমান্সের মতো লাগে। অতটা নির্জনতা আমাদের সয় না। তাতে আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্নিমান্দ্যের সূচনা করছে। পল্লী ও নগর উভয়কে উপভোগ করতে পারা চাই। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়া উপভোগ করা নয়। একান্তভাবে সভ্য ও আধুনিক হতে গিয়ে যা সৃষ্টি করব তা আধুনিকতার মতো অচিরস্থায়ী ও সভ্যতার মতো অগভীর হবে। অবিমিশ্র নাগরিক অভিজ্ঞতার উপদ্রব আমরা সাহিত্যে পোহাচ্ছি। চিড়িয়াখানায় গিয়ে জীবচরিত্র অধ্যয়ন করার মতো নগর থেকে কি মানবচরিত্র, কি বিশ্বব্যাপার,

কোনোটার ঠিকমতো নিরিখ হয় না। বাস্তব বলে যাকে চালাই সেটা একটা বিশেষ অবস্থায় বাস্তব। বদ্ধ ঘরে প্রতিধ্বনির মতো জীবনের হাহাকারকে নগর অতিরঞ্জিত করে। জীবনের দুঃখদৈন্যগুলোকে অপরিমিত কালের পটভূমিকায় প্রসারিত করলে তাদের সত্যিকারের পরিমাণ উপলব্ধি করি এবং মানুষের সংসারকে অপরিমিত প্রাণলোকের অধিকারভুক্ত বলে জানলে যা নিয়ে উত্তেজিত পীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করছি তার দিকে সুদূরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আনন্দ পাই।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের দিনগুলি অল্প পরিসরের মধ্যে সত্য ছিল, সম্পূর্ণ ছিল। সাংসারিক উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিল না এবং সাহিত্য তাঁকে দেশের সর্বত্র পরিচিত করলেও দেশের কর্মপ্রবাহ থেকে তিনি দূরেই ছিলেন। হঠাৎ একদিন দেশে নবযুগের প্রাণস্পন্দন এল, সে যে কী অপূর্ব জন্মলক্ষণ 'ঘরে-বাইরে'তে তার বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিভৃত সাধনা ছেড়ে সকলের সঙ্গে যোগ দিলেন। বৃহৎ সংসারের প্রতি কর্তব্য একদিন-না-একদিন করতেই হবে—দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি। কিন্তু সেই কর্তব্য যার প্রতি, সে যে পরিমাণে বৃহৎ, কর্তব্যের পূর্বাঙ্গের সাধনাও যেন সেই পরিমাণে বিপুল হয়। দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কেবলমাত্র পণ্যনিবদ্ধ ছিল না, দেশের ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের মতো তাঁরও অনুরাগের সামগ্রী ছিল। দেশের শিল্পদ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা এঁরা স্বদেশী আন্দোলনের চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই করে আসছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি জনকয়েক মিলে একটি স্বদেশী বস্ত্রের দোকানও খুলেছিলেন। দেশে জন্মেছি বলে দেশ আমার নয়, দেশকে নিজের তনু-মন দিয়ে সৃষ্টি করেছি বলে দেশ আমার, পেট্রিয়টিজ্‌মের এই সূত্রটি দেশকে রবীন্দ্রনাথ ধরিয়ে দিলেন। দেশ এর মর্যাদা তখন বুঝল না, এতদিন পরে আজ বুঝছে।

দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে আধুনিক কালের উপযুক্ত করে দেশকে একদিক থেকে সৃষ্টি করার ব্রত নিলেন তিনি নিজে। এই উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা। আধুনিক কালে 'আশ্রম' কথাটির অর্থ বদলে গেছে। এখন আমরা 'আশ্রম' বলতে সাধনাপীঠ বুঝে থাকি। যথা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম প্রাচীন অর্থের আশ্রম অর্থাৎ অবস্থা। রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্যাশ্রম ও তাঁর শিষ্যগণের ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরস্পরের পরিপূরকতা করল। এর আরম্ভ অতি সামান্য আকারে। এর দ্বারা রাতারাতি দেশের দুঃখমোচনের আশা ছিল না। নিরক্ষরতা দলন নয়, অর্থকরী বিদ্যাবিস্তার নয়, জনসেবা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। জীবনের সর্বাঙ্গীণতার প্রতি দৃষ্টি রেখে জীবনের প্রথম অঙ্গের অনুশীলন, পরিপূর্ণরূপে বালক হওয়া। আজ যারা পরিপূর্ণ-রূপে ফুল হতে পেরেছে তারাই কাল পরিপূর্ণরূপে ফল হতে পারে, অপরে নয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমী বালকের দেহ-মনকে নানাদিকে স্ফূর্তি দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ খেলা, অভিনয়, গান ও উপাসনা এগুলিকে বিদ্যাশিক্ষার মতোই প্রয়োজনীয় বলে গোড়া থেকেই জেনেছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা বা নীতিশিক্ষাকে স্ফীত হতে

দেননি এবং অপরগুলিকে ওর কোনোটার বাহন করেননি। বিদ্যার্জনই বালকের একমাত্র বা প্রধান করণীয়, সভ্যসমাজ থেকে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার যদি কোনো দিন ঘোচে তবে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশ ও জগৎ আর-একটু ভালো করে বুঝবে।

অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক প্রিয়জনের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের দারুণ দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই করুণ অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ অপচিত হতে দেননি। তাঁর 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি' এই বেদনার রূপান্তর। তাঁর জীবন ও তাঁর কাব্য যেন এমন একটা পরিণতির প্রতীক্ষা করছিল। ফলের পক্বতার পক্ষে প্রখর রৌদ্রের প্রয়োজন ছিল। তাঁর মধ্যে কারুণ্যের সঞ্চার না হলে তিনি সকলের সব কালের কবি ও প্রতিভূ হতে পারতেন না। প্রিয়-বিয়োগের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়ত্বকে একান্ত mystic-ভাবাপন্ন করলে। তিনি ভগবানের মধ্যে হারানো প্রিয়দের সঙ্গ পেলেন, তাই ভগবান হলেন তাঁর প্রিয়তম। যিনি এতদিন পিতা ছিলেন, তিনি হলেন সখা ও প্রেমিক। 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' রচিত হলো।

অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হন। ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ নেই। রোগশয্যাবিনোদনের জন্যে কয়েকটি বাংলা রচনার ইংরেজী তর্জমা করেছিলেন, সেগুলি কী মনে করে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইরিশ কবি ইয়েট্‌সকে পড়তে দেন। একদা যেমন দুর্ঘটনার ভিড় জমেছিল একদিন তেমনি যশ, অর্থ ও সম্মান বন্যার মতো দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে এল। দুঃখের সময় যিনি অভিভূত হননি সুখের দিনেও তিনি অভিভূত হলেন না। বঙ্গের কবি বিশ্বের অর্ঘ্য সহজভাবে নিলেন। ছিন্নভিন্ন পরাধীন দীনদরিদ্র দেশের মানুষ সাধনা করেছিলেন দিগ্বিজয়ীর মতো, আরম্ভ করেছিলেন রাজকীয় ধরনে। হাতে রেখে দান করেননি, হাতে-হাতে ফল চাননি। যাঁর অধিক মূলধনের কারবার, তাঁর বিরাট ক্ষতি, বিরাট লাভ, তাঁর লাভের জন্যে ত্বরা নেই। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ও ব্যাপক যোগাযোগ, মানুষের গভীরতম চরিত্রে আস্থা, ভগবানের কল্যাণবিধানে সংশয়হীন বিশ্বাস, সৌন্দর্যের রসায়নে ব্যবহারিক জীবনকেও রসায়িত করা—এতগুলো বড়ো বড়ো জিনিস কি ছোট একটি দেশে আবদ্ধ থাকতে পারত? দু দিন আগে না হলে দু দিন পরে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ত। তারপর রবীন্দ্রনাথ চিরদিন up-to-date বিশ্ব-সাহিত্য তাঁর ভালো করে জানা, বিশ্বের আধুনিকতম ভাবনাগুলো তাঁরও ভাবনা। বাংলা দেশের পদ্মা নদীতে নৌকাবাস করবার সময় তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলেই বাস করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত হবার পর থেকে তাঁর দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। বৃহত্তর মানবসংসারের ব্যাপারে তাঁর ডাক পড়ল। গত মহাযুদ্ধের বিনষ্টির ক্ষণে Nationalism সম্বন্ধে তাঁর নির্ভীক উক্তি তাঁকে তখনকার মতো অপ্রিয় করলেও আজ সভ্যজগতের বহু মনীষী ব্যক্তি তাঁরই মতে মত মিলিয়েছেন। মানুষের নতুন ভবিষ্যতের তিনি অন্যতম স্রষ্টা, সেই ভবিষ্যতের প্রতি বাৎসল্য

তাঁর স্বদেশবাৎসল্যকেও ছাড়িয়ে যায়, তাই তাঁকে আমরা ভারতবর্ষের নেশন্ হওয়ার দিনে পাচ্ছিনে। কিন্তু যখনি ধর্ম আমাদের পক্ষে, তখনি তিনি আমাদের পক্ষে। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদ করতে তিনি মুহূর্তমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি।

মহাযুদ্ধের পর ইউরোপখণ্ডে লীগ্ অফ্ নেশন্স্-এর প্রতিষ্ঠায় Nationalism-এর জড় মরল না। যা যেমন ছিল তা প্রায় তেমনি থাকল। মানুষের চরিত্রে যা শ্রেষ্ঠ, তা নিয়ে নেশনও নয়, লীগ্ অফ্ নেশন্স্ও নয়। স্বার্থের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে মিলন সত্যকার হতে পারে না। হাট-বাজারকে আমরা মিলনস্থলী বলিনে। মানুষ যেখানে জ্ঞানবিনিময়, প্রীতিবিনিময় করে, সেইখানে তার মিলনতীর্থ। রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার বে-সরকারী লীগ স্থাপন করলেন, অফ্ নেশন্স্ নয়—অফ্ কাল্চারস্। তাঁর বিশ্বভারতী বিশ্বের সকলের ভারতী। মহাযুদ্ধের মহাপ্রলয়ের পর এই একটি সৃষ্টির মতো সৃষ্টি! আজ যথেষ্ট মর্যাদা পাচ্ছে না এ। বটবৃক্ষের বীজের মতো এর আকার ক্ষুদ্র, আয়োজন অল্প। কিন্তু বিপুল সম্ভাবনা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের থাকে তবে এরই আছে। আমাদের গৌরব এই যে "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" এমন একটি পুণ্যতীর্থের প্রতিষ্ঠা হলো।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হয়ে, শতায়ু হয়ে, তাঁর জীবন-শতদলের অপরাপর দলগুলি উন্মোচন করতে থাকুন। সেই তো তাঁর মুক্তি। একটি মুক্তপুরুষের দৃষ্টান্ত লক্ষ মুক্তপুরুষের আবাহন করে। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। রবীন্দ্রনাথের উত্তর পুরুষরা এই বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন যে, মানুষের যা চরম উত্তরাধিকার তাই তিনি দিয়ে গেলেন। সেটি হচ্ছে, "কী ভাবে বাঁচব" এই জিজ্ঞাসার নিঃশব্দ উত্তর।

(১৯৩১)

ফাউস্ট

ব্যক্তির জীবনে দেখি এক বয়সের একটি আইডিয়া দিন দিন পরিণত হতে হতে পরবর্তী বয়সে যেই সম্পূর্ণ হয় অমনি সমাপ্ত হয়। তখন আর মনের ভিতর তার খোঁজ পাওয়া যায় না, তার আশ্রয়স্থল তখন স্মৃতি।

জাতির জীবনেও সেইরূপ। তবে জাতির জীবন হচ্ছে বড়ো স্কেলের ব্যাপার। যেমন তার আকার তেমনি তার আয়ু। তার সামান্য দুই দশ শতাব্দীর ইতিহাসে কত ঘটনা, কত অঘটন, কত রাজ্য ভাঙাগড়া, কত পতন অভ্যুদয়। এত কিছুর মধ্যেও এক একটি আইডিয়া জাতির মানসে স্পষ্টতা লাভ করছে। পরিশেষে একটি অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে, একটি আন্দোলনে বা বিপ্লবে, একখানি কাব্যে বা কীর্তিতে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে।

ইউরোপের মধ্যযুগে এমনি একটি আইডিয়া ছিল শয়তানের সঙ্গে চুক্তি। শয়তানকে লোকে ঘৃণা করত, গাল পাড়ত, ভয় করত অথচ শয়তানের আকর্ষণও

তলে তলে অনুভব করত। ফাউস্ট নামে সত্যিকার এক পণ্ডিত নাকি শয়তানের কাছে পরকাল বিক্রয় করে ইহকালে শয়তানের শক্তি কিনেছিল। অত বড়ো যাদুকর নাকি আর ছিল না। মুখে ফাউস্টের মুণ্ডপাত করলেও মনে তার সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল সকলের। তার বিষয়ে রচিত হয়েছিল অনেক গ্রন্থ, চলিত হয়েছিল অনেক কাহিনী, অভিনীত হয়েছিল অনেক পালা। সেগুলিতে তার শোচনীয় পরিণাম—তার অপমৃত্যু ও শয়তানের অধিকারে তার আত্মার দুর্গতি—আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছিল বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন লোকটা যে সুখের জীবন, শখের জীবন, যখন-যা খুশির জীবন কাটিয়ে গেল তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছিল সাড়ম্বরে।

ফাউস্ট হতভাগাটা যে অমন একটা চুক্তি করে নিতান্তই ঠকে গেল মধ্যযুগের শেষভাগের মানুষ অন্তরে তা স্বীকার করতে পারছিল না। পরকালের ভয় যতই কমে আসছিল ইহকালের সম্ভাবনা ততই বৃহৎ মনে হচ্ছিল। বিজ্ঞান এল, প্রকৃতির বস্ত্রহরণ হতে থাকল, শয়তানী যন্ত্রপাতির সাহায্যে এঞ্জিনিয়ার একে একে বহু অসাধ্যসাধন করল। তখন যাদুকর ফাউস্টের উপর শ্রদ্ধা জাত হলো। শয়তানের খুর, লাঙ্গুল ও শিং খসে গেল। শয়তান বলা হলো বিশ্ব-সংসারের অন্তর্নিহিত সেই পরশ্রীকাতরতাকে যা অহরহ ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়ায়, সাজানো বাগান শুকিয়ে দেয়, যজ্ঞ পণ্ড করে, ভালোকে দিয়ে ভালোর সর্বনাশ ঘটায়। এমন যে শয়তান সে মানবসংসারে ভদ্রবেশী।

কালক্রমে ফাউস্ট ও শয়তান উভয়ের বিবর্তন হয়েছিল জনগণের কল্পনায়। গ্যেটে যখন উভয়ের চুক্তির আইডিয়াটিকে পূর্ণতা দিয়ে চুকিয়ে দেবার সংকল্প করলেন ততদিনে ফাউস্টের পরিণাম সম্বন্ধে লোকের রুচি বদলেছে। লেসিং বললেন, ফাউস্টের তো স্বর্গে যাবার কথা। মৃত্যুর পরে তার আত্মা শয়তানের খপ্পরে পড়বে এ যে অসহ্য।

অথচ যে মানুষ সাক্ষাৎ শয়তানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে মর্ত্যকেই পরম বলে গণ্য করল, স্বর্গের চিন্তা মনে আনল না, তাকে স্বর্গে নিয়ে গেলে পাপ পুণ্যের পরিণামভেদ থাকে না। আর শয়তানকেও তার শিকার থেকে বঞ্চিত করলে অন্যায় হয়। গ্যেটে এই সমস্ত কারণে চুক্তির মধ্যে একটি ফ্যাকড়া রাখলেন। ফাউস্ট বলল শয়তানকে, "তুমি আমাকে যা দেখাবে যা দেবে যেখানে নিয়ে যে অবস্থায় রাখবে তাতে যদি আমার বিন্দুমাত্র সন্তোষ হয়, তাতে যদি আমি আসক্ত হই তবেই আমার আত্মা তোমার হবে।" শয়তান জানত মানুষের বাচ্চার দৌড় কত দূর। বলল, "বহুৎ আচ্ছা।" শেষ পর্যন্ত শয়তান ফাউস্টের সঙ্গে পারল না। ফাউস্ট বলে, "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে।" কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। "নেতি, নেতি।" একশ বছর বয়স হলো, তবু সে নিরলস, নিত্য উদ্যত। একটু আরাম কি বিশ্রাম তাকে এক মুহূর্তের জন্য ছোঁয় না... তার অন্তহীন চলার মাঝখানে এল মৃত্যু। এমন মানুষের আত্মার উপর কি শয়তানের কর্তৃত্ব সম্ভব না সংগত?

তবু সে স্বর্গে যেতে পারে না। স্বর্গে যাবার পক্ষে তার যোগ্যতা যথেষ্ট

নয়। সে পাপে আটকে থাকেনি বটে, কিন্তু পাপের জন্যে সে অনুতপ্ত নয়। পুণ্যের প্রতি সে একদিন আকৃষ্ট হয়েছিল, পুণ্যবতীতে অনুরক্ত হয়েছিল, শয়তানের প্রেরণায় সে পুণ্যশীলাকে ভ্রষ্টা করে পলায়ন করেছিল। তার সেই প্রিয়া তার হয়ে প্রার্থনা করল কুমারী-জননীর সকাশে, কুমারী-জননীর করুণাকে তার প্রতি উন্মুখ করল, ভাগবত করুণায় হলো ফাউস্টের স্বর্গলাভ।

এইখানে গ্যেটের 'ফাউস্টে'র বিশিষ্টতা। ফাউস্টের আখ্যানের মধ্যে গ্রেচেনকে—কল্যাণীকে, সতীকে—প্রক্ষিপ্ত করলেন তিনিই। বিবর্তনের মধ্যে এই তাঁর প্রবর্তন। এর দ্বারা বিবর্তনের সমাপ্তি ঘটল, ফাউস্টের পরিণাম হলো চিরকালের সর্ব মানবের অভিলষিত।

এ ছাড়া তিনি আখ্যানটিকে যথেচ্ছ পল্লবিত করলেন। অর্ধ শতাব্দীকাল তাঁর দ্বারা পল্লবিত হতে হতে আখ্যানটি হয়ে উঠল উপলক্ষ মাত্র। মানবাত্মার মহানিয়তিকে সূত্র করে গ্রথিত হলো রাজনীতি, অর্থনীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব, করুণাতত্ত্ব, সৃষ্টিবাদ, বিবর্তনবাদ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানবশিশু নির্মাণ, সমুদ্রশোষণ করে ভূখণ্ড বিস্তার ইত্যাদি প্রাচীন ও আধুনিক ভাবনা। গ্যেটের 'ফাউস্ট' যেন একখানি মহাভারতসার।

লোকসাহিত্যকে সাহিত্যে—প্রাকৃতকে সংস্কৃতে—উন্নীত করবার উদাহরণ এই প্রথম নয়। কালিদাসের 'শকুন্তলা', শেক্স্পীয়ারের 'হ্যাম্লেট্', প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডিসকল মূলত লোকমনের কল্পনা। প্রতিভাশালীরা লোক-কল্পনার অসম্পূর্ণ আলেখ্যের উপর তুলিকা-স্পর্শ করে তাকে চিরকালের মতো সম্পূর্ণ করে দেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা লোক-সত্যেরও মর্যাদা রক্ষা হয়, প্রতিভাশালীকেও কালের বিচার সম্বন্ধে সন্দিহান হতে হয় না। আমার একার জিনিস সকলের হাতে দিলে আমাকে ঝুঁকি নিতে হয়, কে জানে হয়তো ওরা আমার অসাক্ষাতে ওর তত্ত্ব নেবে না। সকলের ঘরের জিনিস আমার হাত দিয়ে ছুঁইয়ে ফিরিয়ে দিলে সকলের হয়ে থাকবে—উপরন্তু আমার হয়ে থাকবে। কালিদাস বা শেক্স্পীয়ার বা গ্যেটে যদি গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিজের হাতে বানাতেন তবে সেটা হতো একটা এক্স্পেরিমেন্ট্, যার কাজ শাড়ির পাড়ে ফুল তোলা তার পক্ষে শাড়ি বোনার মতো। অনাবশ্যক শক্তিক্ষয় তো হতোই, তার পর সে এক্স্পেরিমেন্ট কখনো নিপুণ হস্তের নির্মিত হতো না। প্রতিভাশালীদেরও অধিকারের সীমা আছে। সীমার বাইরে গিয়ে শক্তিক্ষয় করতে তাঁরা স্বভাবত পরাঙ্মুখ। অবশ্য সীমার অর্থ কৃত্রিম গণ্ডী নয়। সীমা হচ্ছে স্বধর্মের সীমা।

বহুজনের পায়ে চলার পথ বহু দিনের পরীক্ষিত। নিজের জন্যে স্বতন্ত্র করে নতুন একটা পথ না কেটে সেই পথে চলতে প্রতিভাশালীদের দ্বিধা নেই। তাঁরা জানেন যে তাঁদের ব্যবহারের দরুন প্রাচীন পথ চিরনবীন বলে মনে হবে। তাঁদের স্বীকৃতির দরুন গ্রাম্যপথ রাজপথ বলে গণ্য হবে।

গ্যেটের 'ফাউস্ট' কাব্য কিংবা উপন্যাস না হয়ে নাটক হলো কেন? কাব্যের প্রাণ বেদনা, উপন্যাসের প্রাণ বিবরণ, চিত্রের প্রাণ বর্ণনা, নাটকের প্রাণ সংঘটন। লোকচিত্তের ফাউস্টে বেদনার সূচনা করলেন গ্যেটে স্বয়ং—গ্রেচেনের প্রেমে,

বিষাদে, উন্মাদে। কিন্তু কাব্যের পক্ষে সেই যথেষ্ট নয়, বিষয়ের মর্ম নয় সে। আর উপন্যাসের পক্ষে যা প্রাণস্বরূপ তা ক্রিয়া নয়, ক্রিয়ার বিবরণ। লোকচিত্তের ফাউস্ট ক্রিয়ারত। তাই ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোজনা নিয়ে গ্যেটের 'ফাউস্ট' হলো নাটক। তার সবগুলি বাইরের ঘটনা নয়। বাইরের যেগুলি সেগুলি যথাযথ নয়। কোথায় ঘটছে, কবে ঘটছে—এ সমস্ত গৌণ। ঘটছে—এইটে মুখ্য। ফাউস্ট তো মধ্যযুগের মানুষ। সে ধরে রাখল প্রাগৈতিহাসিক হেলেনাকে। তাদের যে সন্তান হলো সে দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠল, উড়তে গিয়ে মারা গেল। যেন বাস্তব নয়, ইন্দ্রজাল। যাঁরা সাধারণ নাটকের মতো করে 'ফাউস্ট' পড়বেন তাঁরা বাস্তব ও ইন্দ্রজাল এর একটার থেকে অপরটাকে পৃথক না করতে পেরে উদ্‌ভ্রান্ত হবেন। ইন্দ্রজালের গুণ তা অসম্ভবকে সম্ভব বোধ করায়। দেশকালের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। রূপকথা ও ইন্দ্রজাল, এদের জাত এক। লোকচিত্তের ফাউস্ট তো ঐন্দ্রজালিক, তার কাহিনী রূপকথা। শয়তান যে ভদ্রলোক সেজে এল এ যদি বিশ্বাস হয় তবে হেলেনা ও ফাউস্ট যে মিলিত হলো ও সেই মিলন যে সদ্যফলপ্রদ হলো এতে অবিশ্বাস অরসিকত্ব।

বহির্বিশ্বে ও অন্তর্বিশ্বে যে দুটি—ও দুই জড়িয়ে একটি—ঘটনা-পরম্পরা রয়েছে সেই ঘটনা-পরম্পরা সম্বন্ধে বিশেষ বোধ না থাকলে 'ফাউস্ট' কিংবা কোনো বিশুদ্ধ নাটক বোঝা যায় না। সাধারণত অভিনয় আমরা দেখি উপন্যাসের। পড়ি আমরা কথাবার্তার ভিতর দিয়ে গল্প। তার সঙ্গে থাকে ছবি মেশানো। ইদানীং ছবির ভাগ বেড়েছে। সাজ আসবাব আলো ইত্যাদির উপর থাকে চোখ আর কথাবার্তার দিকে যায় কান। এর মধ্যে নাট্যবোধ কোথায়? স্টেশনে পৌঁছোতে একটি মিনিট দেরি হয়ে গেছে, সামনে দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে, কিছুই করতে পারছিনে, অনড় হয়ে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছি, নিজের এই অসহায়তা মন্দও লাগছে না, বুক যেন ট্রেনের চলার সংগীতে তাল দিচ্ছে—এই তো নাট্যবোধ।

পুত্তলিকার অভিনয় গ্যেটের আশৈশব প্রিয় ছিল। এক অদৃশ্য হস্ত ঝুলন্ত পুত্তলীদের চালন করছে, তাদের মুখের কথা অপরে বলে যাচ্ছে, তাদের অঙ্গ-ভঙ্গি কৌতুককর অথচ মুখভাব অবিকৃত। চরিত্রের বিকাশ নেই, কিন্তু ঘটনার লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্যাভিমুখিত্ব নাটকের ধর্ম। গল্পেরও এটা একটা গুণ, কিন্তু গল্পের ধর্ম তার বিস্তার, তার অপ্রাসঙ্গিকতা। পাকা কথকরা কি কিছুতেই গল্প শেষ করতে চান? কিংবা গল্পের শেষটা ফাঁস করে দিতে? নাটকের শেষ কিন্তু আন্দাজ করা যায়। তা জেনে নিয়েও আমরা নাটক দেখতে কম আগ্রহী হইনে। এর প্রকৃত কারণ আমরা নিজেকে ছেড়ে দিয়ে অসহায় ভাবে ভেসে যেতে ভালোবাসি, বাঁচি আর মরি। ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে পড়ে পিছনের চাপে আপনা-আপনি এগিয়ে যাবার রোমাঞ্চ আমাদের অস্থির করে। তাই ভিড় দেখলেই ভিড়ে যাই। বিশুদ্ধ ঘটনার টান যেন সমুদ্রের অন্তঃস্রোতের গ্রাস। রক্ষা নেই জেনেও নিজেকে সামলাতে পারিনে।

'ফাউস্টে' অনেক রকম অনেক ভিড়। নাগরিকদের উৎসব ডাকিনীদের

শিবরাত্রি (Walpurgis Night), পরীরাজ্যের স্বপ্ন, মহারাজসভা, পারিষদগণের ছদ্মবেশবিলাস, পৌরাণিক গ্রীসের শিবরাত্রি, হেলেনার কোরাস, রাজশিবির, কুমারী-জননীর আশ্রম—প্রত্যেকটিতে অগণিত ব্যক্তির আবর্তন, গতিচাঞ্চল্য, কলগুঞ্জন। এদের বিচিত্র সত্তাও ঘটনার শামিল। ফাউস্ট এদের মধ্যে পড়ে যেন আপনা-আপনি এগিয়ে চলেছে। সাথী মেফিস্টোফেলিস—শয়তান। তার কাজ হলো কথায় কথায় ব্যঙ্গ, উপহাস, অবজ্ঞা, কুৎসিত সমালোচনা।

'ফাউস্টে'র দুই প্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে—একটি তৎকালীন, অন্যটি নিত্যকালীন। তৎকালীন ব্যাখ্যাটি এই। মধ্যযুগের মানব থিওলজির তত্ত্বকেই সত্য বলে বিশ্বাস করত। সেই বিশ্বাস তাকে একান্ত আশ্বাস দিত। যাহা নাই বাইবেলে তাহা নাই ধরাতলে। এমন সময় রেনেসাঁস এসে তার মনে জাগিয়ে দিল সৌন্দর্যের ধ্যান, জ্বালিয়ে দিল অনির্বাণ সংশয়। সে যে কত পুঁথি পড়ল তার সুমারি হয় না। এত পড়েও যার দিশা পেল না তার জন্যে ভানুমতী শিখল, যে পন্থা দুর্গম তাকে আরব্য উপন্যাস্যের ভৌতিক আসনে বসে আশু অতিক্রম করবার চেষ্টা দেখল।

সংশয়ের নাম শয়তান। শয়তান হচ্ছে জিজ্ঞাসা, চ্যালেঞ্জ, বিদ্রোহ, ছিদ্রান্বেষ, অভিমান। শয়তানকে গোলাম করে গুরু করে মধ্যযুগের মানব আধুনিক হয়ে উঠল। হলো বৈজ্ঞানিক, হলো যন্ত্ররাজ, ছেঁচল সাগর, কাটল (সুয়েজ পানামা) খাল, আশা রাখল আকাশে ওড়বার, অভিপ্রায় করল মানবশিশু নির্মাণের। সম্ভাবনার অবধি নেই, আধুনিক মানব কোনখানে থামবে? কত দূরে গিয়ে বলবে, এই আমার সামর্থ্যের সীমানা, এই পর্যন্ত জয় করে আমি নিশানা রেখে দাঁড়ি টানলুম? আধুনিক মানব জীবনকর্মে ক্ষান্তি না দিতেই আসে মৃত্যু। মৃত্যুর পর কি সে অনুতাপে দগ্ধ হবে? গ্লানি বোধ করবে, লজ্জিত হবে? না। যদিও যে স্বর্গকামনা করেনি, ভগবানকে ডাকেনি, তবু সেও ভাগবত করুণা থেকে বঞ্চিত নয়। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উন্নতমনা, নিরলস, নিরাসক্ত। সে তো ঊর্ধ্বাভিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কেউ কি তার হাত ধরে তাকে তুলে নেবে না? নেবে।

মানুষ আপন চেষ্টায় ত্রাণ পেতে পারে না, তাকে ত্রাণ করবার জন্য স্বর্গ থেকে করুণা নেমে আসে। এমনিতে কোনো ব্যক্তি করুণার যোগ্য নয়, শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরাও নন। করুণা কেউ দাবি করতে পারে না। সেটা প্রভুর খুশির খয়রাৎ। এল খ্রীষ্টীয় করুণাতত্ত্ব, grace-এর কথা। এই তত্ত্বের সঙ্গে গ্যেটে একরকম সন্ধি করলেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে করুণা হলো ভগবানের অহেতুক দান, তার পাত্রাপাত্র নেই, তবু সচেষ্ট ব্যক্তি তার আশা রাখতে পারে। ফাউস্টের মতো কর্মী তার দ্বারা অবশেষে ত্রাণলাভ করে থাকে। "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" ফাউস্ট তাই করতে করতে ঠিক একশ বছর বেঁচেছিল। তার একটা গতি না করলে খ্রীষ্টীয় ভগবান আধুনিকদের নিকট মুখ দেখাবেন কী করে?

ক্রিশ্চিয়ানিটির সঙ্গে তো এই মর্মে সন্ধি হলো। কিন্তু মধ্যযুগের মানবের

ছিল তে-টানা। টানছিল তাকে অযুত সম্ভাবনাবিশিষ্ট ভবিষ্যৎ—প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব, যন্ত্রকৌশল, বিজ্ঞানদৃষ্টি, পার্থিব হিত। টানছিল তাকে মৃত্যুর পরপারে অতিমর্ত্য পুণ্য, জাগ্রত করুণা, চিরনবীন কলেবর, অক্ষয় স্বর্গ। আবার উদ্বেগভাবনাশূন্য স্বাস্থ্যসুষমাসামঞ্জস্যের প্রতি, নীতিহীন দ্বিধাহীন কৃত্রিমতাহীন যৌবনের প্রতি, মানবজাতির স্বর্ণাভ অতীতের প্রতিও তার টান ছিল। ফাউস্টের তিনদিকে তিন আকর্ষণ—শয়তান, গ্রেচেন, হেলেনা। তিন জনকেই স্বীকার করে তিনজনের সঙ্গে তিনরকম বোঝাপড়া করা দরকার ছিল।

শয়তান যদি হয় সংশয়ের প্রতিরূপক, গ্রেচেন যদি হয় ক্রিশ্চিয়ানিটির, তবে হেলেনা হচ্ছে মানবসৌন্দর্যের। আজও ইউরোপের ধ্যানে হেলেনার রূপই চিরন্তনী সুন্দরীর রূপ। ভারতবর্ষে তার তুলনীয় নেই। আমাদের রূপের আদর্শ অপ্সরাতে বা দেবীতে নিবদ্ধ রয়েছে, মানবীতে রক্তমাংস পরিগ্রহ করেনি। হেলেনার কথায় একমাত্র শ্রীরাধার কথাই মনে আসে, কিন্তু শ্রীরাধাতে প্রমূর্ত হয়েছে আমাদের প্রেমের আদর্শ—যার তুলনীয় ইউরোপে নেই।

মধ্যযুগের মানব হেলেনাকে উপেক্ষা করে জীবনকে সর্বাঙ্গীণ করতে পারত না। যারা হেলেনার আহ্বান শুনত তাদের ইহকাল-পরকাল যেত, আর যারা শুনত না তারা ছিল অবিদগ্ধ, অনাগরিক। ফাউস্ট হেলেনার সঙ্গে মিলিত হলো অথচ সেই মিলনে ভ্রমরের মতো পদ্মসমাধি পেল না। হেলেনাকে অতিক্রম করে গেল। সৌন্দর্য ও সন্ধিৎসা সংগত হয়ে যার জন্ম দিল সে কথা শোনে না, শূন্যে লাফ দিতে দিতে ছুটে চলে, চায় সংগ্রাম, সে চায় যশ। প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের সন্তান দুরন্ত আধুনিকতা। তার কপালে আছে অপঘাত। কিন্তু কী বিমোহন তার তারুণ্য!

'ফাউস্টে'র নিত্যকালীন ব্যাখ্যা তাকে জাতিনির্বিশেষে সর্বমানবের করেছে। সে আমাদেরও।

মানুষের মধ্যে যে বহির্মুখীনতা আছে তাকে কেউ বলেছে শয়তান, কেউ বলেছে মার, কেউ বলেছে রিপু। তার সঙ্গে মানুষের যেন দ্বন্দ্বের সম্পর্ক। তাকে দমন করা, তার উপর জয়ী হওয়া, এই যেন মানুষের সাধনা। এই সাধনার মধ্যে সত্য যতটুকু থাকুক, একে অবলম্বন করলে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে একাসনে বসে রইতে হয়, প্রকৃতির রূপ গন্ধ গান হয় নিষ্ফল নিরর্থক। এ সাধনায় সিদ্ধি যদি-বা আসে তবে সে যেন pyrrhic victory, তাতে প্রাপ্তির ভাগ ক্ষুদ্র।

এ ছাড়া অন্য এক সাধনা যে সম্ভব তা আমাদের জানা ছিল না। এতে পাপেরও স্থান আছে প্রলোভনেরও মূল্য আছে, শয়তানকে এ সাধনা শত্রু বলে না। কারুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব নেই, কারুর উপর ভয় নেই, সকলে সহায়। সৌন্দর্যকে সম্ভোগ করতে হয়, বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে হয়, প্রবৃত্ত হতে হয় নব-নব অসাধ্যসাধনে। এই সাধনার মন্ত্র—এক এক করে ছাড়িয়ে চল, আটকে থেকো না। মনবাঞ্ছায় আসক্তি সাজে না, বিশ্রাম নেই, আরাম ভয়াবহ। ভোগ কর কিন্তু ভোগের পরক্ষণে ত্যাগ কর। ত্যাগের বেদনাকে এড়াতে চেয়ো না।

ভালোও যথেষ্ট ভালো নয়। ভালোও আজ বাদে কাল ভালো নয়। ভালো মন্দ দুইই নিতে হবে, ছাড়তে হবে। পাপ করলেও পাপে জড়িয়ে যেয়ো না। প্রলোভনের অনুবর্তন কর, কিন্তু অধীন হয়ো না। এইভাবে চরিত্র পাক পূর্ণতা, চরিত্রবলের দ্বারা অক্ষত থাক। জীবন বৈচিত্র্যে ভরে উঠুক, উপলব্ধিতে আসুক সমৃদ্ধি, সত্যের সঙ্গে পরিচয় হোক সত্যতর।

মানুষ যদি কোনোখানে বাঁধা না পড়ে, ক্ষান্তি না দেয়, তবে প্রকৃতির নিয়মে তার মৃত্যু হলেও মৃত্যুতে তার বিরতি নেই। তার চলা এবার মর্ত্যে নয়, অতিমর্ত্য-লোকে। এবার তার সাথী শয়তান নয়, শাশ্বতী। এই বিশ্বের অন্তর্লোকবাসিনী যে নারী মর্ত্যলোকে মানবসঙ্গিনী হতে পারল না, মর্ত্যে যার পরিসর সংকীর্ণ বলে অসীমের অভিসারক যাকে পরিত্যাগ করল, স্বর্গে সেই নারী ভাগবত করুণাবাহিনী, তারই নিত্য প্রার্থনা ভাগবত করুণাকে আবাহন করে আনল, গঙ্গোদকের মতো মানবের শীর্ষে ছিটিয়ে দিল, মানব ধরল দিব্য কলেবর। একটি কেন্দ্রে স্থিত হয়ে সে করেছে আপনাকে নিস্পৃহ, সে রেখেছে মুহূর্তের প্রেমকে চিরন্তন করে, তার তপস্যা তার প্রিয়তমকে ঘিরে। সেই কল্যাণরূপিণী যদি প্রদর্শক না হয় তবে মানব যে মানব-অভিজ্ঞতার চরমে গিয়ে—মৃত্যুতে উপনীত হয়ে—অমৃতের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকবে, পায়চারি করতে থাকবে, প্রবেশ পাবে না। নারী তাকে ছাড়পত্র এনে দেয়, ভিতরে নিয়ে যায়, ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর লোকে ক্রমাগত নিয়ে চলে। সেই নিরুদ্দেশ ঊর্ধ্বযাত্রাই নিরন্তর স্বর্গভোগ। সে ভোগ নারীসমন্বিত।

পরমসঙ্গিনীর প্রশস্তিতে গ্যেটের 'ফাউস্ট' সমাপ্ত হলো। স্থান বৈকুণ্ঠ, কাল চিরকাল। প্রশস্তিকারকরা স্বর্গীয় চারণ।

"All things corruptible
Are but reflection.
Earth's insufficiency
Here finds perfection.
Here the ineffable
Wrought is with love,
The Eternal-Womanly
Draws us above."

(১৯৩৩-৩৪)

সমর ও শান্তি

দুটি কথায় জীবন হচ্ছে সংগ্রাম ও বিশ্রাম।

ভারতীয়রাও এমনিতর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। কিন্তু ইউরোপীয়রা বলতে পারেন জীবনের প্রতি অবস্থায় তো দুঃখ সুখ জড়িয়ে রয়েছে, ওদের পারম্পর্য কোথায়? পরম্পরা যদি থাকে তবে তা সংগ্রামের ও বিশ্রামের। সংগ্রামে যে কেবলই দুঃখ তা নয়, আর বিশ্রাম যে

অবিমিশ্র সুখের তা-ও নয়। সুখদুঃখ-নিরপেক্ষভাবে সংগ্রাম হচ্ছে সংগ্রাম এবং বিশ্রাম হচ্ছে বিশ্রাম। এবং দুই মিলিয়ে জীবন যদি হয় পদ্য তবে 'সংগ্রাম' ও 'বিশ্রাম' বোধ হয় 'দুঃখ' ও 'সুখ' অপেক্ষা গাঢ়তর মিল।

ইউরোপের ইতিহাস—ইউরোপ-নির্দিষ্ট অর্থে মানবের ইতিহাস—মাত্র দুটি শব্দের উলটপালট খেলা। সমর ও শান্তি। কখনো রাজাতে রাজাতে, কখনো রাজাতে প্রজাতে, কখনো বা নেশনে নেশনে সমর যেন একটার পর একটা ঢেউয়ের ভেঙে পড়া। আর শান্তি যেন সেই ঢেউয়ের পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়া। এ খেলা ফুরোয় না, ফুরোবার নয়।

টলস্টয় প্রণীত 'সমর ও শান্তি' নেপোলিয়নীয় যুগের ইতিহাস। ইতিহাসের আক্ষরিক অর্থে নয়। তাই উপন্যাসপর্যায়ভুক্ত। অথচ সাধারণ উপন্যাসের মতো এক জোড়া নায়কনায়িকার বৃত্তান্ত নয়। এর নায়ক বল নায়িকা বল সে হচ্ছে স্বয়ং রাশিয়া, রাশিয়ার প্রণ মন সম্মান। অথবা দেশ কালের সীমার মধ্যে স্থিত অসীম মানববংশ। ইতিহাসের সত্যকার বিষয় যদি হয় মানবভাগ্য তবে এই উপন্যাস হচ্ছে ইতিহাসের ভগ্নাংশ এবং বিষয় এর দেশকাল-রঞ্জিত মানবভাগ্য। এর অসংখ্য পাত্রপাত্রী হচ্ছে মানব-করতলরেখা।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সৈন্যরা অস্ট্রীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আউস্টারলিৎসের রণক্ষেত্রে। হেরে যায়, "হেরে গেছি" এই ভ্রান্তিবশত। প্রকৃতপক্ষে তাদের হারবার কথা ছিল না। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাৎকার ঘটে, বন্ধুতা হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সেই মৈত্রী পর্যবসিত হলো শত্রুতায়। নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু রুশ সেনাপতি কুটুজো দেখেন যে প্রতিরোধ করলে নিশ্চিত পরাভব। নেপোলিয়নের সৈন্যরা অবাধে মস্কো প্রবেশ করল, কিন্তু মস্কো জনশূন্য। একটিও রাশিয়ান তাদের সহযোগিতা করতে চাইল না। কেউ জানে না কে লাগিয়ে দিল শহরে আগুন। এরা বলে ওরা লাগিয়েছে। ওরা বলে এরা লাগিয়েছে। লুটপাট করে ফরাসীরা স্থির করল ফেরা যাক। কিন্তু যে বাঘ খাঁচায় ঢুকে পেট ভরিয়েছে ছাগ মাংসে তারই মতো দশা হলো তাদের। যতটা পথ এসেছিল ঠিক ততটা পথ ফেরার মুখে বহুগুণ বোধ হলো। কুটুজো ইচ্ছা করলে রাস্তায় হানা দিয়ে তাদের নির্বংশ করতেন। কিন্তু অনাবশ্যক রক্তপাতে তাঁর প্রবৃত্তি হলো না, তারা যখন স্বেচ্ছায় রাশিয়া ত্যাগই করছে। তাঁর কোনো কোনো সৈনিক কসাকদের দলপতি হয়ে চোরের উপর বাটপাড়ি করল। এইসব গেরিলা যুদ্ধে ও শীতে বরফে খাদ্যের অভাবে নেপোলিয়নের গ্রাঁদ আর্মে কাহিল হয়ে পড়ল, সৈন্যদের অল্পই বাঁচল। তাও হলো পথি বিবর্জিত। নেপোলিয়ন চুপি চুপি দিলেন এক লম্ফ!

এই হলো কাঠামো। সাধারণ ঔপন্যাসিক হলে তাঁর পাত্রপাত্রীদের দিয়ে বড়ো বড়ো কাজ করাতেন। নতুবা যারা বড়ো বড়ো কাজ করেছে বলে ইতিহাসে লেখে তাদেরকেই করতেন পাত্রপাত্রী। জাতীয় গৌরবের রঙে সমস্তটা হতো অতিরঞ্জিত। সাধারণ ঐতিহাসিক হলে ঘটনার পশ্চাতে দেখতেন মানুষের ইচ্ছা,

মানুষের পরিকল্পনা, মানুষের দূরদৃষ্টি। সেনাপতিদের চাল দেওয়া, সৈনিকদের বোড়ের মতো চলা, অধিককৌশলীর জয়লাভ। পরাভূত পক্ষের ঐতিহাসিক ধরতেন উঠোনের দোষ—নেপোলিয়নের সর্দিকে করতেন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ঘটনাচক্রে কুটুজো মস্কো রক্ষা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সাব্যস্ত করলেন তাঁর পরামর্শ-পরিষদের সম্পূর্ণ অমতে। আর রোস্টোপশিনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও শহরের লোক যে যেদিকে পারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল, নেপোলিয়ন থাকতে সেখানে ফিরল না। জাতীয় ঐতিহাসিক হলে টলস্টয় বলতেন, এ কি আমরা না ভেবেচিন্তে করেছি? আমরা অনেকদিন থেকে মাথা খাটিয়ে ঠিক করেছিলুম যে নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে দেশের ভিতরের দিকে টেনে আনব ও মস্কো খালি করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখব।

টলস্টয় ঋষি। তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিযোগে প্রত্যক্ষ করলেন ঘটনা কেমন করে ঘটল, কেমন করে ঘটে থাকা সম্ভব। যারা খেলা করে তারা জানে কার কত দূর দৌড়। কিন্তু যুদ্ধে অপর পক্ষের সামর্থ্য পরিমাপ করবার কোনো ধ্রুব মান নেই। যারা লড়াই করে তাদের ঐটেই একমাত্র ভাবনা নয়, তারা সবাই বীরও নয়। তাদের নিজেদের ছোট ছোট ঈর্ষাদ্বেষ, তাদের কারুর মনে পড়ছে ঘরসংসার, কেউ গণনা করছে কবে মাইনে পাওয়া যাবে। সেনাপতিদের এক-একজনের এক-এক মত, তাদের সবাইকে একমনে কাজ করানো প্রধান সেনাপতির নিত্য সমস্যা। পদাতিকদের অনুপ্রেরণা জয়গৌরব ততটা নয় যতটা লুটতরাজ। মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েও বীরপুরুষেরা লুটের মাল আঁকড়ে থাকে। যুদ্ধ জিনিসটা একজনের হুকুমে হয় এর মতো ভ্রান্তি আর নেই। যুদ্ধ হয় একবার কোনো মতে শুরু করে দিলে আপনা-আপনি। থামে হয়তো একটা উড়ো কথায়। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা হেরে গেছি।" অমনি সবাই ভঙ্গ দিল।

কেন যে যুদ্ধ হয়, কেন যে মানুষ মারে ও মরে, কী যে তার অন্তিম ফল টলস্টয় তার সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী। নেপোলিয়ন হুকুম করলেন, "যুদ্ধ হোক", আর অমনি যুদ্ধ হলো এই সুলভ ব্যাখ্যায় তিনি সন্দিহান। নেপোলিয়ন নিয়তির বাহন, তাও একটা ঐরাবত কি উচ্চৈঃশ্রবা নন, প্রতিভা তাঁর নেই। মস্কোতে তিনি আগাগোড়া নির্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। সেই শহরে খাদ্য মজুত ছিল ছয় মাসের। কিন্তু নেপোলিয়ন তার হিসাব রাখলেন না। সৈন্যরা লুটপাট করে তছনছ করল। মস্কোর ধনসম্ভার তাদের লোভ জাগিয়ে তাদেরকে এত দূর দেশে এনেছিল, সেই লোভের তাণ্ডব নাচ চলল। নেপোলিয়ন মোরগের মতো নিশ্চিত জানতেন যে নাগরিকরা তাঁর লম্বা-চওড়া ইস্তাহার পড়ে ফিরবে, আবার দোকানপাট বসাবে। গ্রামিকরা আসবে মাছ, তরকারি বেচতে। তাদেরকে তিনি ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন যে, যুদ্ধে যেমন তিনি অপরাজেয় শান্তিকালেও তেমনি তিনি প্রজারঞ্জক।

রাশিয়ার জনগণকেই টলস্টয় দিয়েছেন সাধুবাদ। তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা চালিত হয়নি। তারা পরস্পরের পরামর্শ নেয়নি। তারা অন্তরে

উপলব্ধি করল নিয়তির অভিপ্রায়। তাই মূঢ় রোস্টোপশিনের অনুজ্ঞায় কর্ণপাত না করে শহর ছেড়ে দিল। শহরে আগুন দিল কে তা কিন্তু বলা যায় না। হয়তো রাশিয়ানরা, হয়তো ফরাসীরা। যে-ই দিক সে নিয়তির ইঙ্গিতে দিয়েছে। বোঝেনি কিসের ফল কী দাঁড়াবে।

শত্রুর সঙ্গে অসহযোগ করব, ফিরব না মস্কোতে এই যে তাদের অপ্রতিরোধের সংকল্প এ-ও কারুর নির্দেশে বা শিক্ষায় নয়। এ-ও তারা একজোট হয়ে পরস্পরের পরামর্শ নিয়ে করেনি। এ তাদের প্রত্যেকের অন্তরের আদেশ। এমন যদি না হতো তবে সম্রাট বা সেনাপতিদের ইচ্ছা নেপোলিয়নের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রলয় বাধাত, প্রলয়ঙ্করের করতালি তো এক হাতে বাজে না।

শেষজীবনে টলস্টয় যে জনগণের স্বভাববিজ্ঞতায় আস্থাবান হবেন, অপ্রতিরোধতত্ত্বের গোস্বামী হবেন, তার পূর্বাভাস তাঁর যৌবনের এই গ্রন্থেও লক্ষ করা যায়। নামহীন পরিচয়হীন মহাজনতায় আপনাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর সাধনা। পারেননি, এমনি উগ্র তাঁর ব্যক্তিত্ব। বদ্ধমূল আভিজাত্য উন্মূল হলো না। তবু তাঁর দানবিক প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয়নি। দেশান্তরে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে ভারতের সত্যাগ্রহে, গান্ধীজীর জীবনাদর্শে। টলস্টয়কে দ্বিখণ্ডিত করে কেউ কেউ নিয়েছে তাঁর যৌবনের অনবদ্য শিল্পিত্ব। কেউ নিয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের অপ্রতিরোধতত্ত্ব।

কিন্তু এই যে তাঁর জনগণের সহজ বিচারের প্রতি আস্থা এই তাঁর উভয় বয়সের, উভয় প্রতিকৃতির মধ্যে সাদৃশ্যে নির্ণয়ের সংকেত। শিল্পী-ঋষি ও সাধু-ঋষি মূলত ঋষি। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের কোন রহস্য ধরা পড়েছে? ধরা পড়েছে এই যে, যাবতীয় ঘটনার যথার্থ পাত্রপাত্রী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা নন। নামপরিচয়হীন নির্বিশেষে জনতা যা করে তাই হয়। এবং যা করে তা নিয়তির চালনায়। নিয়তি অন্ধ নয়, খেয়ালী নয়, তার ব্যবহারে আছে নিয়ম। যেমন পৃথিবীর ঘূর্ণন আমাদের অনুভূতির অতীত বলে আমরা একদা তাকে স্থাণু মনে করেছিলুম তেমনি নিয়তির ইচ্ছায় কাজ করতে থেকেও আমরা তার সম্বন্ধে অচেতন, আমরা ঠাওরাচ্ছি আমরা ইচ্ছাময়।

সমর থেকে ওঠে নিয়তির কথা। তেমনি শান্তি থেকে ওঠে প্রকৃতির। বিচিত্র সংসারের ধারাবাহিকতায় কত রস, কত রূপ। যুদ্ধ চলেছে নেশনে নেশনে। কিন্তু অলক্ষিতে বালিকা হয়ে উঠেছে বালা, বালা হয়ে উঠেছে নবযুবতী। অন্তরালে শীতের সূর্য সুধাবর্ষণ করে যাচ্ছে, আকাশ ঘন নীল। কে বলবে যে এই সুন্দরী ধরণী একদিন হবে রণক্ষেত্র, বারুদের ধূমে ও গন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ পশুপক্ষীর হবে শ্বাসরোধ, পাতা ও ফুল যাবে বিবর্ণ হয়ে? টলস্টয়ের এই গুণকে কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন আইডিল, সুখসরলতার ছবি। এক হিসাবে তা সত্য। সহজ, প্রসন্ন জীবন। বিশেষ অভাব অভিযোগ নেই। নেই তেমন কোনো দ্বন্দ্ব। কারুর অতি বড়ো সর্বনাশ ঘটে না, জীবনদেবতা সকলেরই শেষ নাগাদ একটা সুব্যবস্থা করেন। কাউকে দেন সুমধুর মৃত্যু, মুখে হাসিটি লেগে থাকে। কাউকে রাখেন চিরকুমারী করে, নিজের নিষ্ফলতায় সন্তুষ্ট। কেউ

আরম্ভ করেছিল বিশ্বের ভাবনা ভেবে। মরতে মরতে বেঁচে গেল। তারপর বিয়ে করল, সুখে থাকল।

আধুনিক পাঠকের এতটা শান্তি বিশ্বাস হবে না। তবে এটুকু পরিতোষ হবে যে পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয় প্রতিপন্ন করবার অভিপ্রায় ছিল না ঋষির। আর এও না মেনে উপায় নেই যে প্রত্যেকটি কাল্পনিক চরিত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের মতো উৎরেছে। তার মানে ওরা আস্ত মানুষ, কবি ওদের দেখেছেন সকলের মাঝে, দেখিয়েছেন যথাযথরূপে। ওরা থাকলেও থাকতে পারত ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসে থাকলে বিশ্বাস করতুম ওদের জীবনযাত্রার শান্তি।

কথা হচ্ছে সমরের মতো শান্তিকালেও টলস্টয় পড়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ। সমরের যেমন নিয়তি, শান্তির তেমনি সহজ বিকাশ, বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। দ্বন্দ্বের স্থান রণাঙ্গনে। গৃহে বড়ো জোর একটু মান অভিমান, সহজ কলহ। একটু ব্যঙ্গ, একটু রঙ্গ। রাগ হলে, বা রাগ হওয়া উচিত বলে মনে করলে, একটা ডুয়েল। তাতে মরেও না শেষ পর্যন্ত কোনো পক্ষ।

শান্তিও যে আজ আমাদের দিনে সমরের নামান্তর, প্রকারান্তর বলে গণ্য হবে তা তো ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে সূচিত হয়নি। বিশেষত রাশিয়ায়, এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের গণ্ডী কালচিহ্নিত। যেমন খাপ তেমনি তরবারি। তথাপি সেকালের চিন্তায় জমিদার ও চাষার সম্বন্ধ কেমন হবে সে জিজ্ঞাসা ছিল।

সমসাময়িক সমস্যার চেয়ে টলস্টয়কে ঢের বেশী আকুল করেছিল সনাতন জীবনরহস্য। কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, বাঁচার মতো বাঁচা কাকে বলে? এর এক-একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এক-এক জনের চরিত্রে দিয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে নাম করা যায় নাটাশার, মারিয়ার, সোনিয়ার, হেলেনের। পুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় আন্দ্রুকে, পিটারকে, নিকোলাসকে। যাদের অগ্রাহ্য করলুম তারা কেউ উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা শতাবধি। এত রকম এত ব্যক্তি অন্য কোন গ্রন্থে আছে? ডস্টয়েভস্কিও টলস্টয়ের পিছনে পড়ে যান।

নাটাশাকে আমরা প্রথম যখন দেখি তখন তার শৈশব সারা হয়ে গেছে অথচ কৈশোর উত্তীর্ণ হয়নি। সে দেখতে তত সুশ্রী নয়, বরং শ্রীহীন বলা যেতে পারে। কিন্তু রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে উচ্ছলিত প্রাণ। তখনো তার পুতুল খেলার অভ্যাস ভাঙেনি। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। তার সে হাসি সংক্রামক। এই মেয়ে বছর চারেক পরে হয়েছে ষোড়শী, ভাবাকুলা, সুদর্শনা। কিন্তু রয়েছে তেমনি প্রাণবতী। সামাজিক নৃত্যে সে এমন আনন্দ পায় যে তার নিষ্পাপ চিত্ত সকলের আনন্দ কামনা করে। তার উল্লাস যেন কোনো অপ্সরার, তা দিকে দিকে সৃষ্টি করে উল্লাস। তার অচপলতা, তার অকৃত্রিমতা, তার সরল মাধুরী তার প্রতি আকৃষ্ট করল আন্দ্রুকে। আন্দ্রু

উচ্চপদস্থ, উচ্চবংশীয়, উচ্চমনা। বয়সেও বড়ো। দেশের মঙ্গলের নানা পরিকল্পনা ছিল তাঁর ধ্যান। কিন্তু তাঁর প্রথম বিবাহের স্ত্রী তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী ছিলেন না। সামাজিকতার অশেষ তুচ্ছতায় তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত খুচরো খরচ হয়েছিল, বাজে খরচ। বিরক্ত হয়ে তিনি যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের স্বরূপ দর্শন করে তাঁর তাতেও অরুচি ধরল। যাকে আদর্শস্থানীয় বলে বিশ্বাস করেছিলেন সেই নেপোলিয়নকে নিকট থেকে দেখে বীতশ্রদ্ধ হলেন। প্রশান্ত নীল আকাশের নিচে আহত হয়ে পড়ে থাকার সময় তাঁর মনে হলো তাঁর বুদ্ধিগম্য যাবতীয় বিষয় অসার, সার কেবল ঐ অসীম বিশ্বরহস্য। এমন যে য়্যান্ড্রু তাঁরও নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করল নাটাশার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণপ্রবাহে ভেসে। তার নেই লেশমাত্র মলিনতা, সে ঝরনা। এক বছরের জন্যে য়্যান্ড্রু দেশের বাইরে গেলেন, ফিরে এসে নাটাশাকে বিয়ে করবেন। এই এক বছরে নাটাশা তাঁর প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠল। এল তার কুগ্রহ আনাতোল। ক্ষণিক উন্মাদনায় সে প্রতারকের কবলে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়ে আত্ম-হত্যার চেষ্টা করল। বেঁচে গেল। কিন্তু বদলে গেল। য়্যান্ড্রু দেশে ফিরে যা শুনলেন তাতে তাঁর জীবনের স্পৃহা লোপ পেল, নারীর কাছে তিনি কোনো-রূপ মহত্ত্ব প্রত্যাশা করলেন না, এত দুর্বল তারা। তিনি আবার গেলেন যুদ্ধে, এইবার মৃত্যু কামনা করে। আহত হয়ে আনীত হলেন, ঘটনাচক্রে নাটাশাদের আশ্রয়ে। মরণকালে তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত হলো দিব্য ভাবে। তিনি ক্ষমা করলেন, তিনি ভালোবাসলেন প্রাণীমাত্রকে, সংসারকে। তাঁর মনে ব্যর্থতার নিত্য খেদ রইল না। অনুতপ্তা সেবিকা প্রিয়াকে আশীর্বাদ করলেন।

নাটাশাকে তার শৈশব থেকে ভালোবাসত পিটার। লোকটা কেবল যে লাজুক, ভালোমানুষ, কিম্ভূতকিমাকার, মাথাপাগলা তাই নয়, নামগোত্রহীন সত্যকাম। তাই কাউকে কোনোদিন জানায়নি ভালোবাসার কথা। হঠাৎ মারা গেলেন কাউন্ট বেসুকো, উত্তরাধিকারী হলো পিটার, বিরাট ভূসম্পত্তির তথা পদবীর। তখন তাকে লুফে নিল নাটাশাদের চেয়ে উদ্যোগসম্পন্ন প্রতিপত্তিমান কুরাগিন বংশ। তার বিয়ে হলো যার সঙ্গে সে অসামান্য রূপবতী, সোসাইটির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, হেলেন। কোনো পক্ষে প্রেম নেই। বিভবের সঙ্গে সৌন্দর্যের বিবাহ। দুজনেই পরম অসুখী হলো। হেলেন খুঁজল অমন অবস্থায় ওরূপ সমাজের রানিমক্ষিকারা যা খোঁজে। আর বেচারা পিটার হলো ফ্রীমেসন। চরিত্রকে দিন দিন উন্নত করতে চেষ্টা করল, বিশ্বকল্যাণ-ব্রত-রত। দোষের মধ্যে মদটা খায় অপরিমিত। তার সেই ভালোবাসা তার অন্তরে রুদ্ধ থাকে। নাটাশার সঙ্গে তার সহজ বন্ধুতা। নাটাশা তাকে সরল জন্তুটি বলে সখীর মতো বিশ্বাস করে। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন পিটারের ধারণা জন্মাল যে, বাইবেলে যে রাক্ষসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী আছে নেপোলিয়নই সেই রাক্ষস এবং তাকে হত্যা করবে যে সে আর কেউ নয়, সে আমাদের পিটার, যে একটা বন্দুকও ছুঁড়তে জানে না। পিটারের প্রয়াসের শেষ ফল হলো এই যে পিটার অন্যান্যদের সঙ্গে ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় সারি বেঁধে দাঁড়াল।

তার চোখের সম্মুখে মানুষ মরল ঘাতকের গুলিতে। তারও উপর গুলি চলবে এমন সময় তার প্রাণদণ্ড মকুব হলো, সে চলল বন্দী হয়ে ফিরন্ত ফরাসীদের সাথে। কসাকদের সাহায্যে অন্যান্য বন্দীদের সহিত তাকেও উদ্ধার করল ডেনিসো ডোলোগো প্রভৃতি গেরিলা যুদ্ধের নায়ক। মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, বহু লাঞ্ছনা সয়ে যে দুঃখ আমাদের পাওনা নয় সেই দুঃখকেও কেমন ভক্তির সহিত গ্রহণ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত কারাটাইয়েভ নামক একটি পরম দুঃখী ঈশ্বরবিশ্বাসীর জীবনে প্রত্যক্ষ করে পিটারের গভীর অন্তঃপরিবর্তন ঘটেছিল। শৌখীন মানবহিত আর তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করছিল না। সে পথ পেয়েছিল। বিষাদিনী নাটাশাকে বিয়ে করে—ততদিনে হেলেন মরেছিল—সে দস্তুরমতো সংসারী হলো। নাটাশা আবার সেই আনন্দময়ী। প্রকৃতি নিজে তাকে সহজ আনন্দ যোগায়, উদ্ভিদকে যেমন রস। সে কালক্রমে ফলভারাবনত পূর্ণবিকশিত পাদপের মতো প্রসারিত, সমৃদ্ধ হলো। কে তাকে দেখে চিনবে যে এ ছিল একদিন তন্বী আলোকলতা! তবু তাই তার প্রাকৃতিক পরিণতি। তা নইলে যা হতো সেটা তার বিকৃতি। নাটাশা টলস্টয়ের মানসী নারী। সে ভালো। কিন্তু সজ্ঞানে ও সাধনার দ্বারা নয়। শিক্ষার দ্বারা নয়। নীতির চুল-চেরা তর্ক তার মনে ওঠে না। তার প্রাণ যা চায় সে তা-ই চায়। তার প্রাণ যা চায় তার ফলে অনর্থ ঘটলে সে তা ভোগে। নালিশ করতে চায় না।

অ্যান্ড্রুর বোন মারিয়া হচ্ছে কতক তার রূপহীনতার প্রতিক্রিয়ায়, কতক তার কঠোরস্বভাব জনকের তাড়নায় তপস্বিনী। তার সমবয়সিনীরা যখন খেলা করছে, লীলা করছে, শিকার করছে দুই অর্থে, মারিয়া তখন জ্যামিতির পড়া তৈরি করছে আর করছে লুকিয়ে অধ্যাত্মচর্চা। যা অমন দুঃখিনী হলে নারী-মাত্রেই করে থাকে। আপনাকে ভাগবত জীবনের যোগ্য করছে নিষ্ঠার সহিত, বিবাহের তো প্রত্যাশা নেই। তা বলে আশা কি মরেও মরে! কতবার নিরাশ হলো। অবশেষে নাটাশার ভাই নিকোলাস তার পৈতৃক সম্পত্তির খাতিরে তাকে বিয়ে করল, অবশ্য বিয়ের আগে তাকে বিদ্রোহী প্রজাদের হাত থেকে উদ্ধার করে তার হৃদয় জিনে। তাদের বিয়ে বেশ সুখেরই হলো। মারিয়ার দীর্ঘচরিত্র সংযম ও সাধুতা তাকে শুদ্ধ সুবর্ণের আভা দিয়েছিল। তার রূপহীনতাকে ঢেকেছিল সেই আভা।

নিকোলাস নাটাশারই মতো প্রাণময়, তবে সহাস্য নয়, সুগম্ভীর। তার সব কাজে হাত লাগানো চাই, উৎসাহ তার অদম্য, ব্যগ্রতা তা মজ্জাগত। ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়া খরিদ, তরুণ সৈনিকের ভাবনাশূন্য জীবনের হাজার ভাবনা, শিকার, জুয়া এই সব তার বহির্মুখিত্বের নানা দিক। তাকে ভালো-বাসে তাদের পরিবারের আশ্রিতা একটি মেয়ে, সোনিয়া। নিকোলাস তাকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসা তার অন্যান্য কাজের মতো ছেলেমানুষী। কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে, কিন্তু সোনিয়ার অপরাধ সে নির্ধন। তাকে বিয়ে করলে নিকোলাসদের নষ্ট সম্পত্তি ফিরবে না। তার বাবা যে জুয়ায় সব হারিয়ে বসে রয়েছেন। নিকোলাসের মায়ের পীড়াপীড়িতে সোনিয়া তাকে তার প্রতিশ্রুতি

থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সুখ বিসর্জন দিল। নিকোলাস বর্তে গেল, সে তো কিছুতেই তার পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করতে পারত না, অথচ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবার মতো বেইমান সে নয়। সোনিয়া এই কাব্যের উপেক্ষিতা।

ডোলোগো নিকোলাসের বন্ধু। কিন্তু দিব্যি বন্ধুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জুয়াতে ভীষণ হারিয়ে। লোকটা অসাধারণ সাহসী, অথচ অবাধ্য। তার মনে একটা বড়ো দুঃখ সে গরিব। তাতে তাকে নির্দয় করেছিল। তার আর একটা বৃহৎ ক্ষোভ সে একটিও নারী দেখলে না যাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে, পুজা করতে পারে। তার ধারণা রানি থেকে দাসী পর্যন্ত প্রত্যেক রমণীকে কেনা যায়। সে যে বেঁচে আছে তা শুধু তার মানসীকে হয়তো একদিন দেখতে পাবে এই অসম্ভব আশায়। ততদিন সে শয়তানী করবে। করবে গুন্ডামী। তার বিধবা মা আর কুব্জা বোন আর গুটিকয়েক বন্ধু ছাড়া সবাইকে সে বেখাতির করবে।

টলস্টয়ের বর্ণনাকুশলতা এমন যে পদে পদে মনে হতে থাকে টলস্টয় স্বয়ং এসব দেখেছেন, এসব জায়গায় উপস্থিত থেকেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে, মন্ত্রণাসভায়, দরবারে, অভিজাত মহলে, ফ্রীমেসনদের আড্ডায়, গ্রামের বাড়িতে, শিকারের পশ্চাতে, নাচের মজলিসে, চাষাদের সঙ্গে, বন্দীদের সাথে, গেরিলা দলে— সর্বঘটে তিনি আছেন। কল্পনার এই পরিব্যাপ্তি, সহানুভূতির এই প্রসার বিশ্বসাহিত্যে বিরল। অবশ্য সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে তাঁর চিত্তের প্রবেশ ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে তিনি হয়তো শেষ বয়সে তাদেরই দিকে সম্পূর্ণ হেলতেন না। তারপর এত খুঁটিনাটি ভালোবাসতেন বলে তার প্রতিক্রিয়াবশত শেষের দিকে একেবারে ও-জিনিস বর্জন করলেন। এক চরমপন্থা থেকে অপর চরমপন্থায় চললেন। টলস্টয়ের জীবনের তথা আর্টের ট্যাজেডি এই।

আলোচ্যগ্রন্থে তিনি যাকে জয়যুক্ত করেছেন সে পিটার, নাটাশাযুক্ত পিটার। কারাটাইয়েভ মরণের পূর্বে তাকে যে মন্ত্র দিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি তার কানে বাজতে থাকে। জীবনই সমস্ত। জীবনই ভগবান। সর্বভূতের আছে গতি। সেই গতিই ভগবান। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আছে ভগবানের অস্তিত্বকে জানবার আনন্দ। জীবনকে ভালোবাসলেই ভগবানকে ভালোবাসা হয়। জীবনে সবার চেয়ে কঠিন অথচ সবচেয়ে গুণের কাজ হচ্ছে জীবনের যাবতীয় অহেতুক জ্বালা সত্ত্বেও জীবনকে ভালোবাসা।

(১৯৩৪)

বীরবল

'সবুজ পত্র' যেদিন বিনুর মতো অবুঝের হাতে প্রথম পড়ল সেদিন সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালক আর সব বাদ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করল 'চার ইয়ারী কথা'। তখন বোধহয় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' চলছিল, কিন্তু বিনুর সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ যে কে ও কত বড়ো সে জ্ঞান ছিল না

তার। গুরুত্বনির্ণয়ের, মূল্যনির্ণয়ের বয়স সেটা নয়। ভালো লাগা চিরদিনই নিরঙ্কুশ, বাল্য বয়সে সব চেয়ে বেশী। 'চার ইয়ারী কথা' বিনুর ভালো লেগেছিল। ভালো লেগেছিল প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের আরো অনেক রচনা।

বীরবলেরও। বিনু তখন জানত না যে বীরবল আর কেউ নন, সেই প্রমথ চৌধুরী। সে আশ্চর্য হয়ে ভাবত, ইতিহাসে নজির থাকলেও এমন নাম কি মানুষের হয়, আধুনিক মানুষের! বুঝত না যে ওটা একজনের ছদ্মনাম। পরে জানতে পেরেছিল উনি কে, কী ও নামের তাৎপর্য।

কেন এত ভালো লাগত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখা, বীরবলের লেখা, বিনু পরে তা বিশ্লেষণ করেছিল। সে লেখায় ছিল স্বাদ। ছিল নিপুণ রাঁধনীপনা। যত দিন বিনুর রুচি গঠিত হয়নি তত দিন সে অন্যের লেখা পড়ে তারিফ করেছে, কিন্তু একবার রুচি গঠিত হলে কেবল পাকা রাঁধুনীর রান্নাই পছন্দ হয়, অন্যেরটা যদি হয় তবে বিষয়গুণে। বিনুর রুচি গড়ে উঠল বীরবলের রচনার আস্বাদনে, চৌধুরী মহাশয়ের লেখার স্বাদ পেয়ে।

এই বহুরূপী লেখকের যে বিষয়গুণ ছিল না তা নয়। কিন্তু বিষয়গুণকে গৌণ করেছিল তাঁর পদবিন্যাস যা দিয়ে তিনি মন হরণ করেছিলেন। এই যদি শিল্প হয় তবে এক দিন আমিও শিল্প সৃষ্টি করব, মনে মনে বলত সেই বারো বছরের বালক। বলত আর মনে মনে অনুকরণ করত বীরবলের পদবিন্যাস।

কিন্তু রচনাশিল্পের চেয়েও মুগ্ধ করত রসিক চিত্ত। জীবনে ছোট বড়ো কত বিষয়ে আলাপ, কিন্তু সব আলাপই রসালাপ। যুদ্ধ হোক, প্রত্নতত্ত্ব হোক, কোনো বিষয়ই গুরুগম্ভীর নয়, ছায়াচ্ছন্ন নয়। স্বচ্ছ দৃষ্টির সন্ধানী আলো কোথাও অন্ধকার রাখছে না, বিদগ্ধ মনের সকৌতুক রসনা মজলিশী ঢঙে আসর জমিয়ে তুলছে। পাঠকরা যেন এক-একজন দরবারী ওমরাহ। দরবারে বসে কত জ্ঞানের কথাই শুনছেন, কিন্তু রসের অনুপান বিদ্যাকে করছে বিলাস।

চৌধুরী মহাশয় বিদ্যানগরের নাগরিক। বিদ্বান হয়েও চতুর। সে হিসাবে তিনি আধুনিক নন, তিনি ক্লাসিক। এ কালের লেখকরা হয় শিক্ষা দেন, নয় মনোরঞ্জন করেন, বিষয়গুণে মনোরঞ্জন। কিন্তু এই উভয় বৃত্তির উপর বীরবলের বিরাগ। 'সাহিত্যে খেলা' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ আছে। সেটির থেকে তুলে দিচ্ছি তাঁর মতবাদ।

> "সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া—কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশপাতাল প্রভেদ আছে, সেটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলা দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক,—এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।...তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া? অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

স্কুল বন্ধ না হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্য রচনা যে আত্মার লীলা এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন।"

সাহিত্য যে আত্মার লীলা এটি ক্লাসিক ধারণা। লেখা হচ্ছে খেলা আর লেখক হচ্ছেন খেলক। কিন্তু এ দুঃসাহসিক উক্তি যে দিন দিন আরো দুঃসাহসিক হয়ে উঠছে। সমাজ আমাদের চিত্তকে এমন করে আচ্ছন্ন করেছে যে যাতে সমাজের কল্যাণ হাতে হাতে না হয়, সমাজ ভাঙাগড়ার প্রসঙ্গ না থাকে, তা সাহিত্য নামে বুর্জোয়া ইনটেলেকচুয়ালদের ঘুমপাড়ানী বলে নিন্দিত। চৌধুরী মহাশয় কিন্তু দেশের ঘুম ভাঙাতেই চেয়েছিলেন। তাঁর 'সবুজ পত্রের মুখপত্র' থেকে তুলে দেখাই।

"কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয়, ধর্মও নয়, সে হচ্ছে কার্যক্ষেত্রের কথা। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করাতে মনের ভিতর যে সংকীর্ণতা এসে পড়ে সাহিত্যের স্ফূর্তির পক্ষে তা অনুকূল নয়।...যার সমাজের সঙ্গে ষোল আনা মনের মিল আছে তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য, সকল দর্শন, সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এ কথা শুনে অনেকে হয়তো বলবেন যে, যে দেশে এত দিকে এত অভাব সে দেশে যে লেখা তার একটিও অভাব পূরণ করতে না পারে সে লেখা সাহিত্য নয়, শখ।... এ কথা সত্য যে মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়।...সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।"

সাহিত্যের খেলা তা হলে ঘুমপাড়ানী মাসীপিসীর নয়, সেই রাতজাগানী রাজকন্যার যার উপহাসে কালিদাসকে যেতে হয়েছিল বিদ্যানগরে। বীরবল তাঁর দেশবাসীকে করতে চেয়েছিলেন জাগরূক ও রসজ্ঞ। এ সম্বন্ধে তাঁর কথা বিশদভাবে বলছেন তাঁর 'রূপের কথা'য়।

"শিবজ্ঞান আসে সব চাইতে আগে—কেননা মোটামুটি ও জ্ঞান না থাকলে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া তো দূরের কথা।...তার পর আসে সত্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান শিবজ্ঞানের চাইতে ঢের সূক্ষ্ম জ্ঞান, এবং এ জ্ঞান আংশিক ভাবে বৈষয়িক অতএব জীবনের সহায়—এবং আংশিক ভাবে তার বহির্ভূত, অতএব মনের সম্পদ। সব শেষে আসে রূপজ্ঞান, কেননা এ জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম এবং সাংসারিক হিসাবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্য সমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি, সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।...আমার ধারণা, আমরা সব জন্মত কামলোকের

অধিবাসী, সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।"

বীরবল তাঁর দেশবাসীকে রূপলোকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেই জন্যেই 'সবুজ পত্রে'র আবির্ভাব। রূপলোকের লক্ষণ হচ্ছে নিত্য যৌবন। প্রমথ চৌধুরী যৌবনের পূজারী। যৌবন তাঁর মতে মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাই তিনি প্রাণ-উপাসক। তাঁর মন্ত্র "ওঁ প্রাণায় স্বাহা।" এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের জবানী উদ্ধৃত করছি। 'যৌবনে দাও রাজটীকা'য় আছে—

"প্রাণ প্রতি মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়।......প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভুক্ত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি ও জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে, প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই জড়তা প্রাপ্ত হয়।...যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্য নতুন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই।......এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য এবং কী উপায়ে তা সাধিত হতে পারে তাই হচ্ছে আলোচ্য।......সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নতুন প্রাণ, নতুন মন নিত্য জন্ম-লাভ করছে। অর্থাৎ নতুন সুখদুঃখ, নতুন আশা, নতুন ভালোবাসা, নতুন কর্তব্য ও নতুন চিন্তা নিত্য-উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারেন।"

এতবার নতুনের উল্লেখ থাকলেও নতুনের প্রতি নয়, নিত্যের প্রতি তাঁর টান। সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে, এ কথা বলতে পারেন এক তিনি যাঁর মনের ছাঁদ ক্লাসিক। তাঁকে আধুনিকদের দলে ধরলেও আসলে তিনি চিরন্তনদের দলে। তাঁকে নবীন বলাও যা চির নবীন বলাও তাই। এই ছাঁদের মন কোনোরূপ আতিশয্যের আমল দেয় না। সংযমের দিকে, স্বচ্ছতার দিকে এর গতি। এক জায়গায় তিনি বলেছেন,

"ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ না করতে পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করতে পারি তবেই তা পরে সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হবে।......সাহিত্য গড়তে কোনো বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখায় সংযত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া।"

ক্লাসিক মনোবৃত্তির প্রধান লক্ষণ প্রসাদগুণ। আয়াসের চিহ্ন কোথাও নেই।

কিছু বাগ্‌বাহুল্য আছে, সেটা তাঁর বক্তব্যকে অস্পষ্ট করে না। বরং অতিরিক্ত স্পষ্ট করে। তা যদি দোষের হয় তবে বীরবলের একমাত্র দোষ হাতে কিছু না রেখে হাত খালি করে ছড়ানো, অর্থাৎ তিনি যা বলেন তার বেশী ব্যঞ্জিত করেন না, বলার আনন্দে বল নিঃশেষ করেন। কিন্তু এই বাহুল্যও প্রসাদগুণান্বিত। তাঁর রচনার প্রসাদগুণ তাঁর মনেরই প্রতিফলন আর তাঁর মনের পশ্চাতে রয়েছে বহু দিনের মনন ও রোমন্থন। চৌধুরী মহাশয় তাঁর মনটিকে তৈরি করেছেন সক্লেশে, তাই তাঁর বাগ্‌বিস্তার এত অক্লেশ। এবং তাঁর ভাষিতগুলির মধ্যে এতগুলি সুভাষিত। যে মনের এত পরিচ্ছন্নতা তার গঠনের ইতিহাস আমাদের সম্মুখে অনাবৃত নয়, কেননা বীরবল তাঁর প্রথম বয়সের রচনা অল্প প্রকাশ করেছেন। হয়তো অল্পই লিখেছেন, অধিক বকেছেন। আমার অনুমান তিনি তাঁর মনের অনুশীলন করেছেন কথোপকথনে। সে সব কথোপকথনের প্রতিলিপি নেই, থাকলে দেখা যেত কী করে তাঁর মন তার বোঝা নামাতে নামাতে লঘুভার হলো, তাঁর রসনা ক্রমে শাণিত হতে হতে অসিধার হলো, তাঁর কল্পনার থেকে কামনার খাদ গিয়ে বাকী রইল রূপের স্বর্ণাভা। কী করে তিনি যৌবনের অন্তে দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করলেন, একটুখানি আভাস আছে 'কৈফিয়ৎ' নামক একটি কবিতায়।

রসনার প্রসাধন যে বীরবলের সাহিত্য সাধনার অন্তরালে, আমার এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে এক ঢিলে দুই পাখি মরে। প্রথমত তিনি যে কথ্য-ভাষার ভগীরথ এতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। কথক হতে হতে যারা লেখক হয় তারা লেখার কৃত্রিমতা মানতে নারাজ, তাই লেখ্য ভাষাকে মঞ্চচ্যুত করে। কথ্য ভাষার বিপক্ষ দল যদি তর্ক না করে গল্প করতে জানতেন, সোর-গোল না করে আলাপ করতে জানতেন তা হলে একা বীরবল ও তাঁর জনকয়েক শিষ্য মিলে এত কম সময়ে কথ্যভাষাকে আমাদের আসরের ভাষায় পরিণত করতে পারতেন না। লেখ্য ভাষা অবশ্য সরকারী ভাষা, সেটুকু সান্ত্বনা তার থাক।

দ্বিতীয়ত তিনি ছোট গল্পের মুক্তিদাতা। তাঁর হাতে প্রবন্ধও ছোট গল্প, বিবরণ বা সমাচারও তাই। জীবনের যে কোনো ঘটনা বা ঘটলে-ঘটতে-পারত এমন যে কোনো অঘটনা তাঁর কাহিনীর কথাবস্তু। প্লটের জন্যে তাঁর আটকায় না, প্লট না জুটলেও গল্পের উপাদান জোটে। মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হলেই মুখে মুখে গল্প পল্লবিত হয়, সত্য মিথ্যা খেয়াল কল্পনা একাকার হয়ে যায়। গল্প তো আমাদের চারদিকে হাওয়ার মতো ঘুরছে, তাকে বন্দী করার ফন্দী জানলে একাধিক সহস্র রজনী ভোর হয়। বীরবলের গল্পগুলি শ্রুতি-সুখকর, তাদের আবেদন শ্রুতির কাছে। সে হিসাবে সেগুলি খাঁটি গল্প, যাকে ইংরেজীতে বলে yarn. তিনি সুতো কাটতে ওস্তাদ। যেমন মিহি তাঁর সুতো, তেমনি মোলায়েম। যেন মসলিনের সুতো।

'চার ইয়ারী'র উল্লেখ করে শুরু করেছি, সমাপনও করি। 'চার ইয়ারী' থাকবে। শুধু রচনার স্বাদের জন্যে নয়, সৃষ্টির আর্টের জন্যে নয়, চিত্তের

রসের জন্যে নয়, যদিও এর প্রত্যেকটি আপনাতে আপনি মূল্যবান। মন দিয়ে অধ্যয়ন করলে অনুভব করা যায় একটি বিদগ্ধ জীবন রয়েছে ওর পশ্চাতে। ওর অনেকখানি হয়তো কাল্পনিক বা পড়ে পাওয়া। কিন্তু ওর যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগ মণি, যেমন উজ্জ্বল তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর-একখানা 'চার ইয়ারী' লেখা যায় না, কেননা ইচ্ছা করলেই আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার তরুণের চোখে তরুণীকে দেখা যায় না, আর একবার fool হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের swan song গাওয়া হয়েছে ওতে।

(১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন

চার বছর আগে কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আত্রাই নদীর বোটে। পতিসর থেকে ফিরে তিনি ট্রেনের অপেক্ষা করছিলেন। তার পরে আমরা প্ল্যাটফর্মে এলুম ও এক কামরায় উঠলুম। রবীন্দ্রনাথকে এত নির্জনে কোনো বার পাইনি। তখনি লক্ষ করেছিলুম তাঁর আননে অন্য এক সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্য গত বছর শান্তি-নিকেতনে আবার লক্ষ করেছি। সর্বপ্রকার পার্থিব কামনার ঊর্ধ্বে উঠলে সংসার সম্বন্ধে সত্য সত্যই নির্লিপ্ত হলে শিল্পীপ্রকৃতির মানুষের জীবনে যে সৌন্দর্য বিকশিত হয় তার সঙ্গে যদি যোগ দেয় পরিণত বয়সের "all passion spent" ক্ষান্তবর্ষণ শারদাকাশ তবে সেই শারদ সৌন্দর্য বিভাসিত হয় শুভ্র কেশের কাশগুচ্ছের পটভূমিকায় প্রশান্ত উদাস ললাটে। রবীন্দ্রনাথকে এর আগে এত ভালো লাগেনি, এত সুন্দর মনে হয়নি। এই পরিচয় দিয়ে যাবার জন্যে তাঁর এত কাল জীবিত থাকার প্রয়োজন ছিল। জীবন যদি হয় পরিচয়জ্ঞাপন তবে আরো দীর্ঘ জীবনেরও প্রয়োজন আছে। বোধ হয় এই জন্যেই ঋষিরা বলে গেছেন, পশ্যেম শরদং শতং জীবেম শরদং শতং।

মৃত্যুর সমীপবর্তী হয়ে তাঁর মৃত্যুভয় ক্ষয় হয়েছে। মনে হয় তিনি সাগর-সঙ্গমের অস্ফুট কল্লোল শুনতে পেয়েছেন। তাঁর ইদানীন্তন কবিতায় এই বিচিত্র উপলব্ধির বার্তা আছে। শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও এটা একপ্রকার উপভোগ। নিরাসক্ত নিঃশঙ্ক নির্মল হয়ে জীবনকে তিনি চূড়ান্ত উপভোগ করছেন। ব্রাউনিং যে বলেছিলেন—

"Grow old along with me
The best is yet to be"—

তা এই উপভোগের আশায়। এ উপভোগ তখনি আসে যখন মানুষ যাবার জন্যে তৈরি হয়ে যানের অপেক্ষায় বসে। যা কিছু সঙ্গে নেবার তাও গোছানো হয়েছে, যা কিছু রেখে যাবার তাও গোছানো। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, বাইরে কিংবা ভিতরে, পিছনে কিংবা সঙ্গে। কিছু এলোমেলো পড়ে থাকার ক্ষোভ নেই, কিছু অসমাপ্ত রইল বলে খেদ নেই। তাই দু'দিন থেকে যাবার

আগ্রহ নেই। তবে তিনি উতলাও নন। মানুষকে তিনি ভালোবাসেন, মানুষ তাঁকে ভালোবাসে। এই সম্পর্ক হঠাৎ ছিন্ন করবেন কী করে!

উতলা নন। অথচ তাঁর সঙ্গে কথা কইলে বোঝা যায়, যদিও তাঁর ব্যক্তিগত কোনো বাসনা নেই, তবু মানুষের কাছে তাঁর যে বিরাট প্রত্যাশা ছিল সে প্রত্যাশার ক্রমিক অন্তর্ধান তাঁকে বিহ্বল করে তুলেছে। মানবজাতির অধঃপতন যে কত নিম্নে পৌঁছেছে তা মর্মে মর্মে অনুভব করে তিনি বেঁচে আছেন বলে গ্লানি বোধ করছেন। যে জার্মানীতে তিনি রাজসমারোহে অভিনন্দিত হয়েছিলেন সেই তাঁর অতি প্রিয় জার্মানী আজ কোথায়! কোথায় তাঁর আরো প্রিয় জাপান! আর ইংলণ্ড? যে ইংলণ্ড তাঁর আবাল্য শ্রদ্ধাভাজন, যার শ্রদ্ধা তিনি প্রৌঢ় বয়সে লাভ করে বিশ্ববিখ্যাত হন, সেই ইংলণ্ড! তাঁকে যাবার আগে এ-ও দেখতে হলো—এই পতন ও ধ্বংসের চিত্র! আর তাঁর দুর্ভাগ্য দেশ? দেশের জন্যে তাঁর যে আক্ষেপ তা বিলাপের তুল্য, কখনো কখনো প্রলাপের সদৃশ। গৌরব করবার কিছু নেই, আশা করবার কিছু নেই, শুধু দিনযাপনের গ্লানি, শুধু প্রাণধারণের পীড়া। তথাপি তাঁর আস্থা আছে ভারতের উপর, গান্ধীজীর উপর। দেশবিদেশের নবজাতকদের প্রতি, নবীনদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ রয়েছে সব সময়। বিশ্বের অফুরন্ত যৌবনে তাঁর অফুরন্ত বিশ্বাস। তিনি আজকাল ভগবানে বিশ্বাস করেন কিনা প্রশ্ন করে ধরাছোঁয়া পাইনি, কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তারুণ্যে ও মানবের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে তিনি চিরদিনের মতো এখনো বিশ্বাসবান।

তাঁর জীবনের অস্তাচল যদিও মেঘাচ্ছন্ন তবু তিনি একমনে রশ্মি বিকীরণ করে চলেছেন। গ্যোটে ও টলস্টয়ের শেষজীবনের মতো তাঁর শেষজীবনও বিচিত্র প্রয়াসে পূর্ণ। তিনি যে এই বয়সেও প্রচুর লিখে আমাদের প্রত্যহ লজ্জা দিচ্ছেন তা আমরা কনিষ্ঠেরা স্বীকার করি। কিন্তু সেই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি ছবি আঁকি কিনা। আঁকিনে শুনে ক্ষুণ্ণ হলেন, যেন ওর মতো আনন্দ আর নেই। যেন চেষ্টা করলে সকলে পারে। এবার তাঁর ছবি আঁকতে বসা চাক্ষুষ করে এলুম। বললেন তুলি দিয়ে তিনি যেমন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন তেমন লেখনী দিয়ে নয়। দুয়োরানির চেয়ে সুয়োরানির দিকেই তাঁর শেষ বয়সের টান। সম্পাদকেরা তাঁকে লিখতে বাধ্য করেন, নইলে তিনি বোধহয় লিখতেন না, আঁকতেন। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, তবু তুলির আঁচড় জোরালো ও ধারালো। সিংহের মতো থাবা ও নখর দিয়ে তিনি যা আঁকছেন তা এক হিসেবে লেখার চেয়েও দামী। তাতে তাঁর এই বয়সের আসল চেহারা ফুটছে। লেখেন তিনি অভ্যাসবশে। তেমন জিনিস গতানুগতিক না হয়ে যায় না। কিন্তু আঁকার বেলায় অন্য কথা। আমার মনে হয় তাঁর প্রকৃত পরিচয় এক-এক বয়সে এক-একটি মিডিয়ম খুঁজেছে। এখনো তিনি গান রচেন, কিন্তু গানে আর তাঁকে তেমন করে পাওয়া যায় না যেমন করে ছবিতে। পনেরো বছর আগে গানেই তাঁকে পাওয়া যেত, গদ্যে নয়। কবিতা অবশ্য তাঁর জীবন-সঙ্গিনী। কিন্তু তাঁর কবিতাও ক্রমে তাঁর ছবির মতো খাপছাড়া হয়ে উঠেছে।

আমাকে বলছিলেন ছড়া লিখতে। বাংলা কবিতার নিজের রূপটি নাকি ছড়াতেই খোলে। ছড়ার কথা তিনি আমাকে এমন করে বোঝালেন যে আমি অতি সহজেই দীক্ষিত হলুম। তবে এখনো ছড়া লিখিনি। তিনি যেসব ছড়া লিখেছেন সেসব তাঁর ছবিরই আর-এক সংস্করণ। মনে হয় বিশুদ্ধ রেখার মতো বিশুদ্ধ শব্দের ভিতরে যে রস আছে সেই রস তিনি আস্বাদন করেছেন। অর্থের জন্যে তাঁর ভাবনা নেই। ছোট ছেলেরা যেমন হিজিবিজি ও আবোলতাবোলের রসে মুগ্ধ কবিও তাঁর দ্বিতীয় শৈশবে সেই রসের রসিক। তবে এগুলি অর্থ-হীনও নয়, অর্বাচীনও নয়। তাঁর ছবিতে যে জিনিস সব চেয়ে চোখে ঠেকে সে তাঁর জোর, যে জোর ছিল প্রাগৈতিহাসিক মানবের। তাঁর ছড়ায় যে জিনিস কানে বাজে সে তাঁর বিস্ময়, যে বিস্ময়ের সহিত আদি মানব আবিষ্কার করেছিল শব্দের সঙ্গে শব্দ যোজনা করে শব্দধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের ছবি ও ছড়া অবচেতন মনের প্রকাশ। যেন তাঁর মনের নিচের তলায় লক্ষ বছর আগের মন বাস করছে, তাকেই তিনি উপরে উঠে আসতে দিচ্ছেন।

কখনো ছবি আঁকছেন, কখনো ছড়া কাটছেন, কখনো গানে সুর দিচ্ছেন, কখনো নাচের মহড়া দেখছেন। শুনতে পাই গোপনে গোপনে রান্নার পরীক্ষাও চলে, আর হোমিওপ্যাথিক না বাইওকেমিক চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই কর্মিষ্ঠতা তাঁর সারা জীবনের অভ্যাস। শিলাইদহে শুনেছিলুম তিনি নাকি একবার মাটিতে মাছ পুঁতে নতুন রকমের সার তৈরি করতে চেয়েছিলেন, পচা মাছের গন্ধে গাঁয়ের লোকের টেকা দায় হয়েছিল। চাষ করবেন তাঁর ছেলে, সেজন্যে তিনি তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে ক্ষান্ত হননি, একটা আস্ত চর কিনে-ছিলেন বা কিনতে যাচ্ছিলেন কৃষির জন্যে। শিলাইদহের কাছারিতে তাঁর হাতের খানকয় জমিদারি চিঠি পড়েছিলুম। সেসব চিঠিতে তাঁর যে পরিচয় তা একজন ঝুনো জমিদারের। তাতে সাহিত্যের স্বাদ ছিল না, তবে রচনার সৌষ্ঠব ছিল বটে। পতিসরে তাঁর জমিদারি চালনার নমুনা দেখেছি, আর দেখেছি তাঁর প্রজাহিতৈষণার চিহ্ন। প্রজারা যে তাঁকে ভালোবাসত ও ভুলতে পারেনি তা আমি প্রজাদের মুখেই শুনেছি। একবার এক বৃদ্ধের মুখে তাঁর যৌবনের যেসব কাহিনী শুনেছিলুম তার একটি মনে আছে। তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের সময় প্রজারা তাঁকে যেসব উপঢৌকন দিয়েছিল, প্রথম দিন তিনি সেসব নিয়েছিলেন, কেননা ওটা একটা প্রথা। কিন্তু পরদিন তিনি সেগুলি ফিরিয়ে দিলেন। "কী লজ্জা! আমার পিতার শ্রাদ্ধ! আমি নেব তোদের উপহার!" এই বলে তিনি তাদের অবাক করে দিলেন। বোধ হয় এমন অপূর্ব উক্তি ভূভারতের কোনো জমিদারের মুখে শোনা যায়নি। প্রজারা যে তাঁকে ভক্তি করবে এটা স্বাভাবিক। সেবার আত্রাইতে কবি বলছিলেন, "প্রজারা আমাকে দেখতে এসে বলল, পয়গম্বরকে আমরা চোখে দেখিনি। আপনাকে দেখে যাই।"

কিন্তু কর্মিষ্ঠতা যদিও রবীন্দ্রনাথকে গ্যেটে ও টলস্টয়ের সঙ্গে তুলনীয় করেছে তবু তাঁদের সঙ্গে তাঁর মূলত পার্থক্য আছে। কর্মের ভিতর দিয়ে তাঁদের যে চলা তা স্রোতের গতি, তার যতি নেই। আর রবীন্দ্রনাথের চলাচ

পাখির ওড়া। আকাশে ওড়ে, নীড়েও ফেরে।

"যেন আমার গানের শেষে
থামতে পারি সমে এসে"—

একথা ইউরোপের নয়, ভারতের। রবীন্দ্রনাথের সাধনা এই সমে আসার সাধনা। তাঁর অন্তরের অন্তরালে একটি পরম আশ্রয় আছে, সেটি তাঁর নীড়। সেখানে তিনি তাঁর জীবনের পর্বে পর্বে ফিরেছেন, সেইখান থেকে যাত্রা করেছেন। তিনি পদে পদে মিলিয়ে নিয়েছেন আকাশের সঙ্গে নীড়কে, নীড়ের সঙ্গে আকাশকে। তাই তাঁর আদির সঙ্গে অবসানের, উদয়ের সঙ্গে অন্তের একটি গভীর সংগতি পাবে ভাবী কাল। এমন সংগতি, এমন ঐক্য অন্য কারো জীবনে পাবে না এ যুগের।

একদিক থেকে এটা একটা বাধাও বটে। পাখিকে বেশী দূরে উড়তে দেয় না তার নীড়। সে প্রতি রাত্রে ফিরে আসে তার কেন্দ্রে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রাচুর্য আছে, বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তাঁর পক্ষের বিস্তার সীমাহীন নয়, তাঁর জীবনের বাণী নিত্য বলেই তা পুনরাবৃত্তিপরায়ণ। এই ত্রুটি তাঁর একার নয়। এটা তাঁর দেশেরও। আমাদের পক্ষের বিস্তার নেই—কি কায়িক, কি মানসিক। আছে কেবল বাচিক। আমরা ছুটে গেলে ছুটে আসি, উধাও হতে পারিনে। পক্ষান্তরে অমন একরোখা গতি সদ্গতি নয়। ওতে শান্তি নেই। গ্যেটের বা টলস্টয়ের শেষজীবন শান্তির ছিল না। দ্বিধায় সংশয়ে পতনে উত্থানে ব্যাকুলতায় জটিলতায় আবর্তিত ছিল। সেই নিগূঢ় অন্তর্বিরোধ রবীন্দ্রনাথের জীবনে থাকলে তা অত্যন্ত সুশাসিত। তিনি তাঁর পিতার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছেন, যে শিক্ষা পেয়েছেন প্রকৃতির কাছে তার ফলে তাঁর মনে বাইরের বিরোধের ছায়া পড়লেও তাঁর অন্তর নির্দ্বন্দ্ব। সম্প্রতি জগতের অন্যায় ও অনাচার তাঁর মনের উপর আঘাত করছে। কিন্তু ভিতরে শান্তির নীড়।

রবীন্দ্রনাথের ভিতরের বাঁধুনি তাঁকে আজীবন রক্ষা করেছে, জীবনের কোনো অবস্থায় ভ্রষ্ট হতে দেয় নি। সে বাঁধুনি এতই কঠোর যে এই আশি বছর বয়সেও তাঁর কথাবার্তা একটুও বেফাঁস নয়, তাঁর উক্তি অসম্বন্ধ নয়। তিনি যা বলেন গুছিয়ে বলেন, রসিয়ে বলেন। অনুপ্রাস ও উপমা এই বয়সেও আছে। হাস্য পরিহাস এখনো তাঁর স্বভাব। শরীর অবশ্য জীর্ণ হয়েছে, কিন্তু মনের কোথাও জরার লক্ষণ নেই। স্মৃতি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে, তাই ভুল হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু বুদ্ধি তেমনি মার্জিত, কল্পনা তেমনি রঙিন, ভদ্রতা তেমনি অবারিত, স্নেহ তেমনি অকুণ্ঠিত। তাঁর মাজা দুর্বল হয়েছে, নুয়ে নুয়ে হাঁটেন, দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু মজ্জা তেমনি সবল। বুদ্ধির উপর কালের কুয়াশা নামেনি, প্রজ্ঞার দীপ্তি অম্লান। তাঁর ভিতরের বাঁধুনি তাঁকে শেষ বয়সের চরম লজ্জা থেকে রক্ষা করেছে—ভীমরতি থেকে।

রবীন্দ্রনাথ কাজের লোক। উপনিষদে লিখেছে, "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি

জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" কাজ করতে করতে তিনি আশি বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি কেবল কাজের লোক নন, তিনি ছুটির মানুষ। সে ছুটি তিনি কাজের মাঝখানেই ভোগ করেন। যখনি তাঁর কাছে গেছি তখনি তিনি এমন ভাবে অভ্যর্থনা করেছেন যেন তাঁর হাতে দেদার ছুটি, এমন ভাবে কথা কয়েছেন যেন তাঁর সময় কাটছে না। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! কয়েক মিনিট পরে আর-কেউ গিয়ে হাজির। আসলে তাঁর সময় সিকি পয়সাও নেই, তিনি নিরন্তর ব্যাপৃত। অথচ তিনি তাঁর চারদিকে একটি ছুটির আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাঁর ব্যস্ততা বা ত্বরা নেই। কোথায় যে তাঁর ছুটির উৎস আমি তার সন্ধান পাই নি। বোধ হয় মন মুক্ত হলে কাজ মানুষকে বাঁধে না। মানুষ খাটে, কিন্তু সে খাটুনি খেলার মতো লাগে। রবীন্দ্রনাথ মুক্ত পুরুষ। আধ্যাত্মিক অর্থে না হোক, সাংসারিক অর্থে। তাঁর কোনো বাঁধন নেই, তাই তাঁর ভিতরে ছুটির ফুর্তি!

অন্যের বেলায় দেখি বয়স যত বাড়ছে রক্ষণশীলতাও তত প্রবল হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিনা মুক্ত পুরুষ, তাই তিনি সংস্কারমুক্ত। শুনেছিলুম তাঁর সঙ্গে যে কোনো বিষয়ে আলাপ জমানো যায়, এমন কি promiscuity সম্বন্ধেও। তাঁর গত বছর প্রকাশিত 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি পড়ে প্রমাণ পেলুম। কোনো আধুনিক লেখক তাঁর চেয়ে আরো আধুনিক নন, তাঁর দুঃসাহস আমাদের অনেকেরই পক্ষে অসম সাহস। অথচ এমনি সংযত তাঁর শিল্পপদ্ধ যে মনে কোনো বিকার জাগে না। রবীন্দ্রনাথের মনের বাঁধুনি তাঁকে বর্মের মতো রক্ষা করেছে এখানেও। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন এতটা সংস্কারমুক্ত ছিলেন না, তাঁর সতীত্বের সংস্কার একদা অতি দৃঢ়মূল ছিল। মনের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের বাঁধন আলগা হয়েছে। তা বলে তিনি তাঁর বর্ম ও কবচ ত্যাগ করেননি। বরং তাঁর মনের বাঁধুনি শক্ত আছে বলেই তাঁর মন ক্রমে ক্রমে মুক্ত হতে পেরেছে। দেহের বাঁধুনি শক্ত না হলে যেমন আয়ুর ভার বহন করা যায় না মনের বাঁধুনি শক্ত না হলে তেমনি মনের বাঁধন খোলে না। তিনি যে গদ্য, কবিতা লেখেন সেক্ষেত্রেও সেই একই কথা। তাঁর ছন্দের সাধনা নিখুঁত বলেই তিনি ছন্দের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করতে পারেন, তাঁর মিলের হাতসাফাই আছে বলেই তিনি মিলকে সাফ অস্বীকার করতে পারেন। তিনি যে মুক্তক লেখেন তার পিছনে রয়েছে পদ্যের পদ্মাবতীর চরণচারণচক্রবর্তীপনা। জীবনব্যাপী পদসেবার পর তিনি একটু ঢিলে দিচ্ছেন। সে অধিকার তাঁরই আছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন তাঁর জীবনশতদলের মুক্তির ইতিহাস। এক-একটি করে দল খুলেছে, সেই সঙ্গে বন্ধন খুলেছে। সমাপ্তির তটে বসে তিনি প্রতীক্ষা করছেন চরম মুক্তির শেষ খেয়ার।

(১৯৪১)

চোখের দেখা

চোখের দেখার মূল্য কী ? যত লোক তাজমহল দেখতে যায় তাদের সকলে কি তাজমহলের সত্যকার রূপ দেখতে পায় ? তেমনি রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজীর বেলায়।

তবু ইচ্ছা করে চোখে দেখতে, কথা শুনতে, কথা কইতে, পরিচয় দিতে ও নিতে। এবং তার পরে সেসব লিপিবন্ধ করতে। তাতে মহামানবদের প্রতি অবিচার হওয়া সম্ভব সেই আশঙ্কায় এত দিন ইতস্তত করেছি। কিন্তু যদি কোনো দিন না লিখি তবে একজনের সাক্ষ্য একেবারেই গোপন থাকে।

এই প্রবন্ধে আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলব যে রবীন্দ্রনাথ, রম্যাঁ রলাঁ, বারট্রান্ড রাসেল, বার্নার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস ও মহাত্মা গান্ধীকে আমি চোখে দেখেছি, তাঁদের কারো কারো সঙ্গে কথা কয়েছি, তাঁদের একজনের সঙ্গে চা খেয়েছিও। তবে হলফ করে বলতে পারব না যে রলাঁ আমাকে যা দিয়েছিলেন তা চা না কফি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় না হওয়ার এই এক বিপদ যে এসব খুঁটিনাটি আমার স্মরণে থাকে না।

রবীন্দ্রনাথকে দেখতে যেবার শান্তিনিকেতন প্রথম যাই সেবার আমার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না, আর আমিও তখন নামপরিচয়হীন ছাত্র। সেটা বোধ হয় ১৯২৪-এর বসন্তপঞ্চমী। কবির ঘরে সেকালে পাহারা থাকত না, ঘরটিও ছিল খোলা জায়গায়। সটান হাজির হয়ে দেখলুম কবি কী লিখছেন। আমার দিকে দৃষ্টি পড়লে বললুম, "আপনার কাছে একটি জিজ্ঞাসা ছিল, আপনার কি সময় হবে ?" কবি বললেন, "কী জিজ্ঞাসা ?' জিজ্ঞাসাটা অবশ্য ছল। আলাপটাই লক্ষ্য। আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম এমন সময় কবির কয়েকজন আত্মীয় এসে উপস্থিত হলেন, বোধ হয় গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। কবি বললেন, "কাল এসো।" পরদিন কবি একখানি ইংরেজী মাসিকের উপর চোখ রেখে চুপ করে বসেছিলেন, আমাকে লক্ষ করে-কি-না-করে বারান্দায় এলেন একটি গানের সুর গুনগুন করতে করতে। আমি ঠিক কী ভাবে আরম্ভ করব ভাবছি এমন সময় আগমন করলেন তাঁর কন্যা। আমি যে একা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করতে গেছি এই আমার তখনকার দিনের সেরা য়্যাডভেঞ্চার। নারীজাতির সম্মুখীন হতে সাহস ছিল না। আমি প্রস্থান করলুম বিনা বাক্যে। কিন্তু পরাজিত হয়ে পাটনা ফিরলে বন্ধুরা কী বলবে ! আরো এক রাত খরচ করে গেস্ট্ হাউসে থাকলুম। পরদিন ভোরবেলা কবি রাস্তার উপর পায়চারি করছিলেন। আমি পিছু নিলুম। এমন সময় য়্যান্ড্রুজ সাহেবের আবির্ভাব। আমি হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু য়্যান্ড্রুজ সাহেবের দয়ার শরীর, তা ছাড়া কবির সঙ্গে পায়চারি করা কতক্ষণ চলে ! য়্যান্ড্রুজ জোর কদমে পা চালিয়ে দিলেন। আমিও আর কালবিলম্ব না করে ধাঁ করে প্রশ্ন করলুম, "ইয়ে—কী বলে—Is Art too good to be human nature's daily food ?" সেই পাটনা থেকে মুখস্থ করে এসেছি। নইলে মুখে আটকে যেত নিশ্চয়।

কবি বললেন, "আচ্ছা, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায়।"

তাঁর সঙ্গে আরো দু-একটি কথা হয়েছিল। মনে আছে Higher Mathematics সকলে বুঝতে পারে না বলে তাতে জল মিশিয়ে সরল করা সম্ভব নয়। যার ইচ্ছে সে নিম্নতর গণিত অধ্যয়ন করে উচ্চতর গণিতের যোগ্য হোক। উচ্চতর গণিতের সঙ্গে আর্টের তুলনায় তখনকার দিনে আমি অপ্রসন্ন ছিলুম, তর্ক করতে পারতুম। এমন সময়—যাক, ফিরে গিয়ে বলতে পারব যে কবির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। অন্তত কবিকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।

তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় যাইনি। কাগজে দেখেছিলুম তিনি কথা রেখেছিলেন। "একটি বিদেশী ছাত্রে"র প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

এর পরে কতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু প্রথম বারের মতো গ্র্যাণ্ড-ভেঞ্চার আর হয়নি। অভিভূত হয়েছিলুম তাকে দর্শন করে। তাঁর কবিত্ব কেবল কাগজে নয়, জীবনেও। চেহারায়, চাউনিতে, ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, কথায়—কোথাও কবিত্বের অনুপস্থিতি নেই। কোনো সময়েই তিনি কবিছাড়া অন্যকিছু নন। কাব্য ও জীবন এক হয়ে গেছে গঙ্গাযমুনার মতো, তাঁর কাব্যই তাঁর জীবন, জীবনই কাব্য। আমরা যারা কবিতা লিখি, আমরা কি সব সময়েই কবি? সব বিষয়েই? এই জিজ্ঞাসা নিয়ে স্বস্থানে ফিরেছিলুম।

এর এক বছর কি দেড় বছর পরে একদিন আমি গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে—ধার-করা ক্যামেরা, ছবি তুলতে জানিনে—জর্নালিস্ট সেজে প্রবেশ করি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায়। ও ছাড়া প্রবেশের দ্বিতীয় উপায় ছিল না। প্যাটনার সেই অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ। হলটির এক ধারে বুদ্ধমূর্তির মতো বসেছিলেন গান্ধীজী। তাঁর সামনে একটি ছোট ডেস্ক। দিনটা বোধ হয় গরম ছিল, নেতারা বার বার উঠে যাচ্ছিলেন বাইরে গল্পগুজব করতে, কিন্তু মহাত্মাজী অবিচল। কী অসাধারণ ধৈর্য, একাগ্রতা, কর্তব্যবোধ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ভাবে বসে শুনছিলেন, বলছিলেন, লিখছিলেন। আনাগোনা করছিলেন সার আলি ইমামের মতো কত প্রসিদ্ধ লোক, সকলেই ঘুরঘুর করছিলেন একজনকে ঘিরে, কখনো তাঁর কাছে, কখনো তাঁর থেকে দূরে। নেতাদের ছুটি আছে, ছুটোছুটি আছে, কিন্তু মহানায়কের নেই।

গত বছর মালিকান্দায় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছলুম। এবার একটি ডেস্কের একদিকে তিনি, অন্যদিকে আমি। একেবারে সামনাসামনি। ব্যক্তিগত বিষয়ে অল্প কয়েকটি কথা। তিনি শুধু শুনলেন ও মাথা নেড়ে বললেন, "হুঁ।" চাপা লোক, সহজে ধরাছোঁয়া দেন না। আমার শোকের সমাচার শুনে বিষণ্ণ হলেন। বললেন, "এসব কি মানুষের হাতে?" তাঁর স্বর আর্দ্র ও নয়ন স্নিগ্ধ। অন্য এক প্রসঙ্গে একটু হাসলেন। হাসলে তাঁর চেহারা বদলে যায়। চোখের মণি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিশুর মতো সরল তাঁর হাসি। কিন্তু সেও ক্বচিৎ। অধিকাংশ সময় তিনি গম্ভীর, মৌন, স্থির।

খালিগায়ে থাকেন। কিন্তু বিসদৃশ বোধ হয় না। মনে হয় ওই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যা স্বাভাবিক তা সহজ নয়। এতগুলি কংগ্রেসনেতার মধ্যে একমাত্র গান্ধীজীর এই বেশ। তাঁরও চিরদিন ছিল না। তাঁর সাহেবিয়ানা তিনি

দক্ষিণ আফ্রিকায় দিয়ে এলেন, গুজরাতিয়ানা দিলেন ১৯২১এর শেষভাগে মাদুরায়। তিনি বড়ো আশা করেছিলেন যে দেশের লোক তাঁর নির্দেশমতো খাদি তৈরি করবে ও পরবে। যখন দেখলেন যে বছর শেষ হতে চলল, দেশের সাড়া অতি সামান্য, তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে, "as a sign of mourning, he would discard for a month his dhoti, vest and cap, and content himself with a mere loin-cloth, and when needed, an additional piece of cloth to be thrown over the upper part of the body." সেই এক মাসের পর কত এক মাস অতীত হয়েছে, তাঁর সেই শোক দূর হয়নি, এখনো তাঁর অঙ্গে সেই অশৌচের চিহ্ন। ইংলণ্ডের শীতেও তিনি সেই পরিধেয় পরিবর্তন করেননি।

গান্ধীজীকে দেখলে বুঝতে দেরি হয় না যে তাঁর শক্তির বাজে খরচ নেই। অপরের যেমন ধনের রিজার্ভ, রসদের রিজার্ভ, সৈন্যবলের রিজার্ভ, গান্ধীজীর তেমনি আত্মশক্তির রিজার্ভ। তিনি তাঁর সারা জীবন ধরে প্রস্তুত হচ্ছেন, জীবনের ধনুকে ছিলে চড়াতে চড়াতে তাকে শরযোজনার যোগ্য করছেন। হয় লক্ষ্যভেদ করবেন, নয় ভেঙে খান খান হবেন। মধ্য গতি নেই। তাঁকে বৈরাগী বলে ভ্রম হয়, কিন্তু তিনি অস্ত্রসাধক। বৈরাগ্য তাঁর অস্ত্রসাধনার আনুষঙ্গিক।

র‍্যাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি। যাঁরা 'পথে প্রবাসে' পড়েননি তাঁদের জন্যে একাংশ উদ্ধৃত করলুম।

"জাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টাকে তাঁর ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে যে কল্পমূর্তিটি গড়েছিলুম, সেই মূর্তিটিকে ভেঙে ফেলতে হলো বলে দুঃখ হলো, কিন্তু মানুষটিকে ভালোবাসতে বাধল না। বলিষ্ঠমনা পুরুষের বাহিরটা বলিষ্ঠদেহ পুরুষের মতো হয়ে থাকলে শ্রদ্ধা বাড়ত, কিন্তু ঐশ্বর্যময় মনের বাহিরটা শিশু ভোলানাথের মতো দেখে মমতা জন্মাল। দেহে মনে সুসমঞ্জস পার্সন্যালিটি বলতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। গান্ধীকে দেখে নিরাশ হয়েছিলুম, রলাঁকে দেখে হলুম। এঁদের দেহ এঁদের মনের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ও আগুনকে ঢেকেছে, সন্ন্যাসীর গায়ের বিভূতি যেমন তার অন্তরের তপস্যাকে ঢাকে। কিন্তু যেমন গান্ধীর প্রতি তেমনি রলাঁর প্রতি এমন একটি মমতা জাগল যেমনটি নিছক গুণী ব্যক্তির প্রতি জাগে না।"

রলাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সুইটজারলণ্ডে ১৯২৭এর শেষে কিংবা ১৯২৮এর গোড়ায়। আর একটি অংশ উদ্ধার করি।

"এতক্ষণ সহজ ভাবে কথা বলছিলেন আপনার লোকের মতো ঘরোয়া ভাবে মৃদু মিষ্ট হেসে। যেই ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠল অমনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রাজা লীয়রের মতো। নির্বাণোন্মুখ শিখার মতো স্তিমিত নেত্রে আবেগ জ্বলে উঠল। দক্ষিণ হস্ত আবেগে উঠতে পড়তে লাগল বেগময়ী ভাষার সঙ্গে তাল রেখে। তন্ময় হয়ে চেয়ার থেকে সরে সরে এসে খসে পড়েন বুঝিবা। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে তাঁর হৃদয়ের এক স্থলে একটি ক্ষত আছে, সেই ক্ষতটিতে আঙুল ছোঁয়ালে যাতনায় অধীর হয়ে ওঠেন।"

সেই রলাঁ এখন আর শান্তিবাদী নন, এবারকার যুদ্ধে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসিধারণের অনুকূল। বারট্রান্ড রাসেলও তাই। এঁদের দুজনের শান্তিবাদ কেন যে এক মহাযুদ্ধের প্রহার সইল, অন্য মহাযুদ্ধে ভেঙে পড়ল, তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

রাসেলকে দেখি ১৯২৮এর শরৎকালে লণ্ডনের এক সভায়। তাঁর বক্তৃতার বিষয়টি মনে নেই, কথাগুলির একটিও মনে নেই। রাসেলের লেখা যেমন রসাল বক্তৃতা তেমনি নীরস। হয়তো ছাপার হরফে সেই জিনিসই সরস লাগত, কিন্তু সেদিন কান দিয়ে যেটুকু শুনেছি সেটুকু উপভোগ করিনি। তিনি সমস্তক্ষণ কাঠের মতো খাড়া থাকলেন, মাঝে মাঝে পিছু হটলেন ও এগিয়ে গেলেন, তাঁর বক্তৃতার খসড়া রইল তাঁর সামনে কয়েক হাত দূরে আঁটা। হাসলেনও না, হাসালেনও না। যখন লেখেন বোধ হয় খেয়াল থাকে না যে তিনি অভিজাত-বংশীয়, যখন মঞ্চে দাঁড়ান তখন আভিজাত্যের সংস্কার এসে তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁকে দারুভূত করে। কণ্ঠস্বর গম্ভীর, মুখভাব পরিবর্তনহীন। সুগঠিতদেহ, সুপুরুষ, কেশগুলি পক্ক, কিন্তু বার্ধক্যের অন্য কোনো লক্ষণ নেই।

তার কিছুদিন পরে সেইখানেই বার্নার্ড শ-র বক্তৃতা। শ-রও একটা খসড়ার মতো ছিল, কিন্তু তিনি সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন না, তাঁর দৃষ্টি আমাদের সকলের দিকে। কী আশ্চর্য তাঁর কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ, যেন তিনি গানের জন্যে গলা সেধে গলাটিকে সুরেলা করেছেন, আর তাঁর কথাগুলি এত স্পষ্ট যে কেউ যদি ভুল শোনে তবে তা কানের দোষ। বিষয়টি মনে নেই, তবে ফেবিয়ান সোসাইটির উদ্‌যোগে বক্তৃতা, সোশ্যালিজম সংক্রান্ত। তাতে ভাববার কথা ছিল। শ-র বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ভাববার কথাকেও হাসবার কথা করে তুলতে পারেন। তা ছাড়া তিনি সব সময়েই রসিক, মঞ্চে যতক্ষণ ছিলেন সমস্তক্ষণ রসিকতা করছিলেন। এক-এক সময়ে দুষ্টুমি করে হাসি যোগাচ্ছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের উপর কটাক্ষ করতে গিয়ে "ল্যাবরেটরি"র উচ্চারণ করলেন "ল্যাভেটরি"। তাঁর মতো চঞ্চল ও প্রাণপূর্ণ পুরুষ তাঁর বয়সে দেখা যায় না।

তারপরে শ যখন নেমে একটু অপেক্ষা করে আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন তখন লক্ষ করলুম তাঁর পোষাক অতি সাদাসিধে, কোট আর টাই ম্যাচ করছিল কি না সন্দেহ। বই লিখে বহু টাকার মালিক তিনি, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী লেখক। কিন্তু নিজের জন্যে ব্যয় করেন অতি সামান্য, থাকেন একটা ফ্ল্যাটে— তখন থাকতেন। তাঁর ব্যবহারও তেমনি সাদাসিধে। মঞ্চে তাঁর আচরণে একটু যেন অভিনয়ের ভাব আসে, নেমে এলে তিনি সকলের একজন। তিনি দীর্ঘকায়, কিন্তু কৃশ। আর তখন তাঁর যে বয়স সে বয়সেও তিনি তালগাছের মতো সোজা। ঠিক যেন একটি তালপাতার সেপাই।

ওয়েলস্‌কে আমি বিলেতে দেখিনি। দেখি আড়াই বছর আগে বোম্বাই শহরে। তিনি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছিলেন, জাহাজ যে কয় ঘণ্টা বোম্বাইতে থামে সেই কয় ঘণ্টার জন্যে শহর দেখতে বেরিয়েছিলেন। মাদাম ওয়াডিয়া তাঁর ওখানে আমাদের জনকয়েককে ডেকেছিলেন ওয়েলসের সঙ্গে আলাপ করতে। সময় অল্প,

আমার বোধহয় কোনো আশাই ছিল না মহিলাদের ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে ভিড়বার, যদি-না মহিলাদের মধ্যে কে একজন লজ্জাশীলা আমাকেই দূতরূপে পাঠাতেন তাঁর জন্যে অটোগ্রাফ আনতে। আমিও সেই খাতাখানা পতাকার মতো ধরে পথ করে নিলুম ওয়েলসের কাছে। বিলাতের বৈজ্ঞানিকদের সভায় ওয়েলস্ কী বলেছিলেন, কী করে তাঁদের দ্বারা বিশ্বের দুর্গতি মোচন হবে, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে দুটো একটা কথা হতে-না-হতেই চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন লীলাবতী মুনশি। আমার বসে থাকা বিশ্রী দেখায়, বিশেষত মহিলাটি যখন মহামান্য মন্ত্রীর স্বনামধন্য পত্নী এবং ইতিমধ্যে একদিন আমাকে চা-য় ডেকে ধন্য করেছেন। মাঝখান থেকে আমার অটোগ্রাফ নেওয়া হলো না।

ওয়েলস্ মানুষটি বেঁটেখাটো, গোলগাল, আঁটসাট। তাঁর পোষাক সাদাসিধে, কিন্তু শ-র মতো অপরিপাটি নয়। তিনি একান্ত মৃদুভাষী, কথা বলেন ধীরে ধীরে, কথাও এমন কিছু চটকদার নয়। তাঁকে দেখতে বেশ ভালো লাগে। চেহারা ভালো হোক না হোক তাঁর মুখে এক প্রকার অদম্য ভাব আছে। ইংরেজ জাতির প্রধান গুণ এই অদম্যতা। হাজার বিপদ ঘটলেও তারা দমে না, তারা সহজভাবে নেয়। হাজার ধাক্কা খেলেও তারা নড়ে না, অটল থাকে। আত্ম-প্রত্যয়ের জন্যে তিনি ও তাঁর স্বজাতি সুবিখ্যাত। ওয়েলস্ কিন্তু অকপট ও নিরহংকার। তিনি যতক্ষণ ছিলেন সকলের সঙ্গে সমান হয়ে মিশেছিলেন, বুঝতে দেননি যে তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো।

(১৯৪১)

বিনু

বিনু যখন খুব ছোট তখন তার বাবা তাকে এক আলমারি বই দিয়ে বললেন, "এখন থেকে তোর কাছে রইল এর চাবি।" বিনু যেন স্বর্গ হাতে পেল। বইগুলি পড়ে বোঝবার মতো বিদ্যা তার ছিল না, তবু দিনরাত নাড়াচাড়া করত। বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, ছোট বড়ো কত রকম বই। হঠাৎ একদিন সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল গৃহদাহে। বিনুর সে কী দুঃখ! তারপর তার কাকা আনিয়ে দিলেন একখানা শিশু মাসিক। তা পড়ে তার শখ গেল সেও মাসিকপত্র চালাবে। হাতে লিখে বের করল একখানা নকল মাসিক, তাতে বিজ্ঞাপনেরও নকল থাকত। ত্রিবর্ণ আর একবর্ণ চিত্র বিনু নিজে আঁকত। গল্প আর কবিতা, নাটক আর উপন্যাস অভাব ছিল না কিছুরই। অভাব ছিল শুধু পাঠকের।

এমনি করে তার সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি হলো। তারপর এক শুভদিনে স্কুলের ছেলেদের সমিতির আলমারি পড়ল বিনুর হাতে। বিনু ক্লাস পালিয়ে সমিতির ঘরে ঢুকত, আলমারি খুলে কেবল মাসিকপত্র পড়ত। তখনকার দিনের প্রায় সব ক'টি প্রসিদ্ধ মাসিক নেওয়া হতো বিনুদের স্কুলে। তাদের মধ্যে ছিল 'সবুজ পত্র'। বিনু যে ওর এক বিন্দু বুঝত তা নয়, কতই-বা তখন তার বয়স

বারো কিংবা তেরো। তবু সেই বয়সেই তার আশ্চর্য লাগত বীরবলের লেখা, তাঁর স্টাইল, তাঁর রসিকতা। তখন থেকে মনে মনে সে তাঁর একলব্য।

কিন্তু এই সব পড়াশুনার সদ্য ফল কিছুমাত্র ছিল না। বিনুর মাসিকপত্র বন্ধ হয়ে গেছল, কেননা পরের নকল করতে তার উৎসাহ ছিল না। সে প্রায় সমস্তক্ষণ পড়ত। তাও পাঠ্যপুস্তক নয়, এই সব মাসিকপত্র ও সাহিত্যগ্রন্থ। ইংরেজী মাসিকপত্র পড়তে পড়তে সে চলে গেল আর-এক রাজ্যে। ভাবতে থাকল কী করে একদিন জাহাজের খালাসী হয়ে দেশান্তরে পালাবে। তারপর ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্র পড়তে পড়তে তার দৃষ্টি পড়ল রাজনীতির উপর। অমৃতসর, গান্ধী, খেলাফৎ। এ সকলের ঠিক মানে বোঝবার মতো বয়স তার হয়নি, তবু তারও ইচ্ছা যেত দেশের কাজ করতে। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তার ধারণা জন্মিয়েছিল সে-ও অমন আগুনভরা সম্পাদকীয় লিখতে পারে, বানাতে পারে এক-একটি কাগজের বোমা।

বিনু একদিন সত্যি সত্যি এসে কলকাতার রাজপথে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল। উদ্দেশ্য সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়ে দেশ উদ্ধার। অথবা খালাসী হয়ে জাহাজে চড়ে আমেরিকা যাত্রা। দুটোর কোনোটাই হলো না। সম্পাদকদের একজন বললেন, "এডিটোরিয়াল লিখতে চাও, বেশ কথা। কিন্তু তার আগে শিখে রাখতে হয় প্রুফ দেখা।" প্রুফ দেখে বিনুর চক্ষুস্থির। আর একজন বললেন, "আগে শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং, তার পরে জর্নালিজম।" শর্টহ্যান্ড শিখতে গিয়ে বিনুর কান্না পেল। কোথায় কাগজের বোমা, অগ্নিবর্ষী কামান, আর কোথায় সরু সরু দাঁড়ি আর ডট! জাহাজের দিকে তাকিয়ে বিনুর বুক কাঁপে। সাত সমুদ্র তেরো নদী। একবার খালাসী হলে কি আর খালাস আছে!

কলেজে ভর্তি হয়ে বিনু পরাজয়ের গ্লানি পরিপাক করল। জীবনের প্রথম পরাজয়। সেই গতানুগতিক গোলামখানা জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন পাঠ্য গ্রন্থ, শিক্ষায়তনের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কৃত্রিম জীবন। অসহযোগীর অধিকাংশই ফিরছিলেন, প্রত্যেকেই এক-একটি বিনু, কে কাকে লজ্জা দেবে? সকলে সকলের লজ্জা ভাগ করে নিল। তবু সেই পশ্চাদ্ অপসরণের গ্লানি বিনুকে বহু দিন নির্জীব করেছিল। মনের সেই নিরবলম্ব অবস্থায় সে সাহিত্যের দিকে মন দিল। এত দিন সাহিত্যের খোঁজ রাখেনি, আবার নতুন করে পড়ল। এবার পড়ল ইবসেন, বার্নার্ড শ, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি, রলাঁ। বিশুদ্ধ সাহিত্য তাকে তৃপ্তি দিল না, সাহিত্যের ভিতরে সে অন্বেষণ করল সামাজিক তাৎপর্য, social significance. নানা বিচিত্র সমস্যার ঘূর্ণিপাক তাকে ব্যাকুল করল। তার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের পসরা নিয়ে সাহিত্যের বাজারে ফেরি করার কথা তার মনে ওঠেনি। নিজের কাঁদুনি নিয়ে কবিতা লিখতে, নিজের কল্পনা ফলিয়ে গল্প লিখতে তার রুচি ছিল না। সে যদি কোনো দিন কলম হাতে নেয় তবে সেই কলম হবে তার তলোয়ার, তাই দিয়ে সে কালাপাহাড়ী করবে, এই ছিল তার তৎকালীন স্বপ্ন। সাহিত্যিক—বিশুদ্ধ সাহিত্যিক—হতে তার ইচ্ছা ছিল না, সে আশাও করেনি যে একদিন সে হবে কবি, কথাসাহিত্যিক।

কিন্তু ভাগ্যদেবতার চক্রান্ত চলছিল তাকে সাহিত্যিক করবার। বিন্‌ প্রেমে পড়ল। প্রেমে পড়ে তার প্রধান কাজ হলো চিঠি লেখা, তার পরে কবিতা লেখা। তিনটি বছর এই সাধনায় সমাহিত থেকে সে আবিষ্কার করল যে সে লিখতে জানে। এর জন্যে তাকে শর্টহ্যান্ড শিখতে হবে না, প্রুফ দেখতে হবে না, শুধু অন্তরের কথা অন্তরের তটে পৌঁছে দিতে হবে। তার লেখনী যেন খেয়ানৌকো, এ-কূল থেকে ও-কূলে পার করাই তার কাজ। কাগজের বোমা, কাগজের তলোয়ার কোথায় পড়ে রইল। বিন্‌ হলো খেয়ানৌকোর পাটনী।

তার সাধনা কথা বলার সাধনা। বোবা সংগ্রাম করছে সবাক হতে। ভাবপ্রকাশের জন্যে সংগ্রাম, struggle for expression. পাঠক তো মাত্র একজন। সেই একজনের জন্যে কী অবিশ্রাম উদ্যম! বলতে হবে, ঠিকমতো বলতে হবে, পরিমিত ভাবে বলতে হবে, হাতে রেখে বলতে হবে। একটিও শব্দ বেশী হবে না, কম হবে না, অপ্রযুক্ত হবে না। পাঠক যদিও একজন তবু লেখা হবে সকলের সেরা। বিনুর প্রয়াস যাতে তার প্রত্যেকটি কথা হয় পড়বার মতো, দুবার পড়বার মতো, আবার পড়বে বলে তুলে রাখবার মতো। যে কৌটোয় বিনুর প্রাণ আছে সে কি নিতান্ত একখানা চিঠি? সে সাহিত্য দুজনের গোপনীয় সাহিত্য।

এর পরে বিনু চলে গেল মথুরায়। তার প্রেমের পরিণতি মাথুরে। যাবার আগে তার এই প্রত্যয় জেগেছিল যে সে সাহিত্যিক ছাড়া আর-কিছু নয়, সাহিত্য ছাড়া আর সবই তার কাছে পরধর্ম। যে জীবিকা সে অবলম্বন করেছিল তাতে তার মন ছিল না। কী আর করবে? সাহিত্যিক হিসাবে তার আয় এক পয়সাও নয়, কিন্তু বাঁচতে হলে পয়সা দরকার। সাহিত্যই যদি তার জীবিকা হতো তা হলেই জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য হতো। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন অপর কোনো জীবিকা স্বীকার করতেই হবে, নইলে অনশন। অসামঞ্জস্যের কাঁটা ফুটে থাকল তার মর্মে।

২

যেদিন জানল যে সাহিত্যিক ছাড়া আর-কিছু নয় সেদিন থেকে তাকে পীড়া দিতে থাকল দুটি প্রশ্ন। এক, কিসের জন্যে সাহিত্য? দুই, কাদের জন্যে সাহিত্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলতেন, জাতীয় ভাবধারায় অবগাহন করে জাতীয় বেশ পরিধান করে বিশ্বসভায় যাতে আসন পায় এই দেশ সেইজন্যে সাহিত্য। কেউ বলতেন, শিক্ষার জন্যে সমাজ সংস্কারের জন্যে সমাজবিপ্লবের জন্যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে জনমনের আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্য। কেউবা বলতেন, চিত্তশুদ্ধির জন্যে ভাগবত উপলব্ধির জন্যে দেবজীবনলাভের জন্যে নৈতিক উৎকর্ষের জন্যে সাহিত্য। এমনি কত কথাই বিনু শুনল। মথুরায় গিয়ে দেখল, ওখানে মানুষকে এমন ভাবে ব্যবচ্ছেদ করা হচ্ছে যেন মানুষ বলে কিছু নেই, আছে তার দেহ, তার মন, তার ব্যবহার, তার এলোমেলো চিন্তা ও লাফ দিয়ে

চলা স্বপ্ন, তার চেতনাপ্রবাহ, তার অবচেতনা, তার রকমারি কম্‌প্লেক্‌স, তার কত রকম রিফ্লেক্‌স। সাহিত্য বলতে ওখানে কী না বোঝায়! বিনু তো দিশা হারাতে বসল। তখন তার হৃদয় বলে উঠল, না, না, নেতি, নেতি।

আর্টের মধ্যে অনেক জিনিস আসতে পারে, যেমন নৌকোর মধ্যে। কিন্তু আর্টকে হতে হবে আর্ট। সাহিত্যকে হতে হবে সাহিত্য। কী করে তা হবে সে কৌশল যারা জানে তারাই সাহিত্যিক, তারাই আর্টিস্ট। তারা হৃদয়বান, তারা বিদগ্ধ, তারা মানুষকে মানুষ বলেই ভালোবাসে, প্রকৃতিকে প্রকৃতি বলেই। তারা সৃষ্টি করে সৃষ্টির জন্যেই, লেখনী দিয়ে খেলনা বানায় খেলার জন্যে।

কিসের জন্যে আর্ট? আর্টের জন্যে। আর্ট ফর আর্টস সেক—এই উত্তরই আর্টিস্টের উত্তর, যদি তিনি আর্টিস্ট হয়ে থাকেন। যাঁদের উত্তর অন্যরূপ তাঁরা আর্টিস্ট নন, তাঁরা ছদ্মবেশী শিক্ষক কিংবা সংস্কারক, সৈনিক কিংবা বিপ্লবী। তাঁরা বায়োলজিস্ট কিংবা প্যাথোলজিস্ট হয়তো, অথবা সাই-কোয়্যানালিস্ট। তাঁরা দেশানুরাগী কিংবা গণপ্রেমিক হয়তো, অথবা যোগী। আর্ট ফর আর্টস সেক তাঁদের অনুমোদন পায় না। তাঁরা বলেন, Art for the sake of someting higher কিন্তু বিনু বলে, জগতে আর্টের চেয়ে বড়ো অনেক কিছু আছে, কিন্তু আর্টিস্টের কাছে আর্টের চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই। সতীর চোখে তার নিজের পতিটিই সকলের চেয়ে সুন্দর; মহৎ, শ্রেষ্ঠ— যদিও অপরের চোখে পাজি আর নচ্ছার, কালো আর কুৎসিত। তেমনি আর্টিস্টের কাছে আর্টই highest, তার চেয়ে higher কিছু নেই। তাই তার বন্ধু যখন প্রশ্ন করেন, আর্টাৎ পরতরং নহি? সে উত্তর দেয়, নহি।

সাহিত্যকে হতে হবে সাহিত্য। সে কৌশল যারা জানে তারাই সাহিত্যিক, তারাই আর্টিস্ট। তারা তো বলবেই, আর্ট ফর আর্টস সেক, সাহিত্যের জন্যে সাহিত্য। কিন্তু ওর মানে এও নয় যে আর্টের জগৎ একটা অন্ধকূপ, তার ভিতরে বাইরের আলো হাওয়া যাওয়া আসা করে না। এও নয় যে শিল্পী বাস করে গজদন্তের গম্বুজে, দুনিয়া পুড়ে ছারখার হলেও তার বেহালা বাজানো বন্ধ হয় না। বিনু বলে, আমি ভালোবেসেছি। কখনো নারীকে, কখনো শিশুকে, কখনো বন্ধুকে, কখনো অপরিচিতকে, কখনো দেশকে, কখনো বিদেশকে। কখনো আইডিয়াকে, কখনো আইডিয়ালকে। আমি ভালোবেসেছি মানুষকে ও মানুষের পরে প্রকৃতিকে। সেই ভালোবাসা আমাকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়েছে, হাতে ধরে লিখিয়েছে। আমি তোমার শৌখীন লেখক নই, না লিখলেও যার চলে। অথবা নই পেশাদার লেখক, না লিখলে যার চলে না। যাদের দেখেছি চিনেছি ভালোবেসেছি তাদের কথা লিখেছি, প্রাণ দিয়ে লিখেছি, লেখায় প্রাণসঞ্চার করেছি। আমি প্রেমিক লেখক। ধর্ম বা নীতি, জাতীয়তা বা সাম্যবাদ, মনোবিকলন বা জৈব ব্যবহার, সাহিত্যে এদের স্থান আছে, কেননা জগতে এদের স্থান আছে। আমি তো এমন কথা বলিনি যে, ঠাঁই নাই ঠাঁই নেই ছোট সে তরী। আমার তরীতে ঠাঁই দিয়েছি সবাইকে। কিন্তু ভাই, আমার সোনার তরীতে যদি সোনার ধানই না থাকল তবে বাকী সব থেকে হবে কী? ও

কি সাহিত্য হবে ? যখন বলি আর্ট ফর আর্টস সেক তখন শুধু এই কথাই বলি যে সোনার ধানের জন্যে সোনার তরী। তা বলে অন্য জিনিসকে বাদ দিইনে, ওজন বুঝে জায়গা দিই।

এবার বিনুর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা। কাদের জন্যে আর্ট ? এই ভেবে বিনু একদা কাতর হয়েছে যে তার এত পরিশ্রম বৃথা যাচ্ছে, জনসাধারণের কাজে লাগছে না, ভোগে লাগছে না। ভেবেছে বোধ হয় তার লেখার মধ্যে এমন মাধুরী নেই যার জন্যে জনসাধারণ চাতকের মতো তার দিকে চেয়ে থাকবে। দোষটা তবে কার ? এই অপরূপ সমাজব্যবস্থার যা শতকরা সাতজনকে অক্ষর চিনতে শিখিয়েছে, হয়তো একজনকে বই কিংবা মাসিক কেনবার মতো অর্থ দিয়েছে ? অথবা বিনুর নিজের ? দোষটা বিনু ঘাড়ে টেনে নিয়ে মনে মনে বড়ো কষ্ট পেয়েছে। যে দেশের সমাজব্যবস্থা এইরূপ সে-দেশে জন্মিয়ে তার প্রথম কর্তব্য কি নয় দেশকে নতুন সমাজব্যবস্থা দেওয়া ? সাহিত্যসৃষ্টির আগে সমাজ ভাঙাগড়া, রাষ্ট্র ভাঙাগড়া ? কিন্তু তাই যদি করে তবে লিখবেই বা কবে, কোন্ জন্মে ? যদি ভাঙাগড়ার কথাই লেখে তবে সে কি হবে সাহিত্য ? সাহিত্য কি সমাজের প্রয়োজনে হয় ? না অন্তরের প্রেরণায় ?

বিনু হৃদয়ঙ্গম করল যে ইচ্ছা করলে সমাজ ভাঙাগড়ার কথা লেখা যায়, কিন্তু তার দ্বারা না হয় সমাজের পরিবর্তন, না হয় সাহিত্যের সৃজন। যে সমস্যা এক দিনের নয় সে সমস্যা রাতারাতি যাবার নয়, যারা তার জন্যে দেহ-পাত করতে ইচ্ছুক তাদের জীবনব্যাপী অধ্যবসায় করতে হবে। কে জানে কত-কাল লাগবে শতকরা সাতাশ জনকে সাক্ষর করতে, শতকরা দশ জনকে বই কেনবার অর্থ দিতে ? জনসাধারণের সাহিত্যরসাস্বাদন বিনুর জীবনে হবার নয়। বিনু তা হলে করবে কী ? লিখবে না, যেহেতু মাত্র জনকয়েক মধ্যবিত্ত পাঠক তার উপভোগী ? লিখবে, কিন্তু ভাঙাগড়ার কথাই লিখবে ? অথবা লিখবে এমন ভাবে যেন একদিন শিক্ষাবিস্তার ও বিত্তসূবণ্টন হলে সব শ্রেণীর লোক সেই সৃষ্টির অধিকারী হতে পারে ? দিয়ে যাবে এমন একটা রস যা সমাজবিপ্লবের আগে রাষ্ট্রবিপ্লবের আগে ফুরিয়ে যাবে না, জনসাধারণ যতদিন না ভোগক্ষম হয় ততদিন বর্তে থাকবে ? এমন এক অমৃত যা আপাতত অল্প কয়েকজনের পাতে পড়লেও কালক্রমে সর্বজনের হাতে পড়বে ?

প্রথম কর্তব্য—বিনু বুঝল—সমুদ্রমন্থন। অমৃত যখন উঠে আসবে সে বস্তু সকলের জন্যেই আসবে, যদিও উপস্থিত জনকয়েক ভাগ্যবন্ত তার ভোক্তা। কাদের জন্যে লিখেছে, এ প্রশ্ন তাকে বিমর্ষ করলেও আসল প্রশ্ন, কী লিখেছে ? যা লিখছে তা কি অমৃতরুচি ? যদি অমৃতপিপাসা মেটাতে পারে তবে আজ তার দ্বারা জনকয়েকের হলেও এক শতাব্দী পরে কোটি কোটি জনের তৃষা মিটবে। তার রচনা হবে চিরকালের ক্লাসিক। আর যদি অমৃতের সন্ধান না পায় ও অমৃতের মধুচক্র না রচে তবে আজকের জনসাধারণ তাকে মাথায় তুলে নাচলেও কালকের জনসাধারণ তাকে পুঁছবে না।

কাদের জন্যে সাহিত্য ? যারা ভালোবাসে ও ভালোবাসবে তাদের জন্যে।

যারা রস পায় ও পাবে তাদের জন্যে। যারা আজ সমাজব্যবস্থার দরুন রস-পানে বঞ্চিত তাদের জন্যে বিনুর দুঃখ হয়, কিন্তু যারা বঞ্চিত নয় তারাও কি বিনুর লেখা কিনে পড়ছে ও পড়ে আনন্দ পাচ্ছে? যাদের ক্ষমতা আছে তাদের কি পিপাসা আছে? না যদি থাকে তবে জনসাধারণের জন্যে মাথাব্যথাটা মাথার বাজে খরচ। তারা শিক্ষিত ও সমর্থ হলেও ঠিক এমনি উদাসীন হতে পারে সাহিত্যের প্রতি, ক্লাসিক ফেলে ডিটেকটিভ নভেল পড়তে পারে।

৩

ক্লাসিক রচনার অভিলাষ নিয়ে বিনু এর পরে ক্লাসিক পড়ল। গ্রীক ট্র্যাজেডি, সংস্কৃত কাব্য, দান্তে শেকসপীয়ার গ্যেটে টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ এসব নাড়াচাড়া করে তার এই প্রত্যয় দৃঢ় হলো যে জীবনের উপলব্ধি গভীর না হলে সাহিত্যে গভীরতা আসে না, সাহিত্যকে আলো যোগায় জীবন, যেমন সূর্য যোগায় চাঁদকে। লিখে ফল কী, যদি বাঁচতে না জানি, ঠিকমতো না বাঁচি! সে লেখা দু'দিন একটু ঝিকিমিকি করবে, তার পর নিবে যাবে। তাতে থাকবে না জ্যোৎস্নার সুধা, যে সুধার উৎস হচ্ছে জ্যোতি।

বিনুকে যেতে হলো জীবনের কাছে। সাহিত্যের সূর্যস্বরূপ জীবন। জীবন যে তার একেবারেই অজানা ছিল তা নয়, জীবনের কাছেই সে নিয়েছে প্রেমের পাঠ। কিন্তু সেই বিদ্যা যথেষ্ট নয়। কী করে আরো গভীরভাবে বাঁচবে এই জিজ্ঞাসা তাকে অধীর করল। সে নানা কাজে যোগ দিল, নানা লোকের সঙ্গে মিশল, নানা স্থানে ঘুরল। তার লেখা কমে এল, কমতে কমতে একসময় থেমে গেল। লেখনী তুলে নিলেও হাত চলে না, হাতের যেন পক্ষাঘাত। বিনুর মনে হতে লাগল তার লেখার পাট চুকেছে। সে ইচ্ছা করলেও লিখতে পারবে না, সে লেখক নয়, ভূতপূর্ব লেখক। নিজের এই অসহায় দশায় তাকে সান্ত্বনা দিত তার বিশ্বাস। সে বিশ্বাস করত যে লেখার চেয়ে ঢের বেশী গুরুতর সত্যিকার বাঁচা। লিখবার অভ্যাস একবার গেলে আবার আসে না অনায়াসে। তবু তাতেও ক্ষতি নেই যদি জীবনের অভিজ্ঞতা জমতে জমতে জমাট বাঁধে। যার উপর জীবনদেবতার স্নেহ আছে তাকে বাণীও বর দেন সাদরে।

জীবনের জলে স্নান করে বিনু ক্রমে জ্ঞানলাভ করল যে ওটুকু স্নানে তার তৃপ্তি হবে না, অবগাহন করতে হবে অগাধ সলিলে। মহামানবের সাগরতলে ডুব দিতে হবে, তবে যদি পায় মানবজীবনের অমৃত। বিনুর কি এত সাহস আছে যে সে ডুব দিতে পারবে? বিনু এই আইডিয়াটা নিয়ে মনে মনে খেলা করে। আজ নয়, কাল। কাল নয়, পরশু। এমনি করে তার দিন মাস বছর কাটে। দশকও কাটল। এইখানেই তার ট্র্যাজেডি। সে যদি জলে নামল তবে আরো গভীর জলে কেন করল না অবগাহন?

ভীরু। ভীরু। ভয়ানক ভীরু সে। তবে তাকে আমি কাপুরুষ বলব না। সে পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে জীবনের অনেক পরীক্ষায়। কাপুরুষ নয়, ভীরু

সে। সাগরতীরে জলকেলি করে দিনের আলো অপচয় করল। এখন আসছে আঁধার। শুধু যে তার নিজের জীবন আঁধার অর্থাৎ পাকা চুল, তাই নয়। দেশের জীবনেও আঁধার, অর্থাৎ অনিশ্চয়তা। ইউরোপের জীবনে তো মহা তমসা, ঘোর বর্বরতা। এই ঘনায়মান সন্ধ্যায়—যুগসন্ধ্যার—যৌবনসন্ধ্যায় বিনুর পাত্রে সুধা কই? কই সেই জীবনসার যা মৃতকেও নবজীবন দেবে, মুমূর্ষুকে দেবে সঞ্জীবনী আশা?

মুক্তা নেই, আছে গুটিকতক নানা রঙের ঝিনুক। সাগরতীরে বসে বসে বালুর ঘর গড়েছে আর এই সব কুড়িয়েছে বিনু। সেই বালুর ঘরেও ভাঙন ধরেছে। আর সেই সব ঝিনুকও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। তা হলে, বিনু, তুমি করলে কী!

যাক, বিনু হচ্ছে বিনু। সে যা সে তা-ই। যার যতটুকু দম তার ততটুকু দৌড়। বিনু যে টলস্টয়কল্প নয় এর জন্যে আফসোস করে কী হবে? স্বয়ং টলস্টয় কি ব্যর্থ হননি? সাগরতলে ডুব দিয়ে তিনি কি তুলতে পারলেন অমৃত? জনগণের সঙ্গে বাস করলেন, কিন্তু এক হতে পারলেন কি? জনগণের মন চিনলেন—কিন্তু মন পেলেন কি? তাদের জন্যে কত লিখলেন, তারা পড়ল কি তাঁর শেষ জীবনের সেইসব লেখা? এত বড়ো ট্র্যাজেডি পৃথিবীতে বেশী হয়নি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে তিনি ঘৃণা করে সরিয়ে রাখলেন, কেননা ওতে রয়েছে অভিজাতদের অশুচি জীবনকথা। শেষবয়সে প্রায়শ্চিত্ত করে ওসব তো তিনি বিসর্জন দিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের দেশেই এমন দিন এল যেদিন অভিজাত বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল তাঁর প্রিয়তম জনসমাজ, বিপ্লবী জনসমাজ।

আশার কথা এই যে ধীরে ধীরে দিন ফিরছে। টলস্টয়ের বই আজকাল খুব চলছে রাশিয়ায়। সেসব বই যে কেবল তাঁর শেষ জীবনের প্রায়শ্চিত্তের পরের বই তা নয়, প্রথম বয়সের সেই সব পঙ্কিল জটিল চঞ্চল অলস চিন্তাকুল ভাবালু বীর্যবান সম্ভ্রান্ত সমাজের চিত্র। কারণ কী? কারণ সেগুলিও আর্ট। আর্টের আকর্ষণ দুর্বার।

বিনু নিজেকে টলস্টয়ের সঙ্গে তুলনা করতে চায় না। টলস্টয়ের ছিল সাহস, বিনুর তা নেই। বরং তুলনা করা চলে চেখভের সঙ্গে তার। চেখভ যে সমাজের কথা, যে সময়ের কথা, যেমন কারুণ্যের সঙ্গে লিখতেন বিনুর সময় সময় মনে হয় সেও সেই সমাজের কথা, সেই সময়ের কথা, তেমনি কারুণ্যের সঙ্গে লিখছে। আসবে ঝড়, উড়বে ধুলো, কোথায় থাকবে আমাদের এই মধ্যবিত্ত অবসরবিহারী সভ্যতা?

তা বলে ঝড়ও চিরদিন থাকে না, ধুলো মরে যায়। নতুন করে অবসর-বিহারী গজায়, অবসরসম্পন্ন শ্রেণী মাটি ফুঁড়ে বেরোয়। অবসর না হলে, আলস্য না হলে জীবনের সঙ্গে পরিচয় পাকা হয় না, তাই সাহিত্যেরও উৎকর্ষ হয় না। রুশদেশেও চেখভ পড়ে উপভোগ করবার মতো শিক্ষিত-সংস্কৃতিমান সংবেদনশীল মন বিবর্তিত হবে। তেমনি এই দেশেও।

তাই সৃষ্ট সাহিত্যের ব্যর্থতা নেই। বিন্দুর এই সব নানা রঙের ঝিনুক অদূর ভবিষ্যতে উপেক্ষিত হলেও সুদূর ভবিষ্যতে আকাঙ্ক্ষিত হবে, যদি থাকে তাদের মধ্যে একটি হৃদয়ের প্রেম, একটি মনের ধ্যান, একটি জীবনের স্বপ্ন, একটি মানুষের প্রাণ।

(১৯৪০-৪১)

ইশারা

নীতিজিজ্ঞাসা

নিশ্চিন্ত ছিলুম।

ছোট এক ফালি গ্রাম, ওকে ঘিরে দিগন্তজোড়া ক্ষেত। অচল অগোলাকার পৃথিবী, ওকে কেন্দ্র করে সূর্য নক্ষত্র ঘোরে। উপরে ইন্দ্রের রাজ্য স্বর্গ, নিচে যমের রাজ্য নরক। পুণ্য করলে উর্ধ্বগতি, পাপ করলে অধঃপাত।

একটি রাজা, একদল পুরোহিত, গুটিকয়েক বেনে, অনেকগুলি চাষা। এদেরই নিয়ে আমাদের দিন কাটে। এক একটি দুর্গের মতো এক একটি পরিবার, সেও এক একটি ছোটখাটো সংসার। তারই কাজকর্ম নিয়ে সে কী ব্যস্ততা! আগুন জ্বালাতে হবে, রান্না চড়াতে হবে, জল আনতে হবে, কাঠ কাটতে হবে—মরবার ফুরসৎ নেই। পুজোপার্বণ আছে, বিয়ে-পৈতে আছে, এক পরিবার নিজেকে উছলে অপরাপর পরিবারকে কুটুম্বিতায় ভাসায়, পরকে কাছে ডেকে এনে আপনারই বৃহত্তর রূপ দেখে আত্মহারা হয়।

এমনি করে হাজার কয়েক বছর কাটল। ভাবলুম, এই চিরকাল চলে আসছে, এই চিরন্তন। ভুলে গেলুম, তারও আগে হাজার হাজার বছর নয়, লাখ লাখ বছর কেটেছে—গ্রামে নয়, বনে। পশুর সঙ্গে পশুর মতো থেকেছি। ফসল ফলাতে জানিনে, শিকার করি; আগুন জ্বালাতে জানিনে, কাঁচা মাংস খাই। তারও আগে কোটি কোটি বছর উদ্ভিদের সঙ্গে উদ্ভিদের মতো থেকেছি—কখনো জলে কখনো স্থলে। যখন আমাদের মানুষ বলে চেনবার উপায় ছিল না পশু বলে চেনবার উপায় ছিল না উদ্ভিদ বলে চেনবার উপায় ছিল না তখনো আমরা ছিলুম—তখন আমরা ছিলুম আগুনের কোলে।

লাখ লাখ ও কোটি কোটি বছরের তুলনায় হাজার কয়েক বছর কতই বা! তবু অনেক। কৈশোরের এক একটা দিন শৈশবের এক একটা মাসের চেয়েও দীর্ঘ বোধ হয় না কি? আমাদেরও বোধ হলো এই হাজার কয়েক বছরই এত দীর্ঘ যে এই সব—এর আগে বা পরে অন্য কিছু ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। যেমনি আছি তেমনি থাকব। জ্ঞানের চারিদিকে প্রাচীর তুলে চেষ্টার চারিদিকে গণ্ডী কেটে মমতার চারিদিকে মধুচক্র রচনা করে দুঃখে সুখে কালাতিপাত করব।

বটগাছের ঝুরির মতো মানুষ যখন মাটির সঙ্গে অনড় সম্বন্ধ স্থাপন করল তখন নোঙর তোলবার সময় এলো। আমরা যাযাবর—মাটি আমাদের কে? চাষের ক্ষেত আমাদের পায়ের বেড়ী, গ্রাম আমাদের কারাগার। চোখ কান হাত পা চঞ্চল হয়ে বলল, আমরা সুদূরের পিয়াসী। মন সাড়া দিয়ে বলল, বহুৎ আচ্ছা। চোখ চাইল দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ, কান চাইল সতার ও বেতার টেলিফোন, হাত চাইল এমন সব যন্ত্র যাতে আঙুল ছোঁয়ালে আপনি চলে, মাংসপেশীকে যন্ত্রণা দেয় না। এবং পা চাইল রেলগাড়ি স্টীমার মোটর এরোপ্লেন। মন সকলের বাসনা মেটাল। মানুষের পক্ষে পৃথিবী তো গোষ্পদ হয়ে গেলই, পৃথিবীর অনুপাতে মানুষ বড়ো হয়ে গেল। মানুষের মনকে

এখন সৌরজগতেও আঁটছে না, মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোর দাবীর আর লজ্জাভয় নেই। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পর উদ্ভাবন ঝড়ের বেগে চলেছে, বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে।

গত দেড়শো বছরে মানুষ যত অস্থিরভাবে বেঁচেছে গত তিন চার হাজার বছরেও তত অস্থিরভাবে বাঁচেনি। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহুগুণ হয়ে গেছে, তার জ্ঞানবিজ্ঞান তাকে মহাশক্তিমান করেছে, তার প্রেম ইতিমধ্যে কখন পরিবারকে অতিক্রম করে নেশনের ও নেশনকে অতিক্রম করে রেসের (race) প্রতি উন্মুখ হতে চলল। এখন তার যতকিছু আয়োজন সবই ইণ্টারন্যাশনাল। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সীমান্তরেখা উঠে গেছে, একমাত্র সীমান্ত এখন পৃথিবীটা নিজে। এর বাইরে চোখকে তো পাঠাতে পারা গেছে, কানকে পাঠাবারও তো চেণ্টার ত্রুটি নেই, শরীরটাকে পাঠাতে পারলে নরনারায়ণের জয়। একে একে পঞ্চভূতকে বশে আনলে পরে মানুষের যারা আদিম শত্রু—জরা ব্যাধি মৃত্যু—তারাও কতদিন অবাধ্য থাকবে তাও গুনে বলা যায়।

২

বিংশ শতাব্দীর মানুষ কোথায় এসে উপনীত হয়েছে চেয়ে দেখি। সৌরজগতের বিরাট খেলাঘরে আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীটি একটি লাটিমের মতো ঘুর ঘুর করছে, ধূমকেতুর পুচ্ছের বাতাস লেগে যে কোনো দিন মাথা ঘুরে পড়তে পারে এবং একদিন যে সন্নিপাতের রোগীর মতো এর তাপ চলে যাবে এও একরকম স্থির। সৌরজগতের খেলাঘরটাও অতি বৃহৎ নয় এবং সমগ্র জমিটারও জরীপ হয়ে গেছে, space নাকি অসীম নয়। মানুষের জ্ঞান এখন ডিমের ভিতরকার পক্ষিশাবকের মতো ব্রহ্মাণ্ডের ছাতে মাথা ঠুকে বলছে, ভিতরে স্থানাভাব, ছাত ফুঁড়ে বেরুতে চাই।

এদিকে ধরা পড়ে গেছে, মানুষ একটা বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়, পশু পাখী উদ্ভিদের সঙ্গে তার পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। উদ্ভিদে ও মানুষে যে প্রভেদ সেটা একই দেহমনের উনিশ বিশ। মরণের পরে যদি স্বর্গ নরক থাকে তবে প্রত্যেকটি তৃণও স্বর্গ নরকে যাবে, অথচ তাদের পাপ পুণ্য নির্দেশ করে দেবার জন্যে কোনো ঋষিমুনি বা অবতার জন্মাননি, যদি তৃণরূপে জন্মে থাকেন তো আমরা অজ্ঞ। তৃণ তরু ও পশু পক্ষীর সঙ্গে আমাদের নৈতিক উনিশ বিশ কেবল এইখানে যে আমরা অনাদিকাল তাদেরই মতো থেকে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে মহাজনদের নির্দেশ মানতে আরম্ভ করেছি ও দেড়শো দুশো বছর আগে পর্যন্ত সেই নির্দেশকে অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় মনে করে এসেছি।

তারপর দেখছি সূর্য চলছে নক্ষত্র চলছে অণু চলছে পরমাণু চলছে বিজ্ঞান চলছে অর্থনীতি চলছে পার্লামেণ্ট চলছে ব্যাঙ্ক চলছে, সকলের সঙ্গে আমরাও চলছি—পৃথিবীর কোলে বসে মহাশূন্যে, এরোপ্লেনের পিঠে বসে বায়ুমণ্ডলে,

মোটরের কাঁধে বসে দেশ-দেশান্তরে। সবাই পথিক, আমরাও পথিক। এই চলনশীল জগতে স্থির তো কেউ নয় ও কিছু নেই, স্থির কি কেবল নীতিসূত্র? জীবন থেকে স্থৈর্য চলে গেছে, প্রতিদিন আমরা এমন সব সংকটে পড়ছি যখন 'চুরি করিও না' বা 'গুরুজনকে মান্য করিও' আমাদের হাস্য উদ্রেক করছে এবং 'Seventh Commandment' আমাদের কাঁদাচ্ছে। একেলে জীবনে সেকেলে জীবনের ক'টা সূত্রই যে সত্যি সত্যি অনুসৃত হতে পারে এবং ক'টা সূত্রই যে নামমাত্র—প্যারিস শিকাগো বা বুয়েনস্ এয়ার্স্ তার সাক্ষী দিচ্ছে।

সুদ নেওয়া যদি দুর্নীতি হয় তো ব্যাংক তুলে দিতে হয়, জুয়াখেলা যদি দুর্নীতি হয় তবে স্টক্ এক্সচেঞ্জ থাকে না, মিথ্যা বলা যদি দুর্নীতি হয় তো advertising-এর কী দশা হবে, চুরি করা যদি দুর্নীতি হয় তো উঁচু ডিভিডেণ্ড আসে কোত্থেকে? যুদ্ধ করা যদি দুর্নীতি হয় তো অসংখ্য সৈনিক নাবিক বন্দুকওয়ালা বারুদওয়ালা ও তাদের কারখানার মজুর বেকার হয়। সব চেয়ে কঠিন হয় সেই সব মানুষের জীবন যারা কোনো-একটা দুর্নীতির সঙ্গে পরোক্ষভাবে লিপ্ত—যেমন মিথ্যাবাদী সংবাদপত্রের কম্পোজিটর বা উঁচু ডিভিডেণ্ডওয়ালা ব্যবসাদারের কেরানী বা বন্দুকের কারখানার মজুর বা আসামের চা-বাগানের সামান্য অংশীদার। আধুনিক জগতে এমন মানুষ ক'জন থাকতে পারে যারা পরোক্ষেও পাপের সহযোগী নয়? এক মুঠো ভাতের সঙ্গে কত কৃষকের দুর্দশা কত মহাজনের দুষ্কৃতি কত দালালের দস্যুতা জড়িত রয়েছে ভাবতে বসলে খাওয়া হয় না। একখানা কাপড়ের সঙ্গে কত মজুরের রক্ত কত মালিকের লোভ কত পরাজিত প্রতিযোগীর হাহাকার ওতপ্রোত রয়েছে ভাবতে গেলে উলঙ্গ থাকতে হয়। সব ছেড়ে যদি বাতাস খেয়েও বাঁচি তবু কত অণুবীক্ষণাতীত প্রাণীর প্রাণ নিই। এর একটা সরল মীমাংসা করেছেন কোনো কোনো হিতৈষী। নিজের ক্ষেত নিজে চষো, নিজের কাপড় নিজে বোনো, অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখলে অন্যের প্রতি অন্যায় করবার উপলক্ষ জোটে না, অন্যে যদি তোমার প্রতি অন্যায় করে তো অন্যের সঙ্গে তুমি অসহযোগ করো। প্রত্যেকে যদি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয় তো দ্বন্দ্বের কারণ থাকে না।

এরূপ মীমাংসার দুটি দোষ আছে। প্রথমত, এ ধরনের কথা মানুষকে বার বার শোনানো হয়েছে প্রতি শতাব্দীতে। মানুষ শুনতে চাইলেও মানুষের বিধাতা শুনতে চাননি। যে কারণে একটা cell শত সহস্র cell হয়ে মানুষের দেহ গড়ে সেই কারণে একাকার সমাজ শত সহস্র ভাগে বিভক্ত হয়ে মানুষের সভ্যতা গড়েছে। সভ্যতাকে মানবসমাজের একটা ব্যাধি ভেবে হিতৈষীরা ভুল করেছেন। সভ্যতা অসংখ্য ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি, এর ঐকতানবাদনে প্রত্যেকের প্রতিভা মিলিত হয়ে সঙ্গীতের ঝঞ্ঝা তুলেছে। প্রত্যেক মানুষ জমি চষলে ও কাপড় বুনলে অধিকাংশের শক্তির বাজে খরচ হয় বলেই এক অবর্ণ থেকে চাতুর্বর্ণ্যের বিবর্তন হয়েছিল এবং পরে ছত্রিশ জাতেও কুলোল না। হিন্দু

সমাজের মতো বৃহৎ সমাজে ছত্রিশশো জাত ছত্রিশশো পেশা অবলম্বন করল। আজ মানুষের সমাজ আরো বিচিত্র হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ কোনো-একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হলে সেই মানুষটির বিশিষ্ট দান থেকে সব মানুষ বঞ্চিত হয়। আমরা ক্রমশ নির্বিশেষ থেকে বিশেষের দিকে এসেছি, এই আমাদের এভল্যুশন। এভল্যুশনকে পেছিয়ে দিয়ে বা থামিয়ে দিয়ে ফল নেই, যা একবার হতে পারে তা আবার হতে পারে যদি এই একবারটিও তাকে না হতে দেওয়া যায়। বার বার বাধা দিলেও শিশু একদিন যুবা হবেই, চকমকি পাথর একদিন দেশলাই হবেই, আবোলতাবোল একদিন সংগীতে পরিণতি পাবে, হিজিবিজি একদিন চিত্রে, মুষ্টিযোগ একদিন আয়ুর্বেদে। মানুষের মাথার ভিতরে জটার সঙ্গে জটা জড়িয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মাথার উপরকার জটাজুটকে ছেঁটেকেটে সে জটিলতার প্রতিকার করা যায় না। এ জটিলতাকে স্বীকার করে নিতেই হবে, স্বীকার করে নিয়ে এর মূলে রস যোগাতে হবে, বল যোগাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ মানুষের সঙ্গ-কাঙাল, পরস্পরকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। সে বরং মার খাবে ও মার দেবে, তবু একলা থাকার পরম দুঃখ সইতে পারবে না, পাগল হয়ে যাবে। সে সকলের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে বাঁধা পড়তে চায়, কারুর সঙ্গে শত্রুর সম্বন্ধ, কারুর সঙ্গে মিত্রের সম্বন্ধ। কিন্তু কারুর প্রতি উদাসীন হতে তার স্বভাবে বাধে, কেননা কারুর ঔদাসীন্য তার স্বভাবে সয় না। আজকের দিনে যখন সব দেশের সব জাতির মিলে মিশে চলবার সুযোগ উপস্থিত হলো তখন ধাক্কাধাক্কির ভয়ে উদ্ভিদের মতো এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে প্রবৃত্তি হয় কি? মানুষ স্বভাবত সহিংসও নয় অহিংসও নয়, স্বভাবত সহযোগী। পরস্পরের সহিত যোগ দিলে ঠোকাঠুকি বাধবেই, কোলাকুলি করলেও দেহে দেহে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

নরনারীর যেটি পরম মিলন সেটিকেও কি দ্বন্দ্ব বলা চলে না? আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনে দেহ চিরদিনই বাধা অথচ দেহের সঙ্গে দেহ যুক্ত না হলে আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন পূর্ণাঙ্গ হয় না। যার নাম বাধা তারই নাম সেতু। বাধাকে এড়াতে গেলে সুযোগকেও এড়ানো হয়। জাতিতে জাতিতে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে সংঘর্ষ মানুষকে পীড়া দিচ্ছে সেটা মিলনেরই পূর্বরাগ ও অন্য নাম। আঘাত করে ও পেয়ে মানুষ মানুষকে চিনছে, নইলে যে যার পল্লীকুটিরেই পড়ে থাকত, আজকের এই হাটের বারে খোলা মাঠে সকলের সঙ্গে কেনাবেচার ছলে মিলিত হতো না। এত দেশের ও এত জাতির মানুষ কেমন অমোঘভাবে এক পৃথিবীর ও এক মহাজাতির মানুষ হয়ে উঠছে তা যখন ভাবি তখন কোনো ক্ষতিকেই ক্ষতি বলে মনে হয় না, যুদ্ধকে মনে হয় সন্ধিরই উপায়।

৩

বস্তুত সমাজ নামক ব্যাপারটাই একটা বিশৃঙ্খলা। কত লক্ষ লক্ষ মানুষকে কত কোটি কোটি প্রাণীকে কত অগণিত পরমাণুকে নিয়ে আমাদের সমাজ। নিজের সুবিধামতো একে ছোট বড়ো করতে পারিনে, বেড়া দিয়ে একে ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত করতে গেলে ঝড় এসে বেড়া ভেঙে দেয়, আমাদের সাধ্য অনুসারে আমরা এর যতটুকু পরিবর্তন ঘটাতে পারি ততটুকুতে আমাদের সাধ মেটে না। তাই সন্ন্যাসীরা সবাইকে বলেছেন সমাজছাড়া হতে। রুশো বলেছেন আদিম অবস্থায় ফিরতে, থোরো বনে গেছেন, অভাব সংক্ষেপ করার পরামর্শ যে কত হিতৈষী দিয়েছেন, সংখ্যা হয় না। কামনাকে অংকুরে বিনাশ করার উপদেশ তো তিন হাজার বছর শুনে আসছি। আশ্চর্য এই যে এখনো মানুষ বিশৃঙ্খলান নামে আঁৎকে ওঠে! এ যেন আগুনের ভিতরে থেকে আগুনের নামে আঁধার দেখা। পৃথিবীটা একটা মস্ত এরোপ্লেনের মতো আমাদের নিয়ে মহাশূন্যে উড়ছে, যে-কোনোদিন চুরমার হয়ে যেতে পারে, আর আমরা উটপাখীর মতো মাটিতে মাথা পুঁতে ভাবছি, safety first! সমগ্র মানবজাতিটা যদি অভাব সংক্ষেপ করতে করতে নির্বাণও পেয়ে যায় তবু এত বড় জগতের অল্পই এসে যাবে, হয়তো একদিন পশুদের কেউ মানুষের মতো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে ও এমনি বিশৃঙ্খল সমাজ নিয়ে মহাসমস্যায় পড়বে। হয়তো অপরাপর গ্রহনক্ষত্রে এর বাড়া বিশৃঙ্খলা এর আগে দেখা দিয়েছে বা এর পরে দেখা দেবে।

সমাজ নামক ব্যাপারটা যে একটা বিশৃঙ্খলা এ আমরা অনেক আগেও জানতুম, কিন্তু এমন প্রবলভাবে জানিনি। এর কারণ এখন সমাজ বলতে আমরা গ্রাম্য সমাজটি বুঝিনে, এখনকার সমাজ সমস্ত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো। ইউরোপে যুদ্ধ বাধলে ভারতবর্ষে বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ হয়, আমেরিকায় অজন্মা হলে ইংলণ্ডে অন্নের দুর্ভিক্ষ, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখলে হাঙ্গেরীর প্রেমিক প্রেমিকেরা প্রেমপত্রের খোরাক পায়, আমেরিকা সাকো ভানজেটিকে ফাঁসি দিলে ভারতবর্ষ আক্ষেপ জানায়। এখনকার সমাজকে প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলোর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যেমন অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে বাদল এলে আসামে বৃষ্টি হয়, জাপানে ভূমিকম্প হলে চীনদেশে তার রেশ পোঁছয়, উত্তর মেরু থেকে বরফ নড়লে নিউইয়র্কে শীত পড়ে, চন্দ্র সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী এসে পড়লে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

এখনকার সমাজকে প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলোর সঙ্গে কেবলমাত্র তুলনা করলে চলবে না, তাদের অন্যতম বলেও মনে করতে হবে। পরমাণুর ঝাঁক ও পাখীর ঝাঁক, cell-এর দল ও মানুষের দল একই নিয়মের অধীন। সবাই সর্বক্ষণ সচেষ্ট, এবং কেউ কারুর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমরা যখন বিশ্রাম করি তখনো আমাদের বিশ্রাম নেই, আমরা যখন নিদ্রা যাই তখনো আমাদের দেহে ও মনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলেছে, আমরা যখন আপনাকে নিয়ে বিব্রত থাকি তখনো আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের জীবনে তুমুল পরিবর্তন ঘটাতে থাকি এবং

আমাদের অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত হলেও আমাদের প্রতিবেশীরা কোটি যোজন দূরে তারালোকেও বিদ্যমান। সমগ্র জগতের সর্বত্র একটি অনবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা অক্লান্তভাবে চলেছে, তার থেকে মানুষের সমাজকে ছিন্ন করতে পারিনে। সমুদ্র থেকে ঢেউকে ছিন্ন করব কেমন করে?

কিন্তু আগেকার সমাজকে আমরা অচল পৃথিবীর মতো বাসুকির ফণায় স্থাপন করে নিশ্চিন্ত ছিলুম, ধর্ম বলে যাকে জানতুম সেই ছিল তাকে ধরে। এখনকার সমাজ সচল পৃথিবীর মতো কোথায় চলেছে কেউ জানে না, কারুর আকর্ষণে ঘুরছে না আপন মনে প্রতি ক্ষণে নূতন পথ আবিষ্কার করছে, এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বিশৃঙ্খলা তো চিরদিন ছিল, কিন্তু তাকে যে ধারণ করেছিল ও যে ধারণ করেছে এ দু'য়ের সঙ্গতি কোথায়? সেকালের ধর্ম ও একালের বিজ্ঞানে সন্ধি হবে কেমন করে? নীতি ও প্রকৃতি এক না পৃথক? যা হওয়া উচিত ও যা হয়ে থাকে সমান না বিরুদ্ধ?

৪

যে বিশৃঙ্খলার দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমরা এই অসমতল ও উড়ন্ত পৃথিবীতে প্রাণ হাতে করে পথ চলছি সে বিশৃঙ্খলাকে কতক পরিমাণে সহনীয় করেছে—আইন। নরকে যাবার ভয় আর নেই কিন্তু জেলখানার ভয় আছে। তবে ধর্মভয় জিনিসটাই যখন মানুষের স্বভাব থেকে চলে যাচ্ছে তখন জেলখানাই বা কদ্দিন মানুষকে শাসন করতে পারবে? তা ছাড়া আইনে মানুষের ক'টা পাপ পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার হতে পারে? গঙ্গায় ডুব দিয়ে বা যাজকের কাছে পাপ স্বীকার করে যেসব পাপের ক্ষালন হতো তার কতক আইনের এলাকার বাইরে। যতক্ষণ না আইনে আটকায় ততক্ষণ যে উকীলেরা পঞ্চমুখে মিথ্যা কথা বলে যায়, গণিকারা দেহ বিক্রয় করে, সৈনিকেরা স্ত্রী শিশুর উপরে এরোপ্লেন থেকে বোমা বর্ষণ করে, কারখানার মালিকরা মজুরদের নিঃসহায়তার সুযোগ নেয়—এজন্যে তাদের কোন্ নরকে যেতে হবে, কার হুকুমে? যমের আদালত কোন্‌খানে তা জিওগ্রাফিতে বা য়্যাস্ট্রোনমিতে নেই। যাঁরা আইন তৈরি করেন তাঁরা অর্থাৎ সমাজের ব্রাহ্মণরা নিজেরাই এখন অন্ধ, প্রাচীন নীতিসূত্রকারদের মতো তাঁরা নিঃসংশয়চিত্ত নন, তাঁদের দ্বারা নীয়মান সমাজ তাঁদেরই মতো দ্বিধায় দোদুল্যমান। যারা আইন মানে ও মানায় তারাই অর্থাৎ সমাজের শূদ্ররাই কেবল পেটের দায়ে চোখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে ও কর্তব্য করাচ্ছে, তাদের দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। কিন্তু এই শূদ্রের অভ্যুত্থান-যুগে শূদ্রও একদিন চিন্তা করতে শিখবে, জ্ঞানের আলোকে তারও খোলা চোখ ঝলসে যাবে। তখন কী হবে?

বিবেক নামক একটা অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য গুরু আছে বটে, কিন্তু কী পরিমাণে সেটা শৈশবের গুরুজনদের হাতে ও কী পরিমাণে সেটা সমাজের দশজনের মতামত দিয়ে তৈরি কে তা বুকে হাত রেখে বলতে পারে? যাই হোক সেই আমাদের সম্বল এবং তার সঙ্গে আছে ইন্‌স্টিংক্ট। যখন বিবেকের

পরামর্শ শুনি তখন আমরা সামাজিক মানুষ, যখন ইন্‌স্টিংক্টের তাড়না পাই তখন আমরা পশু। সামাজিক মানুষ সাবধানতাপন্থী, পশু আত্মরক্ষণশীল, বিবেকটা একটা brake বৈ তো নয়, ইন্‌স্টিংক্টটা একটা কবচ। কোথায় সেই ধর্মবিশ্বাস যা আমাদের প্রতি দিনকে inspiration দেবে, প্রতি রাত্রিকে relaxation ? বিবেকের উপরে ইন্‌স্টিংক্টের উপরে আরো কিছু উদ্বৃত্ত চাই, যার জোরে আমরা পা টিপে টিপে চলব না, যার অনুপ্রেরণায় আমরা অভ্রান্ত উৎসাহে অননুতপ্ত আবেগে নিঃসংশয় সাহসে দিগ্বিদিকে অভিযান করব, যা আমাদের কাজকে গরজ থেকে মুক্তি দেবে, খেলাকে বিলাস থেকে।

বুদ্ধ খ্রীষ্ট মহম্মদ যেদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন সেদিনকার মানুষ এমন অপূর্ব আনন্দ পেয়েছিল যে সেই আনন্দের ভাগ দেবার জন্যে সাগরগিরি তুচ্ছ করে মরুভূমি লঙ্ঘন করে ঘরে ঘরে ধর্না দিয়েছিল, সেই আনন্দের উপর যে নীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে নীতি ইন্‌স্টিংক্ট ও বিবেকের উর্ধ্বস্তরের জিনিস। প্রচুর কলঙ্ক সত্ত্বেও তাতে অমৃত ছিল। সে ধর্মবিশ্বাস আজ আমাদের পক্ষে সেকেলে মোহরের মতো অব্যবহার্য। তাকে মেডেল করে বুকে ঝুলিয়ে বেড়াতে পারি, কিন্তু বাজারে ভাঙিয়ে দৈনন্দিন খোরাক কিনতে পারিনে। আমাদের ভয় যাচ্ছে, বিশ্বাস গেছে, আছে কেবল চুলচেরা বিচার করবার ক্ষমতা আর খাবার শোবার তাগিদ। বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণীর উপরে আর-কিছু আমরা নই।

৫

বিশ্বাসে বল দেয়, নিষ্ঠায় বল রাখে। এই সর্বধ্বংসী অস্থিরতার দিনে কোনো কিছুর অপরিবর্তনীয়তার উপর থেকে আমাদের বিশ্বাস উঠে গেছে। নিষ্ঠা আছে কেবল জীবনযাত্রার পাথেয় সংগ্রহের প্রতি। কাল অবধি বাঁচব কিনা জানিনে, জানি কাল সকালে উঠে এক পেয়ালা চায়ের দরকার হবে, সেজন্যে চারটি পয়সা যেমন করে হোক আজ গাঁটে বাঁধা চাই। 'Take no thought of the morrow' সাধুদের পক্ষে সহজ, কেননা তাঁদের চায়ের ভাবনা ভাববার ভার গৃহস্থের উপরে, কিন্তু গৃহস্থ যদি সাধু না বনে তবে গৃহস্থের ভাবনা কে ভাববে ? অগত্যা গৃহস্থ নিজেই ভাবে এবং চারটি পয়সার জন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়, প্রতিবেশীকে খাটিয়ে তার অর্জন আত্মসাৎ করে, প্রতিবেশীকে ছলে বলে কৌশলে চা-কর বানায়। এরি নাম 'struggle for existence', এতে প্রবলের জয়, দুর্বলের হার, নিষ্ঠুরের রক্ষা, কোমলের মৃত্যু। ডান গালে চড় খেয়েই যার মাথা ঘুরে যায় সে বাঁ গাল দেখাবে কোন্ প্রাণে ?

রোজই বিজ্ঞান পুরোনো থিওরীকে উল্টে দিয়ে নতুন থিওরী খাড়া করছে, আইনস্টাইনের হাতে নিউটনের যে দশা হলো তার ফলে দেশকালনিরপেক্ষ সত্য বলে কিছু রইল না। এখন 'সত্য' কথাটি উচ্চারণ করতে ভয় হয়, পাছে কেউ জেরা করে বলে, ওর অর্থ কী ? ওর প্রতিষ্ঠা কোথায় ? ওর এলাকা কত দূর ? ওর আয়ুষ্কাল কতক্ষণ ? মানুষ এখন এত বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে যে তার ক্ষুরধার বুদ্ধির সামনে যা কিছু ধরা যায় সব কাটা পড়ে। হাজার

বছর হাজার লোকে যাকে সত্য বলে এসেছে আজ তা 'ধর্মব্যবসায়ীর চালাকি'। যাকে মঙ্গল বলে এসেছে আজ তা 'মধ্যবিত্তের আত্মসন্তোষ', যাকে সুন্দর বলে এসেছে আজ তা 'অভিজাতের শৌখীনতা'। প্রেম একটা কথার কথা, সতীত্ব একটা ন্যাকামি, দয়া একটা দুর্বলতা, ক্ষমা একটা ভণ্ডামি, বীরত্ব একটা ভড়ং, পরোপকার একটা নিগূঢ় স্বার্থপরতা, বিবাহ একটা একনিষ্ঠ বেশ্যাবৃত্তির লাইসেন্স্, মাতৃত্ব একপ্রকার সন্তানসম্ভোগ। এক কথায় 'Everything everywhere is bunkum.'

এই যখন আমাদের মনের অবস্থা তখন আমাদের কাছে বল প্রত্যাশা করা বৃথা। ছোট ছোট কাজে আমরা বলের পরিচয় দিয়ে থাকি বৈকি, কিন্তু সব মিলিয়ে যাকে সৃজন বলতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের বল নেই, আমরা দো-মনা। আমরা আকাশ বাতাস জয় করেছি, মানুষের মনের অলিগলির খবর রাখি, কিন্তু সব মিলিয়ে যা এক—যাকে বিশ্বাস করাটাই যাকে জানা—যাকে বোধ করাটাই যাকে বোঝা—সেই অখণ্ড ও অনির্বাণ স্বতঃসিদ্ধের বেলায় আমরা সংশয়বাদী। কেন আমাদের জন্ম, কেন আমাদের মৃত্যু, কেন আমাদের সুখ দুঃখ—কেন-র উত্তর খুঁজে পাচ্ছিনে। বেদ-বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও কথামালার গল্প দুই সমান আজগুবি ঠেকছে।

সব অস্থিরতা সত্ত্বে কী স্থির সেইটে না জানলে বিশ্বাস রাখব কার উপরে, নিষ্ঠা রাখব কার প্রতি? সব পরিবর্তন সত্ত্বে কী অপরিবর্তনীয় সেইটে না জানলে পরিবর্তনে আনন্দ পাব কেমন করে? যা কিছু সৃষ্টি করব সবই কি লোপ পাবে? যা কিছু হব তার কিছুরই কি চিহ্ন থাকবে না? এ জীবনের কি এই জীবনেই আদি এই জীবনেই শেষ? যত খুশি অন্যায় করে গেলে কি মৃত্যুর পরে তার শাস্তি নেই? আজীবন যাতনা পেলে কি মৃত্যুর পরে তার পুরস্কার নেই? আত্মা কি অমর নয়? আমরা কি এত অসহায় যে পৃথিবীর ধ্বংস হলে আমাদেরও ধ্বংস হবে? কাল কি এত নিষ্ঠুর যে ভালো মন্দ উভয়কেই মুছে দেবে? মঙ্গলময় কি নেই?

নব্যনীতির ভিত্তিপাতের জন্যে চিরন্তনকে আবিষ্কার করা আবশ্যক।

(১৯২৯)

স্ত্রী পুরুষ

জীবজগতের ইতিহাসে এমনও এক সময় ছিল যখন স্ত্রীও ছিল না, পুরুষও ছিল না, ছিল আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ অর্ধনারীশ্বর, একাধারে জননী ও জনক। ক্রমশ কেমন করে এক ভেঙে দুই হয়, দুইয়ের এক পক্ষ হয় স্ত্রী অপর পক্ষ পুরুষ, এক আধার হয় জননী, অপর আধার জনক।

এক ভেঙে দুই হলো বটে, কিন্তু কী রকম দুই? যে রকম কাঁচির দুই

ফলা বা মুখের দুই ঠোঁট। দুই—কিন্তু একের সঙ্গে খাপ খাবার জন্যেই অপর, একের প্রতি অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যেই অপরের প্রতি অঙ্গ। দুই হয়েও তারা বহু নয়, তারা এক। তারা হাঁ-ওয়ালা ও না-ওয়ালা তড়িৎ, তারা সমস্তক্ষণ পরস্পরের প্রতি উন্মুখ, তাদের মধ্যে ব্যবধান নেই, তারা পরস্পরের অন্তরে বাইরে অনুপ্রবিষ্ট। তারা পাশাপাশি নয়, তারা বিপরীত; তারা বন্ধু নয়, তারা শত্রু। এক কথায় তারা দুই নয়, তারা দ্বৈত, তারা যমজ নয়, তারা যুগল।

স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধটা দ্বন্দ্বেরও বটে মিলনেরও বটে। বিপরীত বলে তারা মিলতে চায়, মিলতে চায় বলে তারা দ্বন্দ্ব বাধায়। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় তটকে নিয়ে সমাজ তটিনী প্রবহমান, পরিবর্তমান। উভয় তটের মধ্যে নব নব সামঞ্জস্য প্রতি মুহূর্তে আবশ্যক। তাই উভয় তটের মধ্যে নবতর অসামঞ্জস্য যে-কোনো মুহূর্তে অনিবার্য। স্ত্রী-পুরুষের এই দাম্পত্য কলহটাকে যারা বিভীষিকা মনে করে তারা নেহাৎ বেরসিক, তারা নিতান্ত স্থূলদর্শী। আসলে এটা লীলারই অঙ্গ, সম্ভোগেরই পূর্বরাগ। স্ত্রী পুরুষ এক অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, থাকতে পারলে তারা আর স্ত্রী পুরুষ থাকে না, তারা হয় নামহীন অর্থহীন লিঙ্গহীন ক্লীব। পূর্ব না হলে যেমন পশ্চিম হয় না, দিন না হলে যেমন রাত হয় না, হয় শূন্য, তেমনি স্ত্রী না হলে পুরুষ হয় না, পুরুষ না হলে স্ত্রী হয় না, হয় ক্লীব। শূন্য (vacuum) যেমন প্রকৃতির অসহ্য, ক্লীবও তেমনি প্রকৃতির অসহ্য। সন্ন্যাসীর উপরে তাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। তাই মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ হয়, অপাপবিদ্ধারও পদস্খলন।

স্ত্রী পুরুষ এক অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, এই তাদের সম্বন্ধটার অন্তর্নিহিত সত্য। এই জন্যেই দ্বন্দ্ব। অনুরাগকে মধুরতর করবার জন্যেই রাগ। দাম্পত্য কলহের একমাত্র মূল্য, সেটা দাম্পত্য সন্ধিকে সুখ দেয়। সন্ধির মতো কলহটাও নিত্যকার বলে যদি কেউ সেইটিকেই স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধটার মূলগত সত্য মনে করে এবং সেইটিকেই মূলে মারবার জন্যে স্ত্রীকে পরামর্শ দেয় স্ত্রীত্ব ছাড়ো, পুরুষকে পরমর্শ দেয় পুরুষত্ব বিসর্জন দাও, তবে সেই হিতৈষীকে ভ্রান্ত বলতে হয়।

অথচ এরূপ হিতৈষী সেকালেও ছিলেন একালেও আছেন। সেকালে যাঁরা পুরুষকে বলতেন, কামিনী পরিহার করো, তাঁরা আসলে ঐ অসামঞ্জস্যকেই পরিহার করতে বলতেন। একালে যাঁরা স্ত্রীকে বলছেন, পুরুষের সঙ্গে সমান হও ও পুরুষের মতো স্বাধীন হও, তাঁরাও আসলে ঐ অসামঞ্জস্যকেই স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছেন ও স্ত্রীকে পুরুষের সদৃশ করে তুলে স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি-ক্ষমতার সোপান যে বৈপরীত্য তাকেই সরিয়ে ফেলছেন। সন্ন্যাসীদের আদর্শ ছিল দৈহিক ক্লীব, Feministদের আদর্শ মানসিক ক্লীব। এই যা তফাৎ।

২

স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব ও মিলন যুগে যুগে কালে কালে কত কবিকেই না রসসৃষ্টির, কত বীরকেই না ধনুর্ভঙ্গের, কত সামান্য লোককেই না বড় বড় ত্যাগ স্বীকারের উপলক্ষ জুটিয়েছে। কত স্ত্রীকেই না সতী হবার দায়িত্ব সুন্দরী হবার গৌরব কল্যাণী হবার আনন্দ দিয়ে ধন্য করেছে। যুগল আছে বলে দ্বন্দ্ব আছে বটে, কিন্তু যুগল আছে বলেই লীলা আছে। নইলে কি পাখির কণ্ঠে গান থাকত? না ফুলের গায়ে গন্ধ থাকত? এত রঙ ও এত রূপ আসত কোথা থেকে? এই সুন্দর বিশ্বসংসার যে অর্ধেক সুন্দর হতো না!

স্ত্রী যদি পুরুষের সদৃশ হতো, পুরুষ যদি স্ত্রীর সদৃশ হতো তবে কি তারা পরস্পরকে এমন পাগলের মতো ভালোবাসত, ধ্যান করত, স্বপ্ন দেখত? পরস্পরকে উদ্দেশ করে কাজ করত, কীর্তি গড়ত, সুন্দর হতো, বলবান হতো? চেতন অবচেতন অচেতন ভাবে পরস্পরের সঙ্গকাতর রইত? যখন তারা দ্বন্দ্ব বাধায় তখনো তার পরস্পরের অন্তর্লীন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ভাগী। প্রগাঢ় প্রেমের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যেই তাদের দ্বৈরথ সমর, দ্বৈরথ সমরের ছলে তারা পরস্পরের আসঙ্গলোলুপ। কোনোমতেই তারা দূরে থাকতে পারে না, অথচ কোনোমতেই তারা একাকার হতে পারে না। না পারে তারা ক্লীব হতে, না পারে অর্ধনারীশ্বর হতে। প্রবল অভিমানে পরস্পরকে ফেলে লক্ষ যোজন দূরে পালাতে পারলে তাদের সমস্যা ঘুচত, উন্মত্ত আলিঙ্গনে এক হয়ে যেতে পারলে তাদের লীলা সাঙ্গ হতো। কিন্তু নির্মম প্রকৃতি এর কোনোটাই হতে দেবে না, সে চায় দ্বন্দ্ব ও মিলন, কাছে আসা ও আলগা থাকা, টানাটানি ও ঠেলাঠেলি। স্ত্রীকে সে স্ত্রীই রাখবে, পুরুষকে পুরুষ এবং পরস্পরকে পরস্পরের ক্রীতদাস করে তাদের অভিমানকে চোখের জলে ভাসিয়ে দেবে।

পরস্পরের মুখে মুখ রেখে সূর্য ও সূর্যমুখী যেমন প্রহরে প্রহরে চলে, পরস্পরের প্রতি বিপরীত হয়ে স্ত্রী ও পুরুষ তেমনি যুগে যুগে চলেছে। তারা যে চির বিপরীত, এইখানে তাদের সামঞ্জস্য, তারা যে নিত্য সচল এইজন্যে তাদের অসামঞ্জস্য। চলবার সময় দু'টি পা-তে পদে পদে মতদ্বৈধ ঘটে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ থাকে তেমনি। স্ত্রী-পুরুষের চলার ইতিহাসে দ্বন্দ্ব ঘটেছে প্রতিনিয়ত, তবু স্ত্রী স্ত্রীই আছে, পুরুষ পুরুষই আছে। তা নইলে স্ত্রীও থাকত না, পুরুষও থাকত না। থাকত কেবল সেই আদিম অর্ধনারীশ্বর, কিংবা ক্লীবময় শূন্য।

স্ত্রী স্ত্রীই আছে, পুরুষ পুরুষই আছে, কিন্তু যে যেমনটি ছিল সে তেমনটি নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গড়ন এমন যে জল বলো আলো বলো যেখানে যা-কিছু আছে ক্রমাগত গড়াতে গড়াতে আছে, বদলাতে বদলাতে আছে। দশ হাজার বছর আগে স্ত্রীর যে সব গুণ ছিল আজ সে সবের কতক আছে কতক নেই, যে কতক গেছে সে কতকের বদলে নতুন কতক এসেছে। পুরুষ সম্বন্ধেও সেই কথা। যতই যাই হোক স্ত্রী থাকবে স্ত্রী, পুরুষ থাকবে পুরুষ, পারে না

হেঁটে মাথায় হাঁটলেও এর ব্যতিক্রম হবার নয়। পৃথিবী যেমন ভাবেই ঘুরুক না কেন, উত্তর মেরুর সংগে দক্ষিণ মেরুর বৈপরীত্য তেমনি থাকতে বাধ্য। নিজের সঙ্গে নিজের যতই তফাৎ ঘটুক না কেন একের প্রতি অপরের উন্মুখতা ততদিন থাকবে যতদিন এক ও অপর থাকবে।

নিজের সংগে নিজের তফাৎ স্ত্রীরও ঘটে পুরুষেরও ঘটে, কিন্তু পরস্পরের সংগে বৈপরীত্যের সম্বন্ধটাকে তফাৎ সত্ত্বেও অক্ষুণ্ন রাখতে হয়। অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়েই দ্বন্দ্ব। সেকালের স্ত্রীর সংগে একালের স্ত্রীর তফাৎ অস্বীকার করা যায় না, একালের পুরুষও সেকালের পুরুষ নয়, তবু কেন একালের স্ত্রীর সংগে একালের পুরুষের দ্বন্দ্ব? কারণ একালের স্ত্রী মুখে মুখ না রেখে হাতে হাত রাখতে চাইছে, বিপরীত না হয়ে সমান হতে চাইছে, প্রিয় শত্রু না হয়ে প্রিয় বন্ধু হতে চাইছে। কারণ একালের পুরুষ স্ত্রীকে ঘরও দিতে পরাঙ্মুখ, বাহিরও দিতে পরাঙ্মুখ, তার ঘরে ধরা দিতেও নারাজ, তাকে বাহিরে জায়গা দিতেও নারাজ। তাকে কোলেও রাখবে না, তাকে কাছেও রাখবে না। এইজন্যে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের গূঢ় সত্যটি এই যে দ্বন্দ্বেও মিলনের স্বাদ পাওয়া যায়। স্ত্রী পুরুষ মিলনব্যাকুল। আধুনিক বণিক-যুগ পুরুষকে দেশ দেশান্তরে ছোটাচ্ছে, স্ত্রীর ঘর ভেঙে দিচ্ছে, মিলনের স্বাদ দ্বন্দ্বে মেটানো ছাড়া উপায় কী? দ্বন্দ্বকে এড়াতে চাইলে যে স্বাদবোধহীন ক্লীব হতে হয়।

এমনি দ্বন্দ্ব যুগে যুগে বেধেছে। আধুনিক বণিক-যুগের আগে যে কৃষক-যুগ ছিল তার আরম্ভেও এমনি দ্বন্দ্ব বেধেছিল। যাযাবর স্ত্রী পুরুষ যখন চাষের ক্ষেতের আকর্ষণে ঘর বাঁধল, ধন সঞ্চয় করল, সন্তানকে উত্তরাধিকার দেবে বলে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়ল, তখনও পুরাতন বৈপরীত্য এক দিনে লোপ পায়নি, নতুন বৈপরীত্য এক দিনে দেখা দেয়নি। সন্তানের খাতিরে স্ত্রীর দাবী যতই কঠিন হয়েছে স্ত্রীর কাছে পুরুষ ততই কঠিন শর্ত মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছে। স্ত্রী বলেছে, ছেলেকে এটা দিতে হবে ওটা দিতে হবে রাজত্ব দিতে হবে পৌরোহিত্য দিতে হবে। পুরুষ উত্তর দিয়েছে, তা হলে ছেলে যে আমার এইটে প্রমাণ করবার জন্যে আমার চোখে চোখে থাকো, আমার প্রতি সত্য রক্ষা করো, সতী হও। স্ত্রীর পক্ষে এসব শর্ত প্রীতিকর হয়নি, কোনো কোনো স্থলে সে শর্ত ভেঙেছে, তাই পুরুষ পক্ষের মোড়লরা ছড়া কেটেছেন, 'বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু।' কিন্তু স্ত্রী ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসযোগ্যাই হয়েছে, সতীই হয়েছে। এবং পুরুষও সন্তানকে দিয়েছে রাজত্ব বা পৌরোহিত্য বা কৃষকত্বের উত্তরাধিকার, পুরুষও শর্ত রক্ষা করেছে।

কোনো কোনো স্থলে যদি পুরুষ একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে এরূপ শর্ত করে থাকে তবে এটা তার অপরাধ নয়, সে শর্ত রক্ষায় ত্রুটি করেনি। শর্ত মাত্রেই দুই তরফা, তেমন পুরুষের শর্তে যে একাধিক স্ত্রী সম্মতি দিয়েছে তারাও সেই শর্তের জন্যে দায়ী। কোনো কোনো স্থলে স্ত্রীও একাধিক পুরুষের

সঙ্গে শর্তবন্ধ হয়েছে, কিন্তু একই বছরে একাধিক পুরুষের সঙ্গে থাকলে সন্তান সম্বন্ধে কারুকেই খাঁটি প্রমাণ দিতে পারা যায় না বলে একাধিক পুরুষের একেশ্বরী হওয়া স্ত্রীর পক্ষে তত সহজ হয়নি, পুরুষের পক্ষে যত সহজ হয়েছে একাধিক স্ত্রীর একেশ্বর হওয়া।

তবে মোটের উপর স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান সমান বলে সাধারণত পুরুষ একাধিক স্ত্রী খুঁজে পায়নি, সাধারণত পুরুষ স্ত্রীকে কথা দিয়েছে যে সেও স্ত্রীর মতোই বিশ্বাসযোগ্য হবে। কেবল কতক স্ত্রী যারা সন্তানের জন্যে লালায়িত নয় ও কতক পুরুষ যারা সন্তানের উত্তরাধিকার সঞ্চয় করতে অনিচ্ছুক তারা যথাক্রমে বেশ্যা ও সন্ন্যাসী হয়ে সাধারণের সমাজ ছেড়ে গেছে। বেশ্যারা গৃহস্থপত্নীদের পতিদের মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু তাতে পতিদের প্রতি সতীদের দারুণ ক্রোধ জন্মায়নি এইজন্যে যে সন্তান সম্বন্ধে পতিরা শর্ত রক্ষা করেছে। দুঃখ কেবল তারা একটা না-করলেও-চলত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি এই যা। এদিকে সন্ন্যাসীরা গৃহস্থপত্নীদের সমস্ত শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছেন, গৃহীদের তুলনায় তাঁরা দেবতা, একাধিক স্ত্রীর স্পর্শ পাওয়া তো দূরের কথা আধখানা কিংবা সিকিখানা স্ত্রীরও স্পর্শ লাগেনি তাঁদের শ্রীঅঙ্গে।

৪

এমনি করে স্ত্রী পুরুষে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল কৃষক-যুগে। স্ত্রীর উপরে পুরুষ যদি কড়া হুকুম জারি করে থাকে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তবে পুরুষের উপরেও স্ত্রী কড়া হুকুম জারি করেছিল সন্তানের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে। তা ছাড়া পুরুষকে ব্যভিচার করিয়েছিল কে? সেও তো অপর এক স্ত্রীলোক। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, এক পক্ষকে দিয়ে তেমনি ব্যভিচারও হয় না। Double standard of morality নিয়ে যখন তর্ক ওঠে তখন সেই অপর স্ত্রীলোকের moralityটাকে স্ত্রী পক্ষের উকিলরা ধর্তব্য মনে করেন না কেন? স্ত্রী পুরুষের মাঝখানে double standard of morality বলে কিছু থাকতেই পারে না, কারণ যে ক্রিয়াটার দ্বারা স্ত্রী পুরুষের morality নির্ণীত হয় সে ক্রিয়াটাতে স্ত্রীও তেমনি লিপ্ত পুরুষও যেমন। আসলে double standard of morality বলে যদি কিছু থাকে তা কুলাঙ্গনা ও বারাঙ্গনার মাঝখানে, যার সন্তান পিতৃধন ও পিতৃসম্মান পায় ও যার সন্তান সেসব পায় না তাদের মাঝখানে। অর্থাৎ তর্কটা স্ত্রীজাতির ঘরোয়া তর্ক, পুরুষজাতির সঙ্গে সেটার সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। এইরূপ একটা double standard গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর মাঝখানে আছে। আছে নয়, ছিল। কৃষক-যুগ কি আর আছে? দিন দিন অতীত হচ্ছে। পুরুষ এখন মাটির টানে বাঁধা পড়ে না, জীবিকার সন্ধানে পথে পথে বেড়ায়। পথি নারী বিবর্জিতা। বিবাহ করে তাকে গৃহে ফেলে যাওয়া যা, আদপেই তাকে বিবাহ না করাও তাই। অতএব বিবাহ করতে পুরুষ বড় রাজি নয়। এদিকে বরের অপেক্ষায়

বেকার বসে থাকার চেয়ে নিজের জীবিকাটা নিজে উপার্জন করা ভালো, এই মনে করে স্ত্রী আসতে চায় বাইরে। ঘরকন্নার সুযোগই যখন জুটছে না তখন বাহিরকন্না না করে সে করবেই বা কী? একবার নিজের জীবিকা শুরু করলে তাতেই সে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে চায়, তার পরে যদি বিবাহের সুযোগ আসে তবে সে আর নতুন করে ঘরকন্নার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে না, আগের মতোই হোটেলের শরণ নেয়, পারতপক্ষে সন্তানসংখ্যা কমায় ও সন্তানকে পাঠিয়ে দেয় বোর্ডিং স্কুলে। স্বাধীন জীবিকার স্বাদ পাবার পরে ও বিশেষ একটা বিষয়ে দক্ষতা লাভ করবার পরে বিবাহ ও মাতৃত্ব তার জীবনের ধারা বদলে দিতে পারে না, সে আমরণ ইস্কুল মাস্টারনি বা মেয়ে কেরানীই থেকে যায়। পুরুষের মতো তারও বদলি আছে, এক জায়গার কাজে ইস্তফা দিয়ে আরেক জায়গায় কাজ নেওয়া আছে, এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে ভাগ্য-পরীক্ষা আছে, পুরুষের মতো সেও পথে বেড়ায়। পথি পুরুষো বিবর্জিতঃ।

কিন্তু সত্যি কি স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে বর্জন করে একটা মুহূর্তও থাকতে পারে? বিবাহ করবার উপায় নেই বলে কি সান্নিধ্য পাবারও উপায় হবে না? হতে বাধ্য। যে উদ্দাম আকর্ষণ স্ত্রী পুরুষকে ঘরে একত্র করেছিল সে-ই আজ তাদের বাইরে একত্র করেছে। ঘর ভেঙে বাহির গড়ে উঠছে— হোটেল, মেটার্নিটি হোম, বোর্ডিং স্কুল, অফিস, খেলার মাঠ, ক্লাব সর্বত্র পুরুষের সঙ্গ নিতে চায় স্ত্রী। তাকে নইলে পার্লামেণ্ট চলবে না, ম্যুনিসিপালিটী চলবে না, ট্রেড ইউনিয়ন চলবে না, খবরের কাগজ কাটবে না, সিগারেট কাটবে না, সিনেমা খালি পড়ে থাকবে। পথ বলে যাকে আমরা জানি তাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ভিড় জমছে না কি? তবে কেমন করে বলব, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে বর্জন করতে চায়? হাঁ, বিশেষ স্ত্রী বিশেষ পুরুষকে বর্জন করেছে বটে, পতি পত্নীকে ও পত্নী পতিকে, কিন্তু স্ত্রীজাতি ও পুরুষ-জাতি পরস্পরকে বর্জন করতে পারে না বলেই পথের ভিড়ে ঠেলাঠেলির সুখ পেতে ব্যস্ত। ট্রেনে ট্র্যামে, অফিসে ইস্কুলে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে পর্যন্ত তারা গা ঘেঁষাঘেঁষির দাবী রাখে। কুলাঙ্গনা ও বারাঙ্গনা, গৃহী ও সন্ন্যাসী— এদের মাঝখানকার ফাঁক ক্রমেই বুজে আসছে। নিয়মে ও নিপাতনে ভেদ থাকছে না।

(১৯২৯)

সেক্স্

প্রথম বয়সে প্রকৃতিদেবী যে সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন তাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ছিল না। তারা বংশবিস্তার করত আপনাকে বিভক্ত করে। দেখা গেল বংশবিস্তারের পক্ষে এই উপায় সহজ হলেও বংশোন্নয়নের পক্ষে সহজতর

উপায় আবশ্যক। তখন তিনি যে সকল প্রাণী সৃষ্টি করলেন তাদের এক-একজন দ্বিখণ্ডিত না হয়ে দুই-দুইজন সঙ্গত হলো। আর সেই সঙ্গম থেকে এলো তৃতীয়জন। যে দুইজনে মিলে তৃতীয়জনকে জন্ম দিল তাদের একজনের কাজ হলো গর্ভাধান, অন্যজনের গর্ভধারণ। গর্ভাধান অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই পুংপ্রাণী বোধ করল অপেক্ষাকৃত মুক্ত। সে পরীক্ষা করল, আবিষ্কার করল, উদ্যোগী হলো। তার অভিজ্ঞতা, তার পুরুষকার তার সন্তানে সঞ্চারিত হতে হতে বংশলক্ষণ গেল বদলে। বিবর্তন এক দিন মানববংশের পত্তন করল।

এক কথায় সেক্স্ হচ্ছে সেই যন্ত্র যা একজনকে করে গর্ভাধানক্ষম, অপরকে গর্ভধারণক্ষম। যন্ত্রটি সমগ্র শরীরের ভিতরে ও বাইরে এমন সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত যে, একখানা হাত কিংবা একখানা পা যেমন পরিচ্ছন্ন, সেক্স্ তেমন নয়। তার এত দিকে এত শাখাপ্রশাখা যে, তাকে একটি বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ ভাবলে ভুল হয়। কেশ, স্তন, জঘন, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি যা কিছু একজনকে স্ত্রী বলে ও অন্যকে পুরুষ বলে চিনিয়ে দেয় তা সেক্সের অন্তর্গত। সেইজন্যে ইংরাজী সেক্স্ শব্দের পরিভাষা খুঁজে পাইনে। আর যাই হোক 'যোনি' নয়।

সেক্সের উদ্দেশ্য তা হলে একাধারে বংশবিস্তার তথা বংশোন্নয়ন। কিন্তু তাই যদি সব হতো তবে প্রতিবারের মৈথুনে পুংমনুষ্যের উরস হতে ছাব্বিশ কোটি শুক্রকীট নির্গত হতো না। নারীর গর্ভধারণক্ষমতার সীমা আছে। সারা জীবনে একটি নারী খুব বেশী করে ধরলেও যমজ ইত্যাদি মিলিয়ে একশোটি সন্তানের মা হতে পারে। অথচ সারা জীবনে একটি পুরুষের উরস থেকে খুব কম করে ধরলেও ছাব্বিশ হাজার কোটি শুক্রকীট চালান যায়। আমদানি ও রপ্তানির এই যে ঘোরতর অসামঞ্জস্য, এই যে এক দিকে একশো, অন্যদিকে ছাব্বিশ হাজার কোটি, এর কি কোনো জবাবদিহি নেই ?

ছাব্বিশ কোটি শুক্রকীটের অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত, কিন্তু সাধারণ মানুষ বেশ বোঝে যে শুক্রই পুরুষের তেজ। এর অতি সামান্য পরিমাণ ব্যয় করলে প্রকৃতির কার্যসিদ্ধি, অর্থাৎ বংশরক্ষা, হতে পারে। তবে কেন প্রকৃতি অপরিমিত স্ত্রীসম্ভোগের প্রবর্তনা দেয়, কেন দেয় দুর্বার কামপ্রেরণা, তৃপ্তি যার নেই ? যা প্রতি রাত্রে নূতন, যা বছরে কি দু'বছরে মাত্র একটিবার সফল ?

আর্য ঋষিরা শুক্রব্যয়ের একটা রুটিন তৈরি করেছিলেন। পঁচিশ বছর বয়স না হলে ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করতেন না, পঞ্চাশ বছর বয়স হলেই গার্হস্থ্য শেষ। ভোগের সময় বলে নির্দিষ্ট পঁচিশ বছরের মধ্যে কত যে নিষেধ নিপাতন, কত যে অননুমোদিত বার ব্রত তিথি প্রহর, পাঁজিতে এখনো তার তালিকা থাকে।

কিন্তু তাতে করে প্রকৃতির কাছে জবাবদিহি পাওয়া গেল না। তাতে কতকটা আত্মরক্ষা হলো, কিন্তু জিজ্ঞাসার হলো না নিরসন। তাই প্রকৃতির উপর জাত হলো তীব্রতম অভিমান। বৌদ্ধদের 'থেরী গাথা' যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা লক্ষ করেছেন মৈথুনের প্রতি কী অপরিসীম বিরাগ, বংশরক্ষায়

প্রতি কী নির্মম ঔদাসীন্য ! স্বামীসন্তান ত্যাগ করে কী অপার মুক্তিবোধ ! 'থেরী গাথা' নারীদের রচনা। পুরুষদের রচনাতে বোধ করি অধিকতর আশ্বস্তি প্রকাশিত হয়েছিল। কেননা সম্ভোগে নারীর তেমন ক্ষয় নেই পুরুষের যেমন। নারীর ক্ষয় গর্ভধারণে। তা নিয়ে অভিমান করার কিছু নেই, জিজ্ঞাসার কিছু নেই। নারী জানে যে, প্রকৃতি তাকে সেই উদ্দেশ্যে নারী করেছে। পুরুষ কিন্তু বুঝতে পারে না প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্ভোগে কেন তার মতি। বুঝতে না পারায় মতিকে মনে করে কুমতি, প্রবৃত্তিকে মনে করে পাপপ্রবৃত্তি।

বৌদ্ধদের অভিমান ক্রিশ্চানদের চিত্তে বর্তায়। তারাও গোড়ার দিকে বংশরক্ষার আবশ্যক দেখল না। তাদের ধারণা ছিল The Kingdom of Heaven is at hand, স্বর্গরাজ্য এই এলো বলে, কী হবে পুত্র-পৌত্র ! স্বর্গরাজ্যের যতই দেরি হতে লাগল বাবাজীরা গৃহী শিষ্যদের ততই ছাড় দিতে থাকলেন। বললেন, "বেশ। তোমরা ক্ষুদ্র জীব। কর তোমরা তোমাদের জৈব ক্রিয়া সম্পাদন। তবে ভুলে যেয়ো না, বাপধনরা, যে কাজটা পাপ। পাপেই তোমাদের উৎপত্তি। গর্ভধারণ ভালো জিনিস। কিন্তু তার মহত্ত্ব লোপ হলো যদি মৈথুনের দ্বারা তা সাধিত হলো। ইমাকুলেট্ কন্সেপ্শন্ই পুণ্য। কুমারসম্ভবের ইতর প্রক্রিয়া পাপ।"

একদিকে যেমন অভিমানমূলক প্রকৃতিবিরুদ্ধতা সংসারত্যাগীদের দ্বারা প্রচারিত হলো, অপরদিকে তেমনি আত্মরক্ষামূলক প্রকৃতিবিপর্যয় সম্ভোগ-বাদীদের দ্বারা আবিষ্কৃত হলো। নরনারীর সম্পর্কের নিবিড় মাধুর্য যারা একবার আস্বাদন করেছে তারা চেয়েছে তাকে চিরন্তন করতে। তারা চেয়েছে অনন্ত যৌবন, অম্লান রূপ। তারা বলছে, "নায়কনায়িকার নিত্যলীলা লোকোত্তর, মরণোত্তর। রতিবিহীন লীলাবিলাস কল্পনা করা যায় না। অথচ প্রাকৃত রতি নরনারী উভয়ের পক্ষে ক্ষয়কারক। পুরুষের অন্তর্হিত হয় তেজ ! আর নারীর যদি সন্তান হয় তবে রূপলাবণ্য অবশিষ্ট থাকে না, স্ত্রীরোগে তার সম্ভোগ্যতা হানি হয়। অতএব চাই অপ্রাকৃত রতি। তার মানে মৈথুন-কালে শুক্রধারণ।"

জগতের ইতিহাসে এ একটা বিপ্লব। নরম্যান হেয়ার নাকি একটি বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন যে, কন্ট্রাসেপ্শন্ এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। কিন্তু এই আবিষ্কারের দ্বারা অক্ষয় যৌবনের সুরাহা হয়নি। অথচ এদেশের সহজিয়া পদ্ধতি, ওদেশের Carezza পদ্ধতি, লোহাকে সোনা করার আলকেমি। সম্ভব হোক বা না হোক, সম্ভব বলে বহু লোক বিশ্বাস করে এসেছে। আজও করে।

বিপ্লব কেন বললুম তা বিশদ করি। নারীর উপর দার্শনিকদের বিদ্বেষ সেই সোক্রেটিসের যুগ থেকে গড়িয়ে আসছে। এঁরা পুরুষের সঙ্গে পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পক্ষপাতী। তাতে নেই সন্তানচিন্তা, তা বিশুদ্ধ আনন্দ। বেশ্যার সঙ্গে যে সম্পর্ক তাতেও সন্তানচিন্তা থাকে না বটে, কিন্তু তাতে

বংশরক্ষার গন্ধ থাকে, সম্ভাব্যতা থাকে। নারীর সংগে বংশরক্ষাকে দার্শনিকরা এমন অবিচ্ছেদ্য জ্ঞান করেছেন যে, নারীকেই বর্জনীয় মনে করেছেন। 'A married philosopher is ridiculous', নীটশের উপর আরোপিত এই উক্তির পশ্চাতে বৈরাগী মনোভাব নেই, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি দার্শনিকের নয়। এর পশ্চাতে রয়েছে প্লেটোনিক প্রেম, যাতে প্রিয়জনকে নিকটবর্তী হতে দেয় না, দূরে দূরে রাখে। যদি না সে প্রিয়জন হয়ে থাকে সমজাতীয়, অর্থাৎ পুরুষের বেলায় পুরুষ।

এই বিপ্লবের ফলে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। নারী হলো বান্ধবী, সঙ্গিনী, নায়িকা। সে যে প্রজনার্থং মহাভাগা, তার সংগে যে পুরুষের সন্তানঘটিত ব্যবসায়, পুরুষের মনে এমনতর সন্দেহ রইল না। তাদের সম্পর্ক এক তৃতীয় মানদণ্ডে পরিমিত হলো না। নরনারী পরস্পরকে নূতন করে আবিষ্কার করল। ভারতবর্ষে রচিত হলো শ্রীমদ্ভাগবত, বৈষ্ণবপদাবলী। ইউরোপে ত্রুবাদুর-গীতিকা, বিভিন্ন রোমান্স-চক্র। পারস্যে সুফী কবিতা, ওমর খৈয়াম। সুরতরসের উপর একটা দর্শন পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল। কোথাও এই দর্শন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অশরীরী। কোথাও তেমনি স্থূল ও নির্লজ্জ। কোথাও বস্তুর মাত্রা বেশি। কোথাও ভাবের। কিন্তু সর্বত্র এই একই বাণী। নরনারীর মিলন জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন, আপনাতে আপনি অবসিত। তার সঙ্গে বংশরক্ষার সম্বন্ধ নেই, নেই তাতে পাপের গন্ধ। সেটা একটা means নয়, একটা end।

আধুনিক যুগে আমরা যত উপন্যাস পড়ি তাদের অধিকাংশই মিলনান্ত। নায়কনায়িকার মিলনের বাধা অপসারিত হলো, এইবার তাদের বিয়ে। অথবা নায়কনায়িকা অবশেষে প্রেমে পড়ল, এইবার তাদের সুখনীড় রচিত হবে। বংশরক্ষার ইঙ্গিত কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাতে রসভংগ হয়। উপন্যাসের জগতে সন্তানসন্ততি নেই। আছে চিরন্তন নর আর চিরন্তনী নারী।

তা বলে কোনো ঔপন্যাসিক সজ্ঞানে অপ্রাকৃত রতির জয়গান করেন না। তা করা সাহিত্যে অশোভন। তবু চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদাবলী মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে সে জিনিস হেঁয়ালি থাকে না। সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচানো তখন আমাদের মুখে হাসি ফোটায়। সহজ সাধনার সংকেত এইখানে। সহজিয়া গ্রন্থে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সমাজরক্ষীদের চোখে ধুলো দিতে। ও ছাড়া উপায় ছিল না। আমাদের পাবলিক পলিসী হচ্ছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। সহজিয়ারা চেয়েছিলেন পুত্রকে বাদ দিয়ে নারী। এবং সেই নারীতে ও সেই নারীর সংগে অক্ষয় যৌবন। Carezza-র ইতিহাস আমার জানা নেই। অনুমান হয় ত্রুবাদুর যুগেই এর আবিষ্কার। ত্রুবাদুর যুগ সহজিয়া যুগের সমকালীন। ইতিহাসে এ যুগের মূল্য, এ যুগ শিভ্যালরির যুগ। নারীসম্ভ্রমের যুগ। প্লেটোনিক প্রেমে নারীর প্রতি সম্ভ্রম ছিল না, কেননা নারীর যেখানে নারীত্ব প্লেটোনিক প্রেম সেদিক দিয়ে যেত না। প্লেটোনিক প্রেম স্ত্রীপুরুষ-বিভেদহীন ব্যক্তিত্ব-অভিমুখ।

২

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানসিদ্ধ ভাবুকদের অভিমত এই যে ইন্দ্রিয়জ আনন্দ পাপ নয়, এর সঙ্গে বংশরক্ষার দায়িত্ব অবশ্যসংলিপ্ত নয়, মানবের অন্তরে সম্ভোগবাসনা ও সন্তানবাসনা পরিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান, যখন যেটির চরিতার্থতার ইচ্ছা হবে তখন সেটির চরিতার্থতা ঘটতে পারে। শুক্রের স্বভাবিক নির্গম রোধ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ঙ্কর। অথচ শুক্রের নিম্নগতি নিবারণ না করলে যে সামর্থ্য ক্ষয় হবেই এমন কোনো ভয় নেই। শুক্র সম্বন্ধে সদ্‌ব্যবস্থা হচ্ছে সংযত ব্যয়, এর ফলে যদি সন্তান হবার আশঙ্কা থাকে তবে প্রতিষেধক কণ্ট্রাসেপ্‌শনের বহুতর প্রণালী। আর যদি যৌবন অপগত হয় তবে যৌবন ফিরে পাওয়া অপারেশন-সাধ্য। উভয়ের বিবরণ আছে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে।[১]

আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ করা যেতে পারে নব কামশাস্ত্র। লেখকগণ বিশেষজ্ঞ। এঁরা নরনারীর প্রাকৃত রতিরই পক্ষপাতী। সেই রতি যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় তার জন্যে এঁরা দেশবিদেশের কামশাস্ত্র তুলনা করে তাদের অভ্যন্তরে যা বিজ্ঞানসম্মত তাই সংকলন করেছেন। আমাদের 'কামসূত্র' ও 'অনঙ্গরাগ' বাদ যায়নি। দুই পক্ষের এক পক্ষ যদি সম্ভোগের জন্যে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক না থাকে তবে কেমন করে তাকে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক করিয়ে নিতে হয় এ বিষয়ে প্রাচীনরা যা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাই একরকম মানবের চরম বিজ্ঞতা। একদা আমার হাতে একখানি প্রাচীন পটের বই পড়েছিল, তাতে ছিল চৌষট্টি রকমের 'বন্ধ' বা শৃঙ্গারকালীন সংস্থান। লেখকেরা আমাদের শাস্ত্র থেকে কয়েকটি 'বন্ধ' বাছাই করেছেন, প্রধানত জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি দৃষ্টি রেখে। প্রাচীন অঙ্গরাগ ও উদ্দীপক ঔষধাদিও আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মূঢ়তা ও বিজ্ঞতা বিজ্ঞানের নিকষে পরীক্ষিত হয়েছে।

নব কামশাস্ত্রের এইখানেই শেষ নয়। নব কামশাস্ত্র অনন্তপার। তাকে এই বিষ্ণুশর্মারা সাধারণ পাঠকের গ্রহণোপযোগী আকার দিয়েছেন। পুরুষের অঙ্গ ও নারীর অঙ্গ সম্বন্ধে শারীরবিজ্ঞানে যা থাকে তাও রয়েছে এতে। তারপর নরনারীর বিভিন্ন বয়সে অঙ্গের যে সকল পরিবর্তন হয়, বয়ঃসন্ধি, নারীর মাসিক গতি, নারীর অজগোধূলি (menopause) ইত্যাদিও আধুনিক কামশাস্ত্রের অন্তর্গত।

বংশরক্ষার দিকটাও ভুলে যাবার নয়। ধাত্রীবিদ্যার এলাকায় যেসব তথ্যের বাস তারাও নব কামশাস্ত্রের প্রজা।

নরনারী ভোগক্ষম হবার পূর্বে তাদের মধ্যে ভোগেচ্ছা জাত হয়ে থাকে। এর পরিপূর্তি হয় আত্মমৈথুনে। ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই অভ্যাস লক্ষিত

১ An Encyclopaedia of Sexual Knowledge—by Drs. A. Willy, A. Costler and others. Edited by Norman Haire. (Francis Aldor)

হয়। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে এর বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু বহুলতর প্রচলন হয় মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় জগতে। আধুনিক ইউরোপেও এই অভ্যাস অতি ব্যাপক। এ সম্বন্ধে সাধারণের যে ভীতি তা নরম্যান হেয়ারের মতে অলীক। 'Masturbation is a normal phenomenon which appears in the vast majority of healthy children, as well as in young adults who are, for one reason or another, unable to obtain the normal satisfaction of this sexual appetite.'

মৈথুন যদিও নরনারীর স্বাভাবিক লক্ষ্য তবু এই লক্ষ্যের বিকার একটি সুপরিচিত সত্য। নব কামশাস্ত্রে মৈথুনের বিকৃতি ও বিকল্প কেন ও কেমন করে ঘটে তার আলোচনা অবান্তর নয়। এর প্রতিকার চিকিৎসাসাধ্য। এত লোক যে সিনেমা দেখতে যায় তার মূলে রয়েছে অনাবৃত বা ক্ষীণাবৃত স্ত্রী-অঙ্গ দর্শন। চুম্বন আলিঙ্গন এমন কি মৈথুনও কোনো-কোনো স্থলে দেখানো হয়। দর্শনেই অনেকের তৃপ্তি। আবার কেউ কেউ তৃপ্তি পায় দর্শন করিয়ে। এই সব আপদ ইউরোপের বড় বড় পার্কে ও বালিকা বিদ্যালয়ের আনাচে কানাচে বেড়ায়। Masochism ও Sadism এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রদের প্রহার করা যে মৈথুনের বিকার তা আমাদের মাস্টার মশাইদের জানা দরকার।

নর যদিও নারীর স্বাভাবিক ভোগ্য ও নারী যদিও নরের তবু ভোগ্যের বিকারও আর একটি সুপরিচিত সত্য। নব কামশাস্ত্র একে পরিহার করতে পারে না। এও প্রতিবিধানযোগ্য। হোমোসেক্সুয়ালিটি সেই প্রাচীন গ্রীস থেকে চলে আসছে। ইতর প্রাণীদের ভিতর এর অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কত বড় বড় দার্শনিক, কবি ও চিত্রকর যে হোমোসেক্সুয়াল তার লেখা-জোখা নেই। এ সম্বন্ধে এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের মত এটা জন্মগত। এর প্রতি প্রবণতা নিয়ে অনেকে ভূমিষ্ঠ হয়। অন্যান্যদের মতে এটা আকস্মিক ও এর অন্ত আছে। কতক লোক আছে তারা শিশুসম্ভোগী, কেউ কেউ শবসম্ভোগী। কারুর কারুর আবার বুড়ো বর বা বুড়ী বৌ পছন্দ। এমনও লোক আছে যাদের দুনিয়ায় কারুকে ভালো লাগে না, আপনাকে ছাড়া। এরা নার্সিসিস্ট। প্রাচীন কাল থেকে একপ্রকার মানুষ আছে যারা মানুষের চেয়ে পশু-পাখীর পক্ষপাতী। এদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। অল্প হলে পুরাণে এত বার এদের উল্লেখ থাকত কেন?

সবচেয়ে মজার লোক হচ্ছে তারা যারা প্রাণীলোকের বাইরে থেকে ভোগ্য আহরণ করে। এদের ভোগ্যকে বলা হয় 'Fetich'। ফেটিশ যে কত রকম তার সুমারি নেই। এক ভদ্রলোক রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দেখতেন কার জুতো সব চেয়ে ময়লা। তাকে ঘরে ডেকে এনে তার জুতো চিবোতেন, তাতে তাঁর উত্তেজনার পরাকাষ্ঠা ঘটত। আর এক ভদ্রলোক, লুকিয়ে মেয়েদের পোশাকের ক্যাটালগ থেকে ছবি কেটে কেটে রাখতেন। মাঝে মাঝে তাই বুকে চেপে ধরে তিনি মৈথুনের ফললাভ করতেন। ইনি একজন পাদ্রী এবং স্বামী হিসাবে বিফল।

৩

নব কামশাস্ত্রে বেশ্যাবৃত্তির স্থান আছে। যারা বেশ্যা হয় তাদের অনেকে যে স্বভাবদোষে হয় তার সন্দেহ নেই। তাদের স্বভাব বহুস্থলে তাদের শরীর গঠনের ত্রুটি থেকে আগত। নরমান হেয়ার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চান যে আধুনিক সমাজে পুংবেশ্যার আবির্ভাব হয়েছে। থেকে প্রমাণ হয় বেশ্যা-বৃত্তির আদি উৎস স্বভাবদোষ বা শরীরবিন্যাস নয়, সামাজিক চাহিদা। তার মানে সমাজ চায় যে বেশ্যার দ্বারা সমাজের পুরুষদের (ইদানীং পুংবেশ্যার দ্বারা সমাজের নারীদের) একটা অভাব মোচন হোক। সে অভাবটা কিসের? এক কথায় উত্তর দেওয়া কঠিন। কেবল অবিবাহিতরা যদি বেশ্যাগমন করত তবে বলতে পারা যেত মৈথুনের সুযোগের অভাব। কিন্তু বিবাহিতরাও যায়। কেবল প্রবাসীরা যদি বাসায় খেয়ে অন্যত্র রাত কাটাত তবে বলা চলত, সঙ্গে স্ত্রী নেই, সুতরাং। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরাও যায়। বললে চুকে যায় যে যাদের স্বভাব খারাপ তারা সতী স্ত্রীকে অবহেলা করে গোল্লায় যাবেই তো, না গেলে আমরা নভেল লিখব কী নিয়ে? কিন্তু ইতিহাসে লিখছে অনেক ভালো ভালো লোকেরও এ দুর্মতি হতো। এবং হয়।

বেশ্যা শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ সাধারণের ভোগ্যা, পাব্‌লিক উওম্যান। সমাজ যখন প্রাইভেট প্রপার্টির ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নারীরও দুই ভাগ হয়। এক ভাগ প্রাইভেট, বিবাহের দ্বারা তাদের দখল স্বত্ব সাব্যস্ত হয়। আর এক ভাগ পাব্‌লিক। তারা সমাজের এজমালি সম্পত্তি, তাতে বারোয়ারির অধিকার, তারা বারবনিতা। জমি যেমন প্রত্যেকের নিজের নিজের আর রাস্তাগুলি সাধারণের ব্যবহার্য, কুলাঙ্গনা ও বারাঙ্গনা তেমনি। প্রাচীনকালের মহাপুরুষরা বেশ্যালয়ে আসর জমাতেন, বেশ্যার কাছে সহবত শিখতেন, বেশ্যার পরামর্শ নিয়ে রাজ্য চালাতেন। কোনো দেশের পুরাণে বেশ্যার সঙ্গে নরকের সম্রব নাই, বরং আছে মন্দিরের সম্রব, স্বর্গের সম্রব। নরকের উপমা এলো মধ্যযুগে, সন্ন্যাসীর মস্তিষ্ক থেকে।

রূপের সঙ্গে রূপেয়ার সম্পর্ক বেশ্যার বেলা যেমন খাটে, বধূর বেলাও তেমনি। এই গ্রন্থের লেখকরা সেই জন্যে বেশ্যাবৃত্তির সংজ্ঞা নিরূপণকালে বেশ্যার সঙ্গে টাকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করেননি। সমাজের প্রত্যেক স্তরে বিবাহও একটা বেচাকেনা, কোথাও সাক্ষাৎ ভাবে, কোথাও তলে তলে।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, মানুষ বৈচিত্র্য চায়। আর বিকারের প্রতিও অনেকের নেশা। যারা সুন্দরী স্ত্রী ফেলে বেশ্যার কাছে যায় তারা হয়তো চায় রুচির বদল, হয়তো চায় এমন সব খেয়ালের চরিতার্থতা ভদ্র মেয়ে যার যোগান দিতে পারে না। কেউ গান শুনতে, কেউ নাচ দেখতে, কেউ মাতলামি করতে, কেউ রকমারি 'বন্ধ'-ধন্দের সমাধান করতে যায়। কারুর কারুর খেয়াল এমন বীভৎস যে উল্লেখ করতে লজ্জা করে। যদিও আমার এই প্রবন্ধে লজ্জাশীলতার আদর্শ রক্ষিত হয়নি।

বেশ্যার বিলোপ নেই। পরন্তু পুংবেশ্যার সূত্রপাত হয়েছে। একালের

নারীরও তো খেয়াল আছে, আর আছে খেয়াল মেটাবার স্বাধীনতা। দারিদ্র্যের অস্তিত্ব যতকাল থাকবে বেশ্যা ততকাল থাকবে। কিন্তু দারিদ্র্য তো আপেক্ষিক। যার লাখ টাকা আছে সেও ক্রোড়পতির তুলনায় দরিদ্র। সাম্যবাদের দেশে বেশ্যাবৃত্তি রহিত হয়েছে দেখে আশা হয় সাম্যবাদ ব্যাপক হলে বেশ্যাবৃত্তি সংকীর্ণ হবে। কিন্তু সাম্যবাদের দেশেও খেয়ালী মানুষ অনেক থাকবে, তাদের খেয়াল একদিন চরিতার্থতার আয়োজন করে নেবেই। যদি ভাবীকালের চিকিৎসকরা এই সকল লোককে আরোগ্য করতে পারেন, যদি শিক্ষকরা এদের খেয়ালের খতিয়ান করে সেই অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, যদি বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ প্রত্যেক ব্যক্তির রুচির ও রীতির দাবী মানে তবেই ভরসা করা যেতে পারে যে এই অবমানুষিক বৃত্তি, যা পশুদের মধ্যেও নেই, ক্রমে অপগত হবে। আপাতত বেশ্যাবৃত্তির দ্বারা সমাজের একটি উপকার হচ্ছে, sex education-এর অন্য স্কুল নেই।

সমাজের উপর বেশ্যার প্রতিশোধ যৌন ব্যাধি। এই ব্যাধিগুলি অতি প্রাচীনকাল হতে বিদ্যমান। বেশ্যাদের কাছ থেকে এগুলি আমদানি করে পতিরা সতীদের উপহার দেন, পুত্রকন্যারা সেজন্যে কৃতজ্ঞ থাকে। ইউরোপের কোনো-কোনো দেশে বেশ্যাদের সরকারী ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু সে পরীক্ষা নমো নমো করে দায়সারা গোছের। যৌন ব্যাধি দমন আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অসাধ্য নয়। গবেষণার ফলে দুঃসাধ্যও নয়। কিন্তু উটপাখীর সঙ্গে মানুষের এ বিষয়ে কিছু সাদৃশ্য আছে। যা অনিষ্টকর তার সম্বন্ধে মানুষ স্বেচ্ছায় অন্ধ সাজতে চায়। 'চুপ চুপ'-নীতি বিশেষ করে যৌন ব্যাধির বেলায় সমাজের পরম হিতৈষীদেরকেও বোবা বানায়। সমাজরক্ষীদের দুর্বুদ্ধিও সামান্য নয়। ব্যাধির ভয় যদি না থাকে তবে সবাই যে বেশ্যাগামী হবে! অতএব থাক ব্যাধি। হোক পতিব্রতা অসহায় পত্নীর, হোক নিরীহ নিষ্পাপ শিশুর। ঠাকুর চাকর ধোপা নাপিত ময়রা মুদী গাড়োয়ান কণ্ডাকটার সহযাত্রী সহভোজীর দ্বারা সংক্রামিত হোক সমাজের সর্বস্তরে, সমাজরক্ষীদেরও শরীরে। তবে হয়তো চেতনা হবে।

'চুপ চুপ'-নীতির তিরোভাব না হলে মানবের ভাগ্যে সুখ নেই। প্রকৃতি যে অমৃত আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে অজ্ঞতায় অসংযমে ও সামাজিক অব্যবস্থায় তাকে আমরা গরল করে তুলেছি। তার মধ্যে এনেছি পাপ, এনেছি রোগ, এনেছি বিকৃতি। সবচেয়ে ক্ষোভের কথা, এনেছি 'চুপ চুপ'-নীতির জুজু। যতদিন না sex-সংক্রান্ত জ্ঞান মানসাঙ্কের মতো সরল ও বর্ণ-পরিচয়ের মতো সুলভ হবে ততদিন অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর চাষার মতো নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে।

(১৯৩৪)

রবীন্দ্রনাথ : বিনুর সাক্ষ্য

বিনু তখনো জানত না যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবল প্রাইজ পেয়েছেন, কিংবা জানলেও বুঝত না, কেন। হঠাৎ একদিন তার চোখে পড়ল ইণ্ডিয়ান প্রেসের 'চয়নিকা'।

ইতিপূর্বে তাঁর নাম শুনেছিল কিনা স্মরণ নেই, সম্ভবত শুনেছিল 'মুকুট' নাটিকার অভিনয় উপলক্ষ্যে, কিন্তু তার বন্ধুরা ভালো ভালো পার্টগুলি দখল করে তাকে ধুরন্ধর সাজতে দেওয়ায় তার আত্মাভিমানে এমন ঘা লেগেছিল যে সে কেবল ইন্দ্রকুমার ঈশা খাঁর কথাই ভাবছিল, তাদের স্রষ্টার সমাচার নেয়নি।

বন্ধু ও বয়োজ্যেষ্ঠ মহলে তখন বঙ্কিম, গিরিশ ও দ্বিজু রায় বরেণ্য বলে কীর্তিত। বিনুর নিজেরও তখন কাব্যের চেয়ে নাটকে উপন্যাসে, শান্ত রসের চেয়ে বীর রসে, অধিক অনুরাগ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রতি মনোযোগের আবশ্যক ছিল না। যাঁরা 'মুকুট' নির্বাচন করেছিলেন তাঁরা বিশ্বাস করতেন না যে তার প্রণেতা কবিকুলমুকুট। বোধ হয় বালকদের অভিনয়যোগ্য নাটিকা খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে ঐ মনোনয়ন।

সহসা 'চয়নিকা' আবিষ্কার। বয়স তখন এগারো কিংবা বারো। বইখানি একবার চোখে পড়েই অদৃশ্য হলো, মনে রইল শুধু ছবিগুলি, ছবির নিচের কবিতার টুকরোগুলি, অদর্শনের অতৃপ্তি ও পুনর্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। দু তিন বছর পরে পুনরায় সে বই বিনুর হাতে আসে, কিছুদিন থাকে। ততদিনে সে মাসিকপত্রের কল্যাণে কবির সঙ্গে কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তখন চলছে 'বলাকা', 'পলাতকা'র পর্যায়।

বন্ধুরা বলে, রবিবাবু কবি বটে, কিন্তু দ্বিজু রায়ের সঙ্গে তুলনা হয় না। কোনো এক সাহেব নাকি তাঁকে ইংরেজীতে লিখতে সাহায্য করেছেন, সেসব ধরতে গেলে সেই সাহেবেরই লেখা। তাতে নাকি বিদেশে তাঁর সুনাম হয়েছে, কিন্তু ওটা সেই সাহেবেরই পাওনা।

মাস্টার মশাই বলেন, মানছি রবি ঠাকুর অসামান্য লেখক, কিন্তু তা শুধু গদ্যে। পদ্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি এখনো সকলের শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণ করেই রবিবাবুর কবিযশ।

অকালপক্ক বালক বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পড়েছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে তখনো মজেনি। "রসে অনুগমন" হতে হলে "বিদগ্ধ জন" হওয়া চাই, কিন্তু বিনুর রাধারা তখনো বিদ্যাপতির রাধা হয়ে ওঠেনি, চণ্ডীদাসের রাধা হয়ে ওঠা তো আরো বয়ঃসাপেক্ষ। মহাজনদের মধ্যে নরোত্তম দাসকেই তার উপাদেয় লাগত, কীর্তনকালে তাঁর পদগুলি চোখে জল আনত—এবং কীর্তনান্তে প্রসাদ।

বিনু ছিল তার বন্ধুদের মতো দ্বিজু রায়ের ভক্ত। বলা যেতে পারে দ্বিজু রায়ের পাঠশালায় লালিত। যেমন নরোত্তমের কীর্তন তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের

জাতীয় সঙ্গীত বিনুকে দিত অপর দশজনের সঙ্গে কণ্ঠ-সংযোগের সুযোগ। আর বীররসের প্রতি তার একটা অহেতুক আকর্ষণ ছিল। সেই বয়সে সেও এক-রাশ নাটক লিখেছিল, সে সব নাটকের প্রথম অঙ্কে "ধর অস্ত্র, কর যুদ্ধ", শেষ অঙ্কে "পতন ও মৃত্যু"।

বিনুর জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ যেমন আকস্মিক তেমনি বিলম্বিত। কিন্তু বিলম্বে এসেও তিনি সকলের সামনের আসনখানি অধিকার করে বসলেন। বন্ধুদের পরিহাস, মাস্টার মহাশয়ের উপহাস, আত্মীয়দের উপেক্ষা তাকে বিচলিত করল না, সে তার অবিকশিত বুদ্ধি ও অনিয়ন্ত্রিত রুচি দিয়ে আপন করে নিল তাঁকে—তিনি এশিয়ার পোয়েট লরিয়েট বলে নয়, তিনি বিনুর মতো অবোধ জনের সমবয়সী বলে।

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেনো।"

বিনু যে তাঁর রচনার বিশেষ কিছু বুঝত তা নয়। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, "কিছু বুঝলে?" বিনু অমনি উত্তর দিত, "এসব তো বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।" কেউ যদি বলত, "বুঝেছি" বিনু ক্ষুণ্ণ হতো। কারণ বুঝলে কি উপভোগ করা যায়? সব যে স্পষ্ট হয়ে গেল, একটুও রহস্য রইল না।

বিনুকে মুগ্ধ করত তাঁর আলো আঁধারি, তাঁর কিছু খোলা কিছু ঢাকা, তাঁর হাত খালি করে হাতে রাখা। অর্থের চেয়ে ইঙ্গিত বেশী, ব্যক্ততার চেয়ে ব্যঞ্জনা বেশী, ধরাছোঁয়ার চেয়ে লুকোচুরি বেশী, সেই জন্যেই বিনু তাঁর কবিতা বার বার পড়ত, বার বার ভোগ করত। যদি সব বুঝে ফেলত তবে আর পড়ত না, ভুলে যেত। কিন্তু সব কেন, একটুও বুঝত কিনা সন্দেহ। তা সত্ত্বেও সে খুশি হতো, মনে রাখত, গুন গুন করত। দুর্বোধ্য বলে অভিযোগ করত না, অভিযোগ শুনত না। বরং দুর্বোধ্য বলেই, রহস্যময় বলেই রাহুর মতো গ্রাস করত, পরিপাক না করেই আত্মসাৎ করত।

এমনি করে অন্ধ ভক্তের উদ্ভব হয়। বিনুও ছিল কবির একজন অন্ধ ভক্ত। তার সেই অন্ধ ভক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল, যৌবনোদ্গমের পরেও। এখন অবশ্য ভক্তি আছে, কিন্তু অন্ধতা নেই। তাতে হয়েছে বিপদ। কেননা এই পঁচিশ বছরে অন্ধ ভক্তি সংক্রামক হয়েছে। ছেলে বুড়ো সবাই এখন এক বয়সী—এক ভাবের ভাবুক।

সম্ভবত আরো পঁচিশ বছর পরে উল্টো বিপদ হবে। তখন হয়তো বিনুর মতো জনকয়েক ভক্ত থাকবে, কিন্তু অন্ধ ভক্তেরা অন্ধ শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। অন্ধ শত্রু তবু ভালো, সম্পূর্ণ উদাসীন তার চেয়ে খারাপ। কবিদের পক্ষে জীবদ্দশায় সর্বত্র পূজিত হওয়া ঠিক সৌভাগ্য নয়। সকলেই যাকে গ্রহণ করে সকলেই তাকে ঠেলে। রাজনীতির এই নিয়ম সাহিত্যেও প্রযোজ্য। সেই

জন্যে কবিদের জীবিতকালে খ্যাতি যেমন বাঞ্ছিত অপখ্যাতিও সেই পরিমাণে প্রয়োজন। এক দল অভক্ত থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে মৃত্যুর পরে অন্ধদের রুচিবদলের ফলে খ্যাতিলোপ হবে না, অপখ্যাতিই খ্যাতিকে বাঁচিয়ে রাখবে, অভক্তেরাই ভক্তদের জাগিয়ে রাখবে।

২

বিন্দু যখন বড় হয়ে কবিকে দর্শন করতে গেল তখন নিজেকে প্রশ্ন করল, "তুমি তো তাঁকে দর্শন করবে, তিনি তোমাকে দর্শন করবেন কেন?"

অর্থাৎ তোমার মধ্যে এমন কী আছে যা তিনি দেখবেন? তুমি কি তোমার অন্তরের রূপটিকে আকৃতি দিতে পেরেছ তোমার বাইরের রূপে, কিংবা তোমার রচনার রূপে, কিংবা তোমার মনীষার রূপে? তুমি কি সুপুরুষ, অথবা সুলেখক, অথবা সদালাপী? কী হাতে করে তুমি তাঁর দরবারে দাঁড়াবে? অন্ধ ভক্তি?

বিন্দুকে সুপারিশ করবার কেউ ছিলেন না, ইনট্রোডিউস করবার মতো কিছু ছিল না। তখনো সে আত্ম-আবিষ্কার করেনি, লিখেছে অতি সামান্য ও সেসব লেখা ক্বচিৎ ছাপা হলেও প্রতিশ্রুতিবিহীন। বিন্দু গিয়ে একাকী তাঁকে পাকড়াও করল, ছাত্র বলে পরিচয় দিল ও সুযোগ বুঝে পেশ করল একটি জিজ্ঞাসা। কবি তার মুখ রেখেছিলেন, তার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, বিন্দু সে বক্তৃতায় উপস্থিত ছিল না।

জিজ্ঞাসার কীট প্রবেশ করেছিল রম্যাঁ রলাঁর বই পড়তে পড়তে। টলস্টয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। আর্ট কি সকলের পাতে পৌঁছনোর উপযোগী হবে? না নিজের অন্তর্নিহিত নিয়ম মেনে স্বকীয় নিয়তি পূর্ণ করবে? অবশ্য এই জিজ্ঞাসার মীমাংসার উপর তৎক্ষণাৎ কিছু নির্ভর করছিল না। বিন্দু তার আপনাকে পায়নি, লেখক হতে মনস্থ করলেও তা ঠিক সাহিত্যিক অর্থে নয়। আত্মোপলব্ধির পর তার জিজ্ঞাসার নিরসন আপনি হলো। সকলের গ্রহণযোগ্য হওয়াটা গৌণ। মুখ্য হচ্ছে প্রেরণার বাঁশি শোনা। শিল্পী হচ্ছে ব্রজগোপী। সমাজের সঙ্গে ঘর করবে, কিন্তু কান পাতবে কানুর বেণু শুনতে। শিল্পী যদি তার প্রেরণার মর্যাদা রাখে, প্রেরণার যোগ্য হয়, তবে তার শিল্প স্বয়ং বিধাতার গ্রহণোপযোগী হবে, সুতরাং মহাকালের, সুতরাং চিরন্তন সমাজেরও। তার যে সৃষ্টি তা বিশ্বসৃষ্টিরই অঙ্গীভূত হবে, অতএব অবিনশ্বর, অতএব লোকহিতকর।

বিন্দু যখন আত্মনির্ভর হওয়ার পর কবির কাছে যায় তখন সে প্রেমের কবিতা লিখছে। সে সব তাঁকে দেখাবার মতো নয়। আর জিজ্ঞাসাও ততদিনে মীমাংসা পেয়েছে, তাঁকে বিরক্ত করবার বিশেষ কোনো কারণও নেই। বিন্দু দূরে দূরেই থাকল এবং দূর থেকেই ফিরল।

এর পরে আবার যখন গেল তখন কৃতী রূপেই গেল, তিনি তার লেখা

পড়েছিলেন। সে ধন্য হলো।

কিন্তু তার লেখা কি তার লেখা। বিনুর প্রশংসা করে একজন বিশিষ্ট কবি লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করে যাঁরা সার্থক হয়েছেন আপনি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

প্রশংসাটা বিনুর কাছে নিন্দার চেয়েও নিদারুণ লাগল। সে কি তা হলে বিনু নয়, সে কি স্বয়ংসিদ্ধ নয়? সে তবে রবীন্দ্রনাথের অনুসারক? স্বনামা নয়, রবিনামা?

অনুসরণ ও অনুকরণ অবশ্য অভিন্ন নয়। কিন্তু অনেক সময় দ্বিতীয়টা কটু হবে বিবেচনা করে প্রথমটা প্রয়োগ করা হয়। বিনু কি তবে অনুকারক? তাই যদি হয় তবে শ্রেষ্ঠ হওয়াটা সুখের কথা নয়। সেরা জালিয়াৎ যে সব চেয়ে বেশি সাজা পায়।

কবির অনুমোদন লাভ করে কোথায় বিনু আনন্দ করবে, না চোরের মতো মুখ ঢেকে রইল। তখন থেকে তাকে পীড়া দিতে থাকল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। না, সে তাঁর প্রভাব স্বীকার করবে না। সে তাঁর প্রভাবের বাইরে ছিটকে পড়বে। সে তাঁর সৌরমণ্ডলের বৃহস্পতি হবে না। সে উল্কার মতো ছুটে বেরিয়ে যাবে।

এই অদ্ভুত চিত্তপীড়া বিনুকে এমন একান্তভাবে অপ্রকৃতিস্থ করল যে সে রবীন্দ্রনাথের রচনায় চোখ বুলিয়ে যাওয়ার সময় পেল না। সাহস পেল না। পাছে তাঁর প্রভাব পড়ে।

বলা বাহুল্য, কবির সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বরাবর সহৃদয় ছিল, সেখানে কোনো তিক্ততার সংস্পর্শ ঘটেনি। কিন্তু শিল্পকার্যে সেই যে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক সেই সম্পর্ক বিনু ছেদন করতে সচেষ্ট হলো।

ফল হলো এই যে সে কবির প্রভাব এড়াতে গিয়ে কাব্যের প্রভাব এড়াল। কাব্য পড়তে স্পৃহা রইল না, সাহিত্যেও অরুচি ধরল। সে অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞান পড়ে। ইতিহাস তো তার পুরাতন বন্ধু। তার কথাবার্তা শুনে আলাপীরা মন্তব্য করেন, "কই, সাহিত্যিকের মুখে সাহিত্যের কথা নেই কেন?" বিনু বলে, "সাহিত্যচর্চা এখন শিকেয় তোলা। আমি ভূতপূর্ব সাহিত্যিক।"

একটি লাইনও লিখতে তার হাত ওঠে না। যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। কী লিখবে? কেন লিখবে? লিখতে বসলেই মনে পড়ে নানা অসংবদ্ধ পংক্তি তাঁর কবিতার, তাঁর গদ্যের। তাঁরই ভাব, তাঁরই ভাষা। তাঁকে অস্বীকার করে তাঁকে অতিক্রম করা অসম্ভব। হয় তাঁকে স্বীকার করে নিয়ে স্বীয় সাধনার দ্বারা অতিক্রম করতে হবে, নয় তাঁকে অস্বীকার করে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অপসরণ করতে হবে। গোটা সাহিত্যক্ষেত্র থেকে না হোক, কাব্যক্ষেত্র থেকে বিনু অপসরণ করল। পড়ল গিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মরুভূমিতে। বহুকাল সেই বালুশয্যায় শয়ন করে সে স্বপ্ন দেখল নতুন জীবনের। সামাজিক আবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ জড়িত, এই বিশ্বাস তাকে জাগ্রত রাখল

শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-বৈজ্ঞানিক চেতনায়।

ভাষা সম্বন্ধেও সে কিছুদিন থেকে ভাবছিল। বাংলা কবিতার ভাষা যেখানে পৌঁছেছে সেখানে একটা ঘূর্ণী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই ঘূর্ণীতে ঘুরছেন, সেখান থেকে তাঁর মতো সর্বশক্তিমানেরও নিষ্কৃতি নেই। তা দেখে সুধীন্দ্রনাথ উড়ে গেছেন আকাশে। সংস্কৃত অভিধানের আকাশ। বুদ্ধদেব দেশী নৌকোয় বিলিতী এঞ্জিন জুড়ে আধুনিকতার স্টীম ভরছেন, বিষ্ণু দে মধ্যস্থতা করছেন। কিন্তু গতি যেটুকু দেখা যাচ্ছে অগ্রগতি নয়, চক্রগতি। সুতরাং বিনু যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে তা হলে কেউ যে তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন তা নয়। বিনুর বদ্ধমূল ধারণা যে বাংলা কবিতাকে গতি দিতে পারে—চক্রগতি নয়, অগ্রগতি—লোকসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। লোকসাহিত্য অবশ্য হালফ্যাশনের গণসাহিত্য নয়, সেকালের Folk সাহিত্য। ছড়া তার শামিল।

৩

অবশেষে বিনুর কাণ্ডজ্ঞান ফিরল। পূর্বপুরুষের রক্তের প্রভাব যেমন তার রক্তের মধ্যে রয়েছে, পূর্বকবিদের ভাবের প্রভাব তেমনি তার ভাবনায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্বীকার করতে যাওয়া মূঢ়তা। বরং কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে নেওয়াই সিদ্ধির শর্ত। হাঁ, পড়েছে তাঁর প্রভাব আমার রচনায়। হাঁ, আমি অনুসরণই করেছি তাঁকে। অনুকরণও করেছি। তা সত্ত্বেও আমি বিনু, আমি নিজের কক্ষায় ধাবমান জ্যোতিষ্ক। আমি তাঁকে স্বীকার করলেই তাঁকে অতিক্রম করবার ছাড়পত্র পাব। পূর্বগামীদের কাছে ঋণী হতে যার সাহস নেই সে তার সামান্য মূলধনে কতটুকু লাভ করবে! বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা বড়ো বড়ো খাতক। কর্জ করতে তাঁদের লজ্জা নেই।

এর পরে সে যখন কবি সন্দর্শনে গেল তখন মাথা হেঁট করে পায়ের ধুলো নিল—যা সে আগে কখনো করেনি, ছাত্র অবস্থায়ও না। "গুরুদেব" বলে উল্লেখ করল—যা সে আগে কোনো দিন করেনি, প্রশংসার প্রত্যুত্তরেও না। তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবের নিকট নতজানু হয়েই সে পীড়ামুক্ত হলো। ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে তবেই সাহিত্যিকের শান্তি। যারা প্রবর্তক হবে তারা অনুবর্তক হবে তার পূর্বে। সাহিত্য একটা প্রবাহ। প্রভাব এড়াতে গেলে প্রবাহ থেকে সরে গিয়ে চরে বন্দী হতে হয়। সেই সকরুণ বিচ্ছেদ মৌলিকতার দ্বারা ভরে না, তার ক্ষতিপূরণ নেই। যারা ঐতিহ্যভ্রষ্ট তারা পিতৃধনবঞ্চিত অনাথ নাবালক। তেমন স্বনামা হয়ে পৌরুষ থাকতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণতার অভাব। বরং প্রভাবের ভয় কাটালেই প্রভাব ক্রমে ক্রমে কেটে যায়।

ওদিকে বিনুর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে বস্তুবাদের মরীচিকা অপসৃত হয়েছিল। যা কিছু দৃশ্যমান বা দৃষ্টিগোচর তাই একমাত্র সত্য বা অখণ্ড সত্য, এ ধারণা বিলীন হলে পরে রিয়ালিটির প্রকৃত রূপ বিভাসিত হলো। এতদিন সে রবীন্দ্রনাথকে রিয়ালিস্ট বলে আমল দেয়নি, এখন আসন দিল। ধ্যানীরাই

রিয়ালিস্ট হয়ে থাকেন। তিনি ধ্যানী। প্রাণের মতো পদার্থবিজ্ঞানের ধরা-ছোঁয়ার অতীত পদার্থ ধ্যানেই ধরা দিতে পারে, যন্ত্রে কিংবা গণিতে কিংবা ইন্দ্রিয়ে নয়।

প্রাণের বর্ণে গন্ধে স্বাদে ও লাবণ্যে যে রচনা ভরপুর সে যদি অবাস্তব হয় তবে দ্যুলোকভূলোকব্যাপী প্রাণ নিজেই অবাস্তব। বাস্তবের একটা কৃত্রিম সংজ্ঞা নির্মাণ করে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে সেই সংজ্ঞার মধ্যে পুরতে না পারার বিড়ম্বনা বিনু লক্ষ করেছে। তেমন অভিরুচি বিনুরও যে হয়নি তা নয়। বিজ্ঞানের মতো সাহিত্য যাতে objective হয় সে বিষয়ে সে-ও জল্পনা-কল্পনা করেছে। পরিণামে সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। হতে পারত অনাসৃষ্টি, কিন্তু বিনুর রসবোধ তাকে তেমন পরিণাম থেকে রক্ষা করেছে।

বিনু কদাপি কবুল করেনি যে সামাজিক আবর্তন হচ্ছে end, সাহিত্য হচ্ছে means। বরং তার জীবনের বস্তুবাদী অধ্যায়েও সে ধরে নিয়েছে যে সামাজিক ওলটপালট হচ্ছে means, সমৃদ্ধতর শিল্প সাহিত্য প্রেম হচ্ছে end, অর্থাৎ বর্তমান ব্যবস্থার ধ্বংসের উপর যে নতুন ব্যবস্থার পত্তন হবে তাতে কবিরা হবে নিরঙ্কুশ, প্রেমিকরা নির্বন্ধন, বাউলরা নির্দৈন্য। সবাইকে খেটে খেতে হবে, এই নির্দয় নীতি যদি রাষ্ট্রের মূলনীতি হয় তবে নতুন ব্যবস্থা হবে এই তিন শ্রেণীর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথকে যদি খোরাকের জন্য খাটতে হতো তিনি আর যাই হোন রবীন্দ্রনাথ হতেন না।

আর্টই যে end বিনুর এই মজ্জাগত প্রত্যয় তাকে শিল্পীর অপমৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরিয়ে এনেছে। যেমন করে ফিরে এসেছিল বাইবেলের সেই অমিতব্যয়ী তনয়।

তা বলে তার অন্ধ ভক্তি নেই। সাত আট বছরের ব্যবধানে সে ক্রিটিকাল হতে শিখেছে। কবিকে মেনে নিলেও কবিতাকে মেনে নেয় না। উপরে যে ঘূর্ণীর উল্লেখ করা হয়েছে কবিতা তাতে ঘুরপাক খেয়েছে কবির শেষ বয়সে। বিশেষ কোথাও উপনীত হয়নি। আধুনিক বাংলা কবিতার আসল সমস্যার সমাধানে আমরা তাঁর কাছে যথেষ্ট সহায়তা পাচ্ছিনে। ভাব ও ভাষার অসামঞ্জস্য দিন দিন বাড়ছে।

৪

বিনুর জীবনে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে চণ্ডীদাসের পদপাত ঘটেছিল। সেই থেকে চণ্ডীদাসের প্রতি তার একপ্রকার পক্ষপাত। বঙ্গের জ্যেষ্ঠ কবিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করতে সে সম্মত হয়নি, রবীন্দ্রনাথই তার বিচারে শ্রেষ্ঠ। তথাপি চণ্ডীদাসের সঙ্গেই তার affinity, চণ্ডীদাসের মতোই সে প্রথমে প্রেমিক, তারপরে কবি, বোধ হয় পরিশেষে বাউল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথমে কবি, তারপরে কবি, পরিশেষেও কবি। সেইজন্যে কবি হিসাবে শ্রেষ্ঠ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। রবীন্দ্রনাথের সাধনা কবিভাবের। চণ্ডীদাসের সাধনা প্রেমীভাবের।

এ তো গেল পক্ষপাতের একটা কারণ। আর একটা কারণ আর একটু জটিল : মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন বিনুর জীবনের উপর এমন ছাপ রেখে গেছে যে সে ছাপ ইউরোপের মানসসরোবর-স্নানে ধুয়েমুছে যায়নি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মানসিক প্রক্ষালনেও সে দাগ ওঠেনি। অসহযোগ আন্দোলনের যে অংশটা তাকে চঞ্চল করেছিল সেটা ইংরেজ কিংবা ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধতাবাচক নয়। বিনু বুঝতে পেরেছিল যে ইংরেজীতে যাকে বলে people তারই মধ্যে রয়েছে বীর্য, সৌন্দর্য, তাজা ভাষা ও তাজা ভাব। ইংরেজের সঙ্গে মান অভিমানের খেলা বিনুকে চিরকাল হাসিয়েছে, কিন্তু People-এর কাছে বল সন্ধান করা সত্যিই sublime.

পরবর্তীকালে people-কে অপমান করা হয়েছে masses আখ্যা দিয়ে। মানুষকে অপমান করা হয়েছে গণেশ বলে অভিহিত করে। যাক, সে কথা অবান্তর। কথা হচ্ছিল, people-এর অন্তরে যে বীর্য ও সৌন্দর্য আছে এটা সেই ১৯২০-২১ সাল থেকে বিনুর মনে বিঁধে রয়েছে। প্রেমের কণ্টক যেমন দিনের পর দিন দৃঢ়প্রবিষ্ট হয় এই কণ্টকও তেমনি। রম্যাঁ রলাঁর 'People's Theatre' ও টলস্টয়সংক্রান্ত পুঁথিপত্র পড়ে বিনুর ধারণা কায়েমী হয়। তা বলে সে সাহিত্যকে জনমনের উপযোগী করা নিয়ে রলাঁ কিংবা টলস্টয়ের সঙ্গে একমত হয়নি। সেখানে সে রবীন্দ্রশিষ্য। কবি হবে জনগণমন অধিনায়ক। নেতা নিজেকে নীয়মানদের উপযোগী করেন না, করতে গেলে হন অভিনেতা। নীয়মানদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নেতা করবেন তাঁর inner voice-এর প্রতি কর্ণপাত। কবির কাছে তাঁর inner voice হচ্ছে ধ্রুবতারা। কম্পাস যেমন সর্বদা উত্তরমুখী তেমনি কবির লেখনীও প্রতিনিয়ত প্রেরণামুখী।

বীর্য ও সৌন্দর্য, তাজা ভাব ও তাজা ভাষা সংগ্রহ করতে হবে people-এর কাছে। বিনুর এই ধারণার উন্মেষ অসহযোগ আন্দোলনের সময়। টলস্টয়ের মতো গ্রামে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে চাষী বনবার মতলব ছিল তার, উপরন্তু চাষানী বিয়ে করবার। বিনুটা কোনো কাজের নয়, কাজের বেলা পিছু হটাই তার স্বভাব। তার প্রিয়তম বন্ধু এ বিষয়ে বিনুর চেয়ে সাহসী। তিনি চাষীদের সঙ্গে চাষী হয়েছেন, চাষানী বিয়ে না করলেও স্ত্রীকে চাষানী করেছেন। তিনি যদি কবি হতেন তবে বিনুকে অনায়াসে হারিয়ে দিতেন, এক দিনেই ছাড়িয়ে যেতেন। তাঁর স্বরাজ সাধনা সাঙ্গ হলে হয়তো সাহিত্যে নামবেন। তখন কি বিনু তাঁর সঙ্গে পারবে?

এদিক থেকে চিন্তা করলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার এক জায়গায় একটা দুর্বলতা ছিল। তিনি সেকথা জানতেন। সেই জন্যে স্বদেশী যুগে ভার নিয়েছিলেন সর্বতোমুখ কর্মের। তাঁর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন কার্যত যে আকারই ধারণ করে থাকুক, জনসমূহের প্রতি প্রাণের টান থেকেই তাদের সূচনা। তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' এর আর-এক প্রমাণ। তিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রজাদের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে। পারেননি বলে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। টলস্টয়ও সত্যিকার 'মুঝিক' হতে পারেননি। চণ্ডীদাসের কালে যা

একান্ত সহজ ছিল এ কালে তা কল্পনাতীত কঠিন। বিনু তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।

তা হলেও বিনুকে ও তার পরবর্তীদেরকে এই চেষ্টাই করতে হবে। এ ছাড়া পথ নেই। বিশুদ্ধ কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। যাঁরা সেরূপ অধ্যবসায় করছেন তাঁরা ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করবেন এর তাৎপর্য।

৫

এমন কথা বিনু বলছে না যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই বাংলা কবিতার সহমরণ ঘটেছে বা সব সম্ভাব্যতা নিঃশেষ হয়েছে। তার বক্তব্য শুধু এই যে বিশুদ্ধ কাব্যসাধনায় জীবনব্যাপী অভিনিবেশ যদি রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধির সংকেত হয়ে থাকে তবে তাদৃশী সিদ্ধি আমাদের কারো কপালে জুটলেও আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা হয়নি, হলে সামান্যই হয়েছে। প্রাণপণ পরিশ্রমেও যেটুকু ফল লাভ হবে সেটুকু অকিঞ্চিৎকর। আমাদের কর্তব্য বিশুদ্ধ কাব্যসাধনায় অন্তত কিয়ৎকাল ক্ষান্তি দিয়ে উপরে যে পন্থার আভাস দেওয়া হয়েছে সেই পন্থায় পদক্ষেপ। অথবা অন্য কোনো পন্থা আবিষ্কার।

ইংরেজী সাহিত্যের অনুরূপ সন্ধিক্ষণে এক দল লেখক ও চিত্রকর নিজেদের নাম রেখেছিলেন Pre-Raphaelites। এই নামকরণটা বিনুর ভারি ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথকে যদি রাফেলের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে বিনু যে পন্থার উল্লেখ করেছে সেই পন্থার পান্থদের বলতে পারা যায় Pre-Tago-rites। রবীন্দ্রপ্রভাবকে অস্বীকার করা অনাবশ্যক, কিন্তু চণ্ডীদাসের কালে ফিরে গিয়ে ধীরে ধীরে একালে ফিরে আসা অত্যাবশ্যক। নন্দলাল বসু যেমন অজন্তার যুগে ফিরে গিয়ে বর্তমান যুগে ফিরে আসছেন। যামিনী রায়ের উদাহরণ বোধ হয় আরো জুৎসই হবে। তিনি বাংলার Folk Art-এ ফিরে গেছেন ও মাঝে মাঝে আধুনিক ইউরোপীয় আর্টে যাতায়াত করলেও তাঁর আধুনিকতা বাংলার Folk Art-এরই আধুনিকতা।

রবীন্দ্রনাথের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত যদি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে না থাকে তবে আমরা সহজেই দেখতে পাব কবিরা অন্যান্য শিল্পীদের মতো কারিকর বা craftsmen। যারা চরকা কাটে, তাঁত বোনে, কাঠের কাজ করে, মাটির ঘর বানায়, প্রতিমা গড়ে ও বাসন তৈরি করে কবিরা তাদেরই দলের লোক। ঘটনাচক্রে দলচ্যুত হয়ে ভদ্রসমাজে ভিড়েছে। এ সমাজে শ্রম আছে, সৃষ্টি নেই। সৌজন্য আছে, দরদ নেই। বিনয় আছে, আন্তরিকতা নেই। সামাজিকতা আছে, স্বাভাবিকতা নেই। হৈ চৈ আছে, প্রাণ নেই। রসাভাস আছে, রস নেই। এ সমাজে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সুখী হতে পারেননি, কখনো বজরায় কখনো আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন, অন্যথা আপনার মধ্যে আত্মগোপন করেছেন। ভদ্র ও ভদ্রাদের সঙ্গে বাস করে ভদ্র হয়ে ওঠা কবির পক্ষে মর্মান্তিক। নীট্‌শে বলতেন, "A married philosopher is ridiculous." বিনু বলে, "A respectable poet is absurd." কবিমাত্রেই ভদ্রসমাজের বাইরে, যদি

সত্যিকার কবি হয়। রবীন্দ্রনাথও পারতপক্ষে ভদ্রসমাজের বাইরে ছিলেন, কিন্তু তাঁর ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই যে তিনি কারিকরদের সমাজে কল্কে পাননি। অর্থাৎ কুমোর কামার তাঁতী ছুতোর স্যাকরা শাঁখারী রাজমিস্ত্রীরা তাঁকে সমান ভেবে আপন করে নেয়নি, চণ্ডীদাস বা কাশীদাসকে যেমন করে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা যদি মনে করি যে বছরে চারখানা বই লেখাই পুরুষার্থ এবং ইউরোপ আমেরিকায় সংবর্ধনাই মোক্ষ তা হলে আমরা কিছুই শিখিনি বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি যাকে বলেছি আমাদেরও সেটা ট্র্যাজেডি, কেননা যে সমাজে আমাদের কাব্যকলার প্রচার সে সমাজ আমাদের সমাজ নয়, যদিও ঘটনাচক্রে আমরা তার অন্তর্ভুক্ত। আর যে সমাজে আমাদের প্রকৃত স্থান সে সমাজে আমাদের হুঁকো বন্ধ। আমরা কারিকর, কিন্তু অন্যান্য কারিকরদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ। সেইজন্য যারা অন্যান্য কারিকরদের ঘিরে দাঁড়ায় তারা আমাদের ছায়া মাড়ায় না। কাশীদাসী মহাভারত ঘরে ঘরে, আলাওলের পুঁথি অন্তত একটি জেলার গ্রামে গ্রামে, চণ্ডীদাসের পদ মুখে মুখে, রামপ্রসাদী গান যেখানে সেখানে। দেশ শিক্ষিত হলে রবীন্দ্রনাথেরও দিন আসবে, কিন্তু ভয় হয় শিক্ষার সম্যক বিস্তার সম্প্রতি হবে না, হলেও তা ভদ্রশিক্ষা হবে। ভদ্রশিক্ষা শিল্পের শত্রু। রসবোধের বৈরী। দেশসুদ্ধ লোক যদি ভদ্রলোক হয় তবে ছবির চোখ, গানের কান, গঠনের হাত, নৃত্যের চরণ দেশছাড়া হবে।

৬

রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে বিনয়ের একটি থিওরী আছে।

যে সময় তাঁর ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' লণ্ডনে প্রকাশিত হয় সে সময় ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় সাহিত্য এমন একজন কবির প্রতীক্ষা করছিল যিনি সর্বতোভাবে সহজ, অথচ আর্টের সারেগামায় সিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' এত সহজ যে বারো বছরের বালকও তার ভাষা বুঝতে পারে। টলস্টয় এ-ই চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে এত দুরূহ যে বাহান্ন বছরের প্রৌঢ়ও সে ভাষা লিখতে পারেন না। ছন্দের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব জন্মালে, ধ্বনির উপর অধিকার মৌরসী হলে, একে একে সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করলে, বাহুল্যের লেশ না রাখলে সে ভাষা পোষ মানে, বোল শোনে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ঘোড়সওয়ারী করে ভাষা জিনিসটার প্রাণরহস্য আয়ত্ত করেছিলেন। সেইজন্যে ইংরেজী ভাষাও তাঁর শাসন মেনে সহজ চালে চলল।

সাহিত্যকে সহজ করার জন্যে টলস্টয়ের ব্যাকুলতা কেবল তাঁর একার ছিল না, ছিল ইউরোপের তৎকালীন আবহাওয়ায়। কেবল সহজ কথায় লিখলে কি সাহিত্য সহজ হয়? তা যদি হতো তবে শিশুপাঠ্য উপন্যাসগুলোর চেয়ে সহজ আর কী আছে! কথার সঙ্গে ছন্দ, ছন্দের সঙ্গে ধ্বনি, ধ্বনির সঙ্গে অর্থ, অর্থের সঙ্গে ব্যঞ্জনা একাধারে সব মিলে জীবনের সৌন্দর্যে সহজ

হলে তবেই সাহিত্য সহজ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকে সুন্দর ও সহজ করে তোলার পরে ইংলণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, দশ বছর আগে গেলে ও ইংরেজীতে 'চিত্রা' কি 'চিত্রাঙ্গদা'র তর্জমা করলে তেমন সাফল্যলাভ করতেন না। তাঁর জীবনের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স শোকে তাপে ভরা। সেই শোকতাপ তাঁর জীবনকে ও জীবনের সঙ্গী সাহিত্যকে নিরলংকার ও নিরহংকার করেছিল। প্রিয়বিরহের বেদনায় তিনি প্রিয়তমকে চিনেছিলেন, মৃতের মধ্যে অবলোকন করেছিলেন অমৃতময়কে। রিয়ালিটি যে অতি নিষ্ঠুর অথচ অতি মধুর, পরম ব্যথা অথচ পরম আনন্দ, সর্বব্যাপী শূন্যতা অথচ অন্তস্থলে পূর্ণতা, এই সহজ কঠোর উপলব্ধি তাঁকে ও তাঁর বাণীকে এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল যে স্তরে সাধারণ কবিদের ও সাধারণ কবিতার উত্তরণ নেই। তিনি স্বর্গ স্পর্শ করে মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন ওই দশটি বছরে। সেইজন্যে স্বর্গের মতো সহজ হয়েছিল, সুন্দর হয়েছিল তাঁর তখনকার কবিতা।

ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'তে স্বর্গের আমেজ ছিল। ইউরোপ তখন এক ঝুটা রিয়ালিটির আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। রিয়ালিটি যে প্রত্যেকের অন্তরে, সেই সহজ বোধটুকু হারিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাকে দিলেন সেই সহজ বোধ। তাঁর নিজের জীবনের কাঁটাবনের গোলাপ। ইউরোপ বহুকাল একজন মিস্টিক দেখেনি। ঠাওরাল তিনি একজন মিস্টিক। তুলনা করল মধ্যযুগের মিস্টিকদের সঙ্গে। কিন্তু মিস্টিকরা তো শিল্পের স্বরগ্রামে সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ যে শিল্পী। বাক্‌সাধনার দ্বারা বাণীকে বশ করেছেন। তাঁর মিস্টিক খ্যাতি যদিও অযথা নয়, তবু বিভ্রান্তকারী। ইউরোপ কতকটা বিভ্রান্ত হলো। সেই বিভ্রমের প্রতিক্রিয়া ওখানকার সাহিত্যিক মহলে এখনো চলেছে। ওঁরা তাঁকে মধ্যযুগের কোটায় ফেলেছেন, আধুনিক যুগের এলাকায় না। অথচ তিনি পরম আধুনিক তথা চিরন্তন।

রবীন্দ্রনাথের সত্যিকার দিগ্বিজয় এইবার আরম্ভ হবে। তিনি পূর্ণ শিল্পী। জীবনশিল্পী। তাঁর কাব্যসাধনাকে স্বরূপে দেখলে নিছক আর্টের দিক থেকে তাঁর কবিতার চূড়ান্ত সমাদর হবে। যেমন রাফেলের।

(১৯৪১)

হিন্দু-মুসলমান

আমাদের অনেকে নিখুঁৎ ইংরেজি বলেন, পোশাকও পরেন ইংরেজের মতো। আমাদের কেউ কেউ ইংরেজের মতো ফরসা। এমন কি, আমাদের মধ্যে ইংলণ্ডে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন বা আশৈশব শিক্ষা পেয়েছেন, এরূপ ব্যক্তিও বিরল নন। তবু কোনো ইংরেজ তাঁকে ইংরেজ বলে গণ্য করবে না। তিনি যদি ইংলণ্ডে

বাস করেন নির্দিষ্ট কাল, তবে আইনের চোখে তিনি ইংরেজ হতে পারেন। তবু তিনি ইংরেজের দলে ইংরেজ নন। তিনি যদি ইংরেজ-কন্যা বিবাহ করেন, চার্চ অফ ইংলণ্ডের সভ্য হন, তবু তিনি যে-কে-সেই। আমাদের কথা ছেড়ে দিন, স্বয়ং বার্ণার্ড শ প্রায় ষাট বছর ইংলণ্ডে কাটিয়েও লোকচক্ষে এখনো আইরিশ। এবং লেডী অ্যাস্টর ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজে বিবাহ করে তাদের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য হয়ে তাদের পার্লামেণ্টের সদস্য হয়েও লোকচক্ষে এখনো মার্কিন।

তবে ইংরেজের গুণ এই যে, ওরা দু-এক পুরুষ বাদে মনে রাখে না, কে কার বংশধর। ইংলণ্ডের মাটিতে পুরুষানুক্রমে জন্মালে ও মরলে, ওদের সঙ্গে বিয়ে না করেও ইংরেজ হওয়া যায়—ইহুদীরা হয়েছে। কিন্তু এর জন্যে ইহুদীদেরকে অন্যরকম ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। তাদের নাকি একসেট ঘরোয়া নাম আছে। অথচ বাড়ির বাইরে তারা জন স্মিথ, এডওয়ার্ড ব্রাউন, জর্জ জোন্‌স। তারা বাড়িতে যা খুশি বলুক, বাইরে বলে নির্ভুল ইংরেজি। তারাও মুসলমানদের মতো জবাই-না-করা মাংস খায় না, খায় না শুয়েরের মাংস। কিন্তু সে তাদের বাড়িতে। ইংরেজের দলে তারা আহারাদিতে বিলকুল ইংরেজ। বিয়েটা নিজেদের মধ্যে না করলে তাদের ইহুদীত্বের ভিত্ নড়ে। রক্তের মিশ্রণ তারা হতে দেয় না। তাই তারা অন্যকে ইহুদীধর্মে দীক্ষা দিয়ে ইহুদী করে নেয় না। রক্তে আলাদা থাকার দরুন তাদের চেহারা দেখে চেনা যায়, তারা হাজার ইংরেজ সাজলেও তারা ইহুদী।

ইহুদীদের মতো পারসীরাও রক্তের মিশ্রণ এড়াবার জন্যে পরকে তাদের ধর্মে দীক্ষা দেয় না, পারসী করে নেয় না। নিজেরা কিন্তু পোশাকে ভাষায় আচারে ব্যবহারে পরের নকল করতে করতে অন্যরকম হয়ে গেছে। মানিকজী দাদাভাই—এর কোন কথাটি ফার্সী? আজকাল ইংরেজের অনুকরণে পার্থিব সুবিধা। যে কারণে দত্ত হয়েছেন ডাট, মিত্র হয়েছেন মিটার, সেই একই কারণে পারসীরা আর-এক পা এগিয়ে গিয়ে কুপার, মরিস, কণ্ট্রাকটর, ক্যাপটেন ইত্যাদি ইংরেজি নামকরণ করেছেন। দুঃখের বিষয়, এর সবগুলি ইংরেজি শব্দ হলেও ইংরেজি নাম নয়।

ওদিকে নিগ্রোরাও নিজেদের ইংরেজি নামকরণে ওস্তাদী দেখাচ্ছে আরো বেশী। আমার কাছে 'লণ্ডন টাইম্‌সে'র সেই সংখ্যাটি নেই, যাতে এর অনেকগুলি নমুনা ছিল। আমরা তো নিচ্ছি শুধু বিশেষ্য পদ। ওরা নিচ্ছে ক্রিয়া-বিশেষণ। একটা-কিছু হলেই হলো। যেমন 'জেমস ভেরি গুড প্রিন্স অলরাইট ম্যান।'

এবার ইংরেজের কথায় ফিরে আসা যাক।

বহু ফরাসী ওলন্দাজ জার্মান রাশিয়ান রক্তের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ইংরেজ হয়ে গেছে। রক্তের মিশ্রণকে ইংরেজ সমাজ ক্ষতিকারক মনে করেনি। ইংরেজ ধর্মবিশ্বাসের ঐক্য দাবী করে না। অনেক ইংরেজ চার্চের এলাকার বাইরে। কেউ মুসলমান হলে তার জাত যায় না। ইংরেজ ও অনইংরেজে প্রভেদ ধর্মগত

নয়, রক্তগত। ইংলণ্ডবাসী ইহুদীদের ধরলে, রক্তগতও নয়, ঐতিহ্যগত। ইংলণ্ডের স্বকীয় ট্র্যাডিশনকে আপনার করলে, আপনাকে সেই ট্র্যাডিশনের বাহক করলে, ইংরেজের মতো ভাবলে, ইংলণ্ডের স্বার্থকে প্রথম স্থান দিলে ইহুদী বা পারসী থেকেও ইংরেজ হওয়া যায়।

এর সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করা যাক।

এ-দেশেরও একটা ঐতিহ্য আছে। অতিদীর্ঘ এর ইতিহাস। ঐ ইতিহাসের আদি থেকে কে কে এ-দেশে আছে, কে কে পরে এসেছে, তা হিন্দুসমাজের রূপ দেখে বোঝবার উপায় নেই। এমন মিশাল ঘটেছে যে, যারা পরে এসেছে তারাও নিজেদের আদি-ভারতীয়দের বংশধর বলে বিশ্বাস করে। রাজপুতরা ভাবে, তারা মহাভারতীয় যুগের ক্ষত্রিয়। মহাভারতীয় যুগের ক্ষত্রিয় রক্ত যে একেবারে তাদের দেহে নেই, তা কে জোর করে বলবে! তবু ক্ষত্রিয় না হয়ে রাজপুত হলো তাদের নাম। আমরা হিন্দুরা ভারতবর্ষের সমগ্র ঐতিহ্যকে দাবী করে থাকি। আমাদের এ-দাবী অন্যায় নয়। কারণ আমরা যাদের বংশধর, তাদের কেউ-না-কেউ আদিতে এদেশে ছিল। তাদের রক্তধারার, তাদের ভাবধারার বাহক আমরা। তারা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

যারা আদিকাল থেকে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে, তেমন জাতি পৃথিবীতে বেশী নেই। আমাদের হিন্দুদের প্রধান গর্ব এই যে আমরা তেমনি একটি জাতি। আমাদের কৌলীন্য অবশ্য ঝুটা। রক্তের বিশুদ্ধি কাল্পনিক। একদিন আমাদের ভ্রান্তি ছিল যে আমরা অমুক অমুক ঋষির গোত্র। আজও বিয়ের সময় সেটা মনে পড়ে যায়। চোখের সামনে কোচেরা রাজবংশী ও রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় হয়ে উঠল। এখন তারাও চন্দ্র সূর্যের নীচে কথা কইবে না।

তা হোক, একই দেশে একাধিক ঐতিহ্য সম্ভব নয়। একদিন-না-একদিন সবাইকে মূল স্রোতে ভাসতে হবে। মূল স্রোতটা রাজবংশীদের ধারণায় রক্তকৌলীন্য। যেমন আমাদের শিক্ষিতদের ধারণায় ছিল এবং দরকারের সময় ফিরে আসে। কিন্তু তা যে নয়, এ বিষয়ে শিক্ষিতদের দ্বিমত নেই। তবে কারুর কারুর নতুন ধারণা, হিন্দুর হিন্দুত্ব তার ধর্মবিশ্বাসে। এই বলে এঁরা হিন্দুধর্মের একটা সংজ্ঞা তৈরি করছেন। সেই সংজ্ঞা যদি কোনো জাপানী বা আমেরিকান গ্রহণ করে, তবে সে-ও নাকি হবে হিন্দু! তার মানে হিন্দুত্ব ভারতবর্ষের বাইরে টিকতে পারে। এঁরা ভুলে যান যে বিদেশীয় 'হিন্দুরা' বা 'আর্যসমাজীরা' তাদের জাতীয় প্রকৃতি বদলাতে পারে না। এবং জাতীয় প্রকৃতি যদি বেঁচে থাকে, তবে একদিন ধর্মের ভেক বদলানো কাপড় ছাড়ার মতোই সোজা। জাভার দৃষ্টান্ত কী শিক্ষা দেয়?

দেশের মূল স্রোত ঐতিহ্য। প্রত্যেক দেশের স্বকীয় ঐতিহ্য আছে। কোনো-কোনো দেশ তা রাখতে পেরেছে। কোনো-কোনো দেশ তা রাখতে পারেনি। কোনো দেশে একটানা স্রোত, কোনো দেশের স্রোত মাঝখানে শুকিয়ে গেছে। অতীত ও বর্তমান স্রোতের মাঝখানে বিস্মৃতির বালুচর।

অতীত বন্ধ্যা, বর্তমান তার দত্তক পুত্র। এসব দেশের একখানার স্থলে দু'খানা ইতিহাস লিখতে হয়। ফারাওদের মিশর, আরবদের মিশর। মায়া ও আজটেক আমেরিকা, ইউরোপীয় আমেরিকা।

ভারতের ঐতিহ্যের সংজ্ঞা দিতে যাওয়া বৃথা। কোনো জীবন্ত জাতি নিজের সংজ্ঞা দেয় না। মরণের সংজ্ঞা আছে, জীবনের নেই। আমরা বহমান, আমরা বিদ্যমান। আমরা দিন দিন কাপড় ছাড়ছি। নখ কাটছি। চুল ছাটছি। আমরা পরিবর্তিত হচ্ছি, বিবর্তিত হচ্ছি। আমাদের ধর্মবিশ্বাসও তলে তলে বদলে যাচ্ছে। আমাদের ধর্মগ্রন্থ চূড়ান্ত নয়, তারও পরিবর্তন ও বিবর্তন আছে। পৌর্বাপর্য রক্ষা করে হিন্দুসমাজ বার বার সংস্কৃত হয়েছে। প্রত্যেক জীবন্ত সমাজের রীতি এই। ইংরেজও চিরকাল বাঁধা ধর্ম মানেনি, বাঁধা আচার মানেনি। ইংরেজ রক্তও কত রক্তের সাংকর্য। ইংরেজি ভাষাও কত ভাষার সাংকর্য। আধুনিক ইংরেজের মধ্যে আদিম ব্রিটনও রয়েছে।

ভারতবর্ষে যেমন মুসলমান আছেন তেমনি খ্রীষ্টানও আছেন। সংখ্যা কার বেশী কার কম সেটা আকস্মিক, সত্যই আসল। সংখ্যার বাড়তি-কমতি আছে, একটা বন্যায় বা ভূমিকম্পে মেজরিটি মাইনরিটি হতে পারে। সংখ্যার উপর সত্যের স্থান। খ্রীষ্টানের সংখ্যা কম বলে তাঁর অস্তিত্ব কম নয়।

খ্রীষ্টান আছেন মালাবার অঞ্চলে প্রায় প্রথম শতাব্দী থেকে। তার মানে ইসলাম যদি এদেশে আটশ' বছর আগে প্রচারিত হয়ে থাকে খ্রীষ্টবিশ্বাস প্রচারিত হয়েছে আঠারশ' বছর আগে। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক দ্বিগুণকালব্যাপী। তবে পর্তুগীজ আগমনের পূর্বে খ্রীষ্টবিশ্বাসে দীক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না, মিশনারীতে দেশ ছেয়ে যায়নি।

খ্রীষ্টানরা যেমন প্রথম শতাব্দীতে মালাবারে আসেন সীরিয়া থেকে, তেমনি আরবরাও এসেছিলেন ও আসছিলেন ভারতের সমুদ্রতটবর্তী যাবতীয় প্রদেশে। আর্যযুগের পূর্বে যখন দ্রাবিড়যুগ ছিল তখন সামুদ্রিক বাণিজ্যও ছিল। সমুদ্রযাত্রায় আরবরা চিরকাল অভ্যস্ত। আরবদের হাত দিয়েই ভারতের পণ্য ইউরোপে যেত।

তারপর কেবল যে আরবদের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাই নয়, পারসিকরাও কখনো যুদ্ধ করতে, কখনো সৌর উপাসনা প্রচার করতে এদেশে এসেছিলেন খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বে। গ্রীক, গ্রীকবংশী, শক ও হূনদের কথা সবাই জানেন। আমি শুধু জোর দিতে চাই আরব পারসিকদের উপর। এঁরা ভারতবর্ষে বসবাসও করেছিলেন, করে অবিকল ভারতবর্ষীয় হয়ে গেছেন। আমরা হিন্দুরা এঁদেরও বংশধর।

আরবরা নিরীহ বণিক জাতি ছিলেন, ইসলাম তাঁদের দিগ্বিজয়ী করে। ইসলাম নিয়ে তাঁরা ভারতে এলেন কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের এদিকে অগ্রসর হতে পারলেন না। তাঁদের অসমাপ্ত কাজ আফগানদের উপর পড়ল। আফগান ও তুর্কিস্থানীরাই ভারতে রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং পরাজিত হয়ে

মুঘলকে পথ ছেড়ে দেন। পারসিকদের একেবারেই হাত ছিল না।

অথচ ভারতের আফগান, তুর্কিস্থানী, মুঘলরা পারস্যের ভাষাকে রাজভাষা ও আরবের ভাষাকে ধর্মভাষা করলেন। সেই দুই সূত্রে আরব-পারস্যের সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতিরূপে ভারতে উপনীত হলো। আরব ও পারসিক কেউ কেউ ভাগ্যপরীক্ষা করতে এসে রাজসরকারে কাজ পেলেন, জায়গীর পেয়ে এদেশে বাস করলেন। এঁদের স্বকীয়তা এঁদের মুসলমানত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত হলো। অন্যান্য দেশে যেমন সারাসেন সভ্যতার সৃষ্টি হয় তেমনি এদেশে হলো এক বিমিশ্র সভ্যতা, তাতে রাজপুতদেরও অংশ ছিল। তা ভারতের প্রচলিত ভাষাকে গ্রহণ করে তার ক্রিয়াপদ অক্ষুণ্ণ রেখে তাতে বিদেশী বিশেষ্য বিশেষণ মিশিয়ে তার নাম দিল উর্দু ওরফে হিন্দুস্থানী। শিল্পে ঘটেছে সারাসেনের সহিত রাজপুতের মিশাল, অনেক স্থলে রাজপুতের উপর সারাসেনের প্রলেপ। মন্দিরের কারুকার্য নিয়ে মসজিদের অঙ্গে গ্রথিত করলে পাঠান-রাজাদের কার্যসংক্ষেপ হতো। মুঘলরা কার্যসংক্ষেপ করেননি, কিন্তু তাঁদের কার্যে ডাক দিয়েছেন রাজপুতদের, শিল্পীদের মধ্যে ভেদবিচার করেননি।

ছয়-সাতশ' বছরের মুসলমান রাজত্বে বিদেশী রক্ত যা এসেছে তাকে তার আগের দুই-তিন হাজার বছর ধরে আসা বিদেশী রক্তের চেয়ে বেশী বলবার কারণ নেই। সংস্কৃতি যা এসেছে তার সম্বন্ধেও সেই কথা। কত আরব পারসিক গ্রীক গ্রীকবংশী শক কুশান হূন তিব্বতী চীনা মগ আর্য দ্রাবিড় আদিম রইল একদিকে, অন্যদিকে দাঁড়াল আফগান তুর্কিস্থানী আরব পারসিক ও তাদের দ্বারা ইসলামে দীক্ষিত পূর্বোক্তবংশীয়। দুই পক্ষের নাম হয়েছে হিন্দু মুসলমান।

হিন্দু-মুসলমান একই দেশের মাটির উপর বাড়ি করেছে, এটা আকস্মিক। এই আকস্মিকের উপর মিলনের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। মিলন হয় যদি দেশের সনাতন ধারার সঙ্গে এরা আপন আপন সত্তা মিলিয়ে দেয়। প্রত্যেক দেশের একটি সনাতন ধারা আছে। ভারতবর্ষে যখন আর্য আসেনি তখনো এ ধারা ছিল। আমেরিকায় যখন শ্বেতাঙ্গ যায়নি তখনো এ ধারা ছিল। জয়গর্বে আত্মাভিমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই আগন্তুকরা আদিমদের অগ্রাহ্য করেন, সনাতন ধারাকে করেন অস্বীকার। মহাকাল নেন এর প্রতিশোধ। একদিন-না-একদিন আগন্তুকের ঘাড় ধরে একই ঘাটে জল খাওয়ান। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গরা নেটিভদের দ্বারা অতি অলক্ষে প্রভাবিত হচ্ছে। নেটিভরা কেবল মানুষ নয়, ওরা দেশ। দেশের জল বাতাস বন আকাশ ওদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। ওরা বিজিত হতে পারে, কিন্তু ওদের দেশ একদিন জয়ী হয় আগন্তুকের উপর। কাইজারলিং তাঁর 'ইউরোপ' নামক গ্রন্থে এর আলোচনা করেছেন। দেশের অতীতকে মেনে নিতেই হবে, নিস্তার নেই। ধর্মবিশ্বাস তার সঙ্গে লড়াই করে পারে না, সামঞ্জস্য করতে বাধ্য হয়। আর্য বলে আমরা বড়াই করতে পারি, কিন্তু বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের বিশুদ্ধি আর

আছে কি ? সে সমাজব্যবস্থাই বা কোথায় ? দ্রাবিড় জয়লাভ করেছে, আদিম তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আগন্তুক আর্যদের নাম নয়, আদিমদের জননীর নাম আজ আমরা ধারণ করেছি। আমরা হিন্দের সন্তান। আমরা হিন্দু। যে-সব আর্য ভারতের বাইরে থেকে গেছেন—যেমন জার্মান বা ইংরেজ—তাঁদের প্রতি আমাদের মমতা নেই। আমাদের ভারতীয়ত্ব আমাদের প্রকৃত রূপ। আমাদের আর্যামি একটা পৈতামহিক পরিচ্ছদ।

মুসলমানকে ভারতের প্রয়োজন আছে। আমরা লক্ষ করেছি যে মানুষ হিন্দু থাকতে 'দাস্যসুখে হাস্যমুখ বিনীত যোড়কর' ছিল সেই মানুষ মুসলমান হয়ে 'উন্নত মম শির' বলে গান গেয়ে উঠেছে। সে তার আত্মার গান। যথার্থই তার কাছে 'নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।' হিন্দুসমাজে যে কয়জন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরাই কেবল ও কথা বলতে পারেন। জনসাধারণকে ও মন্ত্র উচ্চারণ করতে দিতে সমাজ অন্তরে অন্তরে আপত্তি করে এসেছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকলেরই প্রণাম করতে করতে মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে।

ধার্মিকের চিরকৌমার্যের প্রতি হিন্দুসমাজের একটা অস্বাস্থ্যকর পক্ষপাত আছে এবং বিধবার পক্ষে এই হলো বিধি। এগুলি হয়তো আমাদের তিব্বতী ও দ্রাবিড় পূর্বপুরুষের কাছে পাওয়া সংস্কার। এমনি একটি সংস্কার আমাদের গোভক্তি। যারা ছাগরক্তে কালীঘাট ধৌত করেছে, বলিদানে মহিষাসুর বধ করতে যারা দ্বিধা বোধ করে না, গোমাতাকে প্রহার করা যাদের নিত্য কাজ তারাই মুসলমানের প্রতি ঘৃণায় কণ্টকিত, ওরা যে গোরু খায়! এসব সংস্কার যে কত বিসদৃশ, ইসলাম গ্রহণ করলে এক মুহূর্তে বোঝা যায়।

আর্যদের আগমনের পূর্বে আদিম ছাড়া অন্য যে কয়টি জাতি ছিল তারা যে কে কখন ও কোনখান থেকে এসেছিল তা স্থির করা কঠিন। এই পর্যন্ত স্থির যে তারা স্বতন্ত্রভাবে নানাদিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল এবং আদিমদেরকে রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো খেদিয়ে দিয়ে নিজেরা মালিক হয়ে বসেছিল। তারা গোড়া থেকে সভ্য ছিল কি ক্রমে ক্রমে সভ্য হলো, তাও বলা কঠিন। কিন্তু তারা যে আর্য আগন্তুকদের চেয়ে সভ্য ছিল এতে ভুল নেই। আমরাই ভুল করে থাকি আর্যদেরকে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলদের চেয়ে সভ্য মনে করে। এটা আমাদের আগন্তুক মানসিকতা।

মুসলমানরা এদেশে আসার আগে হিন্দু কম সভ্য ছিল না, তবু আমাদের মুসলমানদের ধারণা তাঁদের খানা ও পোশাক বেশী জাঁকালো বলে তাঁরাই সভ্যতর। তেমনি আমাদের আর্যামির মোহ। আসলে কিন্তু আর্যেরা ছিলেন মোটের উপর আদিমদের মতো একবৃত্তিসম্পন্ন। গোড়ায় মৃগয়ার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু তাঁদের করণীয় ছিল না। তবে তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল, তাঁরা আসবার সময় বেদের কতক অংশ রচনা করে সঙ্গে এনেছিলেন। কেমন করে তাঁরা এদেশে এলেন এ সম্বন্ধে আমার অনুমান এই যে, তাঁরা

এলেন ঠিক তেমনি করে যেমন করে পরে এলেন পাঠান ও পাঠানের পরে মুঘল। অর্থাৎ ভারতের গৃহশত্রুর আমন্ত্রণে। কোনো-এক জয়চাঁদ কি লোদি-বংশাবতংস তাঁদের ডাকলেন মিত্ররূপে। তাঁরা মিত্র হয়ে এলেন, রাজা হয়ে থাকলেন। আর্যদের আগমন একবারে ঘটেনি। একই পথেও তাঁদের সকলে আসেননি। আর এক জাতিও তাঁরা ছিলেন না। তাঁদের নানা শাখা, নানা উপজাতি ছিল। আর্যদের আগমন বহুশতাব্দীব্যাপী।

তাঁরা এসে দেখলেন যে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁদের বিবেচনায় বর্বর। আপনাকে বড়ো ও অপরকে ছোট মনে করে মানবমাত্রেই, বিশেষ করে বিজেতা মানব। এই অহংকারটুকু অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁরা যা দেখলেন তাই আত্মসাৎ করতে লাগলেন। আর্যপূর্ব ভারতীয়দের সমাজদেহ বহুবৃত্তিসম্পন্ন জটিল ছিল। তাদের কেউ করে চাষ, কেউ করে ভোগোপকরণ নির্মাণ, কেউ করে আমদানি-রপ্তানি, কেউ কেবল যুদ্ধই করে। ইংরেজরা যেমন মুঘলদের শাসনযন্ত্র হাতে নিয়ে তারই চাকাটা স্প্রিংটা কব্জাটা ইস্কুপটা যখন যেটা দরকার তখন সেটা পালটিয়ে ও যোগ করে তাকে আজ পোনে দু'শ' বছর পরে ভিন্ন আকার দিয়েছেন, তেমনি আর্যরাও দ্রাবিড় ইত্যাদির চলন্ত ঘড়িতে দম দিতে দিতে মেরামত করতে করতে উন্নত করতে করতে তাকে আজ হিন্দুসমাজ নামক বিচিত্র জটিল দুর্বোধ্য একটি ঘড়িতে পরিণত করেছেন।

জাতিবিভাগ ভারতের বৈশিষ্ট্য। এর তাৎপর্য এই যে সমাজের এক অঙ্গের কাজ অপর অঙ্গ করবে না, সেই অঙ্গই করতে থাকবে। এই উপায়ে প্রতি-যোগিতা ও তার আনুষঙ্গিক অনিশ্চয়তা নিবারিত হবে। ইউরোপের সমাজে সকলের সব ব্যবসায়ে অধিকার আছে। ভারতে ডোমের অধিকার নেই ময়লা সাফ করবার। হাড়ির অধিকার নেই মড়া ছোঁবার। একের কাজ করতে অপর অসম্মত। তাতে উভয়ের অন্ন থাকে। এক পক্ষের অন্ন যায় না।

একান্নবর্তী পরিবার ভারতের বৈশিষ্ট্য না হলেও ভারতে বদ্ধমূল। বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেক সভ্য প্রয়োজনমতো খাদ্যপরিধেয় পায়, সাধ্যমতো উপার্জন করে পারিবারিক ভাণ্ডারে দেয়। বেকার, বৃদ্ধ, বিধবা, বিকলাঙ্গ এদের ভরণ-পোষণের জন্যে সমাজকে চাঁদা দিতে বা রাষ্ট্রকে সদাব্রত খুলতে হয় না। পরিবারের উপরই এর ভার।

আমার মনে হয় আর্যদের পূর্বেই জাতিবিভাগ ও একান্নবর্তী প্রথার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অবশ্য এমন বিপুল আয়তনে নয়। সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রথা দিনে দিনে, বছরে বছরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ ধরে বিরাট বটবৃক্ষের ব্যাপকতা পায়। কোনো-একদিন একদল বুদ্ধিমান মিলে রাতারাতি সমাজ গঠন করেন না। সমাজ গঠিত হয় বহুদিনের প্রয়োজনে, পরীক্ষায়, ভুলভ্রান্তির অভিজ্ঞতায়।

বাংলায় দেখা যাচ্ছে চাষ প্রধানত মুসলমানের হাতে। চাষী মুসলমান একটা জাত না হলেও জাতের যাবতীয় লক্ষণ তাদের ভিতর আছে। তারা কাচিৎ অন্যপ্রকার মুসলমানের সঙ্গে বিবাহাদি করে কিংবা খায়। একান্নবর্তী

পরিবারও তাদের তেমনি হিন্দুদের যেমন। সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার থাকায় বহুবিবাহের প্রলোভন অনেকে এড়াতে পারে না। একাধিক সম্পত্তির লোভে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। তাতে জনসংখ্যা এত বেশী বাড়ে যে সম্পত্তির ভাগ হলে দেখা যায় সম্পত্তির চেয়ে শরিক বেশী। বিধবার ভাগে সম্পত্তি পড়ায় বিধবাকে বিবাহ করতে অনেকের আগ্রহ। মুসলমান সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ চাষী মুসলমানদের বেলায়।

আশ্চর্য এই যে চাষকে বাংলার ইসলাম সম্মানকর মনে করে, অথচ তাঁতকে করে ঘৃণা। কসাইয়ের কাজ গর্হিত নয়, কিন্তু ধীবরের কাজ অবজ্ঞাত। তাঁতী ও জেলে মুসলমানদের মধ্যে অনেক। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে এরা সেন্সাসে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে নারাজ। এদের সঙ্গে চাষী মুসলমান কুটুম্বিতা করে না, এরা এক হিসাবে অন্ত্যজ। ঢাক বাজায়, গান করে, সাপ খেলায় এমন মুসলমান আছে বিস্তর। কিন্তু ইসলামে এসব কাজ নিষিদ্ধ। সুতরাং এদের সঙ্গে বিবাহাদি করাও সৎ মুসলমানের পক্ষে নিন্দনীয়।

বিজেতাকে বয়কট করার নীতি আজকের নয়। হিন্দু সমাজ আটশ' বছর আগে সংকল্প করে, মুসলমানের সঙ্গে সংস্রব রাখবে না। এই বয়কটের ভাব এখনো লোপ পায়নি। মুসলমানের জল খাব না, তাকে স্পর্শ করলে স্নান করব ইত্যাদি পুরুষানুক্রমে গড়িয়ে আসছে। এই নীতির ভুক্তভোগী মুসলমান আমাকে দুঃখের সহিত জানিয়েছেন যে এতকাল একত্র থেকেও তাঁরা হিন্দুর কাছে পল্লীঅঞ্চলে উদার ব্যবহার পাননি, এমন কি যে-ক্ষেত্রে হিন্দুরা তাঁদের প্রতিবেশী ও বন্ধুসদৃশ। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে তাঁরা হয় বিজেতারূপে এসেছেন, নয় বিজেতার দলে যোগ দিয়ে পর হয়ে গেছেন। হৃদয় জয় করবার দায়িত্ব তাঁদেরই। যারা হারে তারা কখনো ভোলে না, ক্ষমাও করে না তারা মহত্ত্বের পরিচয় না পেলে। মুসলমান সমাজের মধ্যে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করে হিন্দুদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। মুসলমান পীর হিন্দুরও গুরু। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মুসলমান—মুসলমান সমাজ—হিন্দু সমাজের প্রতি কী ব্যবহার করেছেন? হৃদয় জয়ের কোনো চেষ্টা হয়েছে কি? আকবরের সময় যা হয়েছিল সেটা তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টা, তাঁর জনকয়েক বন্ধুর চেষ্টা। কিন্তু প্রায় দু'শ' বছর হলো বিজিত হয়েও মুসলমানসমাজ আজও সেই বিজেতা ও বিদেশী মানসিকতা নিয়ে হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করছে। আর্যকে দ্রাবিড় ক্ষমা করেছে, কিন্তু মুসলমানকে হিন্দু ক্ষমা করেনি। এর কারণ সমষ্টিগত ভাবে মুসলমান হিন্দুকে প্রসন্ন করেনি। এখনো মুসলমানের সামাজিক মন থেকে যাচ্ছে না যে, সে নিজে গরীব হলে কী হয় তার তুর্কী মামা, তার আরবী চাচা, তার আফগান দাদা বড়লোক। বিজিত হিন্দুদের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক। এরা তো ছোটলোক। আর এই যে ভারতবর্ষ, এও তার মাতৃভূমি নয়—এ তার হারানো জমিদারি। এর প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মেলানো অবান্তর। তার ইসলাম তো তাকে এ কাজে উৎসাহ দিচ্ছে না।

কেমন করে সম্ভব হলো তার ইতিহাস নেই, কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে

ভারতবর্ষের মুসলমানদের অধিকাংশ কৃষিজীবী ও তাদের বসতি বাংলায় পাঞ্জাবে। কেন যে মাঝখানে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার বাদ গেল, কেমন করে যে লাফ দিয়ে মুসলমান মেজরিটি পাঞ্জাব থেকে বাংলায় এলো, এর গবেষণা চাই। আবার এই দুটি মেজরিটি কেন যে কৃষিজীবী হলো তাও গবেষণার বিষয়। পাঞ্জাব ও বাংলা ছাড়া অন্য যেসব প্রদেশে মুসলমান বিদ্যমান সেসব প্রদেশে তারা চাষ করে না, গ্রামে থাকে না। অবশ্য এ উক্তির ব্যতিক্রম আছে। সচরাচর সেসব প্রদেশের মুসলমান ভূম্যধিকারী, বাণিজ্যজীবী ও রাজকর্মে নিযুক্ত।

বস্তুত একটা দেশে দুটো সামাজিক কাঠামো থাকতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে বেচাকেনা করে, হিন্দু মেথর না হলে মুসলমানের চলে না, নাপিতও হিন্দু, ধোপাও। আবার মুসলমানদের এযাবৎ এমন কতকগুলো কাজ একচেটে ছিল যা হিন্দুরা করতে জানত না কিংবা করতে চাইত না। যেমন দর্জি দপ্তরী গাড়োয়ান চামড়ার ব্যাপারী ইত্যাদির কাজ। লস্করের কাজ এখনো মুসলমানদের একচেটে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই জাতীয় একটা সামঞ্জস্য শ্বেত মনুষ্যদের অনভিপ্রেত। সেদেশে তিনটে সমাজ আছে, কিন্তু ব্যবসায়িক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র দিন দিন সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আমাদের দেশে তিনটের বেশী সমাজ আছে—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসী, ইহুদী, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন। কিন্তু আহারবিহার ব্যতীত অন্য কিছু নিষিদ্ধ নয়। যদি ব্যবসায়িক অসহযোগ থাকত তবে হিন্দু মেথর এদের সকলের মল পরিষ্কার করতে চাইত না। তার ফলে মুসলিম মেথর, খ্রীষ্টান মেথর, পারসী মেথর ইত্যাদির উদ্ভব হতো।

(১৯৩৪)

ডিক্টেটরশিপ

ডিক্টেটরশিপ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে তা ব্যক্তিবিশেষের সর্বময় কর্তৃত্ব নয়। ডিক্টেটর নন সীজর। মুসোলিনিকে নেপোলিয়ন-বর্গীয় বলে মনে করলে ভুল করব। ডেমক্রেসির সঙ্গে ডিক্টেটরশিপের পার্থক্য হচ্ছে দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈতের। ডেমক্রেসির দুই পক্ষ। এক পক্ষের নাম পার্টি ইন পাওয়ার। অপর পক্ষের নাম পার্টি ইন অপোজিশন। ডিক্টেটরশিপ অপোজিশন সইতে পারে না, তাই অপর পক্ষ ছেদ করে নিরঙ্কুশ হয়। ডিক্টেটরশিপ হচ্ছে ডানা-কাটা ডেমক্রেসি। তার যিনি কর্ণধার তিনি পার্টির তেজে তেজীয়ান, পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তাঁর সত্তা। তিনি রাষ্ট্রের ডিক্টেটর হলেও পার্টির ডিক্টেটর নন। ব্যক্তিত্ব যদি তাঁর থাকে তবে তা নিতান্ত আকস্মিক, না থাকলেও অচল হতো না। যেমন কন্স্টিটিউশনাল রাজার।

আদত কথা দুই হাতে যে তালি বাজে তার নাম ডেমক্রেসি আর এক হাতে যে কাঁসি বাজে তার নাম ডিক্‌টেটরশিপ। হাত এস্থলে পার্টি। উভয়েরই প্রাণ পার্টিগত। পার্টিকে নির্মূল করে দাও, দেখবে ডেমক্রেসিও নেই, ডিক্‌টেটরশিপও নেই। পক্ষান্তরে পার্টিকে ডালপালা মেলতে দাও, একদিন পাবে হয় ডেমক্রেসি নয় ডিক্‌টেটরশিপ। একই বীজ থেকে কী করে দুই জাতের চারা হতে পারে তা আমাদের সকলের জেনে রাখা ভালো। নইলে বুনব ডেমক্রেসি আর ফলবে ডিক্‌টেটরশিপ।

২

ইংলণ্ডে যখন রাজার হাত থেকে প্রজার হাতে ক্ষমতা আসে তখন প্রজাদের দুই দল দাঁড়িয়ে যায়। তাদের এক পক্ষ নেয় রাজার অংশ, করে শাসন। অপর পক্ষ নেয় প্রজার অংশ, করে সমালোচনা। চক্রের আবর্তনে সমালোচকরাও শাসক হয়, শাসকরাও হয় সমালোচক। তারা পালা করে ক্রিকেট খেলে, কখনো এর হাতে ব্যাট ওর হাতে বল, কখনো ওর হাতে ব্যাট এর হাতে বল। হুইগ ও টোরি এই দুই দল ওস্তাদ খেলোয়াড় ইংলণ্ড সরগরম করে তুলল, অন্যান্য দেশেও সাড়া পড়ে গেল। সবাই বলল আমাদেরও অমন দুটি টিম চাই। উঠল ডেমক্রেসির জয়ধ্বনি।

ইংরাজের মতো সবাই তো ক্রিকেট বোঝে না। অন্যান্য দেশে টিম তৈরি হলো বটে, কিন্তু দুটি নয়, তার বেশী। জোড়াতালি দেওয়া দলের খেলা ঠিক ইংরাজি খেলা নয়। তা হলেও তা খেলা। তা পার্লামেণ্টারী গবর্নমেণ্ট।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র জগৎ যখন ডেমক্রেসির নাম জপছে তখন এক বেসুরো গলায় উচ্চারিত হল, ডিক্‌টেটরশিপ। রসভঙ্গকারীর নাম কার্ল মার্ক্‌স্‌। কার ডিক্‌টেটরশিপ? কোনো ব্যক্তিবিশেষের? না। প্রোলিটারিয়াটের। শ্রমিকগোষ্ঠীর।

মার্ক্‌সের মতে রাজার ক্ষমতা প্রজার হাতে এসেছে বটে, কিন্তু প্রজা এক্ষেত্রে কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। পার্লামেণ্ট হয়েছে তাদের পাঁঠা। সেটাকে তারা যেমন ইচ্ছা কাটছে। তাতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রবেশ নেই, প্রবেশ থাকলেও স্বার্থসিদ্ধির ভরসা নেই। শ্রমিক কী চায়? কোন পক্ষ কত দৌড় করল? কয়টা ছোটখাটো উপকার করল? না। শ্রমিক চায় সে তার শ্রমের সম্পূর্ণ মূল্য পাক। যারা তাকে তার ষোলো আনা পাওনার জায়গায় পাঁচ আনা দিয়ে বলে খুব পেয়েছে, যারা তার বকেয়া এগারো আনা পকেটে পুরে বড়োলোক, তাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে তর্ক করা বৃথা। তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ না করে তাদের সোজা বিদায় কর। কেড়ে নাও তাদের হাত থেকে ক্ষমতা। নির্বাচনে জয়লাভ করে নয়, সরাসরি গায়ের জোরে। রাষ্ট্র-পরিচালনা ছেলেখেলা নয়, ক্রিকেট নয়। যারা শ্রম করবে না তারা বাঁচবে না। তাদের বাঁচা বারণ। আর যারা শ্রম করবে তাদের কী নিয়ে দলাদলি হতে পারে? তাদের নিয়ে যে সমাজ তাতে একাধিক দলের স্থান নেই।

মার্কসের সময় থেকে ডিকটেটরশিপের আইডিয়া ডেমক্রেসির আইডিয়ার সপত্নী হলো, কিন্তু তার প্রতি বিশেষ কেউ ভ্রূক্ষেপ করেননি। ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের শ্রমিকরা পার্লামেন্টে প্রবেশ করতে টোরি হুইগের মতো পার্টি খাড়া করল, নির্বাচনের আসরে নামল। ধীরে ধীরে তারা দলে ভারী হয়ে একদিন অপোজিশনের আসন নিল। তারপরে ব্যাট ধরল। হুইগ বনাম টোরির খেলায় হুইগ দলে ফাটল দেখা দেয়, অ্যাস্কুইথ ও লয়েড জর্জ পৃথক হয়ে যান। ফলে উভয় উপদল নগণ্য হয়। লেবার লিবারলের বদলে খেলার আসর জমায়।

ইংলন্ডের লেবার পার্টির অনুরূপ জার্মানীর সোশ্যাল ডেমক্র্যাট পার্টি। অন্যান্য দেশে বিশুদ্ধ সোশ্যালিস্ট পার্টি। এদের সকলেরই পলিসি পার্লামেন্টে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে টোরি বা হুইগের মতো রাষ্ট্র শাসন করা। অর্থাৎ বিপক্ষকে খেলায় আউট করে তার ব্যাট ধরা। এরা বিপক্ষকে খেলার মাঠ থেকে খেদিয়ে দিতে চায় না, এরা চায় ওরা বল ছুঁড়ুক। সমালোচনায় এদের আপত্তি নেই, এরা অপোজিশনের রসগ্রাহী।

মাঝখানে একটা মহাযুদ্ধ না ঘটে গেলে ডেমক্রেসির উপর জনগণের আস্থা অচলা হয়ে রইত। কোনো দেশেই ডিকটেটরশিপের প্রশ্ন কাফিখানা বা লেখকের দপ্তর ছাপিয়ে উঠত না। কিন্তু মহাযুদ্ধের দিন ইংলন্ডের মতো খেলোয়াড়ধর্মী দেশেও ডেমক্রেসির খেলার ভোল বদলায়। অ্যাস্কুইথকে গুরু-দক্ষিণা দিয়ে লয়েড জর্জ কোয়ালিশন গবর্নমেন্ট গড়লেন। সমালোচনা করবার জন্যে কেউ রইল না। সকলের এক তনু এক মন এক ধ্যান। অপোজিশনের অভাব যদি হয় ডিকটেটরশিপের সংজ্ঞা তবে ইংলন্ডে এই সময় ডিকটেটরশিপই স্থাপিত হয়েছিল। ডিকটেটরশিপের লক্ষণ এই যে তার অধীনে ব্যক্তির অধিকার সঙ্কুচিত হয়, ব্যক্তিকে স্বাধীন বলে গ্রাহ্য করা হয় না। মহাযুদ্ধের আমলে ইংলন্ডের মানুষ যা-খুশি করতে পারত না, যা-খুশি বলতে পারত না। খবরের উপর সেন্সরশিপ, খাবারের উপর ভাগ-বাঁটোয়ারা, আলোর উপর নির্বাণের আদেশ, সব জিনিসের উপর খাজনা। গবর্নমেন্ট নিজেই গোলা-বারুদের কারখানা চালান, অন্য অনেক ব্যবসার উপর গবর্নমেন্টের হস্তক্ষেপ চলে। যার ইচ্ছা সেই তাকেও পাকড়িয়ে সেপাই করে যুদ্ধে পাঠানো হয়, তার বিবেকের বাধা থাকলে কয়েদ করা হয়।

ইংলন্ডের মতো বনেদী ডেমক্রেসিও যুদ্ধের দিনে ফেল মারল। শুধু যুদ্ধের দিনে নয়। ডিপ্রেশন যখন ঘনিয়ে এল তখন ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে সমস্ত কনসারভেটিব, সমস্ত লিবারল ও বহু সংখ্যক সোশ্যালিস্ট মিলে ন্যাশনাল গবর্নমেন্ট পত্তন করলেন। নামমাত্র একটি বিপক্ষ দল রইল, তাদের মৃদু স্বরের সমালোচনা দুর্বলের প্রতি অনুগ্রহ করে শুনলেন কর্তারা, কিন্তু কর্মের ইতরবিশেষ লক্ষিত হলো না। সুখের বিষয় ইংলন্ডকে এই ডিপ্রেশন জখম করতে পারেনি, যেমন করেছে আমেরিকাকে। যদি করত তবে ব্যবসার উপর দস্তুরমতো হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হতো।

৩

মহাযুদ্ধে যখন ক্রিকেটের জন্মভূমির এই দশা তখন অন্যে পরে কা কথা। মার্কসের মানসকন্যা রুশকে মাল্যদান করলেন। নির্জলা ডিক্‌টেটরশিপ Tsarএর মসনদ দখল করল।

বোলশেবিক রুশ একালের প্রথম নিরাবরণ ডিক্‌টেটরশিপ। ইংলণ্ডে যা অল্পের উপর দিয়ে গেল, রুশে তা ষোলো কলায় পূর্ণ হলো। অন্নের ভাণ্ড রাষ্ট্রের হাতে। বস্ত্রের ভাণ্ডার রাষ্ট্রের জিম্মায়। গহনার বাক্স রাষ্ট্রের সিন্দুকে। একটি পয়সাও কারুর পকেটে নেই। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি, বল ভাই ধন্য রাষ্ট্র! নিজেকে ব্যক্তি বলে ভাবাটাও রাষ্ট্রদ্রোহ, সমষ্টির অকল্যাণ।

সবচেয়ে বড় কথা, কোনো সমালোচক রইল না। দেশে কেবল একটি বাণী, একটি সুর, একটি সত্য। তার প্রতিবাদ নেই। তার সংশোধন নেই। বিপক্ষের সংবাদপত্র বাহির হয় না, বই ছাপা হয় না, বক্তৃতা উচ্চারিত হয় না। বিপক্ষীয়রা হলো নির্বাসিত, কারারুদ্ধ, নিহত। সব জমিই খাস মহল, সব ব্যবসাই খাস ব্যবসা, সব কারখানা খাস কারখানা। এর সামান্য ব্যতিক্রম স্থলে স্থলে অনুমোদিত হলেও আইনে স্বীকৃত হলো না। ভোগোপকরণের উৎপাদনে ও বিতরণে রাষ্ট্রের কেউ প্রতিযোগী নয়, কোনো প্রতিযোগী নেই। ঘরে-বাইরে নিরঙ্কুশ হয়ে রাষ্ট্র স্থির করল প্ল্যান করে সেই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের অশন-বসনের অভাব পূরণ করবে। সমস্ত ব্যক্তির সংহত প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের নির্দেশে ধন সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্র যোগাবে মূলধন, ব্যক্তি যোগাবে শ্রম, রাষ্ট্র যোগাবে দিশা, ব্যক্তি যোগাবে মনীষা। ব্যক্তির পারিশ্রমিক বিভিন্ন হবে, কিন্তু সেই পারিশ্রমিককে মূলধনে পরিণত করা নিষিদ্ধ। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খাটাতে পারবে না। অপরের জন্যে খাটতে পারবে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র প্রত্যেককে কাজ দেবে, খোরাক দেবে।

এখন এই ব্যবস্থা একদা ডেমক্রেসির সাহায্যেও সাধিত হতে পারত। সেই সুদিনের অপেক্ষায় বসে থাকতে মার্কসপন্থীরা রাজি নয়, তাই তারা দিনটাকে সরাসরি উপায়ে এগিয়ে নিল। তাদের কৈফিয়ৎ এই যে মধ্যবিত্তরা ভোটে হেরে রাষ্ট্রের পায়ে সম্পত্তি সমর্পণ করাবার পাত্রই নয়, ভোটে হারজিত্ তাদের ঘরোয়া তামাশা, তার সুযোগ নিয়ে অন্য শ্রেণীর লোক যে তাদের ঘর সংসার বেদখল করবে এর সম্ভাবনা দেখলে তারা তামাশার টিকিট বেচবে না, জুয়াখেলায় বাজি রাখতে দেবে না। তার মানে ডেমক্রেসির আটঘাট বেঁধে তাকে নিজেদের পক্ষে নিরাপদ করে তুলবে। আধুনিক পরিভাষায় তাদের ডেমক্রেসি সেফগার্ডে সমাচ্ছন্ন পর্দানশীন সাজবে।

৪

মার্কসপন্থীদের আশঙ্কা অমূলক নয়। তার প্রমাণ ধীরে ধীরে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ তাদের আশঙ্কার প্রতিষেধকরূপে তারা যা উদ্ভাবন করেছে তা এমন সদ্যফলপ্রদ যে দেশে দেশে তার জাল হতে লেগেছে। রুশবিপ্লবের

অনতিকাল পরে ইটালীতে ফাসিস্ট ডিক্‌টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাসিস্টরা পার্লামেণ্ট উঠিয়ে দেবার দরকার দেখল না, রাজারও মাথা কাটল না। চার্চের সঙ্গে একটু ঝগড়া বাধলো বটে, কিন্তু চার্চ তাদের স্বার্থে বাদ সাধল না, সুতরাং চার্চের স্বার্থকেও তারা মেনে নিল।

ফাসিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য ইটালীকে প্রথম শ্রেণীর শক্তির পর্যায়ে উন্নীত করা। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া যখন পৃথিবী ভাগ করে নিচ্ছে ইটালী ও জার্মানী তখন বহুধাবিভক্ত। উপরন্তু ইটালী তখন পরাধীন। অন্যেরা অনেক দূর যাবার পর এই দুই জাতি জাগে। জেগে দেখে তাদের ভাগে বেশী কিছু অবশিষ্ট নেই, আফ্রিকার মাংস নিঃশেষ, খানকয়েক হাড় পড়ে রয়েছে। এশিয়াও পরের গ্রাসে। অবশ্য ঘরের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হলে চলত। কিন্তু তা হলে প্রথম শ্রেণীতে নাম ওঠে না। প্রথম শ্রেণীই স্বর্গ, প্রথম শ্রেণীই ধর্ম, প্রথম শ্রেণীই পরম তপ। নবজাগ্রত ইটালীর নবপ্রতিষ্ঠিত ডেমক্রেসি আফ্রিকার দিকে হাঁ করল। কিন্তু হাঁ ভরল না। আদোয়াতে আবিসিনিয়ার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে ইটালী আর ও-মুখো হলো না। বলকান যুদ্ধের মরসুমে তুর্কীর কাছ থেকে ত্রিপোলী কেড়ে নিয়ে সে কোনো-মতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেল বলা চলে। মহাযুদ্ধে তার মহদ্‌ভোজ্য সমুপস্থিত হয়, তার বিভীষিকার হেতু অস্ট্রিয় সাম্রাজ্য চূর্ণ হয়ে যায়। আড্রিয়াটিক সাগরের বন্দর তো সে আহার করলই, অধিকন্তু দক্ষিণ টিরোল দক্ষিণা পেল। বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া রাশিয়া ও তুর্কীর যে প্রতিপত্তি ছিল একা ইটালী তার সবটা করায়ত্ত করল। অস্ট্রিয়ার জাহাজগুলি বগল-দাবা করে ভূমধ্যসাগরে ইটালীর ভার বাড়ল। ওদিকে জার্মানীর বাণিজ্যের একাংশ তার ভাগ্যে জুটেছে। এক কথায় ইটালীর সামনে সীমাহীন আশা, প্রাণে সদ্যলব্ধ সাহস। অন্ধ যেন দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, খঞ্জ ফিরে পেয়েছে চলৎ-শক্তি।

বাছুরের নতুন শিং উঠেছে, সে যত্রতত্র ঢুঁ মারবার জন্যে অধৈর্য। সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ হবার জন্যে ইটালীর ফাসিস্ট দলের স্বর সইল না। রাশিয়ার বোলশেবিকদের দৃষ্টান্ত ছিল চোখের সুমুখে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের আদর্শও নিত্য পরিচিত। এবং এমন আশঙ্কাও ছিল যে কমিউনিস্ট দল বাহুবলে রাষ্ট্র অধিকার করবে। ডিক্‌টেটরশিপ যদি ইটালীর কপালে লেখা থাকে তবে কমিউনিস্ট ডিক্‌টেটরশিপ কেন? ফাসিস্ট ডিক্‌টেটরশিপ কেন নয়? ফাসিস্টরা কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করল। অবিকল কমিউনিস্ট পদ্ধতি দিয়ে কমিউনিস্টকে পরাস্ত করল। যেন জিউজুৎসু দিয়ে জাপানীকে। মাঝখান থেকে মারা পড়ল বেচারা উলুখাগড়া লিবালরা। সোশ্যালিস্টরা বেকুব বনল। ডেমক্রেসির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ঘটল প্রাণান্ত। ফাসিস্টরা বিরুদ্ধবাদীমাত্রকেই টিপে টিপে মারল, সরাল, তাড়াল, বাঁধল। অপোজিশনের নামগন্ধ রাখল না।

আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে, ফাসিস্টদের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য স্বদেশের

শক্তিবৃদ্ধি। এর জন্যে রাষ্ট্রকে দিয়ে যা-কিছু করানো সম্ভব তাই করণীয়। রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে বাঘকে হরিণকে এক ঘাটে জল খাওয়াতে পারে। রাষ্ট্রের চাপে ধনিক ও শ্রমিক আপোস করল। রাষ্ট্র সাহায্য করল উভয়কেই। কারুর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে খাস করতে হলো না, সকলের সম্পত্তির উপর ক্ষমতা জাহির করাই যথেষ্ট বোধ হলো। একটা উদাহরণ দিই। ইটালীতে বেড়াবার সময় লক্ষ করেছি হোটেলের প্রত্যেক ঘরে ফাসিস্ট পার্টি একখানি কাগজ এঁটে দিয়েছে, তাতে লেখা আছে ঘর ভাড়া এত, বিদ্যুতের ভাড়া এত, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স এত ইত্যাদি। মনোযোগের বিষয় এই যে রাষ্ট নয় ফাসিস্ট পার্টির স্থানীয় কর্তৃপক্ষই এইসব হোটেলের মা বাপ। পার্টি রাষ্ট্র দখল করেছে বলে নিজের দুর্গ ছাড়েনি। ওটুকু রাষ্ট্রীর স্বাধীন।

যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডের সঙ্গে ফাসিস্ট ইটালীর তুলনা সর্বাধিক সংগত। ফাসিস্টরাও বলে তাদের ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা, যুদ্ধ জগতের সনাতন ধর্ম, তা শান্তির দিনেও অন্য আকারে রয়েছে। প্রাণে মারার চেয়ে ভাতে মারা কম মারাত্মক নয়। বিদেশী মালের উপর শুল্ক চড়িয়ে শান্তির দিনেও এক দেশ অন্য দেশের অন্ন মারছে। আবার দেশী মালের ব্যবসাদারকে অর্থসাহায্য করে সেইসব মাল সস্তায় বিদেশী হাটে চালান দিয়েও বিদেশীর অন্ন কাড়ছে। এই অন্নযুদ্ধ কি কম হিংস্র? এ কি কোনো অংশে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু?

ইংলণ্ডে যা ছিল আপদ্ধর্ম ইটালীতে তাই সনাতন ধর্ম, যেহেতু আপদ হচ্ছে সনাতন। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ, শান্তির সময় অন্নযুদ্ধ, সব সময় এক-প্রকার না একপ্রকার যুদ্ধ। সুতরাং ফাসিজম্ ইটালীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সেদেশের অন্য বাণী হতে পারে না, অন্য সুর হতে পারে না, অন্য সত্য হতে পারে না। ইংলণ্ডের লোক যা দু' বছরের বেশী বরদাস্ত করতে পারে না ইটালীর লোক তা তেরো বছর পছন্দ করে এসেছে।

ইটালীতে পার্লামেণ্ট আছে, কিন্তু তাতে মেজরিটি মাইনরিটি নামক দুই দল নেই। তাতে আছে বিভিন্ন ও বিচিত্র স্বার্থের নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি। তারা সমালোচনা করে না, তাদের কেউ মন্ত্রীপদ পাবার অধিকারী নয়। মন্ত্রীপদ ফাসিস্ট পার্টির লোককে পার্টির দান। রাশিয়াতে পার্টির কর্তারা রাষ্ট্রের কর্তাদের নিযুক্ত করেন, লোকপ্রতিনিধিদের ইচ্ছা খাটে না।

৫

ইটালীর অনুকরণে যেসব দেশে ডিক্‌টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা হয় তাদের মধ্যে জার্মানীই উল্লেখযোগ্য। পোলণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশে পিলসুড্স্কি প্রিমো প্রভৃতি ব্যক্তি সৈন্যদলকে হাত করে রাষ্ট্রের গাড়োয়ান হয়েছিলেন, তেমন তো অহরহ দক্ষিণ আমেরিকায় ঘটছে। তুর্কী ও ইরানের নায়কদের সম্বন্ধে আর-একটু বেশী বলা যায়, তারা নেপোলিয়ন-বর্গীয়।

বোলশেবিক ও ফাসিস্ট পার্টির মতো জার্মানীর ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট পার্টি। ওরফে নাৎসী পার্টি। এই পার্টির পত্তন যুদ্ধের অল্প পরে। অথচ

ক্ষমতা আয়ত্ত করতে এদের দীর্ঘকাল লাগল। ফাসিস্টদের যেমন ভয়ের কারণ ছিল যে ওরা না হলে কমিউনিস্টরা ডিক্‌টেটর হবে, নাৎসীদের তেমন অজুহাতও ছিল না। এদের পথ পরিষ্কার করে দিল সোশ্যাল ডেমক্র্যাট ও কমিউনিস্টদের গজকচ্ছপ কলহ। এরা গরুড়ের মতো দুটোকেই ভক্ষণ করে অসপত্ন হলো। বোলশেভিক ও ফাসিস্টকেও এরা বিপক্ষদলনে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এরা সহজে নিষ্কণ্টক হতে পারছে না। প্রথমত কমিউনিস্ট পার্টিকে নিঃসত্ত্ব করলেও কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন ব্যক্তি নিশ্চিহ্ন হয় না জার্মানীর মতো কমিউনিস্ট তীর্থে। নিকটে রাশিয়া। তার ছোঁয়াচকে অতিমাত্রা ভয়। দ্বিতীয়ত ইহুদীর সংখ্যা কেবল যে ছয় লাখ তাই নয়, তারা সর্বঘটে বিদ্যমান ও সর্বত্র তারা জাতজার্মানের চেয়ে অবস্থাপন্ন ও উন্নতিপরায়ণ। তাদের সঙ্গে মিশ্রণ সম্ভব নয় বলে তারা চিরকালই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র হিসাবে দ্রোহিতা করবে। বিশেষত তাদের মিত্র ইউরোপের সব দেশে। জার্মানীর শত্রুরাজ্যের যদি তারা চর হয়, যদি গোপনে তাদের আত্মীয়দের কাছে স্বর্ণ রপ্তানী কিংবা তাদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ পণ্য আমদানী করে, যদি যুদ্ধের দিনে পরের পক্ষে চক্রান্ত করে, তবে দেশ বিপন্ন হবে। ইহুদীদের অনেকে কমিউনিস্ট, একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। নাৎসীরা ইহুদীকে আমেরিকার নিগ্রোর মতো দীনহীন দশায় উত্তীর্ণ না করে ছাড়বে না। ওদের দেশে দেশে আপনার লোক রয়েছে, আন্দোলন করে জার্মান পণ্যের বাজার খারাপ করে দিচ্ছে। তৃতীয়ত জার্মানীর ক্যাথলিকরা পার্লামেণ্টেও প্রতিনিধি পাঠায়, তাদের একটা স্বতন্ত্র পার্টি আছে। ধর্মের নামে পলিটিকল পার্টি কেবল ভারতে নয় জার্মানীতেও রয়েছে, তা নইলে ওদেশের এমন দুর্দশা হবে কেন? এখন ইহুদীর মতো ক্যাথলিকও অন্যান্য দেশে আছে, তাদের সঙ্গে জার্মানীর ক্যাথলিকদের ভাব থাকা ভালো নয়। জার্মানীর মহাশত্রু ফ্রান্স আবার ক্যাথলিক কিনা! তদ্ব্যতীত রোমের পোপ জার্মানীর ক্যাথলিকদের ব্যাপারে কথা কন। এক্ষেত্রেও সেই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র। এজন্যে নাৎসীরা ক্যাথলিকদের প্রতি বিরূপ। এরাই কতকটা অপোজিশনের কাজ করছে। এমনি কপাল যে প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গেও নাৎসীদের বনছে না। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট উভয়কে এক সূত্রে গেঁথে একটা 'দীন এলাহী' প্রবর্তন করতে এ যুগের আকবর বাদশাহের সখ। গ্যয়রিং আবার প্রাক্‌খ্রিশ্চান পেগান যুগকে ফিরিয়ে আনতে চান।

নাৎসীদের মর্মগত উদ্দেশ্য কী? ইতিহাসের মঞ্চে তারা কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে অবতীর্ণ? এর উত্তর তারা জার্মানীকে পুনরায় মহাশক্তির আসনে বসাতে কৃতসংকল্প। যুদ্ধে জার্মানী পরাভূত হয়েছে, এই তথ্যটাকে তারা ইতিহাসের পাতা থেকে রবার দিয়ে মুছে ফেলতে পণ করেছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য গবর্নমেণ্টের মতো তারা বেকারসমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছে। ভাবী যুদ্ধের আয়োজনে জার্মানী যা খরচ করেছে তাতে বেকার সংখ্যা হ্রাস হয়েছে। দেশরক্ষার্থে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে সর্বস্বীকৃত। তাদৃশ কারণে সংবাদের, অভিমতের ও আর্টের নিয়ন্ত্রণও মাথা

পেতে নিতে হয়। নাৎসী জার্মানীতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ফাসিস্ট ইটালী ও বোলশেবিক রাশিয়ার মতো রাষ্ট্রের স্বার্থে বিলীন হয়েছে, জীবাত্মা যেমন পরমাত্মায়।

ব্যক্তির তো এই জীবন্মুক্ত দশা। নাৎসী পার্টি কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করছে, রাষ্ট্রভার গ্রহণ করে আত্মদেহ ত্যাগ করেনি।

রাশিয়া, ইটালী ও জার্মানী এই তিন দেশেই রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিজের জারক রসে জীর্ণ করেছে, কিন্তু পার্টিকে উদরস্থ করতে পারেনি, বরং পার্টিই রাষ্ট্রের পিঠে সওয়ার হয়েছে। এইখানেই ডিক্‌টেটরশিপের ভণ্ডামি। তিন দেশেই ডিক্‌টেটরশিপ রাষ্ট্রের মহিমা গান করছে, রাষ্ট্রের চেয়ে বড় নেই, না ভগবান না ধর্ম। নমো রাষ্ট্র নমো রাষ্ট্র বলে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করতে হবে, রাষ্ট্র নামক অব্যয় অক্ষয় পরব্রহ্মের চরণে আপনার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নিবেদন করে চরণামৃত সেবন করতে হবে। তা হলে যে অপূর্ব আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হবে তাই হচ্ছে ইহজীবনের সার্থকতা। এই যাদের মতবাদ, যাদের ফিলসফি, তারা কিন্তু পার্টিকে শিকায় তুলে রেখে দিয়েছে ঠাকুরের ঠিক মাথার উপরে। অন্যান্য দেশে এই ফন্দার চুরি নেই। এর থেকে অনুমান হয় যে পার্টি বাইরে থেকে রাষ্ট্রের লাগাম কেড়ে নিয়েছে, ভিতর থেকে তার মন কাড়তে পারেনি। নাৎসী, ফাসিস্ট ও বোলশেবিক নিজ নিজ দেশের সমস্ত মানুষকে পার্টির সদস্য করতে সাহসী নয়, কারণ সেক্ষেত্রে ভোটের মর্যাদা আছে, ব্যক্তির মতামতের মূল্য আছে, যদি অধিকাংশের আনুকূল্য না পাওয়া যায় তবে পার্টির পলিসি পণ্ড হবে ও নেতৃত্ব পাত্রান্তরিত হবে।

শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল এই যে মঙ্গলের জন্যে গৌরবের জন্যে পরাভবগ্লানি ধৌত-করণের জন্যে মুষ্টিমেয়র নেতৃত্বে মহাজনতাকে চালিত হতে হবে। সংকল্প অল্পের, সমর্পণ অধিকাংশের। রাষ্ট্র হচ্ছে জগন্নাথের রথ, জনসাধারণ তাকে টানবে, পার্টি হবে তার পাণ্ডা। এ যদি দুর্দিনের ব্যবস্থা হতো তবে ডেমক্রেসির পক্ষে ভয়াবহ হতো না, কিন্তু যেমন দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় উক্ত তিনটি দেশে এই ব্যবস্থা সুদিনেও অটুট থাকবে, যাতে অটুট থাকে তার জন্যে পার্টি আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অপিচ ঐ তিন দেশে এর সাফল্য একে অন্যত্র সংক্রামক করতেও পারে। অতএব ডিক্‌টেটরশিপ ডেমক্রেসির স্থায়ী প্রতিযোগী হতে উদ্যত হয়েছে। হয় ডিক্‌টেটরশিপ জিতবে, নয় ডেমক্রেসী। দুটোর প্রভেদ যাঁরা বোঝেন না তাঁদের ষষ্ঠ-ণত্ব জ্ঞান নেই। ডেমক্রেসি হচ্ছে সংখ্যাভূয়িষ্ঠের শাসন, ডিক্‌টেটরশিপ সংখ্যালঘিষ্ঠের।

সম্প্রতি ইংলণ্ডেও ডিক্‌টেটরশিপের আইডিয়া বহু মনীষীর মনঃপূত হয়েছে। আমি অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ মস্‌লের কথা ভাবছিনে। ভাবছি ক্রিপ্‌স্‌, কোল লাস্কির কথা। এঁরা ডেমক্রেসির ঠাট বজায় রেখে ডিক্‌টেটরশিপের প্রাণবস্তু চান। এঁদের প্রস্তাব এই যে লেবার পার্টি সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ

হয়ে পার্লামেণ্টে আসুক, এসে ভোটের জোরে বিনা সময়ক্ষেপে রাতারাতি ব্যাংক, খনি, রেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবসায় রাষ্ট্রের খাসদখলে আনুক।

এই প্রস্তাব শুনে প্রতিপক্ষ হেসে বললেন, ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ক্রিকেট নয়। সমালোচনার সময় দিতে হবে। পদে পদে জবাবদিহি করতে হবে। দেশের লোককে ফলাফল অনুধাবন করবার অবসর দিতে হবে। রাতারাতি একটা সুপ্রতিষ্ঠিত দেশের একতরফা ওলটপালট ঘটানোর জন্যে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করা পার্লামেণ্টে ধ্বংস করার সামিল। তোমরা যদি ভোটের জোরে অন্যায় করতে উদ্যত হও আমরাও গায়ের জোরে অন্যায়কে ঠেকাতে জানি।

এঁরা প্রত্যুত্তর করলেন, দেশের লোক যদি আমাদের সংখ্যাভূয়িষ্ঠরূপে পাঠায় তবে ধরে নিতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য ও পন্ধতি ভালো করে বুঝেসুঝেই আমাদের পাঠিয়েছে। আমরা ম্যাণ্ডেট পালন করছি মাত্র।

এই যুক্তির দ্বারা আদালতে মামলা জেতা যায়, কলেজে ছেলে ভোলানো যায়। কিন্তু এ ক্রিকেট নয়। কোনোমতে একবার সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হলেই যে ডালে বসেছি সে ডাল কাটবার অধিকার জন্মায় না। গোড়া ঘেঁষে কোপ মারার প্রস্তাব সর্বসাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়া দরকার। সংখ্যাভূয়িষ্ঠ তো চিরদিন সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নয়। পাঁচ বছর পরে তারাই হতে পারে সংখ্যালঘিষ্ঠ। সমাজ ব্যবস্থা কি প্রতি পাঁচ বছরে বিপরীত হবে? কাটা ডাল গজাবে কি?

মোট কথা ডেমক্রেসি বিপ্লবের বাহন নয়। কামারের দোকানে দইয়ের ফরমাস বৃথা। মার্ক্‌স্‌ এ সত্য জানতেন বলে তাঁর শিষ্যদের সোজাসুজি বিপ্লবের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। লেবার পার্টি কনফারেন্সে মনীষীদের এই প্রস্তাব সহজবুদ্ধির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলো। এতে আছে ডিক্‌টেটরশিপের সারবস্তু। লেবার ডিক্‌টেটরশিপের থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে ব্যগ্র। কারণ লেবার ডিক্‌টেটর হবার উপক্রম করছে টের পেলেই তার আগে প্রতিপক্ষ ডিক্‌টেটর সেজে বসবে। গায়ের জোর প্রতিপক্ষের বেশী। প্রেস প্রতিপক্ষের হাতে। সাফাই সৃষ্টি করা একান্ত সোজা। ব্যাংক প্রতিপক্ষের হাতে। আতঙ্ক সৃষ্টি করা কয়েক মিনিটের কর্ম। লেবার জানে যে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে ক্রিকেট খেলাই নিরাপদ, তাতে মাঝে মাঝে ব্যাট ধরবার সুযোগ মেলে।

৭

ডিক্‌টেটরশিপের লক্ষ্য সুস্পষ্ট, সুভেদ্য, নির্দিষ্টকালে নিবন্ধ। ডেমক্রেসির কোনো লক্ষ্য নেই। যদি থাকে তবে তা মৃদু মন্থর প্রগতি। ডিক্‌টেটরশিপ বলে, সাত বছর সময় দাও। জার্মানীকে পরাক্রান্ত ও নিরভাব করে দিচ্ছি। পাঁচ বছর সময় দাও রাশিয়া শিল্পপ্রধান দেশ হবে। যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে বহুগুণ ফসল ফলবে। দশ বছর সময় দাও, ইটালী উপনিবেশ জয় করে নেবে। ডেমক্রেসি তেমন কোনো অঙ্গীকার করে না। প্রত্যেক নির্বাচনে প্রত্যেক দল কার্যতালিকা দাখিল করে বটে, কিন্তু সেসব খুচরা, ঘরমেরামতি, তাতেও তারা ঢিলে দেয়। তাদের দোষ নেই। গৃহস্থ যে ট্যাক্স দেয় সেই খরচে তার

বেশী হয় না। ট্যাক্স বাড়াবার নাম করলে নির্বাচনে মাত্‌ হতে হবে, বাড়ালেও পরবর্তী নির্বাচনে ইটপাটকেল ভাঙা বোতল পচা ডিম দিয়ে সংবর্ধনা করবে দেশের লোক।

বলা যায় না ডিক্‌টেটরশিপ যদি লক্ষ্যভেদে অক্ষম হয় তবে তার সংবর্ধনা কীরূপ হবে। যারা চড়া পণে জুয়া খেলতে যায় তারা জুয়াড়ির পরিণাম জেনেশুনেই যায়, বিনাশ তাদের অপ্রত্যাশিত নয়। যাঁরা রাশিয়ায় ডিক্‌টেটর-শিপের দীর্ঘজীবন অথচ জার্মানী ও ইটালীতে তার অকালমৃত্যু কামনা করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তত্রত্য ক্যাপিটালিজমের পতনকামী। তাঁদের সে অভিলাষ ডেমক্রেসি কর্তৃক পূরণ হবে না, তাঁদের মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে ডিক্‌টেটরশিপের মরণ নয় তার লক্ষ্যের পরিবর্তন আবশ্যক। ডেমক্রেসি ক্যাপিটালিজমের মিত্র। তার কাছে সোশ্যালিজ্‌মের প্রত্যাশা আকাশকুসুম। তবু এই প্রত্যাশাই অধুনাতন বামমার্গীয় আদর্শবাদীকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়। সামঞ্জস্যের ভরসায় সে ধৈর্যের সহিত দিন গুনছে। তার বিশ্বাস রাশিয়াতেও একদিন ডেমক্রেসির সূচনা হবে। সোশ্যালিস্ট ডেমক্রেসি।

ওদিকে দক্ষিণমার্গের আদর্শবাদীর মানসে ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে ডেম-ক্রেসির সমাহার নব নব বর্ণে উদ্‌ভাসিত হচ্ছে। ডিক্‌টেটরশিপ তার প্রার্থনীয় নয়, কিন্তু সোশ্যালিজ্‌মের চেয়ে ডিক্‌টেটরশিপ স্পৃহণীয়। সে প্রথমে ক্যাপিটালিস্ট, পরে ডেমক্রাট। ইটালী জার্মানী যেদিন ক্যাপিটালিজ্‌মের পক্ষে নিরাপদ হবে সেদিন ডিক্‌টেটরশিপের পরিবর্তে ডেমক্রেসি সংস্থাপিত হলেই সে প্রীত হবে। সে খেলোয়াড় মানুষ, জুয়াড়ি নয়। ডিক্‌টেটর সম্বন্ধে তার মোহ নেই, আছে বিপৎকালে নির্ভর।

বিশ্লেষণ করলে দ্বন্দ্বটা মূলত ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে সোশ্যালিজ্‌মের। ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ তার মিত্রের সংকট দেখলে আত্মরক্ষার জন্যে ডিক্‌টেটর শিপের বায়না দেয়। তা থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে ডিক্‌টেটর তার বরকন্দাজ তবে ভুল করবেন। ডিক্‌টেটরকে যে নিয়োগ করে সে তার। রাশিয়ায় সে প্রোলিটারিয়াটের, ইটালী জার্মানীতে সে ক্যাপিটালিস্টের। সে প্রভুভক্ত গুর্খা ভৃত্য। মালিকের বিচার করে না, যদি খোরাকী পায়। ডেমক্রেসি ভদ্রলোক। ক্যাপিটালিজ্‌ম তাকেই খাতির করে বেশী। কিন্তু সম্পত্তির গায়ে হাত পড়লে লোকে ভালোমানুষ বন্ধুর চেয়ে বিশ্বস্ত লাঠিয়ালের দিকে বেশী ঝোঁকে। সোশ্যালিজম্‌ যখন নূতন দখল নিচ্ছে তখন লাঠিয়ালই তো তার একমাত্র অবলম্বন। সম্পত্তি রাখতে গেলেও যেমন কাড়তে গেলেও তেমনি, সম্পত্তির বেলায় ভদ্রতা করতে গেলে সর্বনাশ। যে মানুষ দু'বেলা মালা গলায় তত্ত্বকথা আওড়ায় নিরামিষ খায় সেও সম্পত্তির জন্যে জাল করে, মিথ্যা জবানবন্দী দেয়, ভাইয়ের গলায় ছুরি চালায়।

অতএব দ্বন্দ্বটা মুখ্যত সম্পত্তিঘটিত।

(১৯৩৫)

শরৎচন্দ্র : বিনুর য়্যাডভেঞ্চার

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিনুর আলাপ ছিল না। সে মাত্র তিনটি বার তাঁকে দেখেছে। দ্বিতীয় বার রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে। তৃতীয় বার পি. ই. এন. ক্লাবের ভোজে। আর প্রথম বার? সেই কথাই আজ বলবে।

হাওড়া স্টেশন। ট্রেন ছাড়ছে, এমন সময় বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে যে কামরায় বিনু ও তার সহযাত্রিণী উঠে বসলেন সে কামরায় আরো দু'জন ছিলেন। দু'জনেই পুরুষ। যিনি প্রৌঢ় তিনি বার্থের উপর অর্ধশয়ান হয়ে কী যেন বলে যাচ্ছিলেন, আর যিনি যুবক তিনি পায়ের কাছে বসে সমনোযোগে শুনছিলেন। লক্ষণ দেখে বোঝা উচিত ছিল যে ইনি একজন ভক্ত ও উনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু বিনুর অতটা খেয়াল ছিল না, সে ধরে নিয়েছিল যে পিতা কিংবা পিতৃব্য তাঁর সুপুত্র কিংবা পুত্রপ্রতিমকে বৈষয়িক পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁদের কথাবার্তায় বিনুর কান ছিল না, চোখও ছিল না তাঁদের দিকে। তার আগ্রহের পাত্রী তার পাশেই ছিলেন, আর নবদম্পতির তপোভঙ্গ স্বয়ং দেবাদিদেবেরও অসাধ্য। তবে কিনা স্থানটা হচ্ছে রেলগাড়ি, আর উপস্থিত ভদ্রদ্বয় ইংরেজীও বোঝেন, সুতরাং···বিনুকে মাঝে মাঝে তাঁদের দিকে চেয়ে সতর্ক হতে হচ্ছিল।

কোনো দরকার ছিল না। কারণ কামরায় যে আর কেউ রয়েছে সেই ধারণাই তাঁদের ছিল না। উনি বলে যাচ্ছিলেন এক নিঃশ্বাসে, ইনি শুনে যাচ্ছিলেন এক নিঃশ্বাসে। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কানে এল প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলছেন তাঁর জ্বর হয়েছে। জ্বর নিয়েই তিনি কুমিল্লা থেকে বেরিয়েছিলেন, বাড়িতে খবর দেওয়া হয়নি, স্টেশনে যদি কেউ নিতে না আসে তবে কী করে এতটা পথ হাঁটবেন? তার পরে যেন শুনতে পাওয়া গেল, "সভাপতির অভিভাষণ", "ছাত্রদের উৎসাহ", "মিটিংএর কাপড়", এমনি দু'চার বচন। ভদ্রলোক নিজেই উদ্‌যোগী হয়ে ইশারায় দেখালেন একটি বিপুল তোরঙ্গ, সেটি নাকি মিটিংএর কাপড় অর্থাৎ খদ্দর দিয়ে ভরা। তিনি না হয় কোনো মতে বাড়ি পৌঁছলেন, কিন্তু তাঁর বোঝাটির কী হবে! বিনুও তাই ভাবছিল, সেটির জন্যে অন্তত চারটি মুটে চাই। যা হোক যুবকটি তাঁকে অভয় দিলেন, ও জিনিস পরের দিন জাহাজে রওনা হবে। আপাতত তিনি ভারমুক্ত।

কিন্তু বোঝাটি না হয় জাহাজে চাপল, ওদিকে যে আরো একটি চীজ আছে। ভদ্রলোক অসুস্থ শরীরে বার্থ থেকে নেমে বাথরুমের দরজা অবধি হেঁটে গেলেন। নিজের হাতে খুলে দেখালেন একটি নয় দুটি নয়, দশটি কি বারোটি বাঁধানো গড়গড়া। এমন আদরের সহিত দেখালেন যেন গড়গড়া নয়, খোকাখুকু। কোথায় পাওয়া গেল, কী করে পাওয়া গেল, এসব বিষয়ে যা বললেন তা যেন সাধারণ সওদার কাহিনী নয়, আবিষ্কারের য়্যাডভেঞ্চার।

ইতিমধ্যেই বিনু অনুমান করেছিল যে ইনি শরৎচন্দ্র। সেইদিনই সকাল-বেলার কাগজে তাঁর কুমিল্লার অভিভাষণ পড়েছিল। প্রতিকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে

চিনতে ভুল না হবারই কথা।

সহযাত্রিণীকে জানাল, ইনিই সেই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎ চট্টোপাধ্যায়।

সহযাত্রিণী বললেন, হাজার লোকের ভিড়েও এঁকে চেনা যায়। চেহারায় লেখা রয়েছে ইনি অসামান্য শিল্পী।

তখন বিনু খোদার উপর খোদকারী করল। যিনি কত মানুষের ছবি এঁকেছেন তাঁর ছবি এঁকে নিল। লক্ষ করল ভাস্কর্যের মডেল হিসাবে তাঁর মুখের কাট অমূল্য। ভালে প্রতিভার অভ্রান্ত ব্যঞ্জনা। নাসায় আভিজাত্যের নিশান। নয়নে সকরুণ মমতা। মুখের কোনো এক অংশে কী একটা দুর্বলতার আভাস ছিল, বোধ হয় ঠোঁটে। হাবভাব খুবই এলোমেলো, কতকটা জ্বরের দরুন। চুল আলুথালু। কিন্তু বেমানান নয়। বেশভূষা ফিটফাট, জ্বর সত্ত্বেও। চেহারা শুধু আর্টিস্টের চেহারা নয়, আর্টের বিষয়বস্তু।

শরৎচন্দ্র রূপকারও ছিলেন, রূপবানও ছিলেন। তাঁকে দেখে অন্যান্য বারও সেই কথা মনে হয়েছে। কিন্তু তাঁর কথাবার্তায় সাহিত্যের নামগন্ধ ছিল না এবং ছিল না কোনো স্টাইল বা আর্ট।

সেনগুপ্তের গায়ে কারা লাঠি তুলেছে, সুভাষের গায়ে কারা কয়লার গুঁড়ো ছুঁড়েছে, এমনি কত কথা বলে আফসোস করলেন। তবু তাঁর স্বদেশের তরুণদের উপর আস্থা ছিল অসীম।

সেদিনকার আর একটি প্রসঙ্গ মনে আছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দেখা করতে চান, কবিরও তাই ইচ্ছা। কিন্তু ভরসা হয় না, ভয় করে। বড়ো মানুষ, কী জানি কেমন ব্যবহার করবেন! কী বলো, তোমার কী মনে হয়!

যুবকটি কী উত্তর দিয়েছিলেন স্মরণ নেই। তবে কবিকে বিনু চিনত, কবির পক্ষে যা বলা সম্ভবপর তা বিনুই হয়তো বলতে পারত। এই সূত্রে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করবার অভিলাষ পূর্ণ হতো। কিন্তু কবির সম্বন্ধে তাঁর যে সংশয় তাঁর সম্বন্ধে বিনুরও সেই সংশয়। কী জানি কেমন ব্যবহার করেন! তা ছাড়া সে চিরদিন লাজুক, বিশেষত অসমবয়সীর সামনে। এবং আরো একটা কারণ ছিল, সেইটে আসল। শরৎচন্দ্রের কথনে এক মুহূর্ত বিরাম ছিল না, যুবকটি কেবল সায় দিচ্ছিলেন বা স্তোক দিচ্ছিলেন। ফস্ করে পরের কথায় কথা কওয়া বিনুর অসাধ্য না হলেও তাঁদের অসহ্য হতো।

গাড়ি থামতেই তাঁরা নেমে গেলেন। তোরঙ্গটা নামাতে একদল কুলি কামরায় ঢুকল। যতদূর মনে পড়ে, গড়গড়াগুলি তিনি নিজের হাতে নামিয়েছিলেন।

২

এই ঘটনার পূর্ব হতেই শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে বিনুর অন্ধ ভক্তির অবসান হয়েছিল। তবে সে কোনো দিন তাঁর প্রশংসা করতে পরাঙ্মুখ হয়নি। বিলেতে থাকতে তাঁর প্রসঙ্গে ইংরেজীতে লিখেছিল, তার আগে দেশে থাকতে বহুবার বিভিন্ন ভাষায়। যে লোকটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জিন্দাবাদ হাঁকে সে যদি কোনো একটি

বই পড়ে নিরাশ হয় ও নিন্দাবাদ করে তবে সে আর যাই হোক শত্রু নয়।

শরৎচন্দ্র এখন নেই, সেসব বাদ প্রতিবাদের উপর যবনিকা পড়েছে। এখন মনে হয়, বিনু যদি অমন তস্করের মতো তাঁকে না দর্শন করত তবে হয়তো 'শেষ প্রশ্ন' নিয়ে অতটা নিষ্করুণভাবে না-ও তিরস্কার করত। অঘটনঘটন-পটীয়সী নিয়তি তাকে এক ঘণ্টার জন্যে সহযাত্রী করে চিরকালের জন্যে এমন একটা false position-এ নিক্ষেপ করল যার প্রতিকার হতে পারত শরৎচন্দ্র অকালে অস্ত না গেলে।

সেসব কথা মন থেকে সরিয়ে বিনু ভাবে শরৎচন্দ্রের প্রতি কী করলে সুবিচার করা হয়। অন্ধ ভক্তি অবশ্য ফিরবে না, কিন্তু ভক্তির ব্যত্যয় হয়নি। এখনো বিনু তাঁর ভক্ত। তার মানে এ নয় যে সে নিন্দার বিষয় পেলে নিন্দা করবে না, নির্জলা সাধুবাদ করবে। কিন্তু নিন্দা প্রশংসা অবান্তর, লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায় বিচার।

এ দেশের কথাসাহিত্যে তাঁর মতো প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র অন্য কারণে নমস্য, কিন্তু শরৎচন্দ্র সত্যি অপরাজেয় কথাশিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্র পড়তে পড়তে অবসাদ আসে, শরৎচন্দ্র পড়তে বসলে শেষ না করে নিষ্কৃতি নেই। দু তিন শ বছর আগে জন্মালে শরৎচন্দ্র হয়তো কথক ঠাকুর হয়ে গ্রামে গ্রামে পসার জমাতেন। তেমন কথক কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। তখনো তিনি এমনি জনপ্রিয় হতেন, এমনি আদরণীয়।

কথকতাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক বৃত্তি। যেখানে যা দেখেছেন যা শুনেছেন, যা অনুভব করেছেন তার বিবরণ দেওয়াই ছিল তাঁর স্বধর্ম। তিনি যে কোনো দিন কবিতা লেখেননি তার তাৎপর্য এই যে তাঁর ভিতরে কবিত্ব বলতে সামান্যই ছিল। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সত্যিকারের কবি। বঙ্কিম যদিও কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন তবু কবিত্ব তাঁকে ছাড়েনি। শরৎচন্দ্র অবশ্য স্থলে স্থলে কবিত্ব করেছেন, কিন্তু বিধাতা তাঁকে কথক ঠাকুর করেই গড়েছিলেন, তিনি কথকতার চূড়ান্ত করে গেলেন।

কথকতার সঙ্গে কথাবার্তার প্রভেদ আছে। যাঁরা বীরবলের রচনার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা লক্ষ করেছেন যে বীরবল হচ্ছেন বৈঠকী আলাপ-আলোচনায় ওস্তাদ, তিনি গল্প বলতে বসলে বাক্যের দ্বারা মাতিয়ে রাখেন। আর তাঁর বাক্যের রূপই তাঁর গল্পের রূপ। অমন রূপবান বাক্য শরৎচন্দ্র কী করে পাবেন! তাঁর সমস্ত মন পড়ে থাকে বিবরণে। অপর পক্ষে, অমন বিবরণী-শক্তি বীরবলের বা রবীন্দ্রনাথের নেই। বীরবল বাক্‌পটু, রবীন্দ্রনাথ অন্তর্যামী। তাঁদের গল্পের মূল্য বিবরণনিরপেক্ষ। কিন্তু শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস বিবরণবিরহিত হলে আকর্ষণশূন্য।

শরৎচন্দ্রের কথকতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাঁর অতুলনীয় দরদ। তিনি যে শুধু কথক ঠাকুর ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন দা'ঠাকুর। ইতর ভদ্র সব রকম মানুষের সঙ্গে মিশতে পারা খুব কম লোকের পক্ষেই সহজ। লেখকরা তো সচরাচর কুনো। তিনি এ বিষয়ে লেখকদের মধ্যে একক। লেখা ছিল তাঁর

পেশা, মেশা ছিল তাঁর নেশা। মেশার মূলে ছিল দরদ। তাঁর গল্পে উপন্যাসে বুকের রক্ত মেশানো। বিবরণের শক্তি অন্য কোনো কোনো লেখকেরও আছে, কিন্তু সোনার সঙ্গে সোহাগার মতো বিবরণের সঙ্গে সমব্যথা বড়ো দুর্লভ গুণ। হিন্দী সাহিত্যের প্রেমচন্দ্ ব্যতীত শরৎচন্দ্রের মতো ব্যথার ব্যথী ও ব্যথার বিবরণকার—একাধারে দুই—খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সাধারণত একটি মেলে, অন্যটি মেলে না।

শরৎচন্দ্রকে বিনু আরো দুবার দেখেছে, দুবারেই লক্ষ করেছে তাঁর মুখে অনির্বচনীয় বিষাদ। তাঁর বেদনাবোধ একান্ত প্রগাঢ় ছিল, শেষ জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর বেদনার উপর প্রলেপ মাখাতে পারেনি। তিনি যে একজন পাকা বিষয়ী লোক ছিলেন এটা ঠিক, কিন্তু মানুষকে তার বিষয়বুদ্ধির বা পার্থিব সাফল্যের দ্বারা জড়িয়ে দেখাটা ভুল দেখা। সাফল্য তাঁর ক্ষতি যা করেছিল তা বাহ্য। সে ক্ষতি ভিতরে পোঁছয়নি, তাই তাঁর সমবেদনায় কোনো ছলনা ছিল না। তিনি ছিলেন অকপট।

শুনতে পাই তাঁর বই আজকাল তেমন চলে না। এর একটা কারণ বোধ হয় প্রতিক্রিয়া। সব লেখকের কপালে তা জোটে। কিছু দিন পরে আবার প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হবে। তখন আবার সেসব বই তেমনি সচল হবে। আর একটা কারণ, এ কালের মানুষ নিজের জীবনে এত দুঃখ পাচ্ছে যে পরের দুঃখের কাহিনী পড়ে জীবন দুর্বহ করতে নারাজ। আইডিয়ার দিকেই মানুষ ঝুঁকছে। সোশ্যালিজম প্রভৃতি আইডিয়াগুলি ক্রমে কথাসাহিত্যেও প্রবেশ করছে। শরৎচন্দ্রও শেষ বয়সে আইডিয়ার দাবি মেনেছিলেন। কিন্তু মানা যথেষ্ট নয়, জানা আবশ্যক। ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে নতুন ধরনের উপন্যাস লিখলে তা কেউ মেনে নেবে কেন? শরৎচন্দ্রের বিবরণী-শক্তি ও বেদনাবোধের সঙ্গে তৃতীয় কোনো গুণের সমাহার ঘটেনি, তাই ভাবজিজ্ঞাসু পাঠকপাঠিকার তৃপ্তি হয় না তাঁর শেষ বয়সের লেখা পড়ে। সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলতে তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আয়াস ছিল না। এইখানেই তাঁর ট্র্যাজেডি। না খাটলেও যদি টাকা আসে তবে খাটতে চায় কে!

এ দোষ বিনুর সমবয়সীদেরও আছে। শরৎচন্দ্রের দোষের অনুবর্তন করে কেউ তাঁর গুণের অধিকারী হবেন না। বরং তাঁর গুণের অনুবর্তন করলে পার্থিব না হোক অপার্থিব সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ এ কালের পাঠকের মন না পেলেও পরবর্তী কালের মনোনীত হওয়া সম্ভবপর।

শরৎচন্দ্রের মধ্যবয়সের লেখা থাকবে। কেউ না পড়লেও সেসব গল্প সেসব উপন্যাস তাঁকে ও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে অমর করবে। তারা কি তাঁর সৃষ্ট চরিত্র? তারা তাঁর দৃষ্ট চরিত্র। তারা বিধাতার সৃষ্টি। সেইজন্যে এমন সজীব। তারা থাকবেই, আর তাদের মধ্যে থাকবে চিরকালের বাংলা দেশ। দেশকে এমন করে কেউ ভালোবাসেনি, এই হোক শরৎচন্দ্রের epitaph.

(১৯৩৮, ১৯৪২)

জীয়নকাটি

প্রবন্ধ সমগ্র—১২

টেমস নদীর কূলে বসে বঙ্গোপসাগরের কলরোল শুনছি। সে কলরোল নিকটে যেমন উচ্চ দূরে তেমনি তুচ্ছ।

দেশ থেকে যে সব পত্র ও পত্রিকা পাই সে সব পড়ে অস্পষ্টরকম বুঝতে পারি দেশে দু'রকম কবিওয়ালা কথার কুস্তি লড়ছেন।

দেশে কোনোরকম যুদ্ধবিগ্রহ নেই, রাজনৈতিক আন্দোলনটা বোধ করি যথেষ্ট প্রচণ্ড নয়। পাছে দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে তাদের কানের কাছে তরজার অভিনয় করতে হবে।

সবচেয়ে আমাকে লজ্জিত করেছে, রবীন্দ্রনাথও এর মধ্যে আছেন। কেউ কেউ বলেন তিনিই তো নাটের গুরু, কেউ কেউ বলেন অমলচন্দ্র হোম। সৌভাগ্যক্রমে আমি 'সাহিত্যধর্ম' ও 'অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য' দুটি লেখাই পড়ার সুযোগ পেয়েছি। তারপর যুদ্ধটা কতদূর এগিয়েছে সে খবর আমার জানা নেই। আশা করি, এতদিনে রবীন্দ্রনাথ পরাস্ত হয়ে শরশয্যা গ্রহণ করেছেন এবং হোম মহাশয় রণে ভঙ্গ দিয়েছেন।

এমন আশা করবার কারণ এই যে, আমিও তরুণ, আর সব তরুণের এক রা। ল্যাজ কেটে প্রবীণের দলে ভিড়ে যেতে ইচ্ছে থাকলেও পারিনে, পাছে বয়সের দোষে এমন একটা স্বর মুখ চিরে বেরিয়ে যায় যা শুনে প্রবীণরা ভাববেন গুপ্তচর। তরুণরা বলবেন নামকাটা।

সুতরাং স্ববয়সে যা থাকে কপালে শ্রেয়। আমি তরুণ। আমি আশা করছি যে পিতামহদেব ও জ্যাঠামহাশয় এতদিনে আমাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ জেনে ফেলেছেন ও মেনে নিয়েছেন। তাঁরা হাল ছেড়ে দিলে তাঁদের পদাঙ্কানু-সরণকারীরাও যদি হাল ছেড়ে না দেন, তবে আমরা তাঁদের নৌকো বানচাল করবই। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অতি-আধুনিকদেরই জয় হতে বাধ্য। তবে ভয় এই যে, আমাদের পরেও যুগযুগান্তর আছে, আমাদের তরুণী প্রিয়াদের কোলে যারা লালিত হবে তারাও একদিন তরুণ হয়ে উঠবে, ততদিনে আমরা প্রবীণ হয়ে তাদের গাল পাড়তে থাকলে তারা আমাদের গালে কাজল কালি মাখিয়ে দেবে।

আমাদের সেই ভাবী শত্রুদের সৃষ্ট তরুণতর সাহিত্য কেমন রূপ ধরবে ও কী কী বুলি উদ্ভাবন করবে, তা একবার কল্পনা করতে সাহস হয় না। বাস্তবে প্রবীণদের ঘা খেয়ে খেয়ে অস্থির। কল্পনায় অজাতদের ঘা খেলে পাগল হয়ে যাব। তারা যে আমাদের চেয়েও এক একটি সরেস হবেই এ তো স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং shocked আমাদের হতেই হবে, তাদের দ্বারা। ততদিনে প্রবীণরা স্বর্গ থাকলে স্বর্গে থাকবেন, জন্মান্তর থাকলে তরুণতর হয়ে জন্মাবেন, সুতরাং তাঁদের ভয় নেই, আশা আছে। কিন্তু আমরা যখন ভগবান মানিনে, পরলোক মানিনে, জন্মান্তর মানিনে, তখন যতদিন না আমরা নির্বাপিত হই, অথবা মৃত্যুমাত্রে নির্বাণ পাই, ততদিন আমাদের আমলের অর্বাচীনের মার সহ্য করতেই হবে।

মারের নমুনা দুটো একটা কল্পনা করতে চেষ্টা করি। আমাদের দলের সবচেয়ে সাহসী লেখকেরা এখন বই বোঝাই করে যত রকম দুঃখ দুর্দশা ব্যাধি বালাইয়ের তালিকা দিচ্ছেন তার মধ্যে চুম্বন আলিঙ্গন থেকে ভ্রূণহত্যা, শিশু-হত্যা পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি এবং তাঁদের নায়কেরা কুকুরের সঙ্গে ভাগ করে আস্তাকুঁড়ের ভাত না খাওয়া পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে জীবন্ত হন না। কিন্তু জীবনের আরো অনেক দিক আছে—একেবারে নগ্ন বাস্তবের চেয়েও নগ্নতর।

আমরা কাপড় খুলে মানুষকে বিবসন করা অবধি গেছি। ভাবীকালের তাঁরা মানুষের চামড়া তুলে দিয়ে পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি খুলে দেখবেন। ইউরোপের কোনো কোনো ডাক্তার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে শিশুহত্যা তো ঘরে ঘরে চালাতে হবেই নরবংশের উৎকর্ষের খাতিরে, তার উপরে নারীদের জরায়ু বানরীদের দেহে রোপণ করে নারীদের ছুটি দেওয়া যাবে আরো বড়ো বড়ো কাজ করতে। বানরীরাই মানবসন্তানকে গর্ভে ধারণ করে মানবসমাজকে উপহার দেবে, সন্তানের পিতাকে নয়। পিতা থাকবে না। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা জন্মক্রিয়া সম্পাদিত হবে। পুরুষও ছুটি পেয়ে ঢের বড়ো বড়ো কাজ করবে কিনা।

এখন অনুমান করুন আমাদের অতি-অনাগত সাহিত্যের কেমন চেহারা হবে। তাতে চুম্বন আলিঙ্গন থাকবে না, নর ও নারী উভয়েই drone। বানরীই রানি-মক্ষিকা। যৌন সমস্যা থাকবে না, সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যাপার। আস্তাকুঁড়ে ভাত খুঁটে খাওয়া থাকবে না, খিদে পেলে ইঞ্জেক্‌সন নিতে হবে! শুনেছি আত্মহত্যারও একটা উপায় করা হবে।

কী নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হবে তাই ভাবছি। প্রেম তো দূরের কথা, কামই থাকবে না। হৃৎপিণ্ডটা যদি অস্ত্র করে তুলে নেওয়া হয় তবে বেদনা কথাটাও জীবন থেকে, সুতরাং সাহিত্য থেকে, উঠে যাবে। আদি রস করুণ রস যদি না থাকে তবে বোধ করি বীভৎস রসই সাহিত্যের আসর গরম রাখবে।

কিন্তু ততদিনে সাহিত্য আদপেই থাকবে কি না ঠিক নেই। সাহিত্যকে আমরা বাংলার তথা ফ্রান্সের রাশিয়ার আমেরিকার তরুণেরা আস্তাকুঁড়ের ভাত খাইয়ে যেমন রোগা করে এনেছি সে বেচারা ততদিন টিঁকে থাকলে হয়! সাহিত্যই যদি না থাকে, তবে সাহিত্যধর্ম! মাথা নেই তার মাথাব্যথা!

২

German Youth Festival-এর ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমাদের তরুণ তরুণীদের ব্যথা। এক সঙ্গে সহস্রাধিক তরুণ athlete ও তরুণী athlete-এর শোভাযাত্রার উপরে পথপার্শ্ববর্তী সৌধশিখর হতে পুষ্প-বৃষ্টি হচ্ছে, পতাকা উড়ছে, জনতা ঝুঁকে রয়েছে। সকলের মুখে হাসি, সকলের দেহে স্বাস্থ্য। মেয়েরা পরেছে ছেলেদের মতো খেলার পোষাক, হাত পা মুখ খোলা, চুল খাটো, বুকের উপরে নম্বর লেখা। পাশাপাশি চলেছে, কে তরুণ, কে তরুণী প্রথম দৃষ্টিতে বোঝা যায় না।

অনেক দিন থেকে ভুলে গিয়েছিলুম আমাদের দেশে পর্দা-প্রথা আছে, বাইরের মেয়েদের মুখ দেখতে পাইনে, ঘরের মেয়েদের সঙ্গ পাওয়াও বিদ্যার্থীর বা কেরানীর পক্ষে দুর্ঘট। অথচ আমরা যারা সাহিত্য লিখি ও তরুণ সাহিত্যিক বলে নিন্দিত হই তারা অধিকাংশই বিদ্যার্থী কিংবা কেরানী। আমাদের সঙ্গে আমাদের সমান স্তরের সমবয়সিনীদের ঘরে বাইরে কোথাও এতটুকু চোখের দেখাও ঘটে না। আমরা ষোল বছর বয়সে মা-বোনকে ছেড়ে শহরে আসি। মেসে ভর্তি হই, সাত-আট বছর পরে বিদ্যাস্থান থেকে চাকুরিস্থানে প্রমোশন পাই এবং যদি-বা ইতিমধ্যে কোনো কন্যাদায়গ্রস্থ ভদ্রলোককে দায়মুক্ত করি তবু কন্যাটির সঙ্গে ছুটি না পেলে দেখা করতে যাইনে।

এমনি একান্ত নারীবর্জিত জীবন থেকে যে সাহিত্যের উদ্ভব সে সাহিত্য প্রাণহীন সত্যহীন আন্তরিকতাহীন না হয়ে যায় না। মানসীকে নিয়ে আমরা যত কবিতা গাঁথি ও গল্প ফাঁদি বাস্তবীকে নিয়ে তার শতাংশও পারিনে। পশ্চিমের তরুণদের সাহিত্যে কত উত্তাপ, কত জ্বালা! রক্তমাংসের নারীকে নিয়ে তাদের কারবার। তাদের প্যাশনের সঙ্গে আমাদের প্যাশনের তুলনা যেন সূর্যের সঙ্গে জোনাকির আগুনের তুলনা। আমাদের যাঁরা কামের কবিতা লেখেন তাঁরা কেবল কথার উপরে কথা জুড়ো করেন, আবেগের সঙ্গে আবেগ জুড়ে দেন। সে সব কবিতার যাঁরা সমালোচক সাজেন তাঁরা বোঝেন না যে সত্যিকারের একটা কামের কবিতা লেখার সাধ্যও আমাদের নেই। আমরা কামের ভান করি শুধু কামের স্ফূর্তি পাইনে বলে। স্ফূর্তি পেলে কাম দু দণ্ডেই প্রেমে রূপান্তরিত হতো, ক্ষুধা দু দিন পরে সুধা খুঁজত, 'কড়ি ও কোমলে'র কবি 'মানসী'তে লিখতেন, "ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানবী"।

অল্পবয়সী কবিমাত্রেই কামের কবিতা লিখে থাকেন। কালিদাস 'ঋতুসংহার' লিখেছিলেন। Shakespeare লিখেছিলেন 'Venus and Adonis'। এখনকার ইউরোপের কবিরাও লেখেন। কিন্তু তাঁদের একটা স্বাভাবিক পরিণতি আছে। তাঁরা কুঁড়ি থেকে ফুল ও ফুল থেকে ফলে পরিণত হন। কিন্তু আমাদের সমাজের গড়ন এমন অদ্ভুত যে আমাদের এখনকার কবিরা কুঁড়িতেই পাকেন কিংবা পচেন।

ত্রিশ বছর আগেও আমাদের পুরুষরা অল্প বয়সে বিবাহ করত, বাইরের নারীকে না জানলেও ঘরের নারীকে জানত। বহুকাল থেকে আমাদের দেশে নারীকে জানবার একমাত্র উপায় ছিল তাকে ঘরে এনে জানা। একজন একটি গল্পে লিখেছেন—বাঙালির মেয়েকে জানতে হলে তাকে বিয়ে করতে হয়। আমাদের আগের generation-এর তরুণরা তেমনি করে জেনেছিল। তাঁদের কবিতা দাম্পত্য কামের ও দাম্পত্য প্রেমের কবিতা। বিয়ে না করেও যে ভালো-বাসতে পারা যায় এটা তাঁদের চোখে দুর্নীতির মতো ঠেকত। ভালোবেসে বিয়ে করা তাঁদের কাছে অপরাধ বলে গণ্য হতো।

কিন্তু তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ। আমাদের বয়ঃসন্ধি কাটে প্রবাসে অবিবাহিত অবস্থায়। ঘরের নারী, বাইরের নারী দুইই আমাদের কাছে দুর্লভ।

অগত্যা আমরা মানসীর উদ্দেশে এমন কবিতাও লিখি যা কোনো রক্তমাংসের নারীর উদ্দেশে লিখলে তিনি আমাদের ধিক্কার দিতেন। এ কবিতা আদিরসাত্মকও নয়, বীভৎসরসাত্মক। এর ভোগকামনাতে রাজসিকতা নেই, এর পূজাকাঙ্ক্ষাতে সাত্ত্বিকতা নেই। এর ভাবে ভাষায় তামসিকতা। এ কবিতা পানওয়ালীর বা মেসের ঝিরই যোগ্য। দুঃখের বিষয় তাদেরও সত্যি করে জানতে আমাদের সাহসে বা আত্মসম্মানে কুলোয় না। স্তরগত তফাৎ আছে, আমরা যাই বলি না কেন আমরা বুর্জোয়া, আমরা কুলি মজুরকে নিয়ে দু'শ পাতার নভেল লিখতে পারি কিন্তু তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাল্কী বইতে পারিনে, তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারিনে। ভালোবাসতে পারি কিন্তু মন জানতে পারিনে, মন কল্পনা করে কাগজ ভরাই। এই আমাদের ডেমোক্রাটিক সাহিত্য। শ'খানেক বছর পরে পানওয়ালী ও পাল্কী বেহারার দল যখন সাহিত্য সৃষ্টি করবে তখন আমাদের রচিত তাদের মনস্তত্ত্বকে যাদুঘরে রেখে আমাদের মনস্তত্ত্ব গবেষণা করবে। শরৎবাবুর মেসের ঝি তাঁর নিজের স্তরের মেয়ে। দৈবক্রমে অস্থানে পড়েছে। নিজের আত্মীয়ার মন বুঝে শরৎবাবু তার মন কল্পনা করতে পারেন। তাই 'সাবিত্রী'কে এত জীবন্ত মনে হয়। অচিন্ত্যবাবুর 'পুতলি' কি এমনি জীবন্ত ?

আমাদের স্তরের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের যোগ নেই, এইটে আমাদের অধিকাংশের দুর্ভাগ্য। পারিবারিক প্রেমের দিন চলে গেছে, সামাজিক প্রেমের দিন আসেনি, মাঝখানে দাঁড়িয়েছে পর্দার প্রাচীর ও লোকনিন্দার কপাট। আমাদের স্কুলগুলো কলেজগুলো যতদিন না শান্তিনিকেতনের মতন হয় ততদিন আমাদের তরুণ কবিরা সঙ্গিনীকে শ্রদ্ধা না দিয়ে কামিনীকে কামনা নিবেদন করবেন। আমাদের আপিসগুলো যতদিন না মেয়ে-কেরানীতে ছেয়ে যায় ততদিন আমাদের তরুণ গল্প লেখকেরা পানওয়ালীর বা মেসের ঝির ছাড়া আর কারুর মন বুঝতে মন দেবেন না। সমালোচকেরা নিন্দা করছেন, করুন। কিন্তু বরং পানওয়ালীরও মন বুঝতে চাইলে বোঝা যায়, সমস্তরের অনাত্মীয়ার মন বোঝবার উপায় নেই। আমাদের ভদ্রসমাজে অনাত্মীয়ের সঙ্গে অনাত্মীয়ার মেলামেশা এত অল্প যে আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যিককে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়। এবং যে বয়সে আমরা কাব্য লিখতে আরম্ভ করি সে বয়সে আত্মীয়ার সঙ্গেও আমাদের অধিকাংশের যোগ থাকে না, আমরা মেসে হোস্টেলে নির্বাসিতের মতো বাস করি। ইউরোপের তুলনায় আমাদের ছাত্রজীবন যে কী ভয়ানক নীরস ও নির্জীব তা মিলিয়ে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

পুরুষের পক্ষে নারীর সান্নিধ্য সব বয়সেই অবশ্য প্রয়োজনীয়। শৈশবে কৈশোরে যৌবনে বার্ধক্যে। এটা একটা axiom বা স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার না করলে সমাজের ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে না। যখন আমাদের সমাজে বাল্য-বিবাহ ও একান্নবর্তী পরিবার ছিল তখন জীবিকার জন্যে বিদ্যাধ্যয়ন ও স্ত্রীকে ছেড়ে প্রবাসে থাকা ছিল না। তখন গুরুগৃহে বিদ্যার অন্বেষণে গেলেও গুরু-কন্যার সান্নিধ্য পাওয়া যেত। এখন আমাদের সমাজের গড়ন যা হয়েছে তা

দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়! ন্যাকামির নাম দেওয়া হয়েছে নীতি! নারীকে চোখে দেখতে না পাওয়াটাই নাকি ব্রহ্মচর্য! মানুষের স্বাভাবিক ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে নিয়মিত খোরাক না দিয়ে তাকে উপবাস করতে শেখানোই বুঝি সমাজপতিদের কর্তব্যের শেষ সীমা! ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জার্মানী-রাশিয়ার সমাজপতিরা কিন্তু সমাজের গড়ন বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের তরুণ তরুণীদের মিলনব্যবস্থাও বদলে দিয়েছেন। তাই এসব দেশে নীতি উপদেশ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয় না; ছেলেমেয়েরা নিজেদের নীতি নিজেরাই ঠিক করে নেয়; প্রচুর খেলা-ধুলা ও কায়িক পরিশ্রম করতে করতে যে ব্রহ্মচর্য শৈশব থেকে গড়ে ওঠে সে ব্রহ্মচর্য একত্র বিহারের শত অমিতাচার সত্ত্বেও জাতির মেরুদণ্ডকে শক্ত রাখে; এবং বীরত্বের পরীক্ষা দিতে দিতে তরুণ-তরুণীরা পরস্পরকে অর্জন ও রক্ষা করতে থাকে।

পাপ কি এসব দেশে নেই? অতি অগণ্য পাপ। কামকবিতা কি এসব দেশে নেই? যথেষ্ট আছে। কিন্তু সমালোচকেরা বসে বসে মাছি মারছে না। লেখকরাও জেদ করে তাদের ক্ষ্যাপাচ্ছে না। জীবনকে নিয়ে এদের হাজারো experiment। কোনোটাতে আসক্ত থাকতে কেউ চায় না। আজ কলেজে পড়ছে, কাল Air Forceএ কাজ নিয়ে দূরদেশে উড়ে যাচ্ছে। পরশু ক্যানাডায় জমির লীজ নিয়ে চাষ করছে। তার পরদিন নভেল লিখছে। চারদিন চারজন চাররকম নারীর সঙ্গে পরিচয়। তারা জলজ্যান্ত নারীই, তারা কামের সুর শুনলে প্রেমের সুর দাবি করে। তারা প্রেমনিবেদন পেলে যোগ্যতার নিদর্শন পেতে চায়। তারা কামিনী হয়ে তুষ্ট হয় না, স্বামিনী হবার স্পর্ধা রাখে। এসব নারীর জন্যে যারা কবিতা লেখে তাদের অশ্লীলতা এত স্বল্পস্থায়ী যে কেবল তারই সমালোচনাকে ব্রত করে 'শনিবারের চিঠি' চালাতে হয় না।

বৈশাখের 'হসন্তিকা'র পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখে পড়ল—"ছোঁড়াদের লেখা শুধু মেয়েধরা ফন্দী"। এই রসঘন বাক্যটি 'হসন্তিকা'র নিজের রচনা নয়। এটি তাঁরা 'নন্দী ভৃঙ্গী'র মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। ধন্য 'নন্দী ভৃঙ্গী'! এই একটিমাত্র বাক্য দিয়ে কেবল আমাদের তরুণ সাহিত্যকে কেন, আবহমান-কালের বিশ্বসাহিত্যকেও চুম্বকে বোঝানো যায়। শুধু সাহিত্য নয়, চিত্র ভাস্কর্য সঙ্গীত থেকে যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত ছোটবড়ো সব কিছুই তো মেয়েধরা ফন্দী, নারীর মন পাবার জন্যে মন রাখবার জন্যে পুরুষের সৃষ্টি। হেলেনকে ধরে নিয়ে ঘরে রাখবার ফন্দী ট্রয়ের যুদ্ধ। মমতাজকে মরণের পরে ধরে রাখবার ফন্দী তাজমহল। "ছোঁড়াদের লেখা শুধু মেয়েধরা ফন্দী"—এই একটিমাত্র সূত্র বেয়ে সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে পৌঁছানো যায়। Rolland তাঁর আধুনিকতম উপন্যাসের উপরে উদ্ধৃত করেছেন, "Before all else was Passion and Passion engendered Thonght"। (Rig veda) মানুষের মন পাবার জন্যে ভগবানের এই যে সৃষ্টি এটাও একটা ফন্দীই, একটা Thought; এবং এর মূলে রয়েছে তাঁর Passion—কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি (ঋগ্বেদ)।

আমাদের লেখা যদি মেয়েধরা ফন্দী হয়ে থাকে তো আমাদের লজ্জার কিছু

নেই। মেয়েদের না ধরলে আমাদের চলে না। নারীকে পুরুষের বড়ো দরকার। যে বয়সে কোকিলাকে ডেকে ডেকে কোকিলের শ্রান্তি ধরে না আমাদের সেই বয়স। আমাদের কুহু ডাকই আমাদের সাহিত্য। এ সাহিত্য আদিকাল থেকে রচিত হয়ে আসছে এই একটি কথাকে অবলম্বন করে যে "তোমাকে আমার বড়ো দরকার, তোমাকে আমি চাই।" আমাদের যুগ যুগ সঙ্গিনী রাধা' "ধরিলে তো ধরা দিবে না"; তবু তাকে ধরবই বলে আমাদের পণ; তাকে ধরবার জন্যে আমাদের শিরে শিখিচূড়া, গলে বনমালা, হাতে বাঁশি, পায়ে কালীয় নাগ। জটিলা কুটিলা যদি বলে, "ছোঁড়াদের লেখা শুধু মেয়েধরা ফন্দী" তবে আমাদের লজ্জার কিছু নেই। তাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

কিন্তু নিজেদের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করবার আছে। যাকে ধরবার জন্যে আমাদের ফন্দী সে কি বড়ো সহজ নারী? তাকে দুটো চাটুকথা শোনালেই সে ধরা দেবে? কিংবা সে কি শুধু তার দেহখানি যে দেহের স্তব তার মরমে পশবে? দেহ সত্য, দেহ সুন্দর, দেহ অনির্বচনীয় অমৃত; কিন্তু দেহই তো সে নয়। দেহ তার। "Love me? Love my dog" এই নীতি অনুযায়ী যে প্রেমিক প্রিয়ার বদলে প্রিয়ার lap dogটিকেই ভালোবেসে ফেলে তার মতো কৃপাপাত্র আর নেই। এ যেন রাজপ্রাসাদের প্রবেশপথে দ্বারীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। দ্বারী লোকটা সত্য, কিন্তু শেষ নয়। তাকে দুটো মিষ্টি কথা বলতে পারি, দু'গিনি ঘুষ দিতে পারি, কিন্তু তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকব না, তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাব। নইলে অভিমানিনী রানির দেখা পাব না, বড়ো বঞ্চিত হব।

বহুকাল থেকে আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশে কেন, ইউরোপেও—দুটি দল আছেন। একদল দেহকে মিথ্যা বলে দ্বারীকে ফাঁকি দিতে চেয়েছেন, দ্বারী তাদের গলাধাক্কা দিয়ে খেদিয়ে দিতে ছাড়েনি। আর একদল দেহকে চরম বলে দ্বারীর কাছে হাতজোড় করে রয়েছেন, দ্বারী তাদের ভেতরে যাবার পথ বলে দেয়নি। এই দু'দল ascetic ও epicure, বাবাজী ও বাবু মিলে এক দারোয়ানী সাহিত্য বানিয়েছেন, তার একদিকে দারোয়ানকে ফাঁকি দেবার মন্ত্রতন্ত্র আর একদিকে দারোয়ানের মাহাত্ম্যবর্ণন। ঢালের দুই দিকেই দারোয়ানজীর ছাপ। Platonic love ও লাম্পট্য প্রেম যেন বহুরূপীর রঙ পরিবর্তন।

গত শতাব্দীতে আমাদের দেশে ঘোরতর Puritanismএর চর্চা হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণমিশন ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনরা দেহের নামে বিভীষিকা দেখেছেন, ভোগকে ভেবেছেন বিলাস, স্বভাবকে বলেছেন অশ্লীলতা। তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ এখন হয়েছে Restoration যুগ। Roundheadদের মাথা মুড়িয়ে Cavalierরা পরচুলা পরেছেন। ক্রমওয়েলের আমলে যে দেশে গান বাজনা নাচ অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল ও বিশুদ্ধ বাইবেল ছাড়া আর কোনো বই লোকের হাতে দেওয়া যেত না, চার্লস দি সেকেণ্ডের আমলে সেই দেশে পঞ্চ ম-কারের জয়-জয়কার। নারীর সম্মান? নারীর সম্মান সে যুগেও ছিল না, এ যুগেও নেই। তারা নারীকে কামিনী বলে কাঞ্চনের সঙ্গে ত্যাগ করেছিল। এরাও নারীকে

কামিনী বলে মদের দোকানে সাকী বানিয়েছে। শোনা যায় সেকালের কোনো প্রসিদ্ধ নীতিবাগীশ বেশী বয়সে বিবাহ করায় লোকে বলে, তিনি প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছেন। এই কুৎসা শুনে নীতিবাগীশ মহাশয়ের নাকি টাইফয়েড্ জ্বর হয়ে গেল। আজকালকার তরুণজ্বরগ্রস্ত কচি ও কাঁচারা এই সব ন্যাকা ও পাকাদেরই তো নাতি। তাই দাদামহাশয়দের মতো এরাও ঠাউরেছে প্রেম মানে কাম।

তাঁরা করেছিলেন জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, এরা করছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। নিন্দার ভাগ কি কেবল এরাই পাবে, ওঁরা পাবেন না? আস্ত নারীটিকে ওঁরা কেটেছেঁটে নাম দিয়েছিলেন "মা"—মা না বললে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো যেত না। অর্থাৎ কামিনীর কবল থেকে নিরাপদ হওয়া যেত না। নারীকে একটা incestএর সম্পর্কে স্থাপন করে তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক অস্বীকার করাটা কোন্ জাতীয় মনোভাব তা Freudকে ডাকলে তিনি সাক্ষী দিতে পারেন। এই সব মাতৃপূজকদের নাতিরা এখন শিং বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা "হাম্বা হাম্বা" (অর্থাৎ অম্বা অম্বা) করবে না। এরা বলবে, "রমণীর জায়ারূপে করি উপাসনা।" এরা বন্দেমাতরম্ বলবে না। এরা বলবে, "বন্দে প্রিয়াং বন্দে মোহিনীং।" এরা যে "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শে সাহিত্য রচনা করছে না" এজন্যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দই দায়ী।

কিন্তু প্রতিক্রিয়ার প্রলোভন বড়ো প্রবল প্রলোভন। আমাদের এ আবার প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। ডবল ডোজ! বাবাজীদের মুখ ভেংচাতে গিয়ে আমরা অনেকেই বাবু হয়ে পড়ছি। দেশে ও বিদেশে একটা স্ত্রৈণতার জোয়ার এসেছে। স্ত্রৈণতা নারীর প্রতি সম্মানকর নয়। মেয়েধরা ফন্দীটা যদি শস্তা হয় তবে যে মেয়ে ধরা পড়ে ও যে পুরুষ ধরে তারা যেন নীলামী জিনিস ও নীলামী জিনিসের খরিদ্দার। শস্তার আসবাবে ঘর বোঝাই করা এক বিড়ম্বনা। শ্মশানবিলাসী বাবাজী ও শস্তাবিলাসী বাবু দুই-ই সমান বিড়ম্বিত। রমণীকে উপাসনা করবার কথা ওঠে কেন? উপাসনা যদি করতেই হয় তবে একটিমাত্র রূপে কেন? মাতাকেই বলো, প্রিয়াকেই বলো, বন্দনা করবার দরকার নেই। ভালোবাসি, সর্বরূপে ভালোবাসি—নারী সম্বন্ধে পুরুষের এই কথাটাই শ্রেষ্ঠ, এতে কোনো পক্ষের সম্মান বা অতিসম্মান নেই। এতে দেহ মন আত্মা সমস্তেরই যথাস্থান আছে। নারী পুরুষের প্রিয়াই বটে, জননীরূপে প্রিয়া, ভগিনীরূপে প্রিয়া, জায়ারূপে প্রিয়া কন্যারূপে প্রিয়া, কিন্তু উপাস্যা বা বন্দনীয়াও নয়, ঘৃণ্যা বা বর্জনীয়াও নয়।

অতএব আমাদের মেয়েধরা ফন্দীটাকে এমন করতে হবে যাতে মেয়ের সমস্তটা ধরে ও তার কোনো রূপ বাদ পড়ে না। এ ফন্দী যে আমরা ছাড়তে পারব না এ তো স্বতঃসিদ্ধ। যতদিন জগতে মেয়ে থাকবে ততদিন মেয়েধরা ফন্দীও থাকবে। আমাদের কর্তব্য কেবল ফন্দীটাকে মেয়ের উপযুক্ত করা। আমাদের সাহিত্য যেন দারোয়ানী সাহিত্য না হয়ে রাজরানি সাহিত্য হয়। এই আমাদের লক্ষ্য হোক। তাহলে বাণীরানির কোলের পদ্মপাতার ডালায় ঢাকা বরণমালাটি

একদিন গলায় পরবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারব।

এ গেল আমাদের দিককার কথা। এবার একটু নন্দী-ভৃঙ্গীদের দিককার কথা হোক।

"বিগড়েছে বালিকারা কলেজের ছাত্রী
তাই তাঁর ঘুম নেই চোখে দিনরাত্রি।"

এই নন্দী-ভৃঙ্গীদেরকে কলেজের দুগ্ধপোষ্য নাবালিকাদের chaperone পদে কে বহাল করলে? মেয়েধরা আমাদের গরজ, আমরা তো ও কাজ করবই; নন্দী-ভৃঙ্গীকে মেয়েরা পার্শ্বরক্ষী করলে যে ছাড়া পাবে এমন ভ্রান্তি মেয়েদের তো হবার কথা নয়। তবে কি নন্দী-ভৃঙ্গীরা স্বেচ্ছাসেবক? কিন্তু হয়তো মেয়েরাই তাদের শিখণ্ডী সাজিয়ে রগড় দেখতে চায়। 'হসন্তিকা'তেই দেখছি 'বিশ্বপ্রিয়া' নামক নকশাটিতে 'বিশালাক্ষী' নামক মেয়েটিকে বানানো হয়েছে injured innocent, যেন একটা বোবা কুকুরছানা বা একটি জড় পদার্থ। তাকে তার স্বামীর কাছ থেকে যে ভুলিয়ে নিলে সমস্তটা দোষ তারই ও সেজন্যে সবটা সাজাও সেই তরুণীটার। আমাদের তরুণকুলের খাসা সার্টিফিকেট! সত্যিই যদি তাঁরা এত ভালোমানুষ হয়ে থাকেন তবে তাঁদের জন্যে সাহিত্যিক পাহারাওয়ালা মোতায়েন না রেখে আইন করে দেওয়া হোক যে মেয়েরা ঘটি-বাটি সোনা-দানা জাতীয়, তাঁরা কলেজে পড়লেও, বয়স বাড়লেও মাসিকপত্র বা নভেল নাটকের দ্বারা তাঁদের মন চুরি করাটা একটা larceny জাতীয় ক্রাইম্।

দেশের মেয়েরা কেবল লেখা পড়েন না, লেখেনও। সুলেখিকা বলে অনেকেরই সুখ্যাতি আছে। তরুণে প্রবীণে এই যে 'সাহিত্য সংগ্রাম' চলেছে এতে ছোট বড়ো মাঝারি অনেক লেখকই তো যোগ দিলেন; কই কোনো লেখিকাকে তো দেখা গেল না? 'বঙ্গনারী' কেন তরুণদের শায়েস্তা করলেন না? অনুরূপা দেবী কেন তরুণীরক্ষার উপায় বলে দিলেন না? ইন্দিরা দেবী কেন শান্তিজল ছিটোলেন না? নারীনেত্রীরা নীরব। স-রব কেবল তাঁদের আত্মনিযুক্ত পার্শ্বরক্ষীরা। রাজার চেয়ে রাজার পারিষদদের গলার আওয়াজ উঁচু।

৩

আমাদের এই রেডিও টেলিভিসন এরোপ্লেনের যুগে আমাদের কাছে দেশের চেয়ে যুগ সত্য, এইটি আমাদের নিগূঢ় অপরাধ। আমরা যখন কলকাতায় বসে বাংলা লিখি, তখন মস্কোতে বসে যিনি রাশিয়ান্ লিখছেন ও অস্‌লোতে বসে যিনি নরওয়েজিয়ান্ লিখছেন তাঁদের সঙ্গে মনে মনে বেতার বার্তা বিনিময় করি। সাহিত্যরাজ্যের কোটালের দল ভাবেন, এরা গর্কী, হামসুনকে নকল করছে। সাহিত্যসম্রাটের দরবারে এদের ধরে নিয়ে গেলে এদের মাথায় ঘোল ঢালবার হুকুম পাওয়া যাবে। তাঁরা নিয়েও গেলেন ধরে। সাহিত্যসম্রাট অতি উদার লোক, সাজা না দিয়ে sermon দিলেন। কিন্তু তাতে কার কতটুকু উপকার হলো এখনো জানতে পারিনি।

তরুণদের দিক থেকে অনেক কথা বলবার আছে। প্রথমত, আমরা শুধু বাংলার জনকয়েক নই, আমরা সব দেশের অসংখ্য জন। এ সত্যটা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত ছাড়া অন্য কাউকে স্বীকার করতে দেখিনি। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য আসলে অতি-আধুনিক বিশ্বসাহিত্য। বাংলার তরুণ হাম্‌-সুনের প্রাণের কথা প্রাণে অনুভব করছে, তাই তার লেখা হাম্‌সুনের নকল নয়, হাম্‌সুনের দোসর। হতে পারে তার ক্ষমতা অল্প, তার হাত কাঁচা, তার অভিজ্ঞতা ভাসা ভাসা। হাম্‌সুনের প্রতিভা হয়তো তার নেই। কিন্তু হাম্‌-সুনের প্রাণ তার আছে, যে প্রাণ অসুন্দরকে দেখে বেদনা পায়, ভাষায় প্রকাশ না করতে পেরে হাঁপায়। হাঁপানীর লক্ষণাক্রান্ত ভাষার না থাকে কর্তা না থাকে কর্ম, তার আগাগোড়া ভাববাচ্য। এই হাঁপানী রোগটি এখানকার ইউরোপের গণ্যমান্য লেখকদেরও আছে। Rollandর নেই কি ?

দ্বিতীয়ত, আমরা বিষয়কে প্রাধান্য দিচ্ছি, রূপকে অবহেলা করছি, সত্যই। আমরা আর্টিস্ট ততটা নই যতটা প্রোপাগ্যান্ডিস্ট, আমরা আর্টকে প্রোপা-গ্যান্ডার বাহন করেছি। আমরা মুখে যাই বলি না কেন, কাজে প্রমাণ করি art for propaganda's sake। আমাদের কারো উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার, কারো উদ্দেশ্য রাষ্ট্রবিপ্লব, কারো উদ্দেশ্য নরনারীর স্বাধীন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা, কারো উদ্দেশ্য বৈশ্য শূদ্রের সমান অধিকার প্রচার। উৎকট realist বলে যাঁদের নাম-ডাক তাঁরাও তলে তলে উৎকট idealist—যথা বার্নার্ড শ। ওমর খৈয়ামের মতো আমাদের সকলেরই মনোবাঞ্ছা—"to grasp this sorry scheme of things entire to shatter it to bits and to remould it nearer to the heart's desire."

পূর্বকালের সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমাদের গোড়াতেই অমিল। তাঁদের সৃষ্টি তাঁদের নিরুদ্দেশ্য লীলা। তাঁদের হাতে কাল অন্তহীন, তাঁরা এক-একটি রসাত্মক বাক্য লেখবার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে পারতেন। এক-একটি মন্দির গড়তে তাঁদের শত শত বৎসর লাগত। কালিদাসের বা Shakes-peareএর লেখা পড়লে মনে হয় না যে তাঁদের কালে কোনোরকম সমস্যা ছিল বা সে সমস্যার তাঁরা কোনোরকম সমাধান দিতে চেয়ে কিংবা দিতে না পেরে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। 'মেঘদূত' বা "Tempest' যেন এ জগতের নয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে জগতের তুমুল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলে Industrial Revolution। বাষ্পচালিত যন্ত্রের উদ্ভাবনে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহুগুণ হয়ে গেল। মানুষ রেলে ছুটল, জাহাজে সাঁতার দিলে, এরোপ্লেনে উড়ল। হঠাৎ দেখা গেল পৃথিবীটা এতটুকু ইংলণ্ড বা এতটুকু ভারতবর্ষ নয়। এর সমস্যা যে কত ব্যাপক ও কত বিপুল তা তো Shakespeare বা কালিদাস কল্পনাও করতে পারতেন না। বুদ্ধদেব দেখেছিলেন জরা মৃত্যু ব্যাধি। তাইতেই তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আমরা দেখছি অনাহার অত্যাচার নৃশংসতা নির্বোধত্ব কদর্যতা অসহায়ত্ব—দেশব্যাপী পৃথিবীব্যাপী চরাচরব্যাপী।

কালিদাসদের ছোট একটি গ্রামে বা নগরে যা ঘটত তার বেশী তাঁরা দেখতে

শুনতে পেতেন না। আমরা কিন্তু কলকাতায় বসেও সমগ্র পৃথিবীতে বাস করি। খবরের কাগজ রোজ সকালেই আমাদের মন খারাপ করে দেয়, খারাপ মন নিয়ে গলিতে বস্তিতে গিয়ে দেখি সবই খারাপ। কোথাও বেশ্যা, কোথাও আস্তাকুঁড়, কোথাও গুন্ডা, কোথাও কয়েদী। হঠাৎ যেন Infernoর পর্দা খুলে গেছে, আমরা দেখছি এই পৃথিবীটাই যেন Inferno। এটা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের চোখে পড়েনি। আমরাই কলম্বসের মতো আবিষ্কার করলুম। সত্যের সঙ্গে সুন্দরের যে কতখানি ব্যবধান তা আমরা যেমন বুঝি তাঁরা কি তেমন বুঝতেন?

বিষয়ের কথা হচ্ছিল। আমরা দেখছি এত বিষয়ে এত লেখবার আছে যে মাত্র গোটাকয়েক বিষয় নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। চাঁদ কোকিল দখিন হাওয়ার উপরে চোদ্দ বছর থেকে চৌষট্টি বছর অবধি কবিতা লেখা আমাদের চোখে ক্রিমিনাল। রবীন্দ্রনাথ কি এ যুগের লোক? তিনি কালিদাসের কালের লোক। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার জগৎ থেকে তিনি আমাদের জগতে উড়ে এসেছিলেন। তাঁর বার্তা উপনিষদের বার্তার মতো অসহ্য আনন্দের বার্তা। সে বার্তা যখন শুনি তখন মনে হয় না যে শহরে শহরে slum আছে, গ্রামে গ্রামে শ্মশান, ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব আছে, দেশে দেশে যুদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত সব দেশের সাহিত্যে বিরাট একটা ভূমিকম্পের ভাব দেখি, যা নিচে ছিল তাই এসেছে উপরে, যত সব নিষিদ্ধ বিষয় অবহেলিত বিষয় তাদের স্থান সর্বোচ্চে। আমাদের সাহিত্যে সেই ভূমিকম্পের রেশ কিছু দেরিতে পৌঁছেছে বলেই যারা ঘরে দুয়ার দিয়ে সুখে স্বস্তিতে ছিলেন তাঁরা সাহিত্যরাজ্য অন্ধকার দেখছেন, লাভা প্রবাহের অগ্রদূতদের ভাবছেন অপরূপ বিভীষিকা। কিন্তু কিছুকাল থেকে ইউরোপে যা চলে আসছে এখন থেকে আমাদের দেশেও তাই চলবে, আমাদেরও হাটে ঘিরবে, আমাদেরও সাহিত্য হবে হাটের সাহিত্য। সময় সময় বোঝা শক্ত হবে, এ জিনিস সাহিত্য না সমাজতত্ত্ব না অর্থনীতি না যৌননীতি। এবং পদে পদে মনে হতে থাকবে এ জিনিস খাঁটি স্বদেশী, না রাশিয়া-নরওয়ের আমদানী।

তৃতীয়ত, আমরা যে আমাদের পূর্ববর্তীদের তুলনায় কামুক বা দুর্মুখ বা বেহায়া এ অভিযোগ সত্য নয়। আমাদের অপরাধ, আমাদের পূর্ববর্তীরা যে ক্ষেত্রে চোখ বুজে ছিলেন আমরা সে ক্ষেত্রে চোখ খোলা রেখেছি। কালি-দাসের কালে দুর্ভিক্ষ মহামারী দাস-ব্যবসায় বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি সমস্তই ছিল, কিন্তু তাঁরা সামান্যই দেখেছিলেন, সামান্যই কেঁদেছিলেন। সামান্যই cynical হয়েছিলেন। আমরা এত পাপ দেখছি যে মাথা ঠিক রাখতে পারছিনে, কলম সামলাতে পারছিনে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি, নিজেরা পাথর হয়ে গিয়ে অন্যদের পাথর করে তুলছি।

পাঠকের সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তির প্রতি আবেদন আমরা করিনে, কেননা আমাদের নিজেদেরই হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়ে গেছে। ঘা খেয়ে খেয়ে আমাদের হৃদয় হয়ে গেছে ভোঁতা। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের স্থলে স্থলে যে

সৌকুমার্য দেখি সে যেন স্বপ্নরাজ্যের, তার সঙ্গে এ জগতের নাড়ীর বাঁধন নেই ; Yeats, Maeterlinck যেন সুতো ছেঁড়া ফানুস। রবীন্দ্রনাথের মতো মাটির উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশে চোখ মেলে দিয়ে অসীমকে দেখা অন্য কোনো লেখকের মধ্যে দেখিনে, এক ছিলেন Browning, কিন্তু তাঁর মধ্যেও সত্যে মিথ্যায় তুমুল সংঘর্ষ। Tolstoy এর মধ্যেও স্থৈর্য ছিল না।

কতকাল এই অস্থিরতার যুগ চলবে জানিনে। জীবন অস্থির হলে সাহিত্যও অস্থির হয়। জীবনের অস্থিরতা বৃদ্ধিই পাচ্ছে—একটার পর একটা উদ্ভাবন মানুষকে পৃথিবী ছাড়িয়ে মঙ্গলগ্রহে নিয়ে যেতে চলল। তখন হয়তো সৌর-জগতের দুঃখে আমরা পাগল হয়ে যাব। যাঁরা ভাবছেন, ভাবী সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের প্রশান্তি ফিরে আসবে, সব ঠিক হয়ে যাবে, বর্তমান সাহিত্য একটা দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হবে তাঁদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছিনে।

খুব সম্ভব এই হবে যে আমরা স্থিতির বদলে গতিটাকেই জগতের নিয়ম বলে মেনে নেব। বেগের মধ্যে একপ্রকার স্থৈর্য অনুভব করব। পীড়া সত্ত্বেও সমাহিতচিত্ত হতে শিখব। আমাদের ভাবী সাহিত্য হাটের সাহিত্য হয়েও রাজপুরীর সাহিত্যই হবে, একটা ভিত্তিহীন মায়াপুরীর আকাশকুসুম হবে না। জীবনের জটিলতা চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞান দর্শন রাজনীতি ও সমাজনীতি সমস্তই সে সাহিত্যের বন্যাস্রোতে ঘূর্ণি সৃষ্টি করতে করতে চলবে। সমস্যার সমাধানে সাহিত্যকে ঘোলা করে তুলতে থাকবে। এই আমার ধারণা। Rolloandর 'John Christopher' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা ভাবী সাহিত্য সম্বন্ধে আশাবান হতে পারেন। সে সাহিত্য প্রেত প্রমথ দৈত্যদানার সাহিত্য হবে না। মানুষেরই সাহিত্য হবে, কিন্তু সে মানুষ অস্থির মানুষ, অশান্ত মানুষ।

(১৯২৮)

সংকট ও সাহিত্য

বিনুর পরম হিতৈষী এক বয়ঃপ্রাচীন সাহিত্যিক তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন বেশী না লিখতে। তাঁর উপদেশের পূর্ব হতেই সে ঐ উপদেশ পালন করে আসছে। বেশী লেখা দূরে থাক, আদৌ কেন লিখবে এমন কথাও তার মনে উদয় হয়। ঘরে বাইরে আজ ঘটনার ঘনঘটা, জীবনমরণ সমস্যা। বিনুও মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে ভাবে, জগতের ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে, দেশের ইতিহাসের এই সংকটমুহূর্তে নির্জলা সাহিত্যরচনার জন্যে লেখনী যারা ধরে তারা পলাতক, তারা কাপুরুষ। যারা য়্যাকশনের শঙ্খ শুনেছে তারা কী করে ঘরে থাকবে, কী করতে লেখনী নিয়ে খেলা করবে! যাদের রক্তে দোলন লেগেছে তারা দোলনায় শুয়ে স্বপ্ন দেখবে না তারা লাগাম হাতে নিয়ে ঘোড়সওয়ার হবে। ইতিহাসের এই লগ্ন যখন অতীত হবে তখন যদি তারা জীবিত থাকে তবে আবার তুলে নেবে লেখনী, আবার আসবে সাহিত্যের সময়। এখন কি

সাহিত্যের সময় !

তার পরে ভাবে, সব সময়ই সাহিত্যের সময়, সৃজনের সময়। মড়কের দিনে কি প্রজনন বন্ধ থাকে ? প্রলয়ের দিনে কি প্রকৃতি নব সৃষ্টির বীজ বপন করে না ? সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা গেছে চারদিকে যখন মরণের বিভীষিকা, অনাচার, অত্যাচার, তখন সেই ঘাতপ্রতিঘাত অগ্রাহ্য করে সাহিত্যের কুঞ্জে বসন্ত আসে। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে, কিন্তু ঋতুবিপর্যয় ঘটে না, বরং ঋতুলীলা আরো নিবিড় হয়। যারা প্রকৃত কবি তারা প্রকৃতিধর্মী, তারা প্রকৃতিরই মতো লীলারত। না, কোনো সময়েই লেখনী ছেড়ে লাগাম ধরা যায় না। তবে কেউ কেউ সব্যসাচী। এক হাতে লেখনী ধরেন, অন্য হাতে লাগাম। ইতিহাসে তার নজির রয়েছে।

কিন্তু দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থা বিনুর পছন্দ হয় না। লেখনীটাকেই লাগাম করে কাগজের ঘোড়া ছুটিয়ে সংগ্রাম যেন ছেলেদের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। এতে প্রাপ্তবয়স্ক মন তৃপ্তি পায় না, সার হয় আত্মপ্রতারণা। যদিও আধুনিক ইউরোপে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ তথাপি বিনু এসব ভূরিশ্রবাদের শ্রদ্ধা করতে পারে না। এঁরা ধরতে চান বল্লম, কিন্তু সে সাহস নেই, শক্তিরও অভাব। তাই কলমকে বানাতে চান বল্লম। এটা কলমের প্রতি অনুগ্রহ, বল্লমের প্রতি অবিচার। লেখনীর প্রতি যাঁদের মমতা নেই, যাঁরা তাকে ব্যবহার করতে চান ক্ষেপণী রূপে, তাঁদের দ্বিচারিতার ফলে তাঁদের লেখা সাহিত্য হিসাবে নিম্ন।

যাঁরা বল্লম না ধরলে সুখী হবেন না তাঁদের কলম ছাড়তেই হবে, যাঁরা কলম ছাড়তে অনিচ্ছুক তাঁদের বল্লম ধরবার উপায় নেই। সব্যসাচী অবশ্য ব্যতিক্রম। যাঁরা সব কাজে হাত লাগান তাঁরা সব কাজে নাম করতে পারেন, ইতিহাসে তার নজির মেলে। কিন্তু যাঁরা একটি কাজের কাজী তাঁদের সমকক্ষ হতে চাইলে তাঁদেরই মতো একনিষ্ঠ হতে হয়। কলালক্ষ্মী বরদা হন একনিষ্ঠ আরাধনায় তুষ্ট হলে। রণচণ্ডীরও সেই স্বভাব।

তা হলেও, বিনুকে যদি বেছে নিতে বলা হয় বিনু হয়তো য়্যাকশনকেই বরণ করবে আজ। কারণ এত বড়ো একটা ব্যাপারে যোগ না দিলে জীবনের সঙ্গে যোগ থাকে কি ? জীবনের সঙ্গে যার যোগ নেই সে যোগী হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক হবে কি ?

অথচ যোগ যদি দেয় তবে লেখা বন্ধ রাখতে হবে। বেশী লেখা দূরে থাক, আদৌ লেখা হয়ে উঠবে না। বিনু তো সব্যসাচী নয়, সব্যসাচী হলে কোনো প্রশ্ন উঠত না, সব্যসাচীদের কাছে এই সংকট উভয়সংকট নয়। বিনু কিন্তু উভয়সংকটে আরূঢ়। তাই তার পক্ষে বেছে নেওয়া শক্ত। যদি য়্যাকশন বেছে নেয় তবে ধ্যান করবার অবসর পাবে না, ধ্যান না করে লিখলে সে লেখা সাহিত্যের রত্নমঞ্জুষায় স্থান পাবে না। শ্রেষ্ঠীরা তাকে বাজিয়ে দেখবে, সে লেখা বাজবে না, সুতরাং বাজে।

আর যদি ধ্যান বেছে নেয় তবে এই ঐতিহাসিক গোধূলি লগ্নে, এই যুগ-সন্ধ্যায়, লক্ষ লক্ষ বরযাত্রীর শোভাযাত্রায় বিনু থাকবে অনুপস্থিত। এত বড়ো

একটা ব্যাপারে অনুপস্থিত থাকা কি বাঁচা। সে তো বেঁচে থাকা। শিল্পীর পক্ষে তেমন করে বেঁচে থাকা যে বন্ধ্যাত্ব।

ক্রিমিয়ার সমরে অংশ না নিলে কি টলস্টয় পরে 'War and Peacc' লিখতে পারতেন? আমেরিকার গৃহযুদ্ধে যুক্ত না থাকলে কি হুইটম্যান লিখতে পারতেন বহু উৎকৃষ্ট কবিতা ও 'Democratic Vista'? এই দুটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

অপর পক্ষে গ্যেটের কথা মনে আসে। জার্মানী যখন নেপোলিয়নের পদানত তখন তিনি তাঁর সৃষ্টির ধ্যান থেকে সরেননি, তাতে পূর্বের ন্যায় মগ্ন। আর ভিয়েনায় যখন গোলা পড়ছে বেঠোফেন তখন পিআনো বাজিয়ে চলেছেন, ভ্রূক্ষেপ নেই কী হচ্ছে। তিনি অবশ্য কানে শুনতে পেতেন না। শুনতে পেলেও কি শুনতেন? শিল্পীর ধ্যানভঙ্গ করতে ইন্দ্র যেসব অপ্সরা পাঠান ঘটনা তাদের অন্যতম নয়। ঘটনাকে তাঁরা উপেক্ষা করেন।

২

এই সব দৃষ্টান্তের দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে কারো কাছে বাইরের জীবন বড়ো কারো কাছে অন্তরের জীবন। কেউ নিমন্ত্রণে যোগ দিতে না পারলে ভাবেন জীবন ব্যর্থ। কেউ স্বেচ্ছায় অনুপস্থিত থাকেন, ভাবেন ওটা একটা অনাবশ্যক ব্যাঘাত। কেউ স্বভাবত সামাজিক, সকলের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসেন। কেউ স্বভাবত অসামাজিক, মিশতে জানেন না ও চান না। সেইজন্যে সব শিল্পীর বেলায় একই নিয়ম খাটে না। কার বেলায় কোন নিয়ম খাটে তা বোঝেন তাঁরা নিজেরাই। হয়তো তাঁরাও বোঝেন না, না বুঝে মেনে যান অদৃশ্য অনুশাসন।

য়্যাকশনকে যাঁরা একটা উৎপাত মনে করেন তাঁরা ওর থেকে শত হস্ত দূরে থাকলে সুখী হন। এর মানে এ নয় যে তাঁরা প্রাণের ভয়ে পলাতক, তাঁরা কাপুরুষ। এর মানে তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি সংহত করতে চান সৃজনের জন্যে। অপরে ভুল বুঝবে বলে তাঁরা চিন্তিত নন, তাঁদের বিশ্বাস একদিন সকলে ঠিক বুঝবে। গ্যেটে বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর দিনকয়েক পূর্বে একারমানকে—

> "Hard as I have toiled all my life, all my labours are as nothing in the eyes of certain people, just because I have disdained to mingle in political parties. To please such people I must have become a member of a Jacobin club, and preached bloodshed and murder···Mind, the politician will devour the poet."

অথচ গ্যেটে একজন রাজমন্ত্রী ছিলেন, রাজার সঙ্গে অর্থাৎ ভাইমারের ডিউকের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায় গিয়েছিলেন। য়্যাকশন দেখে ভয় পাবার পাত্র ছিলেন না তিনি। ভয় নয়, বিরাগ তাঁকে নিবৃত্ত করেছিল।

এ যেমন এক পক্ষের কথা তেমনি অপর পক্ষের কথা রম্যা রলাঁর ভাষায়—

"Action is the end of thought. All thought which does not look towards action is an abortion and a treachery. If then we are the servants of thought we must be the servants of action."

গত মহাযুদ্ধের সময় রলাঁ লেখনী ছেড়ে ক্ষেপণী ধরেননি, কিন্তু লেখনী দিয়ে যা করেছিলেন তা নির্জলা সাহিত্য সৃষ্টি নয়, আহত ও নিহতদের আত্মীয় আত্মীয়াদের চিঠি লিখে শক্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়েছিল। সাহিত্যের দিক থেকে ওটা একটা অপচয়, সাহিত্যিকদের দিক থেকে বিক্ষেপ। কিন্তু রলাঁ তো শান্তিতে বসে বই লেখবার মানুষ নন।

উভয় পক্ষের বক্তব্য প্রণিধান করে বিনু এই মীমাংসায় উপনীত হয়েছে যে গ্যেটেরা সৃষ্টির ব্যাঘাত সইতে পারেন না বলে য়্যাকশনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, রলাঁরা সৃষ্টির ব্যাঘাত সইতে রাজি যদি য়্যাকশনের নিমন্ত্রণ পান। আসলে ওটা সহিষ্ণুতার প্রশ্ন, ব্যাঘাত সহিষ্ণুতার।

এ দিক থেকে ভেবে দেখলে বিনু মনঃস্থির করতে অক্ষম হয়। কেননা য়্যাকশনের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যত-না কষ্টকর তা রক্ষা করতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর ব্যয় করা ততোধিক দুষ্কর। য়্যাকশন যদি স্বল্পকালীন হতো তা হলে অত বিতর্ক শোনা যেত না, কিন্তু কেউ জোর করে বলতে পারে না বর্তমান সংকট কতকাল স্থায়ী হবে। সৈনিক য়্যাকশনের জন্যে তালিম হয়েছে, পাঁচ বছর তার কাছে কিছু নয়। কিন্তু শিল্পী তত দিন অশিল্পী হলে অতিষ্ঠ বোধ করে। এ যেন শেয়ালের বাড়ি বকের নেমন্তন্ন। হাঁ করে দেখে, মুখ লাগাতে পারে না। শেয়ালের য়্যাকশন ভুরিভোজন, বকের য়্যাকশন ভোজ্যদর্শন।

শেষ পর্যন্ত য়্যাকশনে উপস্থিত থাকার অর্থ দাঁড়ায় সাক্ষী থাকা ও পরে সাক্ষ্য দেওয়া। সাহিত্যিকের সাক্ষ্য সাহিত্য। সুতরাং য়্যাকশনের পরিণতি রসসৃষ্টি। গত যুদ্ধে যে সব সাহিত্যিক যোগদান করেছিলেন তাঁরা সৈনিক হিসাবে কে কেমন কৃতী হয়েছিলেন জানা নেই, কিন্তু ফিরে এসে জবানবন্দী লিখেছিলেন অনেকে।

৩

যাই হোক এটা স্থির যে দ্বিচারিতা বিনুর জন্যে নয়। বিনু বলে, একই মানুষ সাহিত্যিকও হতে পারে, সৈনিকও হতে পারে। এমন কি একই সঙ্গে দুই হতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে লেখনী নিয়ে খেলা করবে সে মুহূর্তে সঙীন ভূতলে রাখবে এবং কবিত্বের রঙে রঙীন হবে। কাব্যের নিয়ম মানলে তবেই সে প্রয়াস হবে কাব্যকলাপ, নতুবা সৈনিকের প্রলাপ। একই মানুষ দুই হতে পারে, কিন্তু একই জিনিস দুই হতে পারে না। সৃজন ও য়্যাকশন দুই স্বতন্ত্র ব্যাপার। সাহিত্য ও সমর দুই স্বতন্ত্র বস্তু।

সৈনিক সম্বন্ধে যা বক্তব্য শ্রমিক সম্বন্ধেও তাই। একই মানুষ সাহিত্যিকও হতে পারে, শ্রমিকও হতে পারে। এমন কি একই সঙ্গে দুই হতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে লেখনী হাতে নেবে সে মুহূর্তে হাতুড়ি হাত থেকে নামাবে আর কবিত্বের আবেশে তুড়ি দেবে। কাব্যের কলাবিধি মেনে চললে তবেই তার সেই প্রযত্ন কাব্যকলাপ, অন্যথা শ্রমিকের বিলাপ।

মোট কথা, তাল ঠুকে কিছু লিখলেই তা সাহিত্য হয় না। সাহিত্যের তালজ্ঞান থাকা চাই। তালজ্ঞান না থাকলে প্রাণে হাজার আবেগ থাকলেও সেই আবেগের উদ্‌গার সাহিত্য হবে না, শুধু ভালোমানুষের মনে উদ্বেগ সঞ্চার করবে, ছেলেমানুষের মনে উদ্দামতা। সাহিত্য একটা আর্ট। আর্টের জন্যে কী পরিমাণ খাটতে হয় তা ভাস্কর্যের দিকে তাকালে প্রত্যক্ষ হয়। কিংবা সংগীতের দিকে। সেইজন্যে খুব কম লোকের পক্ষেই সব্যসাচী হওয়া সম্ভব। যে দু-এক জনকে হতে দেখা যায় তাঁরা ডবল খাটেন। শিল্পের জন্যে এক দফা, সমাজের জন্যে আর-এক দফা।

তবে সাধারণের অবচেতনায় কেমন যেন একটা সংস্কার নিহিত রয়েছে যে সাহিত্য তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়, কোনো মতে কাগজের উপর কলমের আঁচড় টানলেই তার নাম সাহিত্য। রসসাহিত্য বলে একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। যেন নীরস সাহিত্য বলে অন্য কিছ আছে! যাতে রস নেই তা সাহিত্য নয়, আর রসের সাধনা বড়ো দুরূহ সাধনা। এতে তন্ময় না হলে সিদ্ধি নেই, তাই য়্যাকশনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা দুষ্কর। অথচ নিমন্ত্রণ তো প্রতিদিন জোটে না, জীবনে হয়তো একবার সে সুযোগ আসে।

এগুনি সাত-পাঁচ ভাবে বিনু। বেশী লেখা দূরে থাক, আদৌ লিখবে কি না তোলপাড় করে। কেন লিখব? এই তার প্রথম প্রশ্ন। এর উত্তর যদি মেলে তবে দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে, কেমন করে লিখব? এর নিরসন হলে তৃতীয় প্রশ্ন, কী লিখব?

কেন লিখব? এর উত্তর, না লিখে সোয়াস্তি নেই। মনে যা জমছে তা আপনি উপচে উঠছে, ফোয়ারার মতো ছুটছে। সম্পাদক যদি না ছাপেন প্রকাশককে দেব, প্রকাশক যদি না ছাপেন হাতে লিখে ছড়াব, কেউ যদি না পড়ে মাটিতে পুঁতে রাখব। নিজের ভার হাল্‌কা হলেই আমি খুশি। সমাজকল্যাণের জন্যে ত্বরা নেই। যাতে সত্য আছে, সুন্দর আছে, তাতে শিবও আছেন। আমার লেখা যদি মাটিতেই পোঁতা থাকে তবু সমাজ তাকে এক দিন খুঁড়ে বার করবে ও তাতে যদি খোঁচা থাকে তবু তার আস্বাদ নেবে। কেন লিখব? এর উত্তর, লেখার জন্যেই লিখব। আর্ট ফর আর্টস্ সেক।

তারপর, কেমন করে লিখব? এই প্রশ্নটি সব চেয়ে শক্ত। একই কথা একশ' ধরনে বলা যায়। তার মধ্যে কোন ধরনটিতে স্বাদ আছে, ব্যঞ্জনা আছে, মাধুর্য আছে? আর আছে বৈশিষ্ট্য? লেখকের জীবনে এটি হলো প্রতি দিনের প্রতি ক্ষণের প্রশ্ন। পদে পদে এই প্রশ্ন হানা দেয়, বিব্রত করে। লেখক একটু আগে যা লেখেন একটু পরে তা কাটেন। বস্তুত এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির কে কীরূপ

উত্তর দেন তারই দ্বারা নির্ণীত হয় তিনি শিল্পী না অন্য কিছু। লেখক অনেক, রসিক জনকতক। কলালক্ষ্মী এই সাধনাটি সাধতে দিয়ে কলাবিদ মনোনয়ন করেন। যাঁরা ফাঁকি দিতে চান তাঁরা রকমারি বুলি দিয়ে ভোলান, ভঙ্গি বিস্তার করেন। তাতে ফাঁকির ফাঁক ভরে না। ঠেকতে হয় একদিন। এমনও দেখা যায় যাঁরা অজস্র লিখেছেন তাঁরাও মনোনয়ন পাননি, বরমাল্য পেয়েছেন যাঁরা অল্প কয়েকটি মনের মতো লেখা লিখেছেন। অন্য কথায়, রসোত্তীর্ণ হতে হবে।

তৃতীয় প্রশ্ন, কী লিখব? বিষয়ের লেখাজোখা নেই। যে কোনো বিষয়ে লেখা যায়। জীবনমরণ সমস্যা নিয়ে লিখলেও সকলের হাতে সাহিত্য হয় না, আবার কাঁচকলা ও কৈ মাছ নিয়ে লিখলেও কারো কারো হাতে চারুকলা হয়। সরস্বতীর শুচিবাতিক নেই, তিনি একান্ত উদার। আমিষ নিরামিষ যে যা উপচার দেয় তিনি নির্বিকারে গ্রহণ করেন। কিন্তু নির্বিচারে সেবন করেন না। এস্থলে ভালোমন্দের কথা ওঠে। সাহিত্যের ভালোমন্দ সাহিত্যের ঘরোয়া ব্যাপার। সমাজ এতে হস্তক্ষেপ করলে সমাজের ইষ্ট কী হয় সমাজই জানে, কিন্তু সাহিত্যের হয় অনিষ্ট। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের যদিও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তবু তারা যেন দুই প্রতিবেশী রাজ্য, কেউ কারো করদ নয়, উভয়ে উভয়ের মিত্র। সাহিত্য যখনি সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়েছে তখনি আপনাকে আপনি একঘরে করেছে। পক্ষান্তরে যখনি সমাজের তরফ থেকে বশ্যতা দাবি করা হয়েছে তখনি সাহিত্যের অমর্যাদা ঘটেছে। এই দাবি যে কেবল বাইরে থেকে আসা তা নয়। সাহিত্যিকরাও সামাজিক মানুষ। তাঁদের নিজেদের ভিতর থেকে সামাজিক মনের দাবি উত্থিত হয়। তাঁদের সামাজিক মন তাঁদের হাত চেপে ধরে এমন সব কথা লেখায় যা সাহিত্যের প্রাণের কথা নয়, যা সামাজিক প্রয়োজনের কথা। অথবা তাঁদের এমন সব কথা লিখতে দেয় না, যা সাহিত্যের প্রাণের কথা হলেও সমাজের প্রাণঘাতী কথা। উপায় নেই। বাইরের সমাজকে অমান্য করা দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য নয়। ভিতরের সমাজ যখন আগুন হয় তখন সাহিত্যিকের লেখনী হয় ক্ষেপণী, তাঁর কলমের ধার হয় ছুরির চেয়ে তীক্ষ্ণ, হুলের চেয়ে তীব্র।

য়্যাকশনের তাগিদটা প্রকৃতপক্ষে ভিতরের সমাজেরই তাগিদ। বাইরের সমাজেরও ফরমাস। নির্জলা সৃজনের কাজ কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রাখলেও ক্ষতি নেই, ক্ষতি আছে কী লিখব তাও যদি য়্যাকশনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কেমন করে লিখব, তাও লাঞ্ছিত হয় যদি য়্যাকশনের ঘোড়ায় চড়ে লিখি। তার চেয়ে আদৌ না লেখা ভালো।

(১৯৪১-৪২)

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান

রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের কিছুদিন পূর্বে আমাদের একজন মনীষী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবন মুসলমানদের সঙ্গে কাটিয়েও তাদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে কতটুকু জানতে চেষ্টা করেছেন? যিনি কম্যুনাল এওয়ার্ডের প্রতিবাদসভায় নেতৃত্ব করতে পারেন তিনি কৃষকপ্রজার জন্যে যা লিখেছেন বা করেছেন তার চেয়ে বেশী করতে পারতেন না কি?

আমি এর উত্তর দিইনি। দিতে পারতেন কবি স্বয়ং, কিন্তু তখন তাঁর উত্তর দেবার সময় উত্তীর্ণপ্রায়। তখন থেকে এই জিজ্ঞাসা আমার মনে ঘুরছে, যদিও জানি যে কবি চিরকালের মতো নিরুত্তর। শেক্‌স্‌পীয়ারকে স্মরণ করে লিখেছিলেন ম্যাথ্যু আর্‌নল্‌ড্—

> "Others adibe our question. Thou art free.
> We ask and ask : smilest and art still,
> Out-topping knowledge .."

যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু জমিদার ছিলেন তিনি আর নেই, এখন যিনি আছেন তিনি জগতের জনদশেক কালজয়ী মহাকবির একজন। মহাকালের নবরত্নের সভায় দশম রত্ন। যতই দিন মাস বছর যাবে, যুগ যাবে, শতাব্দী যাবে ততই ঝরে পড়বে তাঁর জীবনের এক একটি ছিন্ন পৃষ্ঠা, এক একটি অবান্তর পরিচয়—তাঁর হিন্দুত্ব, তাঁর বাঙালীত্ব, তাঁর ভারতীয়তা, তাঁর আভিজাত্য। থাকবে কয়েকটি কবিতা ও গল্প, আর থাকবে রাশি রাশি গান। বসন্তে বর্ষায় শরতে সেই সব গান কণ্ঠে কণ্ঠে কূজিত হবে। বিরহে মিলনে ত্যাগে, জীবনের যাবতীয় উপলব্ধিতে, জীবনান্তের শোকে সেই সব গান হৃদয়ের ভার লাঘব করবে।

তখনকার দিনে এ প্রকার জিজ্ঞাসা জাগবে না। কিন্তু এখনকার দিনে তো জেগেছে, অন্তত একজনের মনীষায়। এ দেশে মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য, হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য হামেশা দেখা যায়। আমরা কি আশা করতে পারিনে যে রবীন্দ্রনাথের কোনো মুসলমান শিষ্য এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে বোঝাপড়ায় সাহায্য করবেন?

পৃথিবীতে কেন, ভারতে—ভারতে কেন, বাংলাদেশে—এত কিছু জানবার আছে যে একজন মানুষ তাঁর আশি বছরব্যাপী জীবনেও অতি সামান্য জানতে পারেন। সেই যৎসামান্য জ্ঞান লেখনীমুখে জাহির করতে যাওয়া অর্বাচীনের পক্ষে অনিন্দ্য হতে পারে, কিন্তু বিবেচক ব্যক্তির পক্ষে নীরবতার চেয়েও নিন্দনীয়। আমার এক বন্ধুকে আমি একবার প্রশ্ন করেছিলুম, "আচ্ছা, তুমি ওই সব ব্রাহ্ম কিংবা ইঙ্গবঙ্গদের কাহিনী লেখ কেন? দেশে কি আর নায়ক নায়িকা নেই?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "আমি যাদের চিনি তাদের কথা নির্ভয়ে লিখতে পারি, যাদের তেমন চিনিনে তাদের কথা লিখতে সাহস হয় না।" পরে আমিও হৃদয়ঙ্গম করেছি যে লেখকের পক্ষে তার চেনা লোকদের

কথা লেখাই নিরাপদ। যাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ কম, যাদের কথা আমার শোনা কথা, তাদের কথা বুক ফুলিয়ে লিখতে গেলে এমন ভুলচুক ঘটবে যে একালের বন্ধুরা আমাকে সাধুবাদ দিলেও ভাবীকালের সমালোচকরা আমাকে একেবারে বাদ দেবেন। শরৎবাবু একবার পণ করেছিলেন যে মুসলমানদের নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখবেন। লিখলে নিশ্চয়ই একদল পাঠক তাঁকে বাহবা দিতেন, কেননা এই হিন্দু মুসলিম মনোমালিন্যের দিনে শরৎবাবুর মতো উভয় সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন সাহিত্যরথীর শব্দভেদী বাণের প্রয়োজন ছিল ও আছে। কিন্তু সাহিত্য তো সমাজসেবা নয়। সাহিত্যের নিয়ম, যা নিয়ে রসসৃষ্টি করতে পারো তাই লিখো। জেন অস্টেনের নভেল ইংরেজী সাহিত্যের গৌরব, কিন্তু চিনতেন তিনি উপরের দিকের মুষ্টিমেয় নরনারীকে। একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তাদের জীবনযাত্রা নিবদ্ধ। ইচ্ছা করলে তিনি যে বৃহত্তর সমাজের কথা লিখতে পারতেন না তা নয়, কিন্তু সে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকাই শ্রেয়। হাজার জানলেও লিখতে নেই, যদি সে জানা সুনিশ্চিত না হয়। রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের সঙ্গে সারাজীবন কাটিয়ে হয়তো তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতেন, কিন্তু কোনো বড়ো লেখকই নিজের স্বাভাবিক সীমার বাইরে পদক্ষেপ করে ভাবীকালের কাছে উপহাস্য হতে চান না। তাতে উপস্থিত কিছু তারিফ মিলতে পারে, কিন্তু আখেরে উপেক্ষা।

যে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উঠেছে সে প্রশ্ন একে একে আরো অনেকের সম্বন্ধেও উঠবে। আমাকে যদি জবাবদিহি করতে হয় আমি নিবেদন করব, যে পথে আমি নির্ভয়ে রথ চালাতে পারিনে সে পথ আমার নয়। মুসলমানদের সঙ্গে আমার আশৈশব পরিচয়, তাঁদের দোষগুণ দুইই দেখেছি, কিন্তু দুইই দেখাতে পারিনে, কারণ দেশের অবস্থা এমন যে এখানে সব জিনিসেরই বিকৃত অর্থ করা হয় এবং তার থেকে আসে অনর্থ। তাছাড়া পরিচয়ের সীমানা আরো ব্যাপক ও আত্মীয়তার অনুভূতি আরো প্রগাঢ় না হলে যেটুকু জানি সেটুকু নিজের মনে চেপে রাখাই শ্রেয়, ছেপে ছড়ানো অসমীচীন। আমরা যতদিন না পরস্পরের সুখে দুঃখে আপনার হতে পেরেছি, যতদিন আমাদের এক পক্ষের দুঃখে অপর পক্ষ সুখী ও এক পক্ষের সুখে অপর পক্ষ দুঃখী, যতদিন একই দেহের দু'খানা হাত একখানা আর-একখানার আঙুল কাটছে—ততদিন আমরা যে যার সীমার ভিতরে থেকে যথাসাধ্য রস সৃষ্টি করব। পরবর্তীকাল জিজ্ঞাসা করবে না, এ রস হিন্দু রস না মুসলিম রস। যেমন জিজ্ঞাসা করে না, এ আনারস হিন্দু আনারস না মুসলিম আনারস।

(১৯৪১)

কানাই ও বলাই

সাহিত্যিকদের মোটামুটি দু ভাগ করা যায়। এক ভাগে হিতকারী, অপর ভাগে মনোহারী। এক দলের নাম দেওয়া যাক বলাই, আর-এক দলের নাম কানাই।

কানাইদের বিরুদ্ধে বলাইদের নালিশ এ যুগের নয়। হলধরেরা বংশীধরদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে এই কথাই বলে আসছেন যে, ওরা কাজ করে না, খেলা করে। শেখায় না, ভোলায়। রোম যখন পোড়ে তখনো ওরা বাঁশি বাজায়। ওদের কাছে আগুন নেবানো তুচ্ছ, ফাগুন পোহানোই আসল।

বলরামের হলখানির ওজনটি তো কম নয়। ওখানি ঘাড়ে করে বেড়ালে ঘাম এসে যাবেই। কর্মের লক্ষণ হলো ঘর্ম। বলাইদের মতো কাজের লোক কানাইদের মতো বাজে লোকদের সহ্য করতে পারেন না। বাঁশির আর কত ওজন। এ তো ছেলেখেলা।

কিন্তু রাগটা কানুর উপরে না করে বেণুর উপরেই করা উচিত। ওজন হিসাবে হলের ওজন বেণুর চেয়ে বেশী। সুতরাং মূল্য হিসাবে হলের মূল্য বেণুর চেয়ে বেশী। অথচ বেণুর ধ্বনি যোজনভেদী হৃদয়ভেদী।

একদল লেখকের হাতে লেখনী যেন লাঙল। তাঁরা যে লাঙলের গুণগান করবেন সেটা স্বাভাবিক। আর-এক দলের হাতে সেই জিনিসই যেন বাঁশরি। তাঁরা যে তাই নিয়ে বিভোর থাকবেন এটাও স্বাভাবিক। লেখনী দেখতে একই রকম, সেইজন্যে সকলেই লেখক। কিন্তু লেখা যখন বেরোয় তখন দেখা যায় কোনোটা হলকর্ষণ, কোনোটা চিত্তাকর্ষণ। বলরামরা নিজেদের কীর্তি দেখে ফূর্তিবোধ করতে পারেন না, পরের ছিদ্র ধরেন। বাঁশির ছিদ্র আছে, তাই ছিদ্র ধরাও সোজা।

*   *   *   *   *

বলভদ্রদের বল চিরকাল বেশী। সে বল সমাজের বল। তাঁরা বিশ্বাস করেন ও করাতে চান, সবার উপরে সমাজ সত্য, তাহার উপরে নাই। তাঁরা বলেন, সমাজের ভালোমন্দই সাহিত্যের ভালোমন্দ। সাহিত্যের নিজস্ব ভালো-মন্দ নেই, সাহিত্য সমাজের শামিল।

বলাইরা তাঁদের মত নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকুন, কানাইদের তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কালের সঙ্গে বল পরীক্ষায় হলধরদের হার হয়, তাতে তাঁদের মেজাজটা যায় বিগড়ে। সেই জন্যে তাঁরা বংশীধরদের বংশ ধ্বংস করতে পারলে ঠাণ্ডা হন। ওদের প্রধান অপরাধ ওরা পলাতক। ওরা খাটে না, খায়। ওরা ফরমাস মানে না, নিরঙ্কুশ। ওরা সমাজের সঙ্গে বেখাপ।

কিন্তু কালের সঙ্গে ওদের চমৎকার খাপ খায়। কালের স্রোত কালিন্দীর স্রোতের মতো উজান বয়ে শ্রোতা হয় কানুদের বেণুর। অসামাজিক, তবু সমাজের সুপ্রিয়।

(১৯৪১ আন্দাজ)

চিঠির কথা

চিঠি পেতে আমার এখনো ভালো লাগে, কিন্তু লিখতে ?

লিখতে ভালো লাগে না বললে বাড়িয়ে বলা হয়, অথচ ভালো লাগে বলতেও বাধে। অনেক দিন থেকে শরীরে এক প্রকার ক্লান্তি বোধ করে আসছি, বোধ হয় দোষটা তার। অথবা মনের, কেননা মনেও এক প্রকার নির্লিপ্ত ভাব। এমন হুজুগ বেশী নেই যা আমাকে উসকে দিতে পারে। আর সমস্যা যা আছে তা যত সোজা ভেবেছিলুম তত নয়, সমাধান শোনাতে যাওয়া ছেলেমানুষী। এই ধরুন হিন্দু মুসলিম সমস্যা। এককালে এর জন্যে যত রক্তক্ষয় করেছি তা প্রায় রক্তপাতের সমান, সে সব চিন্তা চিতার মতো আমাকেই জ্বালিয়েছে, আর আমার প্রবন্ধ পড়ে পক্ষপাতী পাঠক-পাঠিকারা জানিয়েছেন, "এর চেয়ে একটা গল্প লিখলে পড়ে তৃপ্ত হতো।"

দেহমনের এই অবস্থায় চিঠি লিখতেও উৎসাহ পাইনে। অবশ্য যে চিঠি সরকারী বা দরকারী তার জবাব দিতে হবে, তার বাঁধা ভাষা আছে, লিখতে কষ্ট যেটুকু হয় সেটুকু মানসিক নয়, শারীরিক। সরকারী হলে তো কোনো কষ্টই নেই, স্টেনোগ্রাফার আছেন, তিনিই শারীরিক ক্লেশ থেকে বাঁচান।

কিন্তু যেসব চিঠি নেহাৎ অদরকারী তাদের বেলায় আমার হাতের চেয়ে মাথার ঝঞ্ঝাট বেশী। একদা আমি অকাতরে চিঠির তুলো উড়িয়েছি, ওই যেমন শিমুলের তুলো উড়ছে তেমনি। তখনকার দিনে সব বিষয়েই আমার একটা তৈরি মত ছিল। আইনস্টাইন থেকে শুরু করে গ্রেটা গার্বো পর্যন্ত যে কোনো মানুষের সম্বন্ধে, তত্ত্বের সম্বন্ধে দু'কথা লিখতে ভীত হতুম না, গায়ের জোরে তর্ক করতুম ও কলমের জোরে কাগজ কালো করতুম। ধৈর্যও ছিল অসীম, কেউ যদি না বুঝত আমি চিঠির পর চিঠি লিখে বোঝাতুম। সেসব দিন গেছে।

এখন যে আমার তর্কের ঝোঁক নেই তা নয়। মত জাহির করার রোগও আছে। সেদিন এক বন্ধুর সঙ্গে বারো বছর পরে দেখা হলো, যতক্ষণ একত্র ছিলুম দু'জনে তুমুল বকেছি, কেউ কাউকে ভজাতে পারিনি, সেই তো দুঃখ। কিন্তু শতং বদ, মা লিখ। সেই বন্ধু যদি চিঠি লিখতেন আমার অন্য রূপ দেখতেন। কেননা এই বারো বছরে আমি যেমন লিখতে শিখেছি তেমনি না লিখতেও শিখেছি।

আমার কোনো কোনো চিঠি বন্ধুজনের নির্বন্ধে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর থেকে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে চিঠিরও সাহিত্যিক মূল্য থাকতে পারে। তেমনি ভয়ও জেগেছে যে আমার যেসব চিঠি ছাপবার মতো করে লেখা নয়, ফুর্তি করে লেখা, সেসব চিঠিও একদিন ছাপার হরফে উঠতে পারে। এখন চিঠি লিখতে বসলে অমনি সতর্ক হই, পাছে এমন কিছু লিখি যা ছাপার হরফে ধরা পড়লে আমাকে সুদ্ধু ধরা পড়িয়ে দেবে। পাঠকরা ভাববেন, "কই, এঁর বই পড়ে যেমন মনে হয় চিঠি পড়ে তো তেমন হয় না।" এতদিনের সাধনায় আমার যে সাহিত্যিক রূপটি দেশের পাঠকদের চোখে পরিচিত হয়ে এসেছে একখানি চিঠি তাকে একদিনেই ধূলিসাৎ করতে পারে। অতএব শতং বদ মা লিখ।

তারপর আরো আপদ আছে। সাহিত্য রচনার একটি উৎকর্ষমান আছে, সেই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবার একটা প্রয়াস আছে, সে প্রয়াস তো চিঠির বেলায় স্থগিত রাখতে পারিনে। দরকারী বা সরকারী চিঠি হলে অন্য কথা, কিন্তু যে চিঠি কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা হয়েছে তা সাহিত্যের স্বজাতি, কেননা সাহিত্যও কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা। তা হলে সাহিত্যের মান চিঠির উপরও আরোপিত হয়, চিঠিও হয়ে ওঠে সাহিত্য। তফাৎ শুধু এই যে, চিঠি লেখার একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, সাহিত্যের তা নেই। অর্থাৎ প্রবন্ধ বা গল্প এক মাস পরে লিখলেও চলে, চিঠি ফেলে রাখলে চলে না। পত্রলেখকরা পত্রপাঠ উত্তর প্রত্যাশা করেন। আমি এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাইনে, এ সমস্যা হিন্দু মুসলিম সমস্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। যদি আমি রবীন্দ্রনাথ হতুম তবে যাই লিখতুম তাই হতো উৎকৃষ্ট, কিন্তু আজ যা লিখি কাল তা পছন্দ হয় না। সেইজন্যে আমার চিঠি যেদিন লেখা হয় সেদিন ডাকে না গেলে পর-দিন ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে যায়। যাঁরা আমার চিঠি পান তাঁরা জানেন না যে হয় ও চিঠি কোনোমতে ডাকঘরে গিয়ে জান বাঁচিয়েছে, নয় ওর বহু জন্ম অতীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে চিঠি হয়তো আমার মনের মতো হয়নি। কী করি, একেবারে জবাব না দিয়ে তো পারিনে।

ফল হয়েছে এই যে আমাকে চিঠি লিখলে আমি তিন মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত নিরুত্তর থাকি। এটার মূল কারণ কুঁড়েমি, কিন্তু সেই একমাত্র কারণ নয়। চিঠির যদি সাহিত্যিক মূল্য থাকে আর চিঠিতে যদি কেউ সাহিত্যের স্বাদ আশা করেন তবে তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে, উপায় নেই। দরকারী কাজ থাকলে জবাব লেখা দরকারের নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু যেখানে দরকারটা কাজের নয়, ভাবের, সেখানে মনোভাবের মর্জির উপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই। ভাবুকের চিঠি ভাবের অপেক্ষা রাখে, ভাব যদি তিন মাস আগে না আসে তবে ভাবের অভাব কি ভাষা দিয়ে পূরণ করা যায়? কিংবা মামুলি কুশলসম্ভাষণ দিয়ে?

তাই আমার চিঠিতে প্রায়ই দেখা যায়, "উত্তর দিতে দেরি হলো বলে লজ্জিত।" দেরি না হলেও লজ্জার কারণ হতো, সে লজ্জা পত্রপাঠকের কাছে না হোক নিত্যকালের পাঠকের কাছে। কে জানে কোন চিঠির দৌড় কত দূর! কোন চিঠি কবে ছাপা হবে, কার চোখে পড়বে! এমন করে লেখাই শ্রেয় যাতে লেখার দিক থেকে ত্রুটি নেই, যা রসের তুলিকায় লেখা। তার জন্যে যদি তিন বছর দেরি হয়ে যায় তবে নাচার।

কিন্তু সামাজিক মানুষের লোকভয় আছে। যিনি চিঠি লিখেছেন তিনি কেন মার্জনা করবেন! তাঁর আত্মসম্মান আছে। সসীম সময়ের মধ্যে উত্তর না পেলে তিনি ধরে নেবেন যে লোকটা ভদ্রলোক নয়, চিঠি লিখলে চিঠির জবাব দেয় না। সেই ভয়ে যাহোক একটা কিছু লিখে দিতে হয়। নইলে চিঠির পাহাড় নিয়ে আমি করি কী! এই তো ইতিমধ্যে একটি স্তূপ জড়ো হয়েছে। একদিন বসে যত পারি লিখব ও ছিঁড়ব, অন্তত জনকয়েকের কাছে ভদ্রতা বজায় থাকবে।

লিখব, "উত্তর দিতে দেরি হলো বলে মনে কিছু করবেন না।" লিখব, "আপনার চিঠি অনেকদিন আগে পেয়েছি, কিন্তু আমার শরীর মন ভালো ছিল না।" মিথ্যা নয়। তবু সত্যও নয়। সত্য হচ্ছে এই যে শিল্পী মন সজাগ থাকে না সব দিন। যেদিন জাগে সেদিন হয়ত তিন মাস বিলম্ব হয়ে গেছে। সে মন ভদ্রলোকের মন নয়, তাই ভদ্রলোক তার জন্যে লজ্জিত।

হাঁ, চিঠি পেতে আমার এখনো ভালো লাগে, মনের সঙ্গে মনের ছোঁয়াছুঁয়ি এখনো মধুর। এমন কি ঠোকাঠুকিও আমার মন্দ লাগে না। আমি মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত হতে দিইনে, অতটা self-righteousness আমার সাজে না। কিন্তু চিঠি লিখতে বসলে আমি হয় ভদ্রলোক, নয় ভাবুক। ধরাছোঁয়া দিতে সাহস হয় না, ফুর্তি করে লেখা বন্ধ। এর জন্যে দায়ী আমার সাহিত্যিক খ্যাতি, এ হচ্ছে খ্যাতির খেসারৎ! ছাপাখানার ভয়ে আমি আড়ষ্ট।

(১৯৪১)

জবাবদিহি

মানুষের মন তার শরীরের অধীন নয়, এ আমি চিরদিন মানি, চিরদিন মানব। আশি বছর বয়সেও রবীন্দ্রনাথ তরুণ ছিলেন, মনে-প্রাণে তরুণ। কিন্তু সম্প্রতি আমি আবিষ্কার করেছি যে মানুষের শরীর তার মনের অধীন নয়। মন বলছে লিখতে। লিখতে বসলুম ফুর্তি করে। লেখা চলল জোর কদমে। হঠাৎ দেখি শরীর অবাধ্য। ওকে বসতে বললে শুতে চায়। শুতে না দিলে এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসে যে ডাক্তার ডাকতে হয়। ডাক্তারের কী কড়া হুকুম! শুয়ে শুয়ে চিন্তা করব তাও বারণ। হিটলার আর যাই করুক চিন্তা করতে বারণ করেনি। ডাক্তারের কী দোষ! ডাক্তারের ওয়ার্নিং তো নেচারের ওয়ার্নিং। ঝগড়া যদি করতে হয় তো প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে।

দিব্যকর্ণে শুনতে পাই প্রকৃতিঠাকরুন বলছেন, তুমি কি মনে করেছ মোমবাতির দু'দিক থেকে পোড়ালেও মোমবাতি টিকবে? হয় চাকরিতে ইস্তফা দাও, নয় সাহিত্যে ইস্তফা। নয়তো অকালে দেহত্যাগ করবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো।

এর উত্তরে বলি, তার মানে কী দাঁড়ায় ভেবে দেখেছ, দেবী? হয় অন্ন ছাড়ো, নয় অমৃত ছাড়ো। অন্ন যদি ছাড়ি তো প্রাণে বাঁচব না, অমৃত ছেড়ে বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু তেমন করে বাঁচতে আমার স্পৃহা হয় না।

দেবী বলেন, শরৎচন্দ্র একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন, জীবনে তাঁকে আর চাকরি করতে হয়নি। সাহিত্যই তাঁকে খাইয়েছে, পরিয়েছে, বাড়ি করে দিয়েছে, বাঁচিয়ে রেখেছে, অমর করেছে। তাঁর ছিল নিজের উপর জ্বলন্ত বিশ্বাস, তোমার তা নিবে গেছে। তাই তুমি দু'বেলা চাকরি করে যাচ্ছ।

আমি বলি, থাক, তুমি ওসব বুঝবে না। আমার যা দেবার আছে আমি তা দিয়ে যাবই, যেমন করে হোক। এ সংকল্প ইস্পাতের চেয়ে দৃঢ়। কিন্তু

তুমি যদি দয়া না কর তো আমাকে আমার এ জন্মের কাজ অসমাপ্ত রেখে যেতে হবে, আবার জন্মাতে হবে শুধু সেই কাজটি সারা করতে। দেবী, দয়া কর।

দেবী দয়া করেন এই শর্তে যে চাকরি ও সাহিত্য ছাড়া তৃতীয় কোনো কাজে আমি হস্তক্ষেপ করব না। এতদিন কত রকম কাজে অকাজে মোড়লি ও মাতব্বরি করেছি। এই যেমন দেশ উদ্ধার, সমাজ ভাঙাগড়া, হিন্দু মুসলমানে মিতালি, কমিউনিস্ট ক্যাপিটালিস্ট সংঘাত। মোমবাতি দু'দিক থেকে পুড়ছে—পুড়বে, কিন্তু তিন দিক থেকে নয়। দু'দিক থেকেও আর বেশী দিন না পোড়ে সে কথাও ভাবছি।

এই কি আমার সব কথা? না, আরো আছে। যোগীরা চুপচাপ এক জায়গায় বসে পরমাত্মার ধ্যান করেন, সেই ভাবেই তাঁর সঙ্গে যোগস্থাপন করেন, যুক্ত হন। আমরা সাহিত্যিকরাও যোগী। কিন্তু আমাদের যোগ সকলের সঙ্গে সুখে দুঃখে একাত্ম হয়ে। সকলের মধ্যেই তিনি আছেন, তাই সকলের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়া, যুক্ত হওয়া। সেইজন্যে আমি কখনো মেলামেশার সুযোগ হাতছাড়া করিনে। সম্মেলন তো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন। সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পেলে যাব না কেন? যাব, যদি শরীরের বাধা না থাকে। কিন্তু বাংলায় ও বাংলার বাইরে কয়েকবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে দেখেছি মেলামেশার সুযোগ ধরতে গেলে মেলে না। উদ্যোক্তারা প্রোগ্রামের মধ্যে কোথাও এতটুকু অবকাশ রাখেন না যে সাহিত্যিকদের নিয়ে ঘরোয়া ধরনের বৈঠক বসবে। দশ হাজার লোকের জনতায় দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনের সাহায্যে মুখের কথা বলা যায়, কিন্তু মনের কথা বলতে হলে দশ হাজার নয় বিশ জন দরদী শ্রোতা চাই এবং তাঁরা শুধু শ্রোতা নন, জিজ্ঞাসু। তাঁরা প্রশ্ন করবেন, তর্ক করবেন, নিজেদের মনের কথা জানাবেন। এরই নাম মেলামেশা। তা নয়, একজন বকে যাবে, আর সবাই শুনে যাবেন! এর জন্যে এত কষ্ট করে মীরাট যাবার দরকার দেখিনে। আমার কণ্ঠস্বরে এমন কোনো যাদু নেই যে আমার কণ্ঠস্বরই আপনাদের শুনতে হবে এবং রূপও আমার এমন নয় যে আধ ঘণ্টা চেয়ে দেখবার মতো। লেখকের কণ্ঠস্বর তার লেখার মধ্যেই নিহিত থাকে, রূপ থাকে লেখার সর্বাঙ্গে আঁকা। লেখা যদি পড়েন তো লেখকের সত্যিকার রূপ ও সত্যিকার কণ্ঠস্বর পাবেন। তার বেশী পাওয়া যায় আড়ালে আবডালে। লেখক যেখানে মন খোলে। সভামঞ্চে নয়, ঘরোয়া বৈঠকে।

না, ঘরোয়া বৈঠকেও নয়, আরো অন্তরালে। মনে করুন বাংলাদেশ আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে, জেলায় জেলায় যেখানে যত মেলা ছিল সব আবার বেঁচে উঠেছে। বাউল বৈষ্ণব কবিওয়ালাদের মতো ঔপন্যাসিক গল্পরচয়িতা প্রবন্ধকার ও কবিরা যাচ্ছেন সেসব মেলায় মেলামেশা করতে। এক প্রান্তে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে গাছতলায় বসে হুঁকো টানছি ও আলাপ করছি, ভোজনের জন্যে সিধা নিয়ে এলেন আপনারা দশজন অনুরক্ত বা অনুসন্ধিৎসু, মেয়েরা রান্নার আয়োজন করলেন, ইত্যবসরে আমরা সাহিত্যচর্চায় মগ্ন হলুম। তারই নাম সাহিত্যসম্মেলন, এর নাম নয়। সাহিত্যের মধ্যে একটা সহিতের ভাব আছে।

আমার সহিত আপনি, আপনার সহিত আমি, তবেই আমাদের সাহিত্য। লেখকের সহিত পাঠকের সাহিত্য ঠিকমতো ঘটছে না বলে আমাদের সাহিত্য আমাদের তৃপ্তি দিচ্ছে না। সাহিত্যের বিরুদ্ধে নালিশ শুনছি প্রত্যেক সভায়, পড়ছি প্রত্যেক পত্রিকায়। যদি আমাদের মেলামেশার জন্যে মেলা বসত সাহিত্যের নবযুগ আসত। আমার নিজের বিশ্বাস, "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন আসিবে সেদিন আসিবে"।

সাহিত্যের নবযুগ সম্বন্ধে আমার ধারণা আগে অস্পষ্ট ছিল, এখন ক্রমে দানা বাঁধছে। সাহিত্য হবে লক্ষ লক্ষ লোকের, কোটি কোটি লোকের সাহিত্য। সকলে সকলের সঙ্গে মিশবে, সকলের সুখ দুঃখের সাথী হবে, সকলে সকলের সঙ্গে একাত্ম হবে, সেই অর্থে যোগী হবে। সকলে তো লিখতে পারে না, যাদের ক্ষমতা আছে তারাই সকলের হয়ে লিখবে। সে লেখা তাদের হাত দিয়ে সকলের লেখা। সকলে তা পড়বে, পড়ে বলবে, "হাঁ, ঠিক হয়েছে, এই কথাই আমরা বলতে চেয়েছিলুম।" কিংবা বলবে, "না, ঠিক হয়নি। তুমি আবার চেষ্টা কর। হয়তো এবার পারবে।" একালে যেমন সমালোচকরা লেখককে নিরুৎসাহ করেন সেকালে তেমন করতেন না। বলতেন, "হাঁ, তোমার হাত আছে, কিন্তু এ হাত দিয়ে তুমি সকলের লেখা লিখছ কি ? নিজেকে জিজ্ঞাসা কর। সকলকে জিজ্ঞাসা কর। নিজেই বুঝতে পারবে কোথায় তোমার লেখার দুর্বলতা। দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠ, কবি। চেষ্টা কর। বার বার চেষ্টা কর।"

কে জানে হয়তো এসব আর্ট ফর্ম বদলে যাবে। নতুন আর্ট ফর্ম আপনি তৈরি হবে। আর্ট ফর্ম নিয়ে আমি বৃথা ভাবিনে। আর্টের অন্তঃসার নিয়েই আমার ভাবনা। মানবমানবীর চিরন্তন সুখদুঃখই আর্টের অন্তঃসার, সাহিত্যের রস। এর কোনো পরিবর্তন নেই। এ বস্তু আজ যেমন আছে কাল তেমনি থাকবে। তা যদি না হতো কবেকার কোন জনক-তনয়ার জন্যে আজও আমরা চোখের জল ফেলতুম না। পাঞ্চালীর অপমান গায়ে পেতে নিয়ে কৌরবদের অভিশাপ দিতুম না ধ্বংস হতে, নির্বংশ হতে। সাহিত্যের রস অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এক যুগের সাহিত্য আর-এক যুগের সাহিত্যের থেকে ভিন্ন। কারণ এক যুগের জীবনস্রোত আর-এক যুগের জীবনস্রোতের থেকে ভিন্ন।

এ যুগে জীবনস্রোত ও জনস্রোত একাকার হয়ে গেছে। আমরা যেন একথা না ভুলি। বেড়াগুলো এক এক করে ভেঙে যাচ্ছে, মানুষের থেকে মানুষকে আলাদা করে রাখা যাচ্ছে না। এই যুদ্ধে আমরা তার নমুনা দেখলুম। এর পরে চরম দেখব। কিন্তু তার থেকে হয়তো এক উল্টো বিপত্তির উৎপত্তি হবে। মানুষ মনে করবে ব্যক্তি কিছু নয়, সমষ্টিই সব। লেখক যেন শুধু একখানা হাত, তার যেন ব্যক্তিসত্তা নেই। সে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো লিপিবদ্ধ করবার জন্যেই হয়েছে। তার রচনা যেন নৈর্ব্যক্তিক।

এসব কথা এক দিন জোর গলায় শোনা যাবে, কিন্তু এখন থেকেই মিহি গলায় শোনা যাচ্ছে। সমষ্টির সলিলে অবগাহন করলেও লেখক তার ব্যক্তিসত্তা হারায় না, হারাতে পারে না, যদি হারায় তো সে তার সর্বস্ব হারায়, এটা

জানিয়ে রাখা ভালো। সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মস্থ হতে চাই। লেখক হবে আত্মস্থ পুরুষ, মুক্ত পুরুষ। সকলের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু সর্বতোভাবে মুক্ত। রচনা হবে জীবনরসে জীবন্ত, যৌবনজ্বালায় জ্বলন্ত, শাশ্বত সত্যে অমৃতময়। একাধারে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত। সকলের হৃদয়, আমার হাত, সকলের অনুভূতি, আমার লেখনী, সকলের ব্যাকুলতা, আমার কণ্ঠস্বর, সকলের কল্পনা, আমার রূপ। কিন্তু সকলে যেমন অস্তিত্ববান আমিও তেমনি অস্তিত্ববান। সকলের মধ্যে আমি, আমার মধ্যে সকলে।

(১৯৪৫)

রম্যা রলাঁ

রম্যা রলাঁ দেশকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, এইখানে তাঁর জিত। কালকে অতিক্রম করতে পারেননি, এইখানে তাঁর হার।

এ হার তাঁর একার নয়, একজন কি দুজন বাদে আর সকলের। অথচ এ জিত তাঁর মতো একজন কি দুজনের। আমরা আজ বিজেতাকে অভিনন্দন জানাব, কিন্তু বিজিতকেও সমবেদনা জানাতে ভুলব না। আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এমন নিগূঢ় যে হয়তো আমাদের আনন্দ-বেদনা মৃত্যুর পরপারে তাঁর কাছে পৌঁছবে।

আঠারো-ঊনিশ বছর বয়সে তাঁর 'জন ক্রিস্টোফার' আমার হৃদয় হরণ করেছিল। 'পীপ্‌ল্‌স্ থিয়েটার' আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইচ্ছা করত, জন ক্রিস্টোফারের মতো বাঁচতে, জনসাধারণের জন্যে সৃষ্টি করতে। জানতুম যে, জনসাধারণ আমাকে বুঝবে না, ক্রিস্টোফারকেও বুঝল না, সেইজন্যে আগে থাকতে শোক করতুম। শোক করতুম আর সুখী হতুম এই ভেবে যে, আমি সেই স্বল্পসংখ্যক দুঃখীজনের একজন যাদের কেউ বুঝবে না, অথচ যারা সকলের জন্যে সর্বস্ব দিয়ে গেছে। যখন বুঝবে তখন আর খুঁজে পাবে না, তার আগে আমরা জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ।

এই যে 'elite' বা স্বল্পসংখ্যকের মোহ এ মোহ আমার অনেক দিন পর্যন্ত ছিল, এখনো পুরোপুরি যায়নি। কিন্তু রলাঁ তাঁর এ মোহ শেষ বয়সে কাটিয়ে উঠেছিলেন। যদি কেউ কোনো দিন তাঁর জীবনচরিত হৃদয় দিয়ে লেখেন তা হলে দেখাবেন, এইটুকুর জন্যে তাঁকে কী অমানবিক দুঃখ পেতে হয়েছিল। নিজেকে বহুসংখ্যকের একজন ভাবা শুনতে যত সহজ আসলে তত নয়। যাঁদের এক ছটাক প্রতিভা আছে তাঁরাও এক-একটি কেষ্ট-বিষ্টু। রলাঁর মতো দুর্লভ প্রতিভার অধিকারীর পক্ষে নোবেল প্রাইজের সিংহাসন থেকে নেমে চাষী মজুরের সঙ্গে কাঁধ মেলানো ইতিহাসে অপূর্ব। সতেরো বছরের অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে তিনি তাঁর জীবনের মূল সমস্যার মীমাংসায় পৌঁছেছিলেন।

তাঁর জীবনের মূল সমস্যা বলেছি। বলা উচিত ছিল, তাঁর সাহিত্যিক বা শিল্পী-জীবনের। এ ছাড়া তাঁর আরো একটা জীবন ছিল, নৈতিক বা

আধ্যাত্মিক জীবন। তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিবেক। টলস্টয়ের পরে ইউরোপের বিবেক ছিলেন তিনি এবং বার্নার্ড শ। বিবেকের সঙ্গে আপোস দুজনের মধ্যে একজনও করেন নি। কিন্তু শ'র বিবেকের চেয়ে রলাঁর বিবেক নির্ভরযোগ্য। গত মহাযুদ্ধে এর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।

তার পর থেকে ইউরোপের বিবেকীদের দৃষ্টি শ'র প্রতি তেমন নয়, রলাঁর প্রতি যেমন। কিন্তু এবারকার এই মহত্তর যুদ্ধে দেখা গেল, রলাঁর বিবেকও অনির্ভরযোগ্য। বেঁচে থাকলে তিনি আর বিবেকীদের দৃষ্টিপথে পড়তেন না। সে দৃষ্টি পড়ছে অলডাস হাকস্‌লি প্রভৃতির উপর। যদিও এঁরা কেউ রলাঁর মতো, শ'র মতো, বিরাট পুরুষ নন। এইখানেই তাঁর ট্র্যাজেডী।

কিন্তু এর উপর তাঁর হাত ছিল না। এ ট্র্যাজেডী অনিবার্য। তাঁর জীবন আলোচনা করে আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি কেন সেবারকার যুদ্ধে যোগ দেননি, কেন এবারকার যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছেন। কারণটা রাজনৈতিক বললে কিছুই বলা হয় না, কারণটা তাঁর স্বভাবের মধ্যে নিহিত। ওটা তাঁর নিয়তির নির্দেশ। বিবেক হেরে গেছে নিয়তির হাতে। তাঁর দোষ নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীদের দেশে যে বিপ্লব ঘটে তার স্মৃতি ফরাসীমাত্রেরই মনোজীবনের অঙ্গ। এমন দিন নেই যেদিন তাদের মনে পড়ে না বিপ্লবী জনতার সুকৃতি বা দুষ্কৃতি, বিপ্লবী নেতাদের উদয় বা অস্ত। তার পরেও আরো কয়েকবার বিপ্লব ঘটে গেছে সে দেশে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের আঠারো বছর পরে রলাঁর জন্ম। তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন আরো এক বার বিপ্লব বাধে, কিন্তু ইতিহাসে তাকে বিপ্লব বলে গণ্য করা হয় না। বলা হয়, কমুনার্দ বিদ্রোহ। রলাঁর মনোজগতে এইসব বিপ্লব বা বিদ্রোহের জের চলছিল জন্মকাল থেকে।

কিন্তু যাদের মাঝখানে তিনি মানুষ তারা মধ্যবিত্ত বা বুদ্ধিজীবী, তাদের স্বার্থ প্রথমবারের বিপ্লবেই সাধিত হয়েছে, দ্বিতীয়বারের অপেক্ষা রাখেনি। দ্বিতীয়বারের বিপ্লবে তাদের যেটুকু সহানুভূতি ছিল তৃতীয়বারের বেলা সেটুকুও রইল না। কমুনার্দ বিদ্রোহে তো তাদের সহানুভূতির বদলে অবজ্ঞার ভাব ছিল। মধ্যবিত্তরা বিপ্লবের নেতৃত্ব করা দূরে থাক, বিপ্লবকে হাড়ে হাড়ে ভয় করত। আবার বিপ্লব বাধবে, এতে তাদের অন্তরের সায় ছিল না। তবে তারা ভালো করেই বুঝত যে, জনসাধারণকে যদি তাতিয়ে কিংবা মাতিয়ে রাখা না যায় ওরা বিপ্লবের কথা ভাববে। সেইজন্যে জার্মানীর সঙ্গে আবার কবে যুদ্ধ বাধবে, এবার ফ্রান্স জিতবে, এই ছিল তাদের নিত্যকার জল্পনা। আর ছিল আমোদপ্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা। অন্তহীন মত্ততা। এবং তপ্ততা।

রলাঁ মানুষ হন এই আবহাওয়ায়। তিনিও মধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী। স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে যুদ্ধবিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়সুখ এই তো জীবনের লক্ষ্য। এর জন্যে যত পারো টাকা কামাও, যেমন করে পারো—ছলে বলে কৌশলে। তখনকার দিনের নৈতিক আদর্শ এর উপরে উঠত না। কিন্তু অতি অল্প বয়স থেকে রলাঁর তাতে বিরাগ আসে। দ্বিতীয়ত, তিনি যখন স্কুলের

ছাত্র তখন থেকে টলস্টয়ের শিষ্য। যাকে বলে জীবনের সাফল্য তার চরমে উপনীত হয়েও টলস্টয়ের তৃপ্তি হলো না, তিনি একে একে সব ত্যাগ করলেন— যা কিছু অর্থকরী, যা কিছু অনর্থকারী। কী করে মানুষকে ভালোবাসবেন, মানুষের সেবা করবেন—সব মানুষের, দীনহীন মানুষের, এই চিন্তায় টলস্টয় বিভোর। এমন সময় রলাঁর চিঠি, অজানা অচেনা তরুণের চিঠি, তাঁর হাতে পৌঁছয়। নগণ্য একটি তরুণকে "প্রিয় ভ্রাতা" বলে সম্বোধন করে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন সে উত্তর দু কথায় দায়সারা গোছের নয়। এই তরুণটি যেন তাঁর উত্তরাধিকারী, উত্তরাধীকারীকে সমস্ত জানাতে ও বোঝাতে হয়, তাই তিনি তাঁকে প্রকাণ্ড একখানি পত্র লিখেছিলেন। এইভাবে রলাঁর মন্ত্রদীক্ষা হলো।

স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি ইটালী যান, সেখানে দু'বছর কাটান। এক হিসাবে তাঁর শিক্ষানবিশী শেষ হয়েছিল স্বদেশেই। শিক্ষানবিশীর পরে এক বছর দেশভ্রমণের রীতি ইউরোপের সনাতন প্রথা। রলাঁর ভ্রমণকাল কাটল ইটালীর রোম প্রভৃতি অঞ্চলে। সেখানে তাঁর আলাপ হলো এক বর্ষীয়সী জার্মান মহিলার সঙ্গে, নাম মালভিডা ফন মাইজেন্‌বুগ। ইনি গ্যেটের সময়কার মানুষ। ভাগ্‌নার, নীট্‌শে, মাৎসিনি, গারিবল্‌ডি, ইব্‌সেন প্রভৃতির অন্তরঙ্গ বন্ধু। রলাঁকে দেখে ইনি চিনতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তরবাসীকে। দুজনেই আদর্শ-বাদী, যে আদর্শ মরজগতে মহত্তম সেই আদর্শ দুজনের। মালভিডা তাঁকে আত্মপ্রত্যয় দিলেন, অস্তগামী তারা যেন সূর্যকে দেয়। রলাঁ যখন রোম থেকে ফিরলেন তখন তিনি আদর্শনিষ্ঠ হতে কৃতসংকল্প। তখন আর তাঁকে মধ্যবিত্ত বলে ভুল করা যায় না। যাঁদের সে ভুল ছিল তাঁদের ভুল ভাঙতে দেরি হলো না। একজন তাঁকে বিয়ে করলেন ও বিয়ের অল্পকাল পরে আলাদা হলেন।

উপরে যাকে স্কুল বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে কলেজ। রলাঁ হলেন সেখান-কার অধ্যাপক। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের, অধ্যাপক হন। পরবর্তী বয়সে তিনি পদত্যাগ করেন। লেখা থেকে যা পেতেন তাতেই তাঁর চলত। সারাজীবন সামান্য খরচে চালিয়েছেন।

ইটালী থেকে ফেরার পরে তিনি যখন সাহিত্যে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর প্রিয় বিষয় হলো বিপ্লব ও প্রিয় বিভাগ হলো নাটক। জনগণের নাট্যশালা বলে তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল। সাধারণ রঙ্গালয় তো আমোদপ্রমোদের দোকান। তার জন্যে নাটক লেখা মানে দোকানদারি। যাতে দু'পয়সা হবে না তেমন কোনো নাটক কেউ অভিনয় করবে না। আর অভিনয় করলেও কেউ পয়সা দিয়ে দেখবে না। অথচ নাটকের মতো সার্বজনীন অভিজ্ঞতাকে আমোদপ্রমোদের আধার করে তাই দিয়ে বণিকবৃত্তি সম্পাদন যে ঘোর অসভ্যতা ও অনীতি। গ্রীকদের নাট্যশালা গির্জার মতো মন্দিরের মতো ধনগন্ধহীন ছিল। ফরাসীদের নাট্যশালাও তাই হবে। তার জন্য তিনি লিখতে লাগলেন বিপ্লবের কাহিনী। বিপ্লবের ও ন্যায়নিষ্ঠতার। কিন্তু লিখলে কী হবে। বিপ্লবের প্রতি মধ্যবিত্তদের মনোভাব প্রসন্ন নয়, তাদের হাতেই কলকাটি। তাতে জল মেশাতে রলাঁ রাজি

নন। সব চেয়ে দুঃখের কথা, জনগণ উদাসীন। হাড়ভাঙা খাটুনির পরে তারা চায় একটু রঙ্গ, একটু বিস্মৃতি। রলাঁ তা দিতে অক্ষম।

এর পরে তিনি নাটক লেখায় ক্ষান্তি দিয়ে জীবনচরিত ও উপন্যাস রচনায় মন দিলেন। এসব জনগণের জন্যে নয়। এগুলিতে বিপ্লবের কথা ছিল না, তবে বিদ্রোহের কথা ছিল। তাঁর মনের তার বিপ্লবের না হোক বিদ্রোহের সুরে বাঁধা প্রথম থেকেই। কিন্তু যুদ্ধের উপর তাঁর আন্তরিক বিরাগ। যুদ্ধ বলতে ফরাসীর কাছে বোঝায় জার্মানের সঙ্গে যুদ্ধ। জার্মান মানে মাল্ ভিডা ফন মাইজেন্‌বুগ, জার্মান মানে বেঠোফেন। সংগীতের প্রতি তার আকর্ষণ আশৈশব। তিনি বোধ হয় মনে মনে চেয়েছিলেন সংগীতশিল্পী হতে, ঘটনাচক্রে হয়ে দাঁড়ালেন সংগীতসমালোচক ও সাহিত্যিক। সংগীত ভালোবাসতেন বলে সংগীতনায়কদেরও ভালোবাসতেন। তাঁদের মধ্যে বেঠোফেনকেই ভালোবাসতেন সকলের চেয়ে বেশী। বেঠোফেন ছিলেন তাঁরই মতো বিপ্লবী বা বিদ্রোহী। সেই বেঠোফেনের স্বজাতির বিরুদ্ধে অসিধারণ? রলাঁর জন ক্রিস্টোফারও জার্মান। জন ক্রিস্টোফার-এর স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ? কখনো নয়। যুদ্ধ যদি আর কারো বিরুদ্ধে হতো তা হলে হয়তো কথা ছিল। কিন্তু আর কারো বিরুদ্ধে হলেও তিনি যুদ্ধবিরোধী হতেন। কারণ তাঁর হৃদয়টা আন্তর্জাতিক। তিনি জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন না। সেইজন্যে তাঁর পক্ষে কঠিন হতো যে-কোনো জাতির বিরুদ্ধে খড়্গধারণ।

অথচ তিনি যে ঠিক অহিংসাবাদী ছিলেন তা নয়। তা যদি হতেন বিপ্লবের কথা ভাবতেন না। বিপ্লব কি কোনো দিন বিনা রক্তপাতে হয়েছে? না। তিনি তা জানতেন। সেইজন্যে তাঁকে অহিংসক বলে ধরে নেওয়া যায় না। কিন্তু টলস্টয়ের প্রভাবে তিনি অহিংসার প্রয়োজন মানতেন। বিপ্লব বা বিদ্রোহ ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যদি অহিংসভাবে সিদ্ধ হয় তো অহিংসাই শ্রেয়, যদি না হয় তো হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। উপায়কে উদ্দেশ্যের উপরে স্থান দিলে চলবে না। এটা যে কেবল তাঁর শেষ বয়সের যুক্তি তা নয়, এ যুক্তি বরাবরই তাঁর মনের তলে প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু একবার যদি এ যুক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তো যুদ্ধবিগ্রহেরও সমর্থন করা হয়। যুদ্ধবিগ্রহকে সমর্থন করলে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধে। বেঠোফেনের বিরুদ্ধে, মাইকেল এঞ্জেলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ? ক্রিস্টোফার-এর বিরুদ্ধে, গ্রাৎসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? অসম্ভব।

গত মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে রাশিয়ায় যখন বিপ্লব ঘটে তখন রলাঁ পড়লেন দোটানায়। বিপ্লবী তিনি, তাঁর তো আনন্দে উদ্‌বাহু হওয়া উচিত। লেনিন নাকি তাঁকে সহযাত্রী হতে সেধেছিলেন সুইটজারল্যাণ্ড থেকে রুশ দেশে। তিনি গেলেন না। বিপ্লব হলেই প্রতিবিপ্লব হবে, উভয় পক্ষে হাতাহাতি বেধে যাবে, তার মানে গৃহযুদ্ধ। তাই হলো রাশিয়ায়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যিনি সুইটজারল্যাণ্ড থেকে প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন তিনি কেমন করে গৃহযুদ্ধের পোষকতা করতেন? অসংগতির অপবাদ রটত। তবে এ কথাও ঠিক যে, তিনি

রক্তপাতে কাতর ছিলেন। ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধজনিত যে ভয়াবহ রক্তপাত ও তদ্‌জনিত শোকতাপ ইউরোপের বক্ষ ব্যাকুল করেছিল রলাঁর বুকে বাজছিল, সেই ব্যাকুল ব্যথা। এর উপর আবার বিপ্লব! তিনি প্রস্তুত ছিলেন না তার জন্যে।

মহাযুদ্ধের পরেও বহুকাল যাবৎ প্রস্তুত ছিলেন না। বিপ্লব যে মন্দ, এ যুক্তি তাঁর নয়। তাঁর যুক্তি, বিপ্লবের পদ্ধতি মন্দ। উদ্দেশ্য মন্দ নয়, উপায় মন্দ। বারবুস্‌কে লিখেছিলেন,

> "I wrote in *Clerambault* (and I am more than ever of that opinion): It is not true that the end justifies the means. The means are ever more important for true progress than the end. ..For the end (so rarely reached and always incompletely) but modifies the external relation, between men. The means, howevcr, shape the mind of men according either to the rhythm of justice or to the rhythm of violence."

কিন্তু উপায়ের উপর এতটা জোর দিলে প্রকারান্তরে বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করা হয়, কারণ ইতিহাসে এমন বিপ্লব কোথায় যাতে উপায়ের শুদ্ধিরক্ষা হয়েছে? এই স্বতোবিরোধ রলাঁকে নিষ্ফল করত যদি না তিনি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করতেন গান্ধীকে। গান্ধীও বিদ্রোহী জননায়ক, অথচ তাঁর উপায় অশুদ্ধ নয়। রলাঁর মন যা চায় তিনি তাই, তিনিই সেই বিপ্লবী যাঁর যুক্তি বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করে না। গান্ধীকে রলাঁ ইউরোপের বিপ্লবী মহলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু ইউরোপের বিপ্লবীদের সম্মুখে তখন জরুরি প্রশ্ন: সোভিয়েট রাশিয়া যদি বিপন্ন হয় তা হলে কি উপায়ের কথা ভেবে সময় নষ্ট করা উচিত? রলাঁর গান্ধীচরিত এ প্রশ্নের উত্তর নয়। রলাঁ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত উপায়ের অশুদ্ধতা মেনে নিয়েছিলেন।

ভালো হোক মন্দ হোক এতকাল পরে একটা বিপ্লব ঘটেছে, তার ফলে জনসাধারণের অধিকার ও ক্ষমতা বেড়ে গেছে, এটা তো স্পষ্ট। কথা হচ্ছে, তার দুর্দিনে তাকে বাঁচাতে হলে হিংসার আশ্রয় নেওয়া চলবে কি না? রলাঁ বললেন, চলবে। যদি সোভিয়েটকে নিয়ে যুদ্ধ বাধে তা হলে যুদ্ধে যোগদান চলবে কি না? রলাঁ বললেন, চলবে। এমনি করে তিনি যুদ্ধবিরোধী থেকে যুদ্ধসমর্থক হয়ে উঠলেন। কিন্তু এর জন্যে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের সীমা ছিল না। জার্মানীর সঙ্গে ইটালীর সঙ্গে যুঝতে হলো ফ্রান্সকে। বেঠোফেনের সঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে তাঁকে। কী প্রগাঢ় বেদনা! এ যেন নিজের হাতে নিজের পাঁজর ভাঙা।

খানিকটা আত্মপ্রতারণাও ছিল। রলাঁ মনে করেছিলেন, সময়মতো হস্তক্ষেপ করলে যুদ্ধ বাধবেই না। 'য়্যাক্‌শন্' 'য়্যাক্‌শন্' বলে তিনি যখন হাঁক ছাড়তেন তখন এই কথাটাই বোঝাতে চাইতেন যে, সময় থাকতে চেষ্টা করলে যুদ্ধ বন্ধ হবে। আমাদের অনেকেরই সেই ধারণা ছিল। হিটলারকে উঠতে না দিলে কি

এত বড়ো যুদ্ধ বাধত ? মুসোলিনিকে বাড়তে না দিলে কি হিটলারকে হারানো এত শক্ত হতো ? রলাঁর যুক্তি এক হিসাবে যুদ্ধবিরোধীরই যুক্তি। কিন্তু আমরা যেমন ছেলেমানুষ ছিলুম তিনিও তেমনি শিশু ভোলানাথ। জানতেন না যে, সরষের ভিতর ভূত থাকে।

লাভের মধ্যে হলো এই যে, রলাঁর নৈতিক উচ্চতা টলস্টয়ের ধারেকাছেও রইল না। গান্ধীর কাছে তো নয়ই। নিয়তি।

তবে রলাঁ ছিলেন স্বভাবশিল্পী, সুযোগ পেলেই পিআনো নিয়ে বসতেন, বেঠোফেন বাজাতেন। নাটক বা উপন্যাস লিখতেন। লিখতেন সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধ। মহাপুরুষদের জীবনদ্বন্দ্ব। জীবনছন্দ। তাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরিত একপ্রকার শিল্পকাজ। ও বই লিখে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার বা বিপ্লবী ইউরোপের জিজ্ঞাসা দূর করেননি। ভারতের আত্মার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন ইউরোপের আত্মার। সাধনার সঙ্গে সাধনার। আবিষ্কার করে আনন্দিত হয়েছেন যে, বাইরে আমাদের দূরত্ব যত হোক অন্তরে আমরা নিকট। এই আবিষ্কার তাঁকে শান্তি দিয়েছে শেষ বয়সের চরম অশান্তির মাঝে। বল দিয়েছেও।

সাহিত্য হিসাবে তাঁর জীবনবৃত্তগুলির মূল্য কত জানিনে। তাঁর নাটক বেশী পড়িনি, মূল্য আমার অজানা। দুখানি উপন্যাস পড়েছি—'জন ক্রিস্টোফার' ও 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা'। দ্বিতীয়টি শেষ করিনি। যতদূর পড়েছি তার উপর নির্ভর করে বলতে পারি প্রথমটির সমান হয়নি, কিন্তু তার চেয়েও গভীর হয়েছে। রসঘন হয়েছে। হয়েছে মর্মন্তুদ।

উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকারের মনে একই জিজ্ঞাসা। কেমন করে বাঁচব ? একই উত্তর, মিথ্যার সঙ্গে আপোস করব না, সত্য করে বাঁচব। এর দরুন যদি দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ পাব, এড়াব না। জীবনে বহু দুঃখ আছে, তা জেনেও জীবনকে ভালোবাসব। সেই তো বীরত্ব। মর্ত্যলোকে একমাত্র বীরত্ব।

ক্রিস্টোফার ও আনেৎ, দুই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা, উভয়েই অসুখী। তাদের সুখী করার জন্যে তাদের স্রষ্টার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই। কিন্তু যাতে তারা খাঁটি থাকে, পোড়খাওয়া সোনার মতো খাঁটি, সৃষ্টিকর্তার সমস্তক্ষণ লক্ষ্য। সাংসারিক অর্থে তারা সাধু বা সাধ্বী নয়, কিন্তু উচ্চতর অর্থে তারা শুদ্ধ, তারা নির্মল। পিউরিটি বলতে কী বোঝানো উচিত তার একজোড়া নতুন উদাহরণ দিয়ে গেলেন রলাঁ। হয়তো শুধু এইজন্যেই তাঁকে এ দুটি মহাভারত রামায়ণ লিখতে হয়েছিল এতকাল ধরে।

মহাভারত-রামায়ণের সঙ্গে এ দুটি এপিক উপন্যাসের তুলনা করছি আর এক কারণে। উভয়েরই অন্তরালে রয়েছে দুই প্রলয়ংকর যুদ্ধ। ভাবী যুদ্ধের ছায়া পড়েছে 'জন ক্রিস্টোফার'এর উপরে। 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা'র উপর ভূত ভবিষ্যৎ উভয় যুদ্ধের ছায়া। সুতরাং পরোক্ষ ভাবে এ দুখানি যুদ্ধকাব্য। উচ্চাঙ্গের কি না, স্মরণীয় কি না, সে বিচার মহাকাল করবে।

আমাদের কারো কারো জীবনে রলাঁর এ দুটি পুঁথি স্থায়ী প্রভাব রেখে

গেছে। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে 'জন ক্রিস্টোফার' অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ওর সমকক্ষ অনেক। ওর চেয়েও মাথায় উঁচু টলস্টয়-ডস্টোয়েভ্স্কির একাধিক উপন্যাস। রলাঁর স্থান সাহিত্যের সভায় তাঁদেরই পাশে। তবে 'জন ক্রিস্টোফার' বা 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা' প্রধানত জীবনজিজ্ঞাসুদের জন্যে। 'সমর ও শান্তি' বা 'কারামাজভ' জীবনজিজ্ঞাসু তথা সর্বসাধারণের জন্যে।

'জন ক্রিস্টোফার' বিশেষ করে সংগীতপ্রেমিকদের জন্যে। এর পাতায় পাতায় সংগীত-প্রসঙ্গ। বোধ হয় বেঠোফেনের জীবনী লিখে রলাঁর সংগীত সম্বন্ধে বলবার কথা ফুরোয়নি, তার সঙ্গে মিলেছে সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য। ক্রিস্টোফারের সঙ্গে অলিভিয়েরের। জার্মানের সঙ্গে ফরাসীর। ক্রিস্টোফারকে জার্মান না করলে কি চলত না? না, চলত না। উঁচুদরের সংগীতকার যাঁরা তাঁদের শিক্ষা এক পুরুষের নয়, তিন-চার পুরুষের। বাখ্ ও বেঠোফেন প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সংগীতশিল্পী। জার্মানীতে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত, ফ্রান্সে বিরল। তারপর সংগীতশিক্ষা তো কেবল পরিবারে হয় না, হয় রাজ-রাজড়ার দরবারে। জার্মানীতে শত শত দরবার ছিল একশ' বছর আগেও। ফ্রান্সে বড়ো জোর ছিল একটি। তার পর জার্মানী এমন দেশ যে তার ছোট বড়ো সব শহরেই থিয়েটার অপেরা কন্‌সার্ট ও সেই জাতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান অগুনতি। পাড়ায় পাড়ায় জলসা, ঘরে ঘরে গানবাজনা। কাজেই ক্রিস্টোফারকে জার্মান করতেই হলো। কিন্তু জার্মানীতে তখন সামরিকতার বাড়াবাড়ি, ক্ষুদে কর্তাদের সঙ্গে মুখ সামলে কথা কইতে হয়, কথায় কথায় বিধিনিষেধ। স্বাধীন-চেতা ক্রিস্টোফারকে তাই বিপদে পড়ে ফেরার হতে হলো প্যারিসে। সেখানে তার ধীরে ধীরে পসার জমল, নামডাক হলো। প্যারিস যদিও ফ্রান্সের রাজধানী তবু আন্তর্জাতিকতার পীঠস্থানও বটে। গুণী লোক দেখলে ফরাসীরা খাতির করে। ক্রিস্টোফার তাদের একজন হয়ে উঠল, ফ্রান্সকে ভালোবাসল অলিভিয়েরকে বন্ধু পেয়ে। এদের দুজনের বন্ধুতা প্রেমের চেয়েও নিখাদ। দেশের ব্যবধান অলীক, ভাষার ব্যবধান অলীক।

অলিভিয়ের আদর্শবাদী সাহিত্যিক। ক্রিস্টোফার আদর্শবাদী সংগীতকার। এমনি আরো কয়েকজন আদর্শবাদীকে বাস্তববাদীকে আমরা পাচ্ছি, তাদের কেউ নারী কেউ পুরুষ। তাদের এক-এক জনের এক-এক ধারা, এক-এক দিকে গতি। একজনের নাম ফ্রাঁসোয়াজ উদোঁ। অভিনেত্রী। এঁর সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেছেন,

> "But especially he was indebted to her for a better understanding of the theatre; she helped him to pierce through to the spirit of that admirable art, the most perfect of all arts, the fullest and most sober. She revealed to him the beauty of that magic instrument of the human dreams,—and made him see that he must write for it and

not for himself, as he had a tendency to do..., Francoise's ideas were in accordance with Christopher's, who at that stage in his career, was inclined towards a collective art, in communion with other men, Francoise's experience helped him to grasp the mysterious collaboration which is set up between the audience and the actor.... It was this common soul which it was the business of the great artist to express."

এর পরে আধুনিক ইউরোপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

"Modern Europe had no common book : no poem, no prayer, no act of faith which was the property of all. Oh ! the shame that should overwhelm all the writers, artists, thinkers, of to-day ! Not one of them has written, not one of them has thought, for all. Only Bethoven has left a few pages of a new Gospel of consolation and brotherhood : but only musicians can read it, and the majority of men will never hear it."

রলাঁর সাধ ছিল সংগীতকার হতে। বিধাতা বাদী। পূর্বপুরুষেরা সংগীত-শিল্পী নন। নাট্যকার হতে স্পৃহা ছিল। তাঁর স্পৃহা থাকলে কী হবে, লোকের আগ্রহ ছিল না। বার বার তিন বার। এবার ঔপন্যাসিক। এবার সিদ্ধার্থ।

কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলা যায় বেঠোফেন সম্বন্ধে যা তিনি বলে গেছেন। একটু ঘুরিয়ে বললে যা দাঁড়ায় তা এই :

"Rolland has left a few pages of a new Gospel of consolation and brotherhood : but only seekers after Life can read it, and the majority of men will never hear it."

(১৯৪৪)

কবিতা কেন উপেক্ষিতা

মণীন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ যুগের লোক কাব্য পড়ে না কেন? রলাঁ বলেছিলেন, এ যুগের লোকের সুখদুঃখের কথা কেউ কাব্যে লেখে না বলে। ভিক্তর উগোর মতো জনসাধারণের কবি থাকলে জনসাধারণ কাব্য পড়ত বই-কি। রলাঁর এই উত্তর আমাকে তখনকার মতো নিরস্ত করলেও একেবারে নিশ্চিন্ত করেনি। রলাঁ কোনোদিন কবিতা লেখেননি, আমি লিখেছি। যাদের কথা লিখেছি তারা সংখ্যায় দুজন হলেও তাদের সুখদুঃখ সকলেরই সুখদুঃখ। তা যদি না হতো রাম সীতার সুখদুঃখ বিশ্বজনীন হতো না।

তাহলে কি সুখদুঃখ বলতে রলাঁ ব্যক্তিগত সুখদুঃখ নয়, সমষ্টিগত

সুখদুঃখের কথা বুঝেছিলেন ? মহাযুদ্ধ, মহামারী, মন্বন্তর, বিপ্লব, বিদ্রোহ, ধর্মঘট, এই সব ? তা যদি হয় তবে স্বীকার করতে হবে যে এ যুগের কবিরা এ জাতীয় সুখদুঃখের কথা খুব বেশী লেখেন না। রাশিয়ার কবিদের খবর রাখিনে। অন্যান্য দেশের খবর যা পাই তার থেকে মনে হয় এ ধরনের সুখ দুঃখ কবিদের হতবাক করে। যদি বা তাঁরা মুখ খোলেন তো আভাসে ইঙ্গিতে বলেন, সে-ভাষা লক্ষ লক্ষ লোকের মুখের ভাষা নয়, তাই সেসব কাব্যগ্রন্থের পাঠক হাজার জনের বেশী নয়। প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে বায়রনী গান ধরলে হয়তো জেল কিংবা গারদ কোনো এক জায়গায় আটক করবে, অন্তত বই বাজেয়াপ্ত করবে, এ রকম শংকা আছে বলে মনে হয়। ভিক্তর উগো দীর্ঘকাল নির্বাসনে কাটিয়েছিলেন, শেলী কীটস ও বায়রন স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়েছিলেন, হুইটমান একখানি কি দুখানি বই লিখে আর লিখলেন না, সেও এক প্রকার নির্বাসন। জনসাধারণ যাদের কবিতা পড়তে ভালোবাসে তাদের কপালে আর কিছু না হোক দেশান্তর। এ শুধু কবিতার বেলায় নয়। টুর্গেনিভের স্থান হলো না রাশিয়ায়, ইবসেনের নরওয়েতে, রলাঁর ফ্রান্সে। আমি এর পক্ষপাতী নই। বনস্পতিকে বন থেকে বনান্তরে নিলে তার রসের উৎস শুকিয়ে যায়। সাহিত্যের উৎস শুকিয়ে যায় যদি সাহিত্যিক যান নির্বাসনে। তাঁকে যেমন করে হোক স্বদেশেই থাকতে হবে, লক্ষ লক্ষ লোকের মুখের ভাষায় প্রাণ খুলে লিখতে হবে ব্যক্তিগত সমষ্টিগত উভয়বিধ সুখদুঃখের কথা, কাব্যে অথবা নাটকে, গল্পে অথবা উপন্যাসে। আভাসে ইঙ্গিতে নয়, চোরের মতো নয়। এই হলো আদর্শ। এর জন্যে যদি সাজা পেতে হয় তো সাজাই পেতে হবে। প্রাণ-দণ্ড, কারাদণ্ড, সম্পত্তিনাশ। কিন্তু নির্বাসন নয়।

তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে জনসাধারণেরও দোষ আছে। জন-সাধারণের মূল্যবোধ অনেক সময় ভ্রান্ত। আজকের দিনে উদ্‌ভ্রান্ত। তাদের মূল্যবোধ মেনে নিলে যা হয় তা সাহিত্য নয়, তা সিনেমা। সাহিত্যের ভিতর এখন সিনেমার রোমাঞ্চ ঢুকেছে, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রোপাগান্ডা। এ-স্থলে কেউ যদি হট্টগোলের বাইরে গিয়ে আত্মরক্ষা ও সাহিত্যের চরিত্ররক্ষা করেন তো উচিত কাজই করবেন। জনসাধারণ যদি তাঁর রচনা আস্বাদন না করে তো জনসাধারণই বঞ্চিত হবে, তিনি নন। লোকে তাঁর কবিতা পড়ে না তো কী হয়েছে! লোকে কি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে! বুলবুলের ডাক শোনে! গোলাপের ঘ্রাণ নেয়! প্রকৃতির সঙ্গে তাদের যেমন ভাশুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক, কবিতার সঙ্গে তেমন হলে আশ্চর্য হবার কী আছে!

কিন্তু লোকে না পড়লে বাস্তবিক মনে লাগে। আমরা অনেকেই কবি হয়ে সাহিত্যের আসরে এসেছিলুম, আসরে বসে দেখলুম কবিতার আদর নেই। তখন গল্প উপন্যাসের বায়না নিলুম। বেচারি কবিতা হলো কাব্যের উপেক্ষিতা। এ যেন একজনের প্রেমে পড়ে আর-একজনের কাছে বরপণ নেওয়া। প্রেমের সুখ বিয়ের সুখ দুই সুখ গেল। সংসার ধর্ম, জৈব ধর্ম, এ-সব কর্ম করে যশ ও অর্থ এল। তারপর কালেভদ্রে এক-আধ ছত্র কবিতা লেখা গেল।

কিংবা গতর খাটিয়ে রাত জেগে কবিতা লেখাও চলল, উপন্যাস লেখাও। গায়ের জোরে লিখলে কারিগরি থাকে, যাদুকরী থাকে না। অবশ্য যাদের বহুমুখী প্রতিভা তাদের কথা আলাদা। তারা বহুজনের প্রেমিক, একজনের পতি নয়। তারা কবিতা বা প্রবন্ধ যাই লিখুক তাতে যাদুকরী থাকে, কারিগরিও। কিন্তু একথাও ঠিক যে একনিষ্ঠতার অভাবে গভীরতার অভাব ঘটে। এইজন্যে প্রজাপতিত্বের চেয়ে পতিত্ব ভালো। মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়র নাটক লিখলেন অনেক, কবিতা লিখলেন কয়েকটি। কবিতাও লিখতে পারতেন অনেক। কিন্তু সেটা হতো নিছক গায়ের জোরে, নিপট কারিগরি। গ্যেটের পক্ষে নাটক লেখা কঠিন ছিল না, তাঁর হাতে রাজার থিয়েটার ও তাঁর অধীনে একদল উপযুক্ত নটনটীও ছিল। অথচ একমাত্র ফাউস্ট লিখতে তাঁর পঞ্চাশ বছর লাগল। সব্যসাচীত্বের ক্ষমতা নিয়ে তাঁর জন্ম। কিন্তু সে ক্ষমতা তিনি শতধারে বর্ষণ করে অপচয় করেননি।

যা বলছিলুম, লোকে না পড়লে বাস্তবিক মনে লাগে। বোধ হয় শেক্‌স্‌পীয়রেরও মনে লেগেছিল, তাই তিনি কবিতা ছেড়ে নাটক ধরলেন। বঙ্কিম ছিলেন কবি, হলেন কথক। বেচারি কবিতার এ দশা তা হলে আজকের নয়। সাহিত্য বলতে একদা শুধু কাব্যই বোঝাত। তার পরে এল নাটক। তার পরে কথা ও কাহিনী। শেষকালে প্রবন্ধ। লোকে আর কাব্য পড়ে না বলে আফসোস করে কী হবে, লোকে তো নাটক দেখে, কাহিনী শোনে, প্রবন্ধ পাঠ করে। প্রতিযোগিতায় কবিতা হটে যাচ্ছে, একচেটে কারবার হলে হটত না। যদি কোনো ডিকটেটর কী মনে করে তাঁর রাজ্যে গল্প উপন্যাস নাটক প্রহসন প্রবন্ধ নিষেধ করে দেন তা হলে লোকে আবার সেকালের মতো কাব্যই পড়বে। আমরা একধার থেকে কবিতা চালান দেব, তাতে যদি জনসাধারণের সুখদুঃখের কথা না থাকে—যদি থাকে বুলবুল আর সুরা আর সাকী—তা হলেও তারা আদর করে পড়বে ও কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সুর ভাঁজবে।

কিন্তু তেমন ডিকটেটর এ যুগে সম্ভব নয়। বরং অধিকতর প্রতিযোগিতারই সম্ভাবনা। কবিতা ক্রমে আরো কোণঠাসা হবে, আশ্রমে আস্তানা গাড়বে। নাটক তো লোপাট হতে চলল সিনেমার উৎপাতে। প্রোপাগাণ্ডার ডাণ্ডা খেয়ে উপন্যাসও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মনে হয় ভাবী যুগটা প্রবন্ধের। ইচ্ছা করলে সে জিনিস পদ্যেও লেখা যায়। লিখছেনও অনেকে। যাঁরা লিখছেন তাঁরা জানেন না যে প্রবন্ধ। লোকেও জানে না, জানলে আদর করে পড়ত। কবিতার উপর বোধ হয় ওদের জাতক্রোধ হয়েছে।

(১৯৪৬)

কথাসাহিত্য

আমার ছোট ছেলে যখন আরো ছোট ছিল তখন তাকে রোজ রাত্রে গল্প বলে ঘুম পাড়াতে হতো। ডাক পড়ত আমাকে। গল্পটা নতুন হওয়া চাই। শুধু নতুন হলে হবে না, হবে পক্ষিরাজের গল্প। পক্ষিরাজ ঘোড়ার নিত্য নতুন য়্যাডভেঞ্চার মুখে মুখে বানিয়ে বলা ছিল আমার নৈশ কর্তব্য। যেটা তার মনে দাগ রেখে যেত সেটা দিনকয়েক বাদে আবার শুনতে চাইত। হয়তো আমার মনে নেই, তার মনে আছে, মনে করিয়ে দিত। বার বার শুনেও তার তৃপ্তি হতো না, এমন গল্পও ছিল।

সব দেশের সব বয়সের পাঠক-পাঠিকার ভিতরে একটি চিরশিশু আছে। সে চায় নতুন গল্প, নতুন উপন্যাস। 'নভেল' কথাটার মানে কী? যা নতুন। নতুন না হলে তার কৌতূহল জাগে না, কৌতূহল না জাগলে সে পড়তে চায় না। আমাদের প্রতিদিনের কাজ তাকে নূতনত্বের স্বাদ যোগানো। জগতে নূতনত্বের অভাব নেই। চোখ কান খোলা রাখলে কত নতুন মুখ চোখে পড়ে, নতুন কথা কানে আসে। লিখতে জানলে যে কেউ নতুন গল্প, নতুন উপন্যাস লিখতে পারেন। থানায় বা আদালতে, খবরের কাগজের অফিসে বা রাজনীতির আড্ডায়, চায়ের দোকানে বা রেলগাড়ির কামরায় প্রতিদিন যান তো প্রতিদিন কথাসাহিত্যের উপাদান পাবেন। যুদ্ধ কিংবা বিপ্লব অবশ্য প্রতিদিন ঘটে না, কিন্তু কেউ যদি সে সময় উপস্থিত থাকেন তো উপাদানের ঝুলি ভরে উঠবে। ঝুলি ঝাড়লেই ঝরে পড়বে মাসে একটা গল্প, বছরে একখানা উপন্যাস। ডিকেন্স প্রত্যহ লণ্ডন শহরের অলিগলি ঘুরতেন রকমারি মানুষের সন্ধানে। টলস্টয় ডায়েরি রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাদের সুখদুঃখের কাহিনী শুনতেন যখনি মহালে যেতেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন গাঁয়ের লোকের দাদাঠাকুর। তারা তাঁর কাছে প্রাণ খুলত। এমনি করে দেশবিদেশের কথাসাহিত্য গড়ে উঠেছে। এর ভিত্তি হচ্ছে অভিনবত্ব। আমরা আজ রাশিয়ার গল্প এত পড়ি কেন? কারণ সে দেশে নিত্য নতুন পরীক্ষা চলছে মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে।

কিন্তু সব দেশের সব বয়সের পাঠক-পাঠিকার যেমন নূতনত্বের জন্যে কৌতূহল আছে, তেমনি আছে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পক্ষপাত। প্রেম, বীরত্ব, সংঘাত, য়্যাডভেঞ্চার, মৃত্যু, এসব বিষয়ে রাশি রাশি গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে সব ভাষায়। আমার ছোট ছেলের কাছে যেমন পক্ষিরাজের গল্প, অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার কাছে তেমনি নারীচরিত্র, পুরুষভাগ্য। সোভিয়েট রাশিয়াতেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি, ঘটতে পারে না, কারণ অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা দাম দিয়ে আর কিছু কিনবে না, কিনতে বাধ্য হলে পড়বে না। অধিকাংশের রুচিরোচন বিষয়ের সীমা মেনে নিয়ে সেই সীমার মধ্যে অল্পসংখ্যকের রুচির জন্যে একটু জায়গা করে নেওয়া হচ্ছে সার্থক শিল্পীর কাজ। স্বয়ং শেকসপীয়র এই করে গেছেন, এখন পর্যন্ত কেউ তাঁকে অতিক্রম করেননি। বলা বাহুল্য নাটকের ও উপন্যাসের বিষয় মোটের উপর এক। যাদের জন্যে আমরা লিখি তাদের কোন্ দিকে ঝোঁক এ যদি না জানি তো বৃথা লিখছি। মানুষের স্বভাব না জেনে

মানুষের সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না।

মানুষ যেসব বিষয় ভালোবাসে সেসব বিষয়ে শত শত গল্প উপন্যাস প্রতি মাসে লেখা হচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি কি দুটি হয়তো শতবর্ষ পরেও মানুষের মনে থাকবে, ভালো লাগবে। এগুলিকে বলা হবে ক্লাসিক। বাংলা ভাষায় ক্লাসিক বেশী নেই। উনবিংশ শতাব্দীর এমন একখানা উপন্যাসের নাম করা শক্ত যেখানা একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকবে। নূতনত্বের দুর্বলতা এইখানে যে তা বছর ঘুরলেই পুরাতন হয়। যেমন নতুন পঞ্জিকা। সেইজন্যে শিল্পীকে সন্ধান করতে হয় চিরন্তনত্বের। যা চিরন্তন তা চিরনতুন। তা কোনো দিনই পুরাতন নয়। চিরন্তন সত্যের সন্ধান যিনি পেয়েছেন তিনি যদি শক্তিমান লেখক হয়ে থাকেন তো তাঁর দু-একটি রচনা ক্লাসিক হতে পারে। ক্লাসিকের মধ্যেও কতক আছে যা বহুজনের প্রিয়, যেমন শেকসপীয়রের নাটক। কতক আছে যা অল্প কয়েকজনের প্রিয়, যেমন কালিদাসের কাব্য।

আমরা যারা বাংলা উপন্যাস লিখি তারা যেন ক্লাসিক রচনায় মন দিই। লেখা মানেই জীবনপাত। জীবনপাত করে যদি বহুজনের জীবনে বহুকাল ধরে জীবনলাভ করি তো জীবনপাত করা সার্থক। কেবল জীবনলাভ নয়, জীবনদানও বটে। কারণ ক্লাসিক মাত্রেরই জীবনদায়িনী শক্তি অসীম। লোকে তার থেকে জীবন পায় বলেই শতাব্দীর পর শতাব্দী তার স্রোতে অবগাহন করে। তাতে যদি কিছু পঙ্কিলতা থাকে তো উপায় নেই। জীবনের স্রোত নির্মল নয়। ভাগীরথীর স্রোতের মতোই ঘোলা।

(১৯৪৭)

পত্র লেখা

প্রিয়বরেষু,

…আট বছর আগে আমি হঠাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে দিই। কাজের চাপে ছাড়তে হলো এই বোধহয় যথার্থ কারণ; কিন্তু যে দুটি কারণ আমি গভীর ভাবে অনুভব করেছি সে দুটি আপনাকে বলি। একটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে পালিয়ে বাঁচবার ইচ্ছা, আর একটি বাংলা কবিতার ভাষা কেমন হবে তা না বুঝে প্রচলিত ভাষায় লেখার বিড়ম্বনা। অর্থাৎ আমি দেখলুম যাই লিখি না কেন তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি থাকছে। সেটা থাকলে আমার বৈশিষ্ট্য থাকে না। এবং যে ভাষায় লিখি সে ভাষা পচে গেছে। সে ভাষায় লেখা কবিতায় freshness নেই, তা বাংলার মাটির সঙ্গে মেলে না, সে একপ্রকার dead language।

এই দীর্ঘ আট বছরে রবীন্দ্রপ্রভাব কাটিয়ে উঠেছি বলে বিশ্বাস হয় নিজের মনে। আর ভাষারও একটা হদিস পেয়েছি, যদিও এখনো তা পরীক্ষাধীন। আমার অভিজ্ঞতার দ্বারা আপনার বইখানি (দক্ষিণায়ন) যাচাই করে কী

দেখলুম? দেখলুম ওতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েনি। আপনি এ বিষয়ে আমার চেয়ে ভাগ্যবান। কিন্তু ভাষা সেই পোষাকী সংস্কৃত বাংলা। আপনি কি ওতেই সন্তুষ্ট? বাংলা কবিতার ভাষা দেশজ ও স্বাভাবিক না হলে তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ভাবের দ্বারা ভাষার অভাব পূরণ করা যায় না। ছন্দের ওপর আপনার দখল বিস্ময়কর। কিন্তু ততঃ কিম্? ও ভাষা অচল, ওকে অলংকার পরানো বৃথা। এ শুধু আপনাকে বলছি তা নয়—সবাইকে। সব চেয়ে বলি রবীন্দ্রনাথকে, কেননা তাঁর কাছে আরো অনেক প্রত্যাশা করেছিলুম। সারাজীবন ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা চালালেন, ভাষা নিয়ে পরীক্ষা গত বিশ বছর থেকে বন্ধ। কবিতার ভাষার কথা বলছি। নাচার হয়ে গদ্যকবিতা লিখতে লাগলেন—কিন্তু সেটা তো সমাধান নয়, সেটা সমস্যার পাশ কাটানো। আপনার কবিতার ওর্জস্বিতা, সাহস, high soaring ভাব আমার ভালো লাগে, পক্ষান্তরে আপনার মনের একটা অংশ morbid বা অসুস্থ। কয়েকটি কবিতায় যে করাল কৃষ্ণছায়া পড়েছে তা objective বিশ্বের নয়, subjective মনের।

দেশের এই ঘনায়মান দুর্যোগে কাব্য রচনার লগ্ন আসছে, কিন্তু যাঁরা লিখবেন তাঁদের লেখনীতে থাকবে মানুষের মুখের লীলায়িত সহজ সুস্বাদ ভাষা, ক্রিয়াপদগুলি হবে চলতি, সমাসগুলি হবে ভাঙা ভাঙা, কতকটা বৈষ্ণব পদাবলী ও বাউলের গানের মতো দেশী হবে তার ঢঙ। আর তাঁদের মনের কোথাও অন্ধকার থাকবে না, দুর্যোগ যা কিছু তাঁদের মনের বাইরে, বহির্বিশ্বে। অন্তর্দীপ্তির দ্বারা তাঁরা এই তিমির ভেদ করবেন। যেমন অমাবস্যার রাত্রে দীপান্বিতা তেমনি দক্ষিণায়নের সময় জ্যোতির্ময় সবিতা। Environment এর দ্বারা তাঁরা কালো হবেন না, environmentই তাঁদের দ্বারা আলো হবে। আমি একখানা ছড়ার বই লিখেছি, একদিন আপনাকে পাঠাব। নমস্কারান্তে। ইতি।

(বাঁকুড়া, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪২)

২

আপনার পত্র ও পদ্য পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। আপনার কাব্যসাধনা দ্রুতগতিতে সিদ্ধির সামীপ্য পাচ্ছে। ভাষাও অনেকটা সহজ হয়ে আসছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তার প্রকৃত রূপ প্রাকৃত, আর মার্জিত রূপ সংস্কৃত। তেমনি আমাদের প্রদেশে বর্তমান কালে যে ভাষা চলতি তার নাম দেওয়া যেতে পারে প্রাকৃত বাংলা। আমি পছন্দ করি প্রাকৃত, যে ভাষা প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া। তার মধ্যে আমি পাই রস, গন্ধ, স্বাদ, ফ্রেশনেস, চার্ম। সংস্কৃতকে তাচ্ছিল্য করি তা নয়, শ্রদ্ধা করি তাকে, কিন্তু সে যেন কাগজের ফুল। তার আছে রূপ, আছে বর্ণ. তাকে দেখে মুগ্ধ হওয়া যায় কিন্তু 'যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'? তাতে নেই অমৃত। সেই মৃত ভাষা কাঁধে করে সতীপতির মতো তাণ্ডবনৃত্য করলে যে সাহিত্য হয় সেই

সৎ সাহিত্য আমাদের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সজ্জন ছাড়া আর কেউ বোঝে না, ভালোবাসে না, চায় না। সংস্কৃত যে অত সহজে মৃত বা অচলিত হলো তার কারণ কি এই নয় যে তার প্রতি দেশের লোকের মমতা ছিল না? মমতার অভাব ভক্তি দিয়ে ভরে না। সংস্কৃত বাংলাও সম্ভবত এই শতাব্দীতে গঙ্গালাভ করবে। কাগজ যদি দুষ্প্রাপ্য হয়, ছাপাখানাগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে তার গঙ্গাযাত্রা আসন্ন।

কবিতা সম্বন্ধে আমার ধারণা বলি। কবিতা এমন হওয়া চাই যা লোকে স্বেচ্ছায় মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ করবে, মনে রাখবে, মানুষের স্মরণেই যার স্থায়িত্ব। তা নয়, বইয়ের পাতায় আবন্ধ রইল, কেউ হয়তো পড়ল, কেউ পড়ল না। এ দশা যেন আমার কবিতার না হয়। ছাপাখানার কল্যাণে আমরা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশার সংকেত ভুলেছি। নইলে কবিতা রচতুম গুন্‌গুনিয়ে, তাতে গানের আমেজ থাকত। যেই শুনত সেই মুখস্থ করত। শুনত সাধারণত আমাদের কাছের লোকেরাই, আমাদের পাড়াপড়শী, আমাদের গাঁয়ের বা শহরের লোক। জনসাধারণ বলতে আমি জনতা বুঝিনে, বুঝিনে দেশসুদ্ধ বালবৃদ্ধ-বনিতার ভিড়। প্রতিবেশীরা যদি জানে যে আমি একজন কবি, যদি আমার কবিতা শুনতে আসে, শুনে গুন্ গুন্ করে ও আরো দশজনকে শোনায় তা হলেই আমার কবি হওয়া সার্থক। ছাপাখানার ওপর নির্ভর করতে আমি একটুও উৎসাহ বোধ করিনে, কারণ কোন দিন ছাপাখানা উঠে যাবে আর আমার কবিতাও যাবে হারিয়ে। তার চেয়ে আমি ঢের বেশী বিশ্বাস করি মানুষের স্মৃতিকে। লোকে যদি আমার রচনা ভালোবাসে তো প্রাণপণে রক্ষা করবে। প্রতিবেশীদের ডিঙিয়ে পণ্ডিতদের সভায় হাজির হতে আমি কুণ্ঠিত। কাব্য জিনিসটা মস্তিষ্কধর্মী নয়, হৃদয়ধর্মী। তত্ত্বকথা নয়, প্রিয়কথা। 'মুর্খেন্তে বুঝিতে পারে, পণ্ডিতে লাগে ধন্দ'।

তারপর কবিতা রচনা একটা আর্ট। আর্ট সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, আর্ট হচ্ছে অন্তরের লীলা। কিন্তু আমাদের একালের কবিরা লীলা করতে ফুর্তি বোধ করেন না, তাঁদের রুচি ব্যায়ামে। তাঁদের মাথায় ঘুরছে আঙ্গিক, অঙ্গভঙ্গী। প্রাণে জাগছে না রঙ্গ। যাকে বলে abandon বা হাল ছেড়ে দিয়ে রঙ্গিণীর অনুসরণ, তা এখানকার কবিতায় কই? এ যেন দেবাসুরের সাগর-মন্থন, দেখে তাক লগে। আমি এর মধ্যে নেই। আমার নিজের দল বাউল বৈষ্ণব ভাওইয়া দরবেশ। আমার আক্ষেপ এই যে তাদের সঙ্গ পাচ্ছিনে। যেন বৃন্দাবন ছেড়ে দ্বারকায় এসেছি। এটা পার্থিব দৃষ্টিতে প্রগতি বইকি। আপনারা তো ভাবীকালের সবাইকে এমনি উচ্চ করতে চান। নমস্কারান্তে। ইতি।

(বাঁকুড়া, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৪২)

৩

আপনার চিঠি বড়ো মর্মস্পর্শী হয়েছে। দারুণ অর্থকষ্টে কখনো পড়তে হয়নি আমাকে, তবে গত মহাযুদ্ধের সময় আমার বাবাকে পড়তে হয়েছিল। তাঁর তখনকার আয় আপনার এখনকার আয়ের চেয়ে খুব বেশী ছিল না। অথচ পরিবার পরিজন ছিল ঢের বড়ো। তখনকার কৃচ্ছ্রতার ছাপ এখনো রয়েছে আমার শরীরে। মা তো অকালে গেলেন। স্কলারশিপ না পেলে আমার পড়া-শুনা অসম্ভব হতো। পেয়েও শরীরের সদ্‌ব্যবস্থা হয়নি। ঠিক অনশন না করলেও অল্পাশন করতে হয়েছে সারা ছাত্রজীবন।···

···আমার বন্ধুরা আমাকে বৈষ্ণব বলে ভুল করেন, আসলে আমি সহজিয়া। চণ্ডীদাস যা ছিলেন। সহজিয়া সাধনা বৈষ্ণব সাধনার অনুরূপ কিন্তু শামিল নয়। দান্তের মতো আমি চিরদিন বিয়াত্রিচের আরাধনা করে আসছি। আমার **Eternal Feminine** আমাকে তারকা থেকে তারকান্তরে নিয়ে চলেছে —বৃন্দাবন থেকে দ্বারকায় নয়। নমস্কারান্তে। ইতি।

(বাঁকুড়া, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪২)

৪

কাল আপনাকে যে চিঠি লিখেছি আজকের এ চিঠি তার পরিপূরক। কাল বলেছি আমি বৈষ্ণব নয়, সহজিয়া। এ কথা শুনে আপনি হয়তো বলবেন, "তফাৎ কী?" তফাৎ কোথায় ভেবে দেখলুম।

বৈষ্ণবদের বিশ্বাস আমরা সবাই নারী—আমিও নারী, আমার স্ত্রীও নারী, আপনিও নারী, আপনার স্ত্রীও। একমাত্র পুরুষ হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, আমরা সেই ব্রজেশ্বরের ব্রজগোপী।

সহজিয়াদের ধারণা আমি পুরুষ, আমার স্ত্রী বা নায়িকা নারী। আমরা দু'জনেই পরস্পরের ভগবান। আমরা দু'জনেই **Eternal Masculine** ও **Eternal Feminine**। অবশ্য এটা আক্ষরিক অর্থে ধরলে বিপদ। কেননা আমরা সামান্য প্রাণী— যেমন আরো দশজনে। তবু সর্বঘটে ভগবান আছেন, এই সামান্য আধারেও। লোকে হাসবে এই আশঙ্কায় সহজিয়ারা নিজেদের প্রণয়লীলাকে রাধাকৃষ্ণলীলা নাম দিয়ে কবিতা লিখেছেন। সেসব কবিতা বৈষ্ণব কবিতা বলে বিখ্যাত হয়েছে। চেনবার উপায় নেই, শত শত কবিতার মধ্যে কোনটি সহজিয়া ও কোনটি বৈষ্ণব। তবে হৃদয় দিয়ে বিচার করলে পার্থক্য ঠাহর হয় বইকি।

সুফীদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের মিল আছে। পাশ্চাত্য mysticদের সঙ্গেও। তাঁরাও আপনাদের নারী বলে কল্পনা করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' এই সুরে লেখা। বৈষ্ণব তত্ত্বের মধ্যে নিশ্চয় কিছু সত্য আছে, নইলে এত ব্যাপক প্রসার হতো না। মানবহৃদয়ের কোনো একটা গভীর প্রদেশে তা রহস্যময়রূপে সত্য, আমি ততদূরে যাইনি। যেতে প্রস্তুত

হইনি, বোধ হয় কোনোদিন হব না। আমি ভাবতেই পারিনে আমি ও আমার প্রিয়া দু'জনেই কী করে নারী হতে পারি! তা যদি হই একজন অপরজনের কাছে বাহুল্য হয়ে পড়ি। পরস্পরকে সম্পূর্ণতা দিতে পারিনে। পুরুষের চরিত্রে পৌরুষের বিকাশ হয় না, যদি সে নারীর চোখে পুরুষ না হয়। নারীর স্বভাবে নারীত্বেরও বিকাশ হয় না, যদি সে পুরুষের চোখে বিশিষ্টা না হয়, হয় সাধারণ। বৈষ্ণব তত্ত্বকে আঘাত না করে এটুকু আমি বলতে চাই যে "বৈষ্ণব সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" আমার মা বাবা বৈষ্ণব দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমি জানি তাঁদের সাধনায় আত্মবিলোপ (self-effacement), আত্মদান (self-surrender) প্রভৃতি পরম গুণ আছে। কিন্তু ও সাধনায় স্ত্রী-পুরুষের সত্য সম্পর্ক অবিকশিত থেকে যায়, এই আমার সিদ্ধান্ত। হতে পারে ভুল বুঝেছি। ইতি।

(বাঁকুড়া, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪২)

৫

যে দুঃস্বপ্নের মধ্যে আপনি বাস করছেন তার প্রান্তভাগে আমিও। বোমার চেয়েও মারাত্মক বিপদ আছে, তার জন্যে মনটাকে প্রস্তুত রাখতে হবে। বিশ্বাস জিনিসটা মেরুদণ্ডের মতো। তার পরীক্ষা প্রতিদিনই অলক্ষ্যে চলেছে। শেষ পর্যন্ত যদি খাড়া রইতে পারি তবেই আমরা মানুষ, নতুবা চতুষ্পদ। খাড়া মেরুদণ্ড ছাড়া মনুষ্যত্বের কী সংজ্ঞা হতে পারে?

তা বলে practical না হওয়াটাও ভুল। স্ত্রীর যদি মানসিক আঘাত পেয়ে মস্তিষ্কবিকৃতির ভয় থাকে তবে এই বোমার মরশুমে তাঁকে কলকাতার বাইরে অথচ অদূরে স্থানান্তরিত করতে হবে, যদি সাধ্যে কুলায়। তবে পুরুষ-মানুষের পক্ষে কলকাতা ত্যাগ সমীচীন হবে না। "উলুখড়ের" অপেক্ষায় আছি। "ইন্দ্রপ্রস্থ" বেশ হয়েছে। কলকাতার অন্য নাম নয় তো?

কলম আমাদের পাখা। দুঃসময়ে কি বিহঙ্গ তার পাখা বন্ধ করবে? কোনো কবির যদি তেমন শঙ্কা দেখি তবে তাঁকে আমি কবির ভাষায় বলব "এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা"। আমি তো মনে করি এইটেই পাখা চালানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। সুতরাং প্রাণ খুলে লিখে যান। ছাপা হোক বা না হোক।

ব্যষ্টি বা সমষ্টির তর্ক যুগে যুগে শোনা গেছে। দুই-ই সমান সত্য। আমিও আছি সমষ্টিও আছে। কেউ কারুর স্থান পূরণ করতে পারে না, সুতরাং কেন এ দ্বন্দ্ব? জীবন চিরকাল প্রবহমান। ব্যষ্টির জীবন লোকলোকান্তরে, জন্ম জন্মান্তরে। সমাজের জীবন ইহলোকে, মর্ত্যে। ব্যষ্টির জীবনের সবটা দৃশ্যমান নয় বলে অজ্ঞেয়বাদী হওয়া সাজে, কিন্তু নেতিবাদী হওয়া সাজে না।

(বাঁকুড়া, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪৩)

৬

…সংস্কৃত কাব্য rhythm-এর শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়েছিল জয়দেবের পূর্বেই। তিনি তাকে rhyme-এর শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিলেন। তা সত্ত্বেও সংস্কৃত কাব্যের আর অগ্রগতি হলো না, কারণ ভাষায় ঘুণ ধরেছিল। জনমুখের ভাষা ও লেখনীমুখের ভাষা দুই স্বতন্ত্র ভাষার মতো ব্যবধান বাঁচিয়ে চলতে চলতে এক সময় পর হয়ে গেল। সংস্কৃত রইল পুঁথির পাতায়, প্রাকৃত রূপান্তরিত হলো বাংলা ইত্যাদি প্রাদেশিক ভাষায়, সেসব ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হলো। গোড়া থেকে গড়ে তুলতে হলো ছন্দ, মিল, rhythm rhyme। ক্রমে একটা সময় এল যখন বাংলা কবিতায় ছন্দ ও মিল কালিদাস জয়দেবের মতো নিখুঁৎ হলো। আপনি সেই নিখুঁৎকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তাকে আধুনিকতার পরিপন্থী ভেবে পরিহার করছেন না। এখানে আপনার প্রাজ্ঞতার পরিচয় পাচ্ছি ও প্রশংসা করছি। নিখুঁতের ওপর আর এক কাটি সরেস হলে আপত্তি করব না, তারিফ করব। কিন্তু "এহো বাহ্য"। আরো গভীরে গেলে দেখবেন কবিতাকে সার্থক করে Poetic Feeling ও Poetic Vision. এ দুয়ের অভাবে ছন্দ ও মিল ব্যর্থ। আপনার রচনায় Poetic Feeling আছে কিন্তু Vision-এর অনটন। Poetic Vision-এর অভাব Political Vision বা Historical Vision দিয়ে ভরে না।

কিন্তু "এহো বাহ্য"। আরো গভীরে নামলে দেখবেন কবিতার উৎস আনন্দ। "আনন্দাৎ খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"। কাব্যও তো সে অর্থে ভূত। আনন্দের উৎস প্রত্যেকের অন্তরে বিদ্যমান। কিন্তু সে উৎসের মুখ খোলা থাকলে আমাদের আপিস আদালত করা, রুজি রোজগার করা অসম্ভব হয়। সকলে কিছু জমিদার নয় যে দিবারাত্র কাব্যলক্ষ্মীর সহবাস করে আনন্দে কাটাবে। আমরা আজকালকার কবিরা অর্থোপার্জনের অবসরে কবিতা লিখি। আমাদের যখন অবসর ঠিক সেই সময়েই যে আনন্দের জোয়ার আসবে তা হয়ে ওঠে না। যেই জোয়ার আসে অমনি আপিসের ঘণ্টা বাজে। অমনি ভাঁটা পড়ে। আমি তো কিছুতেই কবিতার সময় আনন্দ, আনন্দের সময় কবিতা খুঁজে পাই না। চাকরি ছাড়বার কথা কতবার ভেবেছি কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। কেননা আমার পৈতৃক সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছুই নেই, থাকলেও শরিক আছে। খেটে খেতে হবে যখন, তখন এই বা মন্দ কী? সাম্যবাদী আমলে যদি এর চেয়ে বেশী অবসরের আশা থাকত তা হলে সাম্যবাদী হতে আমার বাধত না।

যে সমস্যার কথা বললুম এর মীমাংসা না হলে কবিদের সঙ্গে আনন্দের বিচ্ছেদ ঘুচবে না। মাঝে মাঝে একটু-আধটু সরবে উৎস-মুখের পাথরটা। এক-আধটা ভালো কবিতা উঠে আসবে। তাতে আর কতটুকু প্রগতি হবে? অগত্যা প্রগতির নামে অধোগতি বা চক্রগতি বা বক্রগতিই আমাদের গতি! স্বল্প অবসরে যে যত বড়ো চালাক সে তত বড়ো আধুনিক। এই clevernessই আধুনিক কবিদের সম্বল। এটাকে আমি দুর্বলতা মনে করি। আপনি এর থেকে

মুক্ত। আমার প্রীতি নমস্কার ও শুভাকাঙ্ক্ষা জানবেন। আশা করি সস্ত্রীক ভালো আছেন।

(এই পত্রগুলি কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে লেখা)

জবানবন্দী

সাহিত্যে কিছু না কিছু পরিবর্তন সব সময়েই হচ্ছে। তবে গত মহাযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে যে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল বর্তমান মহাযুদ্ধের পর সেরকম উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন দেখছিনে। আগের বারে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে যাঁরা ফিরে এলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নজরুল ইসলাম। এই সময় 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলির সমৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য। তারপর 'কল্লোল'। 'কল্লোল'কে আশ্রয় করেই গোকুলচন্দ্র নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের সাহিত্যে আবির্ভাব। অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে এল নতুন আদর্শ—নতুন আকাঙ্ক্ষা। এই পরিবর্তনের সুর সংক্রামিত হলো জীবন থেকে সাহিত্যে। কিন্তু এবারের মহাযুদ্ধ এরকম কোনো পরিবর্তন আনেনি। অবশ্য এ মহাযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে এ যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। কেবলমাত্র সাময়িক বিরতি চলছে। তবে 'কল্লোলে'র যুগের লেখকদের থেকে আধুনিক সাহিত্যিকরা বেশী সমাজসচেতন।

সমাজের কোনো ছবি আঁকা অথবা পরিবর্তন ঘটানোই সাহিত্যিকের আসল লক্ষ্য নয়। অবশ্য তারও একটা মূল্য আছে। তার লক্ষ্য জীবনের সুখের অথবা দুঃখের কোনো অনুভূতিকে প্রকাশ করা। কাজেই সমাজের সঙ্গে শিল্পীর যে সম্পর্ক তা পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নয়। অধিকাংশ ছোটগল্পই কোনো না কোনো কৌতূহলকে নিবৃত্ত করে। সেই সঙ্গে সমাজকে যতটুকু পাওয়া যায় তা গৌণ। সাহিত্যে রসের স্থান সবার আগে। প্রচারমূলক সাহিত্যেও আপত্তির কিছু নেই যদি তা রসোত্তীর্ণ হয়। প্রকাশই লক্ষ্য, প্রচার নয়। লেখক যখন সত্তার গভীরে নেমে শিল্প সৃষ্টি করেন, সে সৃষ্টি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত নয়। তা সার্বজনীন হয়ে ওঠে। না হলে লেখকের সৃষ্টি সাধারণের মনকে স্পর্শ করতে পারে না।

যদি বলেন রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের কী সম্পর্ক তবে বলব দুটো স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তাই। রাজনীতি সাহিত্যে এলে তাকে তো শিল্পরূপ নিয়ে আসতে হবে। এখনকার সাহিত্যিকরা রাজনীতির সঙ্গে এমন-ভাবে জড়িয়ে পড়ছেন যে নিজেদের রাজনীতি থেকে আলাদা করে নিতে পারছেন না। সাহিত্যিক রাজনীতিক হতে পারে। কোনো মানুষকেই বিশেষ একটা গণ্ডীতে আবদ্ধ করা চলে না। একই ব্যক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিচয়। সাহিত্যিক যখন রাজনীতি করেন তখন সাহিত্যিক হিসেবে করেন না। সাহিত্য সেবাদাসী নয়, রানি। তার দাবি অগ্রগণ্য। মহাত্মা গান্ধী ব্রত নিয়েছেন দেশকে স্বাধীন করবার ; কিন্তু তিনি যদি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সে ব্রতকে সফল করতে

চান তবে তাঁকে সাহিত্যের দাবি মেনে নিতে হবে সবার আগে। আর তা হলে হয়তো দেখা যাবে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। সাহিত্য সাহিত্যের জন্যেই। সাহিত্য এবং রাজনীতি দুটোই করতে গেলে কোনোটাই হবে না। যদি ক্যাপিটালিস্টদের ধ্বংস করতে হয় তবে বন্দুক তুলে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ কাজ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। সাহিত্যও লাভবান হবে না। কোনো রচনা একই সময়ে সাহিত্য ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্বরূপ হয়েছে এ উদাহরণ বিরল।

কোন্ শ্রেণীর সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক সম্ভাবনা বেশী এর উত্তরে বলা চলে sensitiveদের। সূক্ষ্ম পেলব আর গভীর হৃদয়বৃত্তি ছাড়া বড়ো সাহিত্য হতে পারে না। কিন্তু সাধারণত এঁদের অনেকেই জীবনযুদ্ধে তলিয়ে যান আর্থিক ও সামাজিক আনুকূল্যের অভাবে। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদেরও সাহিত্যিক সত্তা সাধারণত মুমূর্ষু বা মৃত। কেউ বা পাকা ব্যবসাদার হয়ে বসেছেন অথবা এই রকম আর-কিছু। গভীর হৃদয়বৃত্তি নিয়ে প্রথম জীবনে অনেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে আসেন বটে কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন এরকম দৃষ্টান্ত খুবই কম। হয়তো সাহিত্যের কোনো তুকতাক তাঁদের জানা আছে যার ফলে তাঁদের বই ভালো চলে। কিন্তু এই পর্যন্তই। অনেকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্বল করেই সাহিত্যক্ষেত্রে নামেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে পূর্ণতা নেই। বুদ্ধির সঙ্গে চাই অনুভূতি। অনুভূতি এবং কল্পনাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে স্থায়ী সাহিত্য হয় না।

জিজ্ঞাসা করছেন আধুনিক কোন্ কোন্ লেখক সম্বন্ধে আমি আগ্রহশীল? সবচেয়ে আগ্রহ ছিল সুকান্ত সম্বন্ধে। তাঁর জীবন ফুরিয়ে গেছে। শুধুমাত্র কারো লেখা পড়েই আমি খুশি হতে পারিনে। লেখকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল অত্যন্ত বেশী। এমন সাহিত্যিক চাই যার জীবন থেকে হবে সাহিত্য। জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের কাজে লাগাতে হবে।

কবিদের সম্বন্ধে আমার অভিযোগ তাঁদের অধিকাংশের কবিতাতেই দেখি কেবল কথার প্রাধান্য। কাব্যের সুর তাতে নেই। তবে কথার যে কোনো দাম নেই আমি তা বলছিনে। কথার আকস্মিকতা পদে পদে মনকে নাড়া দিয়ে যায়। এই জন্যেই ছড়া আমার ভালো লাগে। তবে কবিতায় কথার প্রাধান্য সীমাবদ্ধ হওয়াই উচিত। না হলে সুর ব্যাহত হয়। এই সুরবোধের প্রাধান্যই ছেয়ে আছে জসীমউদ্দীনের কাব্যকে। তাঁর কবিতায় এক অপূর্ব গ্রাম্য সুরের মধুর বিস্তার দেখতে পাওয়া যায়।

কবিদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মত বলতে গেলে নজরুলের স্থান আমার কাছে অত্যন্ত উঁচুতে। তাঁর অনুভূতির আবেগ দূরপ্রসারী। ভালো লাগে সত্যেন্দ্র-নাথ দত্তের অনেক কবিতা, মোহিতলালের 'বিস্মরণী', প্রিয়ম্বদা দেবীর, উমা দেবীর এবং অপরাজিতা দেবীর কিছু কবিতা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা', অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের 'অমাবস্যা'। গোকুলচন্দ্র নাগের 'পথিক', সুরেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'চিত্রবহা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', বিভূতিভূষণ

মুখোপাধ্যায়ের গল্প, প্রবোধকুমার সান্যালের গল্প এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্প আমার ভালো লেগেছে। রাখালচন্দ্র সেনের 'সহযাত্রিণী' একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী। গদ্যের ক্ষেত্রে কাজী আব্দুল ওদুদের অনুভূতির গভীরতা ব্যাপক এবং ভাষার দখল অদ্ভুত। মাহবুব উল আলম, আবুল ফজল এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবও ক্ষমতার অধিকারী। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি গল্প এবং সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' আমার ভালো লেগেছে। 'ফসিলে'র লেখক জীবনকে দেখেছেন। অনুভব করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাস পড়েছি আগ্রহ নিয়ে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' ও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' একখানি অগ্রগণ্য নাটক। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ও গল্প শিল্পকৌশলে অদ্বিতীয়। কবিদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগে বিষ্ণু দে ও অজিত দত্তকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' অপূর্ব বই। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ও অমিয় চক্রবর্তীর বৈদগ্ধ্য আমাকে মুগ্ধ করে। আমার সঙ্গে স্বাভাবিক মিল (affinity) দিলীপকুমার রায় ও মণীন্দ্রলাল বসু এ দুজনের। এঁদের লেখা আমি ভালোবাসি। এঁরা আমার বন্ধু।

নিজের লেখা সম্পর্কে আমার মতামত কী, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল। তবে সম্প্রতি যে সব গল্প আমি লিখেছি তার মধ্যে 'দুকানকাটা' আমার নিজের ভালো লেগেছে। আমার পরীক্ষা এই গল্পের মধ্যে কিছুটা সার্থক হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

'পথে প্রবাসে'র মধ্যে আমার জীবনদর্শনকে পাওয়া যাবে।

পরবর্তী প্রশ্ন, পাঠকদের অথবা প্রকাশকদের সম্পর্কে আমার কোনো অভিযোগ আছে কিনা। না, নেই। আমার মনে হয় পাঠকরা আমাকে সাদরেই গ্রহণ করেছেন। প্রকাশকদের সম্পর্কেও সেই একই কথা। তবে অনেক সময় মনে হয়েছে তাঁরা যেন ঠিক উপযুক্ত যত্ন নিয়ে বই প্রকাশ করেননি।

সাহিত্যিকদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কতটুকু এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া একটু শক্ত। তবে আমার কথা বলতে পারি, সব কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে জীবনযাত্রার সামান্য কিছু ব্যবস্থা করে যদি সাহিত্যচর্চার অবকাশ আমাকে দেওয়া হয় তাহলে তাই আমার কাম্য। কিন্তু অপর দিকে সাহিত্যিকরা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে এসে পড়লে তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা যাবে নষ্ট হয়ে। লেখা হবে ফরমায়েসী। আমার লেখা পড়ে পাঠক খুশি হয়ে আমাকে দক্ষিণা দেবে, সেই দক্ষিণায় আমার জীবনযাত্রা নির্বাহ হবে এটাই আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের যা পাঠকসংখ্যা তাতে জীবনযাত্রার জন্যে অর্থ উপার্জন করতে হলে বেশী লিখতে হবে। তার তাহলেই লেখা খারাপ হতে বাধ্য। আমাদের পাঠকসংখ্যা যে সীমাবদ্ধ তার জন্য সমাজব্যবস্থা দায়ী। সমাজকে এমনভাবে গড়তে হবে যার ফলে প্রত্যেকে ভালো লেখাপড়া শিখবে এবং ভালো সাহিত্য বুঝবে। বুঝে তার দাম দেবে। এখন যেমন দাম দেয় ভালো গয়নার ভালো শাড়ীর, তখন দাম দিতে শিখবে ভালো কবিতা ও গল্পের।

লক্ষ লক্ষ লোক যদি এই পর্যায়ে উঠতে পারে তবে লেখকরাও যথেষ্ট দক্ষিণা পাবেন। কাজেই রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে পাঠকের প্রতি নির্ভরশীল হওয়াই সাহিত্যিকের উচিত। তবে যদি কোনো সাহিত্যিক অসুস্থ অথবা অকর্মণ্য হয়ে পড়েন তখন রাষ্ট্রের কর্তব্য তাঁর জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ করা। সুস্থ অবস্থায় আমরা অন্য কোনো কাজ করব আর তারই মধ্যে সাহিত্যের জন্যে অবকাশ করে নেব—এটাই আপাতত আমাদের করণীয়। তবে সাহিত্যকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

অনেকের দেখা যায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা লেখা ভালো বেরিয়ে গেল। কিন্তু পুরোপুরি আন্তরিকতার সঙ্গে সাহিত্যকে তাঁরা গ্রহণ করেননি। অর্থই প্রাধান্য লাভ করেছে। অর্থকে প্রাধান্য দিলে সাহিত্যের অবনতি হবেই।

সিনেমার কথা ধরা যাক। যাঁরা সিনেমার দিকে চোখ রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের হাতে কি সাহিত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকছে? না, থাকছে না। সাহিত্যের জন্যেই বই লিখতে হবে। তারপর যদি সে বই সিনেমা হয় আপত্তি নেই। তা বলে সিনেমার জন্যে বই লিখলেই সে বই খারাপ হবে এমন কথা বলছিনে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই দেখা যাচ্ছে। এমন অনেক বই আছে যা সিনেমায় ভালো হয়েছে অথচ সাহিত্য হিসেবে একেবারে ওৎরায়নি। সিনেমা সাহিত্যিকদের মস্ত বড়ো প্রলোভন। হয়তো এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আর্থিক সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হলেও এ প্রলোভনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত।

আপনাদের শেষ প্রশ্ন আমার সাহিত্যিক জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু ঘটনার স্মরণীয়তা শুধু সাহিত্যিক বলেই হয় না। ধরুন প্রেম। এ তো জীবনের বড়ো একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু এ ঘটনা যখন ঘটল তখন আমার সাহিত্যিক সত্তা কোথায়? হয়তো আত্মপ্রকাশই করেনি। কাজেই ঘটনার স্মরণীয়তা মানুষ হিসেবেই নির্ণয় করা ঠিক নয় কি? সাহিত্যিক এই ঘটনাকে অন্যের কাছে তুলে ধরতে পারে এই পর্যন্ত। কিন্তু সেও অত্যন্ত কঠিন কাজ। ধরুন আমার একটি ছেলে মারা গেছে। শোকের গভীরতা হৃদয়কে মুহ্যমান করে দিয়ে গেছে। আমি চেয়েছি এ অনুভূতিকে সাহিত্যে রূপ দিতে। কিন্তু পারিনি। কারণ তাহলে দ্বিতীয়বার আমাকে সেই দুঃসহ শোকের দাহকে অনুভব করতে হবে। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। আমার পক্ষে অসম্ভব। আবার আনন্দের ঘটনা দেখুন। বিয়ের পর প্রথম রাত্রির আনন্দকে সাহিত্যে প্রকাশ করতে হলে দ্বিতীয়বার আমাদের সেই অনুভূতির রাজ্যে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু এও অত্যন্ত কঠিন। তবে অন্যের কথা আমরা কল্পনার সাহায্যে লিখতে পারি। রবীন্দ্রনাথকে দেখুন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কতটুকু প্রতিফলন সাহিত্যে দেখেছি? অপেক্ষাকৃত কম গভীর অনুভূতিকে আমরা প্রকাশ করতে পারি। এর বেশী আমাদের ক্ষমতার বাইরে। চিন্তাপ্রধান লেখার থেকে অনুভূতি-প্রধান লেখা আরো দুরূহ। 'পথে প্রবাসে' লেখার সময় অনেক গভীর বেদনার

মধ্য দিয়ে গিয়েছি আমি। আমি যে হেসেছি, স্ফূর্তি করেছি এটাই আশ্চর্য মনে হয়েছে। কিন্তু এই সবকিছুর পেছনে আছে এক গভীর বেদনাবোধ। প্রত্যেক মহৎ সৃষ্টির পেছনেই বেদনার অনুভূতি কাজ করে যাচ্ছে। হয়তো সব সময় তা পরিস্ফুট নয়। তবু তার প্রভাব ছড়িয়ে আছে লেখার মধ্যে।

(১৯৪৭)

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহিত প্রশ্নোত্তরকালে দেবদাস পাঠক কর্তৃক শ্রুতিলিখিত ও পরে লেখক কর্তৃক সংশোধিত।

আমাদের সংগ্রাম

আমি মানবচরিত্রে বিশ্বাস হারাইনি, কারণ মানবচরিত্র অনন্ত সম্ভাবনায় ভরা। আজ যে শয়তান কাল সে সাধু, এ রকম তো মাঝে মাঝে দেখা যায়। নোয়াখালীর পরে আমার নিজেরই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এখনো মন খারাপ। তা হলেও আমি মানবচরিত্রে বিশ্বাস হারাইনি, হারাব না কোনোদিন। বহুকাল আমি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সেবা করেছি। সাহিত্যিক হিসেবে আমি উভয়ের জন্যে লিখি। একথা আমি ভাবতে পারিনে যে আমার লেখা শুধু হিন্দুরা পড়বে, মুসলমানরা পড়বে না। একদিন সাম্প্রদায়িকতার আগুন থামবে। উভয়ের মধ্যে যাঁরা হৃদয়বান, মনস্বী, চরিত্রবান তাঁরা হাত মেলাবেন। জনগণকে আমি চিনি। তারা অজ্ঞ হলেও নির্বোধ নয়। তারা আজ না বুঝলেও কাল বুঝবে কারা তাদের সত্যিকার বন্ধু, কারা কপট বন্ধু। তারা যদি বিভ্রান্ত না হতো, এসব দুষ্কর্ম ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হতো না। তাদের তথাকথিত বন্ধুরা তাদের বোকা বানিয়েছে, কিন্তু চিরকাল বোকা বানাতে পারবে না। "You can fool all people for sometime. You can fool some people for all time. But you cannot fool all people for all time."

আজকের নেতারা কাল কোথায় তলিয়ে যাবেন, কোথায় মিলিয়ে যাবে তাঁদের অলীক মরীচিকা। জনগণ তখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গড়ে তুলবে তাদের প্রজারাজ্য। সে রাজ্যের একটি স্তম্ভ কৃষক, আরেকটি শ্রমিক, আরেকটি কারিগর ও আরেকটি কবি। আমাদের কণ্ঠস্বর আজ কারো কানে পৌঁছচ্ছে না। আমি তো লেখা ছেড়ে দিয়েছি বললেও চলে। একদিন আমাদের কণ্ঠস্বর জনগণ সাগ্রহে শুনবে। আমাদের ডেকে নিয়ে সভা করবে। আজ আমি ধ্যানস্থ। আপনাকেও বলি ধ্যানস্থ হতে। সামনে হয়তো একটা গৃহযুদ্ধ আসছে। তাতে হয়তো আমরা বাঁচব না। কিন্তু বাঁচি আর মরি, ভবিষ্যতেও ধ্যান করব। তার জন্যে প্রস্তুত হব। এবং সময় উপস্থিত হলে, ভার নেব।

······বিশ্বাস বজায় রাখাটাই আমাদের সংগ্রাম।

(কলিকাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)

(পত্রখানি 'মানুষের মানচিত্র' পুস্তকের রচয়িতা আবদুর রহমানকে লেখা।)

দেশকালপাত্র

প্রবন্ধ সমগ্র—১৫

চেনাশোনা

১

এতকাল যার সঙ্গে ঘর করছি, এক একদিন তার দিকে তাকিয়ে মনে হয় না কি—কতটুকু এর চিনি !

তেমনি স্বদেশের !

স্বদেশকে আর একটু চিনতে চাই বলে বেড়াতে যাই। বেড়ানো বলতে বুঝি চেনাশোনা।

২

এমনি এক চেনাশোনার যোগাযোগ ঘটেছিল ১৯৩৮ সালে। আমরা বেড়াতে যাচ্ছি শুনে বম্বে থেকে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া লিখলেন তাঁর অতিথি হতে।

বম্বে যতবার দেখেছি ততবার নতুন লেগেছে। তার সম্বন্ধে আমার মোহ চিরদিনের। ভারতে কতকটা বহির্ভারতের স্বাদ পাওয়া যায় একমাত্র সেই দ্বীপটিতে। সমুদ্রগামী পোত। বিস্তীর্ণ নীলাম্বু। দিগ্বলয়ে বহুদর্শী সহ্যাদ্রি। দিগ্বিদিকে নানা দেশের নরনারী। কত সাজ, কত রং, কেমন বাহার। মনে হয় আধাআধি বিদেশে এসেছি, এবার জাহাজে উঠতে পারলে পুরোপুরি বিদেশ। দেশেরও এমনতরো বিচিত্র সঞ্চয়ন আর কই ?—ভারত দেখতে যাদের সময় নেই তারা শুধু বম্বে দেখে, তাহলে ভারত দর্শনের ফল হয়।

শ্রীমতী সোফিয়ার স্বামী সেই প্রসিদ্ধ ওয়াডিয়া যিনি গত মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে হোমরুল আন্দোলন করে মিসেস বেসান্টের সঙ্গে অন্তরীণ হয়েছিলেন। পরে ইনি পৃথক একটি থিওসফিস্ট সংস্থা সংগঠন করেন। ইনি পারসী, এঁর সহধর্মিণীর জন্ম বিদেশে। উভয়েই গভীরভাবে ভারতীয়। স্বামী পরেন মোটা খদ্দরের পায়জামা পাঞ্জাবি, স্ত্রী মিহি খদ্দরের শাড়ি। এঁদের সঙ্গে এক বাড়িতে স্বতন্ত্র থাকেন যে কয়টি পরিবার ও ব্যক্তি, তাঁদের কেউ ইংরাজ, কেউ আমেরিকান, কেউ নরওয়েজিয়ান, কেউ পারসী। এঁরা সকলে কিছু ভারতীয় ধারায় জীবনযাপন করেন না, বৈদেশিক পদ্ধতিও চলে। তবে ভারতীয়দের মর্যাদা মানেন। টাউনসেন্ড আপিস থেকে ফিরলে খদ্দরের পাঞ্জাবী পায়জামা পরে ভারতীয় হয়ে যান। টেনব্রুকের ছেলে তাই পরে ইস্কুলে যায়, মাথায় একটা গান্ধী টুপি। ছেলেটি গুজরাতী পড়ে, তার বোনটি তো পরিষ্কার গুজরাতী বলে।

ওয়াডিয়ারা নিরামিষাশী। শুধু তাই নয়, তাঁদের খোরাক খাদি ভান্ডারের ঢেঁকিছাঁটা বা হাতে-ছাঁটা চালের ভাত। তার সঙ্গে সংগতি রেখে ডাল তরকারি ফলমূল চাপাটি। আমাদের জিজ্ঞাসা করা হলো আমরা কোন রীতি পছন্দ করি। আমরা ছিলুম ঘোর আমিষাশী, কিন্তু অপাংক্তেয় হতে ইচ্ছা ছিল না। তাই ওঁদের রীতি বরণ করলুম। ভাগ্যক্রমে দেশী পোষাক সঙ্গে ছিল। নইলে আমার ময়ূরপুচ্ছ আমাকে নাকাল করত।

পান্ডে নামে এক ভদ্রলোক এসে আমাদের তত্ত্বাবধান করেন। ঠাওরেছিলুম

কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। চেহারাটাও অনেকটা সেইরকম বা তার চেয়ে ভালো। কিন্তু শুনে অবাক হলুম তিনি পারসী। পারসীদের নাম যে পাণ্ডে হয়, তা কী করে জানব? পরে একটি পারসী বিবাহে বরযাত্রী হয়ে পংক্তিভোজনে বসে দেখি পরিবেশকরা অবিকল রাঁধুনী বামুন। অথচ পারসী। পারসীদের সবাই বড়োলোক নয়। এমন কি মধ্যবিত্তও নয়। পাছে পরে লিখতে ভুলে যাই সেই-জন্যে এখনি বলে রাখি যে, নেমন্তন্ন খেয়েছিলুম কলাপাতায়, যদিও টেবিলের উপর। পারসীরা যে গোঘ্ন তা বোধ হয় অজানা নয়, কিন্তু ক'জন খোঁজ রাখেন যে তারা উপবীতধারী? তাদের বিয়ের মন্ত্র অংশত সংস্কৃত।

পাণ্ডে মহাশয়ের কাছে ছিল সেদিনকার খবরের কাগজ। পড়লুম পণ্ডিত জবহরলাল নেহরুর প্রত্যাবর্তন সমাচার। পরের দিন তাঁকে আজাদ ময়দানে অভ্যর্থনা করা হবে। মনস্থ করলুম যাব। শুনতে হবে তাঁর স্পেনের অভিজ্ঞতা।

পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত তখন বম্বেতে কাজ করেন, তাঁকে পাকড়ানো গেল। তিনি ও আমি আজাদ ময়দান অর্থাৎ এসপ্লানেড ময়দানে গিয়ে রবাহূতদের ভিড়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু দাঁড়াতে দিলে তো? কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ার, পরনে খাকী শার্ট হাফ-প্যাণ্ট, পুলিসী স্বরে বললেন, "বৈঠ্ যাও।" রামরাজ্যে কেউ কাউকে 'আপনি' বলবে কি না বোঝা গেল না, অন্তত ভলাণ্টিয়ারের মুখে তার নমুনা ছিল না। বোধ হয় পোষাকটার স্বভাব এই যে, পরলেই মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। লঙ্কায় গেলে যদি রাক্ষস হয়, তবে খাকী পরলে খোক্‌কস হয়।

ঘাসের ওপর পা মেলে দিয়ে আরাম করে বসবার মতো জায়গা যতক্ষণ খালি ছিল ততক্ষণ আমরা পণ্ডিতজীর প্রতীক্ষা করলুম। মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত স্থানীয় নেতারা জনতার ধৈর্য বিধান করতে গান জুড়ে দিলেন; তাতেও ধৈর্য রক্ষা হয় না দেখে শঙ্কররাওজী শুরু করে দিলেন বক্তৃতা। বাগ্মী বলে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে, অযথা নয়।

আমাদের পাঠ্য জুটে গেল একখানি কমিউনিস্ট পত্রিকা। সেখানি কিনতে হলো একটি নীলকৃষ্ণ স্কার্ট পরা বালিকার কাছে। মেয়েটি পারসী কি মুসলিম কি হিন্দু তা বুঝতে দেওয়া হয়তো সাম্যবাদীদের নীতিবিরুদ্ধ। অথবা যে-কোনো প্রকার ভারতীয়তাই তাদের পক্ষে আপত্তিকর ফ্যাসিস্টতা। আমার কিন্তু ধারণা, যে কারণে জাতীয় পতাকাধারীর অঙ্গে খাকী হাফ-প্যাণ্ট ও শার্ট, সেই একই কারণে রক্ত নিশানধারিণীর পরিধানে স্কার্ট। কারণটা আর কিছু নয়, শাসক ও শোষককুলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি। আমরা ইংরাজকে চাইনে, কিন্তু ইংরেজীকে চাই। আমরা কায়ায় ইংরাজ নই, কিন্তু মনোবাক্যে ইংরাজ।

তা কমিউনিস্টরা উদ্যোগী বটে। বাঘের ঘরে ঘোগের মতো কংগ্রেসী জন-সভায় সাম্যবাদী ইস্তাহার। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের—অন্তত কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডলীর—নিন্দাবাদ। তখনো আন্দাজ করিনি যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে

গৃহবিবাদের উদ্যোগপর্ব চলেছে। তখনো ত্রিপুরীর ঢের দেরী।

অন্ধকার হলো। জবহরলালজীর পথ চেয়ে আমাদের মুখচোখ লাল হলো। বেরিয়ে আসছি এমন সময় ব্যাণ্ড বেজে উঠল মনে পড়ে। নহবত নয়, লাউড স্পীকারে শোনা গেল তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ, কিন্তু সন্ধ্যার আবছায়ায় স্পষ্ট দেখা গেল না তাঁর দণ্ডায়মান মূর্তি।

রাজপথের উপর খাড়া হয়ে গৃহিণীদ্বয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি, তাঁরা ছিলেন মহিলাবিভাগে। এবার রামরাজ্যের পুলিস নয়, সাম্রাজ্যের পুলিস এসে হট্‌তে হুকুম দিল। বাপ রে! সে কী পুলিস সমাবেশ! পণ্ডিতজীর সম্বর্ধনার জন্যে কংগ্রেসমন্ত্রীরা স্বয়ং না আসুন, সান্ত্রী প্রেরণ করেছিলেন অগণ্য। গোরা সার্জেণ্ট এমন কড়া পাহারা দিচ্ছিল যে রাস্তায় একটিও পদাতিক ছিল না।

জীবনসঙ্গিনীদের সাক্ষাৎ পেয়ে জীবন ফিরে পাচ্ছি, হেনকালে আলাপ হয়ে গেল জবহরভগিনী কৃষ্ণার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আরো দু'একজন মহিলা ছিলেন, বোধ হয় সরোজিনী নাইডু মহাশয়ার ভগিনীও। এঁদের কাছে সংবাদ মিলল যে, দিন দুই পরে ওয়েস্ট এণ্ড সিনেমায় চীন ও স্পেন বিষয়ক ফিল্ম প্রদর্শিত হবে। উপস্থিত থাকবেন ও উদ্বোধন করবেন জবহরলাল। টিকিট চেষ্টা করলে এখনো কিনতে পাওয়া যায়, সে ভার দাশগুপ্ত নিলেন। তিনি একটা ঘরোয়া নিমন্ত্রণের যোগাড়ে দিলেন, কিন্তু শ্রীমতী কৃষ্ণা বললেন তাঁর দাদা দারুণ ব্যস্ত, স্পেনের জনগণের জন্যে এক জাহাজ খাদ্য পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছেন।

৩

ওয়েস্ট এণ্ড সিনেমায় ফিল্ম দুটি দেখানো হলো দুপুরের আগে। চীনের গেরিলা যুদ্ধ। চু তে। মাওৎ সে তুং। স্পেনের ধ্বংসলীলা। নো পাসারান। রোমাঞ্চকর দৃশ্য। আমরা তো ছায়ামাত্র দেখে শিউরে উঠছি, ওদিকে ওরা বাস্তবের সঙ্গে হাতাহাতি করছে।

করবার কিছুই নেই। শুদ্ধ অনুভব করি। সহানুভবী আমরা ঘরসুদ্ধ লোক। কারো মুখে পাইপ, কারো পরনে জর্জেট। বম্বের শৌখিন সমাজের অনেকেই সমুপস্থিত। গান্ধী টুপিও সংখ্যায় কম নয়। আবহাওয়াটা কস্‌মোপলিটান। সামনের সারিতে বসেছিলেন জবহরলাল, উঠে কয়েকটি কথা ইংরেজীতে বললেন। যাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি তাঁর স্পেনের অভিজ্ঞতা সচিত্র করবেন তাঁরা নিরাশ হলেন। তা বলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ওটা তো সভা নয়, ওখানে আমাদের কাজ ছবি দেখা, জবহরলালের সঙ্গে ছবি দেখা।

তিনি বাগ্মী নন। তাঁর বক্তৃতা যেন বক্তৃতা নয়, একটু উঁচু গলার কথাবার্তা। সম্ভবত আতসবাজির আর্ট তাঁর অজানা। মনে হলো বেশ সহজ সরল মানুষ তিনি। খেয়ালীও বটে। হঠাৎ এক সময় উঠে গেলেন, শুনলুম তাঁর ভালো লাগে না নিজের প্রশস্তি। সভাপতি না কে যেন সেই সময় তাঁর গুণগান করছিলেন। দেখলুম তিনি বাইরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

সেদিন আলাপ হলো কয়েক জনের সঙ্গে। চীন ও স্পেনের জন্যে সত্যিকার মাথাব্যথা যাঁদের, তেমন কারো কারো সঙ্গেও। তাঁরাই এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা, সংগৃহীত অর্থ চীনদেশে পাঠিয়ে তাঁরা মানবের প্রতি মানবকৃত্য করছেন। এই ফ্যাশনের জনতায় তাঁদের নিরাভরণ নির্জিত রূপ কেমন একটা করুণ ছাপ রেখে যায়। দরদী হবার অধিকার তাঁদেরই, আমরা তো সংসারী লোক। একটু পুণ্য করতে এসেছি।

পরের দিন আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ায়। নিমন্ত্রাতা সরোজ চৌধুরী ক্লাবেই ঘরগৃহস্থালী পাতিয়েছেন। চিরকুমারের পক্ষে ওর চেয়ে আরাম আর নেই। সেকালের বৌদ্ধ বিহারের আধুনিক সংস্করণ এই সব ক্লাব, সঙ্ঘারামের আরাম তথা সঙ্ঘ দুই-ই রয়েছে এতে।

অথচ হুবহু বিলিতী ব্যাপার, অফ ইণ্ডিয়াটুকু প্রক্ষিপ্ত। ক্রিকেট কথাটাও প্রক্ষিপ্ত না হোক, উৎক্ষিপ্ত। কারণ সেখানকার সভ্যেরা কদাচিৎ খেলোয়াড়, অধিকাংশই সামাজিকতার সুযোগসুবিধার দ্বারা আকৃষ্ট। কাজের সময় কাজ, ছুটির সময় ক্লাব, এই মহাতত্ত্ব জগতের প্রতি ইংলণ্ডের দান। পৃথিবীময় যার অনুকরণ হচ্ছে, ভারতে তার অনুকরণ মার্জনীয়।

চৌধুরী সুদীর্ঘকাল বম্বের নাগরিক। একটি ইংরাজ কোম্পানীর জেনারল ম্যানেজার। তথা পার্টনার। কলকাতা হলে এঁর মতো বড়ো সাহেব বোধ হয় বাংলা বলতেন না, কিন্তু বম্বের একটা বিশিষ্টতা হচ্ছে এখানকার স্বাধীন-জীবীরা স্বাধীনচেতা। বিদেশীর সঙ্গে সমান হতে গিয়ে এঁরা স্বজাতির নাগালের বাইরে চলে যান না। পক্ষান্তরে পরদেশীর পরশ বাঁচিয়ে গদির উপরে লক্ষ্মীর বাহনটির মতো রাতদিন বসে থাকেন না।

চৌধুরীর ডিনারে এক বাঙালীর মেয়ে আমাকে চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন আমার সহধর্মিণীর সীমন্ত রক্তিম কেন?—আমি বললুম, ও যে সিঁদুর। তিনি জানতে চাইলেন, সিঁদুর কেন? আমার ধারণা ছিল হিঁদুর সঙ্গে সিঁদুর এমন অবিচ্ছিন্ন যে, ভূভারতে কেউ নয় সে বিষয়ে অজ্ঞ। খোঁজ নিয়ে বোঝা গেল তিনি কোনো দিন বাংলা দেশে যাননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিস্ময় দূর হয় না। বাংলা দেশে না যান, হিন্দুস্থানে তো রয়েছেন। আমার বন্ধুরা ব্যাখ্যা করলেন যে, সীমন্তে সিন্দুর পশ্চিম ভারতের প্রথা নয়, হিন্দুর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ প্রাদেশিক সীমান্তেই নিবন্ধ। তাই তো! পশ্চিম ভারতে এ প্রথা নেই, দক্ষিণ ভারতেও না। উত্তর ভারত সম্বন্ধে নিশ্চিত নই। তবে এটা বঙ্গের বিশেষত্ব। উৎকলেরও। বোধ হয় আসাম ও মিথিলারও। এসব প্রদেশ চীনদেশের নিকটে বলেই কি? চীনদেশ থেকে খাঁটি সিঁদুর আসে বলেই কি? বলিদানের রক্ত কপালে মাখতে মাখতে সেই অভ্যাস থেকে এই অভ্যাস জন্মায়নি তো? তন্ত্রপ্রধান অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব কি তন্ত্রপ্রভাবের সাক্ষী?

তার পরের দিন বিচারপতি সেন মহাশয়ের সদনে মরাঠী সাহিত্যিকদের আসরে আমার নিমন্ত্রণ। ক্ষিতীশচন্দ্র একদা রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নাটকটি রাজভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। "বলাকা"র কয়েকটি কবিতার গদ্যানুবাদও

তাঁর সুকৃতি। তাঁর আজকাল অবসর নেই, কিন্তু লেখার হাত এখনো আছে, চিঠিপত্রে ধরা পড়ে। তাঁর বাংলা লেখা তাঁর অন্তরঙ্গদের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগায় যে, কেন তিনি এমন ক্ষমতার অনুশীলন করেন না? অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো যে রসপ্রবাহ তাঁর হৃদয় আর্দ্র করেছে, তাঁর আলাপ আলোচনাও সেই রসে সিক্ত। বিচারপতি হয়ে তিনি মথুরাপতি হননি, সব বয়সের ও সব অবস্থার মানুষ তাঁর কাছে অভয় পায়, পায় আন্তরিক অমায়িকতা।

অভ্যাগতদের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন মামা বারেরকর। অন্তস্থ ব। মহারাষ্ট্রে তাঁর নাটকনাটিকার খ্যাতি তাঁকে সর্বজনের মাতুলসম্পর্কীয় করেছে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম মামা নয়। মামা বারেরকর, কাকা কালেলকর, দাদা ধর্মাধিকারী—এ ধরনের সার্বজনীন সম্পর্কসূচক নাম মহারাষ্ট্রেই চলে। কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, রাজনীতিক্ষেত্রেও। নানা সাহেব, নানা ফড়নাবীশ, এসব নাম এখন ইতিহাসের পাতায়। মাধব শ্রীহরি অণে মহাশয়কে বাপুজী অণে বলা হয়।

এটি সম্ভব সে প্রদেশের পদবীগুলি মুখুয্যে বাঁড়ুয্যে ঘোষ বোসের মতো সুলভ নয় বলে। বাংলা দেশের জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে অন্তত জন-দুই চাটুয্যে, জন-তিনেক মুখুয্যে, জনা পাঁচ ছয় বাঁড়ুয্যে ছিলেন ও আছেন। কাকেই বা মামা বলে ডাকি, কাকেই বা খুড়ো বলে? চাচা ইসলাম ও মামু আহমদ বললে কে কে সাড়া দেবেন? মরাঠী লেখিকারা পিতা ও পতির পদবী অম্লানবদনে আত্মসাৎ করেন। যথা কমলাবাই দেশপাণ্ডে। বাংলায় কিন্তু দেবীদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি না হোক তেত্রিশ তো বটেই। কা দেবী সর্বভূতানাং মাসীরূপেণ সংস্থিতা?

যা হোক, আমাদের মামা একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার। তাঁর সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কথাবার্তা হলো। মামা বললেন, তাঁর প্রদেশে বাংলার মতো ব্যবসায়িক রঙ্গালয় নেই, যা আছে তা শখের। তাতে অভিনেত্রীর অভাব। মরাঠী মেয়েরা ইদানীং সিনেমায় যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই কুলাঙ্গনা ও বিদুষী। কিন্তু থিয়েটারে একজনও প্রবেশ করছেন না। মামা চেষ্টা করছেন অন্তত একটি শখের সম্প্রদায় গড়তে। তাতে মেয়েরাও থাকবেন। এ হলো চার বছর আগের হালচাল। ইতিমধ্যে হাওয়া হয়তো বদলেছে।

৪

মালাবার পাহাড়ের সমুদ্রতীর ছোটবড়ো শিলাখণ্ডে বন্ধুর। সেখানে বিহারের স্থান সংকীর্ণ, স্নানেরও পরিসর নেই। কোনো মতে একটা ডুব দিয়ে উঠে আসা তো স্নান কিংবা অবগাহন নয়। চেষ্টা করলে সেখানেও প্রোমেনাড নির্মাণ করা যেত, কিন্তু জমির দাম এত বেশী যে বাড়ি তৈরির দিকেই নাগরিকদের ঝোঁক। তা ছাড়া পাহাড় ধোওয়া ময়লা জল সেখান দিয়ে নেমে সমুদ্রের জলে মেশে। সেটা অবশ্য বর্ষায়। অন্য সময়েও নর্দমার সঙ্গে সমুদ্রের প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ থাকায় মাঝে মাঝে একটা গন্ধ ওঠে, নাকে রুমাল দিতে হয়। এইসব কারণে

কেউ সমুদ্রের ধারে ফিরে তাকায় না, বাড়িগুলো পশ্চিমমুখী না হয়ে পূর্ব-মুখী। তবে সূর্যাস্তের বিশাল মহিমা উপলব্ধি করবার জন্যে বাতায়ন খোলা রাখে। আরব সাগরের সূর্যাস্ত ভারতবর্ষের একটা দৃশ্য।

মালাবার পাহাড়ের অপর প্রান্তের এক কোণে চৌপাটি। সেখানে বালুর উপর পায়চারি করে লোকজনের মেলায় আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যাবেলাটা কাটে। মরাঠা মেয়েরা যায় খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে। সাদা ফুল। মাথায় কাপড় দেওয়ার বিধি কেবল বিধবাদের বেলায় মহারাষ্ট্রে। কারণ তাদের কেশদাম মুণ্ডিত বা কর্তিত। সাদা ফুলের কুণ্ডলী দেখে চমক লাগে, সৌরভে নিঃশ্বাস আকুল হয়। প্রকৃতির দেওয়া এই আভরণের কাছে সোনারূপা নিষ্প্রভ, আতর এসেন্স অকিঞ্চিৎকর। গুজরাতী পারসী ললনারা কিন্তু আমাদেরই মতো লজ্জাবতী ও সাজসজ্জায় কৃত্রিমতার পক্ষপাতী। তা হলেও গুজরাতীদের প্রসাধন তাদের ঐশ্বর্যের পরিচয় বহন করে না, তারা সুসংবৃত হয়েই সন্তুষ্ট। তাদের মধ্যে আমি এমন একটা সুষমার সন্ধান পাই যা নিসর্গেরই দান। মহারাষ্ট্রীয়েরা বহু শতাব্দী ধরে মানুষ হয়েছে পাহাড়ে পর্বতে, গুজরাতীরা সমতলে ও সমুদ্রবক্ষে। পারসীদের বসনভূষণের সমারোহ বোধ হয় ইরানী উত্তরাধিকার। ধনের সঙ্গে ওর গভীর সম্পর্ক নেই, কেননা ধনিক পরিবারেও আমি অকপট সারল্য লক্ষ করেছি।

যাদের মোটর আছে তাদের মোটরে করে বেড়ানোর জন্যে মেরিন ড্রাইভ। সমুদ্রের পাড় ধরে এই সড়কটি আগে ছিল না, সমুদ্রকে হটিয়ে দিয়ে তার কবল থেকে যে জমিটুকু উদ্ধার করা হয়, এটি তারই সামিল। এক দিকে আরব সাগরের পশ্চাদ্‌ উপসাগর, ব্যাক বে। অপর দিকে অত্যাধুনিক হর্ম্য। কোনোটি সদ্য নির্মিত, কোনোটি অসমাপ্ত। কালক্রমে এটি মালাবার পাহাড়েরই মতো ফ্যাশনেবল জনারণ্য হবে, মোটরিস্টদের ভূস্বর্গ।

ব্যাক বে দেখে তৃপ্তি হয় না। আমার ভালো লাগে মুক্ত পারাবার। খিড়কির চেয়ে সদর শ্রেয়। সদরের খোঁজে একদিন আমরা শহরের উত্তরে যাত্রা করলুম, হাজির হলুম জুহুতে। জুহুর সমুদ্র পুরীর মতো অবারিত, প্রশস্ত বালুশয্যা দিগন্তে মিশেছে। দূর থেকে অয়শ্চক্রের মতো দেখায় কি না জানিনে, কিন্তু বেলাভূমি বঙ্কিমাকৃতি। তমালতালীবনরাজি না হোক, নারিকেলসারি ঘন সাজে সেজেছে। পাশাপাশি অনেকগুলো বাংলো, কোনোটি যথেষ্ট জায়গা জোড়েনি, গাছের ছায়ায় ঝাড়ের মতো গজিয়েছে। তাদের একটেরে ঘোষ বলে একজন ইঞ্জিনিয়ার বাস করেন, কাজ তাঁর জুহুর এরোড্রোমে। ঘোষ তখন কাজে বেরিয়েছেন, খবর পাননি যে আমরা আক্রমণ করছি। ঘোষের কেউ নেই, জুহুর সেই হুহু করা হাওয়ায় নারিকেলের পল্লবমর্মরে তাঁর সেই ঘোষবতী বীণার মতো কুটীরখানিতে চিরন্তন উদয়নের চিরনতুন ঝংকার উঠছে—শূন্য মন্দির মোর। শূন্য মন্দির মোর।

মানুষের অদৃষ্টে সুখ নেই। সাধ ছিল জুহুতে ঢেউয়ের পিঠে সওয়ার হয়ে সাঁতার কাটব। শুনলুম ঢেউ যেখানে আছে তত দূর গিয়ে কেউ কেউ

আরো দূরে চালিত হয়েছে জলজন্তুর জলপানি হতে। শুনে আর সাঁতার কাটা হলো না। হাঁটুজলে হামাগুড়ি দিয়ে জলকেলি সাঙ্গ করলুম। তার পরে ঘোষের চৌবাচ্চায় আমার তিন বাচ্চার অনধিকার প্রবেশ ও অঙ্গ প্রক্ষালন। তবে দিনটা মন্দ কাটল না। বালুর উপর ঝিনুক কুড়ানো, বাড়ি বানানো, পায়চারি থেকে ছুটোছুটি সবই করা গেল সপরিবারে ও সবান্ধবে। দাশগুপ্তরা ছিলেন, চৌধুরীও।

জুহুর সঙ্গে জুজুর সম্পর্ক কাল্পনিক না বাস্তবিক তা বোঝা যায় না, যখন দেখি জেলেরা ঢেউয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, জেলেনীরা জাল ধরে টানছে। ভয়ংকরের প্রতি ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাবছিলুম নারী তো পুরুষের বহিঃসঙ্গিনীও বটে, শুধু গৃহসঙ্গিনী নয়। শ্রমিক শ্রেণীতে এটা স্বতঃস্বীকৃত, যত বিতর্ক কেবল পরাসক্ত শ্রেণীর বেলায়। পুরুষেরা পরগাছা বলে মেয়েরাও পরগাছা।

সেদিন জুহু থেকে ফিরে বেশ পরিবর্তন করে বরযাত্রী হতে হলো। নিমন্ত্রণ করেছিলেন জহাঙ্গীর ব্যাঙ্কার ও তাঁর পত্নী। তাঁদের পুত্র হোমির শুভ বিবাহ। নিমন্ত্রণপত্রে কন্যার নাম তো ছিলই, ছিল কন্যাকর্তা ও কন্যাকর্ত্রীর নামও। নিমন্ত্রণপত্রটি ইংরেজী ভাষায়। বরের ভগিনী থিয়সফিস্ট, সম্ভবত ওয়াডিয়াদের জ্ঞাতি। তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন বিবাহমণ্ডপে।

পারসীদের বিবাহ হয় এমন একটি স্থানে যেটি বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষ কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়। খ্রীষ্টানদের যেমন গির্জায় গিয়ে দু'পক্ষের মিলন হয় পারসীদের তেমনি এক বারোয়ারিতলায়। তার মালিক পারসীসমাজ। আমরা যেখানে নীত হলুম সেখানটার নাম অল ব্লেস বাগ। All-bless একটি ইংরেজী সমাস, মানে সর্বমঙ্গল। শোনা যায় এক পারসী কুবেরের ঐ পদবী ছিল, তিনিই সমাজকে ঐ ভূখণ্ড দান করে গেছেন। আর baug মানে বাঘ-ভালুক নয়, বাগবাগিচা। যেমন আরামবাগ। ভূখণ্ডের উপর মণ্ডপ ও অন্যান্য কয়েকটি ভবন বিবাহকালে ব্যবহার করার অধিকার যে কোনো পারসীর আছে, তবে তার জন্যে অনুমতি নিতে হয় ন্যাসীমণ্ডলীর। বোধ হয় কিছু চাঁদাও দিতে হয় ব্যবহারের বিনিময়ে। এই রকম বাগ বম্বে শহরে আরো কয়েকটি আছে, নইলে এক রাত্রে একাধিক শুভকর্ম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত।

মণ্ডপের প্রাঙ্গণে সারি সারি চেয়ার, লক্ষ করিনি কোনগুলি কোন পক্ষের। মনে হলো তেমন কোনো সীমানির্দেশ নেই, উভয়পক্ষের যাত্রীযাত্রিণীরা নির্বিশেষে সমাসীন। আমরা গিয়ে দেখি প্রভূত জনসমাগম। প্রায় সকলেই পারসী। ব্যাঙ্কার ও তাঁর সহধর্মিণী এসে অভ্যর্থনা করলেন, ঠাঁই করে দিলেন সামনের দিকে। তাঁরা যে কেবল ভদ্র তাই নয়, অত্যন্ত সরল ও স্নেহশীল। নানা ভাবে পশ্চিমের অনুকরণ করলেও অন্তরে তাঁরা পূবদেশী। আমার তো একবারও বোধ হলো না যে ইউরোপে এসেছি। ঠাট বদলেছে, কিন্তু প্রাচ্য আন্তরিকতা তেমনি রয়েছে। তেমনি মাসীপিসীর মতো মানুষটি বরের মা। তাঁর কোথাও একরত্তি মেমসাহেবিয়ানা নেই।

পারসীদের সকলের পরিধানে সাদা পোষাক। আমিই একমাত্র কৃষ্ণ মেষ। সারাক্ষণ কুণ্ঠিত ভাবে বসেছিলুম, কী দেখলুম কী শুনলুম সব স্মরণ নেই। মণ্ডপের তিন দিকে জুঁই ফুলের সাজসজ্জা, এক দিক খোলা। সেটি অবশ্য সামনের দিক। মণ্ডপে আসবার পথে বরের মায়ের সঙ্গে কনের মায়ের ডালি বিনিময় হলো। ডালিতে ছিল শাড়ি, নারিকেল ইত্যাদি। তার পরে বরের মা দিলেন কনেকে উপহার, আর কনের মা বরকে। তার পরে বর কনে দু'জনে বসলেন মণ্ডপের উপর দু'খানি উচ্চাসনে। যেন রাজা ও রানি। দু'জনের দু'দিকে দু'পক্ষের পুরোহিত দাঁড়িয়ে। বরের কাছে কন্যাপক্ষের পুরোহিত, কনের কাছে বরপক্ষের পুরোহিত। পুরোহিত ব্যতীত আরো দু'জন ছিলেন, সাক্ষী কিংবা best men। পুরোহিতেরা পরম উৎসাহে বরকন্যার অঙ্গে তুণ্ডুল নিক্ষেপ করতে থাকলেন, উচ্চারণ করতে থাকলেন অবেস্তার মন্ত্র। মন্ত্রের মধ্যে সংস্কৃত ছিল। বোধ হয় দীর্ঘকাল ভারতে বাস করে ওটুকু গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা হিন্দু ও ইরানী উভয়েরই পূর্বপুরুষ এক, ভাষাও মূলত তাই। যা হোক পুরোহিতদ্বয়ের পরাক্রম দেখে স্থির করলুম পরজন্মে পারসী হব না। হলে তো কানে ঢুকবে মন্ত্রের বুলেট, চোখে বিঁধবে চালের কার্তুজ। রাজা হয়ে মজা নেই, যদি রানির পুরোহিত হিতে বিপরীত করেন।

এর পরে সিভিল রেজিস্ট্রেশন। দেখা গেল পারসীরা কোনো অনুষ্ঠান বাদ দেননি। তা হোক, সবই সংক্ষিপ্ত। হিন্দু বিবাহের তুলনায় সময় লাগল সিকির সিকি ভাগ। মাঝে মাঝে নহবতের বদলে ইউরোপীয় নাচের অর্কেস্ট্রা বাজছিল। শেষ হলো যতদূর মনে পড়ে ইউরোপীয় কণ্ঠসংগীতে। অতঃপর পংক্তিভোজন। সারি সারি টেবিল চেয়ার, বিরাট ব্যাঙ্কেট। তবে ঐ যে—কলার পাতায় বিলিতী ফলার। বিলিতী মদিরাও ছিল, খুরিতে কি কাচের প্লাসে ঠিক স্মরণ নেই। হাঁড়ি হাতে রাঁধুনী বামুন গম্ভীর ভাবে চলছেন সামনে দিয়ে, হাতা দিয়ে তুলে দিচ্ছেন যার যা দরকার। দেশী বিদেশী হিন্দু খ্রীষ্টান বিভিন্ন আচার মিলিয়ে সে এক অপূর্ব সমন্বয়। যেমন কস্‌মোপলিটান বম্বে শহর তেমনি কসমোপলিটান তার অগ্রণী সম্প্রদায়।

হোমি ও তাঁর সদ্যপরিণীতা বধূ ভোজনরতদের তত্ত্বাবধান করে গেলেন। একসঙ্গে বৌভাত সারা হলো। সময়সংক্ষেপের মতো ব্যয়সংক্ষেপও ঘটল। পারসীদের কাছে আমাদের অনেক শেখবার আছে, তবে ঐ নাচের অর্কেস্ট্রাটি বাজে খরচ। বিদায়কালে ব্যাঙ্কারগৃহিণী ও তাঁর কুমারী কন্যা আমাদের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন সযত্নে। এটি বড়ো সুন্দর প্রথা। যেমন সুন্দর ঐ যূথিকাবিতান।

সন্ধ্যায় আরম্ভ, রাত দশটায় শেষ। উৎসব বলতে আমি এই বুঝি, যাতে নিদ্রার ব্যত্যয় নেই। পারসীরা কাজের লোক, রাতের ঘুম মাটি হলে দিনের কাজ মাটি হবে, এটুকু বিবেচনা আছে। তাই উৎসবকে অনিয়ম বলে ভুল করেনি। কিন্তু একান্ত নিঃশব্দপ্রকৃতি তারা, এত বড়ো উৎসবেও কলরব করেনি। আমি কিন্তু হৈচৈ ভালোবাসি। বিয়ের সময় না হোক, ভোজের সময়।

৫

শহরের সাহিত্যিক ও সাহিত্যে আগ্রহীদের সঙ্গে যাতে আমাদের আলাপ পরিচয় হয় তার জন্যে একটি উদ্যান সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে গুজরাতী সমালোচক ঝাবেরীর ও গুজরাতী লেখিকা লীলাবতী মুন্‌শীর প্রদেশের বাইরেও সুনাম আছে। লীলাবতীর স্বামী কন্‌হাইয়ালাল কংগ্রেসমন্ত্রীমণ্ডলীর উজ্জ্বলতম রত্ন। তিনি যে গুজরাতী সাহিত্যেরও উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক এ সংবাদ সকলে রাখে না। উপরন্তু তিনি একজন সমাজসংস্কারক। অসবর্ণ বিবাহের পথিকৃৎ। সেদিন তিনি শহরে ছিলেন না।

তৈয়বজী পরিবারের ফৈয়জ ও তাঁর পত্নী সেখানে ছিলেন। বম্বের মুসলমানদের এক প্রকার বিশিষ্ট পরিচ্ছদ আছে, ফৈয়জ তাই পরেছিলেন। আচকানের বদলে আলখাল্লার মতো, ফেজের পরিবর্তে সোনালী পাগড়ি, যতদূর মনে পড়ে। তাঁর পত্নীর পরিধানে শাড়ি। তবে তাতেও বোধ হয় বিশেষত্ব ছিল। শাড়ি আজকাল সকলেই পরেন, কিন্তু পারসীরা যেমন করে পরেন মুসলমানেরা তেমন করে পরেন না, গুজরাতীরা যে ঢঙে পরেন মরাঠীরা সে ঢঙে না। ক্রমশ একটা নির্বিশেষ রীতি বিবর্তিত হচ্ছে সেটা বিলেত না গেলে মালুম হয় না। সেখানে ভারতীয় মহিলা মাত্রেরই নিখিল ভারতীয় রীতি।

আর ছিলেন কুমারাপ্পাদের এক ভাই, সস্ত্রীক। এঁরা শ্রমিকদের বস্তিতে কর্মীদের শিক্ষালয় চালান। মিসেস নায়ার। এঁর স্বামী ডাক্তার নায়ার ছিলেন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ, প্রায় সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেছেন চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্যে। একটি হাসপাতাল, একটি মেডিকেল স্কুল না কলেজ, এমনি আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চলে তাঁর সদাব্রতে। কোয়াসজী জহাঙ্গীর-ভগিনী মিসেস সবাওয়ালা। অল্পবিত্ত পারসী মহিলাদের জন্যে ইনি ও এঁর সহকর্মিণীরা মিলে একটি শিক্ষাসত্র খুলেছেন, সেখানে যতরকম হাতের কাজ শেখানো হয়। হাজার হাজার পারসী দুপুর বেলা আপিসে বসে এঁদের কাছ থেকে কেনা টিফিন খেয়ে এঁদের সাহায্য করেন। বহু পারসী পরিবারে এঁরা কেক বিস্কুট জ্যাম জেলি সরবরাহ করেন। শাড়ি বোনা, শাড়ির পাড় তৈরি, দরজির কাজ, সূক্ষ্ম সেলাই, মাখন তোলা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাপার এঁদের আটটি বিভাগকে ব্যাপৃত রাখে। এইভাবে অসংখ্য মেয়ে দিনে অন্তত আট আনা রোজগার করে। একটি বাড়ির চারটি মেয়ে মিলে দিনে দুটি করে টাকা রোজগার করলে মাসে অন্তত পঞ্চাশটি টাকা। দক্ষতা অনুসারে উপার্জন বাড়ে।

পরিচয় দিতে দিতে নিতে নিতে পার্টির হাট ভাঙল। হাটের মতো পার্টিও ভাঙে আরেক দিন জোড়া লাগতে। সেদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেলেন শ্রীমতী লীলাবতী মুন্‌শী। মুন্‌শীরা বাড়ি করেছেন ওর্লি শহরতলীতে। সমুদ্রের ধারে প্রোমেনাড, তার ওধারে বাড়ি। কন্‌হাইয়ালাল বাড়ি ছিলেন না, মন্ত্রীর কাজে যন্ত্রের মতো ঘুরছিলেন মফঃস্বলে। সাহিত্য সম্বন্ধে যে দু-চার কথা হলো তার এইটুকু স্মরণ আছে যে বাংলার মতো গুজরাতীতেও

আধুনিকতার বাহন হয়েছেন প্রাচীন সংস্কৃত। গান্ধীজী যে পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রাকৃতি জনের খাতিরে প্রাকৃত ভাষায় লিখতে সে পরামর্শ শিকায় তোলা রয়েছে। উন্নততর ভাব প্রকাশ করতে গেলে দুরূহতর শব্দ ব্যতীত গতি নেই, এই স্বীকৃতি কেবল বাঙালী লেখকদের মুখে নয়, গুজরাতী লেখকদেরও মুখে। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, এই গতিহীনতা থেকে আসবে প্রগতিহীনতা, ঘটবে চক্রগতি। অভিধান থেকে নয়, সাধারণ ব্যবহার থেকে সংগ্রহ করতে হবে চিন্তার বাসা বাঁধবার খড়কুটো। চিন্তা একেই আকাশচারী, তার বাসা বা ভাষা যদি আকাশে হয় তবে মাটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই থাকে না। মানুষের তা ফানুস ওড়ানো।

এই সময় ক্রিকেট ক্লাব সংলগ্ন ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে খেলা চলছিল হিন্দু মুসলমানে। পেণ্টাঙ্গুলার বা পঞ্চকোণী ক্রিকেট বম্বের বিশেষত্ব। সম্প্রতি করাচী প্রভৃতি স্থলেও এর প্রসার ঘটেছে। হিন্দু মুসলমান পারসী ইউরোপীয় এই চারটি দল ছিল আগে, এখন হয়েছে দেশীয় খ্রীষ্টান এবং আরো কয়েকটি সম্প্রদায় মিলে পঞ্চম দল। ইংরাজেরা যদিও ভারতের মালিক তবু ক্রিকেটের উপর তাদের ভাগ্য নির্ভর করে না। তারা সচরাচর হারে ও তার দরুন লজ্জার ধার ধারে না। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের এ নিয়ে উত্তেজনার ও মর্মবেদনার অবধি নেই। সারা বছর ধরে তারা দিন গুনতে থাকে কবে খেলা হবে, কবে দিল্লীর সিংহাসন ফিরে পাবে। আমি যেদিন খেলা দেখতে যাই সেদিন হিন্দু মুসলমানে ফাইনাল খেলা, চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। হিন্দুরা দারুণ হারছিল। এমন অকারণে হারতে কখনো কাউকে দেখিনি। সম্ভবত ক্যাপটেনের উপর রাগ করে তারা নিজেদের নাক কাটছিল। মুসলমানেরা ব্যাট হাতে যেই দৌড় দেয় অমনি মুসলিম দর্শকদের তালে তালে তালি বাজে। হিন্দুর বলে যেই মুসলমান আউট হয় অমনি হিন্দু দর্শকদের করতালিতরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। তালির সাহায্যে যদি খেলোয়াড়দের জিতিয়ে দেওয়া যেত, হিন্দু মেজরিটির তালপরিমাণ তালি সেদিন তৃতীয় পাণিপথের শোধ তুলত। কিন্তু পাণির পথে পাণিপথ জেতা যায় না।

পারপিয়া গুজরাতী মুসলমান। তাঁর পূর্বপুরুষ বাণিজ্য করতে চীন দেশে গিয়ে সাত দরিয়ার পার পেয়েছিলেন, সেই থেকে বংশপদবী "পারপিয়া"। যাঁর কথা লিখছি তিনি আমার সঙ্গে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন, আমরা দু'জনে একই জাহাজে তিন দরিয়ার পার পাই।

সপত্নীক পারপিয়া একদিন সপত্নীক আমাকে তাজমহলে নিয়ে গেলেন, অথ হোটেল। গড়নটা যথাসম্ভব পূবদেশী, তাজমহলের সঙ্গে ভাসা-ভাসা সাদৃশ্য আছে। ভিতরে বিলিতী খানাপিনা গানবাজনা আদবকায়দা। স্বয়ং শাজাহান এলে মোগলের ঘরে ঘোগলকে দেখে চমকে উঠতেন। এটি বোধ হয় একমাত্র ভারতীয় হোটেল যেটি পশ্চিমকে পরাস্ত করেছে তার নিজের খেলায়।

মালিকরা পারসী, তাঁরা পরিচালনার দিক থেকে কোথাও কোনো খুঁত রাখেননি। তাই সাহেবলোকেরাও সমুদ্রযাত্রার আগে এইখানে বসে সমুদ্রের সৌন্দর্য পান করেন, সমুদ্রযাত্রার শেষে এইখানে শুয়ে বাদশাহী স্বপ্ন দেখেন।

সেই যে মিসেস নায়ারের কথা বলেছি, একদিন তাঁর ওখানে নিমন্ত্রণ। তিনি মহারাষ্ট্রীয়া, তাঁর স্বামী ডাক্তার নায়ার ছিলেন যতদূর মনে পড়ে কেরলপুত্র, জামাতা ডাক্তার বেঙ্কটরাও কর্ণাটকী। এঁরা বৌদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধদেরই মতো হিন্দুসমাজের থেকে অবিচ্ছিন্ন। এঁরা একরকম একাকী একটা হাসপাতাল চালান। হাসপাতালটির নাম বাই যমুনাবাই হাসপাতাল। এখানে জাতিভেদ বা ধর্মভেদ নেই, কাউকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করারও অভিসন্ধি নেই। বিশুদ্ধ মানবসেবা এর আদর্শ। হাসপাতালটির যেখানে অবস্থান সেখানটি ধ্বনিবিরল ও নিভৃত। বেঙ্কটরাও আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে আমরা হাজির হলুম হাসপাতালসংলগ্ন বৌদ্ধবিহারে। সেখানে আবিষ্কার করলুম দুটি সন্ন্যাসীকে।

একজনের নাম লোকনাথ। ইনি ইতালীর বৌদ্ধ। এঁর কর্মস্থল ছিল আমেরিকা, ইনি রাসায়নিক ছিলেন। যুদ্ধকালে মানবধ্বংসী বহু প্রক্রিয়া উদ্‌ভাবন করে পরে এঁর পরিতাপ জন্মায়। তারপর থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। রাত্রে নাকি আসনে বসে নিদ্রা যান।

অপর জনের নাম সদানন্দ। ইনি জার্মান বৈষ্ণব। ইনি কেন সংসার ত্যাগ করলেন জানিনে। বয়স অল্প। বেশ বাংলা বলেন, চৈতন্যচরিতামৃত পড়েছেন। চেহারাও কতকটা বাঙালী বৈষ্ণবের মতো হয়েছে, দেখে বিশ্বাস হয় যে ইনি গৌরভক্ত। মানুষ কত সহজে বিদেশকে স্বদেশ করতে পারে তার দৃষ্টান্ত আগেও দেখেছি, তাই আশ্চর্য হইনি। পারবে না কেন? সবই তো মানুষের দেশ। পারে না তার কারণ অক্ষমতা নয়, অনিচ্ছা। অথবা সুযোগের অভাব।

অভিপ্রায় ছিল বম্বের শ্রমজীবী অঞ্চলে ঘোরাফেরা করব, স্বচক্ষে দেখব তারা কী ভাবে থাকে। এই সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে কার্নিক নামে এক ভদ্রলোক এলেন। তাঁর কাছে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তাতে আমার স্বদেশের ধনিকদের প্রতি টান কিছু শিথিল হলো। এখন থেকে বলা যেতে পারে, বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ ধনিকুলেষু চ। তাঁদেরও স্বদেশবিদেশ নেই, লাভের অঙ্কই ইষ্টদেবতা। সেই অপদেবতার পায়ে শ্রমিকের বলিদান যেমন বিদেশী কলে তেমনি স্বদেশী কলে। সরকারী আইনকেও যে তাঁরা কী ভাবে ফাঁকি দেন কার্নিক তা বিশদ করলেন। শ্রমিকদের একমাত্র অস্ত্র তো ধর্মঘট। সেই অস্ত্রের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগসত্ত্বেও তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। বরং তাদের কারো কারো অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। দশ বারো বছর ধরে তারা বেকার।

অধ্যাপক অল্‌তেকর শহরতলীতে থাকেন। শহরতলীর নাম ভিলে পার্লে। এটা কোন্ দেশী নাম জানিনে। বোধহয় পর্তুগীজ। একদিন আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন মধ্যাহ্নভোজনে। দেশী মতে অর্থাৎ মরাঠী মতে রান্না।

গৃহিণীর স্বহস্তে পাক। পিঁড়িতে কি আসনে বসে খাওয়া গেল, পরিবেশনও গৃহকর্ত্রীর স্বহস্তে। এঁরা প্রাচীনপন্থী, প্রাচ্য আতিথেয়তার সবটুকু সৌন্দর্যের অধিকারী। ভাষার অভাব যে কত বড়ো অভাব, অনুভব করি যখন ভালো লাগা বোঝাতে চাই। আমার জানা ভাষা কর্ত্রীর অজানা। অধ্যাপকের কাছে পাঠ শিখে নিয়ে তবে মুখরক্ষা। বর্গীর হাঙ্গামার সময় থেকে মরাঠাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা পরম্পরাগত ভীতি আছে। সেই যে "বর্গী এলো দেশে" বলে ছেলেভুলানো ছড়া, তার প্রভাব আমার মনের উপর বহুকাল ছিল। এবার তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মিশে, কফি খেয়ে, সাহিত্যালাপ করে মনের উপর থেকে পর্দা সরে গেল। বিচারপতি সেন মরাঠাদের বিশেষ ভালোবাসেন, আমিও অল্পকালের মধ্যে তাঁদের পক্ষপাতী হয়ে উঠি। কেন, কী করে বলব? একটা কারণ বোধ হয় তাঁদের বিদ্যানুরাগ। বিদ্যার জন্যে বিদ্যা ক'জন চায়? মরাঠাদের মধ্যে যে বিদ্যানুরাগ লক্ষ করলুম তা দেশানুরাগের মতো জ্বলন্ত ও নিস্পৃহ।

পারপিয়ারা আমাদের উইলিংডন ক্লাবে নিয়ে গেলেন। বম্বের ইঙ্গবঙ্গদের প্রধান ঘাঁটি। নাচ চলছিল ল্যামবেথ ওয়াক কি রুম্বা। পারপিয়ারা আমাদের ডাকলেন, কিন্তু আমরা ও-রসে বঞ্চিত। দেখতে না দেখতে তাঁরা ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন, আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। অপরূপ পাগড়ি মাথায়, কী একটা পোষাক পরে কয়েকজন কচ্ছী জমিদার এসে আমাদের কাছাকাছি আসন নিলেন, শুনলুম মুসলমান। যাঁদের সঙ্গে বসলেন তাঁরা হিন্দু। নাচিয়েদের দলে পারসী স্ত্রীপুরুষও ছিলেন। কসমোপলিটান আসর।

বম্বে থেকে পুনা যেন কলকাতা থেকে আসানসোল। রাঁচি বলতে পারলে দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের আভাস দেওয়া চলত। ভয় ছিল শীতে হয়তো জমে যাওয়া যাবে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। বরং বম্বের গরমের পর পুনার ঠাণ্ডা আমাদের জানিয়ে দিল যে ওটা শীতকাল।

আবহবিদ্যামন্দিরের ডক্‌টর এস. এন. সেন ও তাঁর গৃহিণী আমাদের ঠাঁই দিলেন। "কত অজানারে জানাইলে তুমি", কবি যথার্থ বলেছেন, "কত ঘরে দিলে ঠাঁই!" দিন তিনেক পরে যখন বিদায় নেবার সময় এলো তখন সত্য হলো তার পরের পংক্তিটি—"দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।"

এই সেই পুণ্য নগরী যার সকাশে ভেট আসত দিল্লী থেকেও। দিল্লী থেকে, গুজরাট থেকে, উৎকল থেকে, তাঞ্জোর থেকে। এত বিশাল ছিল মহারাষ্ট্র সীমান্ত! সেই নগর এখন প্রদেশের রাজধানীও নয়। তার প্রধান আকর্ষণ তার ঘোড়দৌড়, প্রধান পরিচয় তার স্কন্ধাবার। বম্বের কুবেরকুল সেখানে বাগানবাড়ি করেছেন. শহরে অতিষ্ঠ বোধ করলে বাগানবাড়িতে ছুটি কাটাতে আসেন। তাতে মোটরিং-এর ফুর্তিও হয়। আর হয় নিচুদরের দার্জিলিং-এর শীতভোগ।

এখনো বহু দেশীয় রাজ্য মরাঠাদের অধিকারে। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বড়োদা, কোলহাপুর ইত্যাদি জুড়লে মহারাষ্ট্রের সীমান্ত সুদূরপ্রসারী। মরাঠাদের মনের উপর এর প্রভাব কোনো দিন নিষ্প্রভ হয়নি। বাংলার বাইরে লক্ষ লক্ষ বাঙালী সসম্মানে বাস করছে বলে বাঙালীর পক্ষে প্রাদেশিক হওয়া শক্ত। চারদিক থেকে বিতাড়িত হওয়ায় প্রাদেশিকতার সূচনা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু দশদিকে ছড়িয়ে যাওয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। তেমনি মরাঠাদের পক্ষে প্রাদেশিক হওয়া দুষ্কর। তাদের মধ্যে বরং একটু সাম্রাজ্যবাদের অভিমান আছে। কী করা যায়, মরাঠা সাম্রাজ্য তো ফিরবে না। তার বদলে যদি হিন্দু সাম্রাজ্য হয় তা হলে মন্দ হয় না। "হিন্দুডম" এই অপরূপ শব্দটি মহারাষ্ট্রীয় মস্তিষ্কের অপূর্ব উদ্‌ভাবন। আপাতত পুনা শহরটাই "হিন্দুডম"-এর প্রেসিডেন্টধানী।

সেদিন অলতেকরকেও পুনায় পাওয়া গেল। তিনি আমাকে প্রথমে নিয়ে গেলেন ফারগুসন কলেজ দেখাতে। এটি মরাঠাদের অতুল কীর্তি। গোখলের ত্যাগ ভারতবিদিত, কিন্তু ত্যাগ আরো অনেকের। কলেজ তখন বন্ধ ছিল। খোলা ছিল লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করার জন্য বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার নিজের বই নেই তার বইয়ের ভাবনা নেই। কলেজটির অবস্থান, তার নির্মাণসৌষ্ঠব, তার বিদ্যার্থীভবন, সবই উন্নত ধরনের। পরের দিন আলাপ হলো মহাজনীর সঙ্গে। ইনি কলেজের অধ্যক্ষ। বয়স অল্প, মনীষা অসাধারণ। কেবল পড়ার গুরু নন, খেলার সাথী ও সেনানায়ক। এত বড়ো কলেজের অধ্যক্ষ, কিন্তু থাকেন একটি নগণ্য বাংলোয়। গোখলের মতো মহাজনেরা যে পথে গেছেন মহাজনী সেই পন্থা অনুসরণ করে স্বচ্ছন্দে না থাকুন, স্বস্তিতে আছেন।

এর পরে সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটিতে গিয়ে কোদণ্ডরাওকে একটা চমক দেওয়া গেল। নিজেও পেলুম একটা চমক। এঁরা কত অল্পের মধ্যে ঘরসংসার চালান। সমস্তক্ষণ যেন তাঁবুতে। কখন কোনখান থেকে ডাক আসবে, অমনি সুটকেস হাতে নিয়ে দু'এক হাজার মাইল রেলদৌড়। নিজের বলতে এঁরা বেশী কিছু রাখেননি। তবে একেবারে ফকির নন। গোখলে যে কেমন করে গান্ধীর আচার্য হলেন তার সাক্ষী এই ভারতসেবক সমিতি। এর রাজনীতি যাই হোক না কেন, এর কর্মনীতির তুলনা নেই। বিভিন্ন প্রদেশের নিঃস্বার্থ কর্মী ও বিদ্বানদের নিষ্ঠাপর জনসেবা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, দশকের পর দশক পরিচালিত হচ্ছে এই কেন্দ্র থেকে। এঁদের কার্যতালিকা বৈচিত্র্যময়। কোল ভীল অস্পৃশ্যদের মধ্যেও কাজ হচ্ছে, আবার মিল শ্রমিকদের মধ্যেও। বিদেশে এদেশের শ্রমিকরা কী ভাবে থাকে তদন্ত করার জন্যে মাঝে মাঝে এঁরা প্রতিনিধি পাঠান। কোদণ্ডরাওয়ের মুখে শোনা গেল ফরাসী ইন্দোচীনে তাঁর প্রবেশনিষেধের কাহিনী।

ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ব্যবধান ইদানীং ধামাচাপা পড়েছে বটে, কিন্তু তার সত্তা এখনো রয়েছে। নেই যাঁরা ভাবেন তাঁরা কখনো বাঁকুড়া জেলায় বাস

করেননি, মহারাষ্ট্রে প্রবাস করেননি, উৎকলে মানুষ হননি, দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেননি। অলতেকর বললেন, আমি যদি তাঁর প্রদেশকে সব দিক থেকে চিনতে চাই তবে যেন অব্রাহ্মণদের সঙ্গেও মিশি। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন অধ্যাপক খাড়য়ের আবাসে।

খাড়য়ে সুধী ও সুপুরুষ। তাঁর সঙ্গে যা নিয়ে আলোচনা তার কিছুই স্মরণ নেই। শুধু মনে আছে পুনার মিউনিসিপাল পলিটিক্সে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ভেদ বিদ্যমান। তা বলে সেটা মারাত্মক নয়, অব্রাহ্মণ দলে ব্রাহ্মণও জোটে, ব্রাহ্মণ দলে অব্রাহ্মণও। সাম্প্রদায়িকতার মতো জাতিভেদও দেখছি হনুমান ও বিভীষণের মতো অমর। রাবণরূপী সাম্রাজ্যবাদ যদি বা মরে এই দুটি আয়ুষ্মান যুগোচিত মুখোশ পরে লাফালাফি দাপাদাপি করতে থাকবে, যতদিন না অসবর্ণ ও অসাম্প্রদায়িক বিবাহ দেশব্যাপী হয়।

পরের দিন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলুম। মহারাষ্ট্রের আরেকটি অনুপম কীর্তি। কার্ভের দর্শন পাওয়া গেল। সাদাসিধে নিরীহ মানুষটিকে দেখে দিনমজুর ভেবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলুম। অলতেকর বললেন, ইনিই কার্ভে। অশীতিপর বৃদ্ধ, সেকালের মহাস্থবির। একদা এঁরাই ভারতের সংঘপতি ছিলেন, কখনো মিলিত হতেন পাটলীপুত্রে, কখনো পুরুষপুরে, কখনো নালন্দায়, কখনো বিক্রমশিলায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে মনে পড়ে যায়। কিন্তু কার্ভের কাজ মহিলাদের নিয়ে। তাঁর আবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। মাতৃজাতির শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। মরাঠীর মতো একটি প্রাদেশিক ভাষায় ক'খানাই বা কেতাব আছে যা পড়ে ইতিহাসে দর্শনে গণিতে বা রসায়নে গ্রাজুয়েট হওয়া যায়! তবু কার্ভের দুঃসাহসে তাও সম্ভব হয়েছে, পরে এক গুজরাতী কুবের-জায়ার দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ হয়েছে, গুজরাতী মেয়েদের জন্যে শিক্ষার বাহন হয়েছে গুজরাতী। তাদের সুবিধার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগ স্থানান্তরিত হয়েছে বম্বেতে। পুনায় যেটুকু অবশিষ্ট সেটুকু দেখে সম্যক ধারণা হলো না।

এর পরে হিন্দু বিধবাভবন। এটিও পুনার তথা মহারাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। বিধবারা এখানে লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তার করেন। শহরের বাইরে অবস্থান, স্বাস্থ্যকর আবেষ্টন। ফারগুসন কলেজ ও সার্ভেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির মতো এই প্রতিষ্ঠানটিরও কয়েকজন স্থায়ী কর্মী আছেন। অন্যূন বিশ বছর কর্ম করবেন এই অঙ্গীকার দিতে হয়, বিশ বছর পরে নিষ্কৃতি। পরিচালনার ভার পনেরোজন নিষ্ঠাপর স্থায়ী কর্মীর হাতে। এঁদের মধ্যে কার্ভে তো আছেনই, আছেন আটজন বিদুষী মহিলা, প্রায় সকলেই কার্ভের প্রাক্তন ছাত্রী। এই প্রতিষ্ঠানটির অধীনে কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠান বা পাঠশালা আছে বিভিন্ন জেলায়।

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনা কলেজের অধ্যক্ষ কমলাবাই দেশপাণ্ডে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কেলকর মহাশয়ের কন্যা। ইউরোপের প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর। তার আগে নিজেদের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট।

ইনি বিধবাভবনেরও একজন স্থায়ী কর্মী। দুঃখের বিষয় অল্প বয়সেই বিধবা। সেকালের তপস্বিনীদের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনায় একটি চিত্র আছে, কমলা-বাইকে সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মিলে যায়। তা বলে তিনি বল্কল কিংবা চীবর পরিধান করেন না, অনাহারে কঙ্কালসার নন। প্রভূত প্রাণশক্তির অধিকারিণী, সেই সঙ্গে মনস্বিতার। "প্রাচীন ভারতে শিশু" নামে একটি সন্দর্ভ লিখেছেন বিদেশী ভাষায়।

লোকমান্য টিলকের কর্মপন্থার উত্তরাধিকারীরূপে কেলকরের পরিচয় আমার অগোচর ছিল না। কিন্তু মরাঠাদের সেই লাল রঙের শিরস্ত্রাণ দেখলেই আমার শিরঃপীড়া জন্মায়। বাঁচা গেল সন্ধ্যাবেলা কেলকরকে নাঙ্গা শির দেখে! আদৌ ভীষণ নন, বেশ সহজ মানুষ, তবে রাশভারি। বাংলাদেশ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন, যৌবনে যেন কিছু বাংলা শিখেছিলেন, মনে পড়ছে। বড়ো বড়ো মরাঠী বই লিখেছেন, একখানা দেখালেন। গম্ভীর বিষয়ের পুঁথি মরাঠারা কেনে। মরাঠারা সংখ্যায় বাঙালীর চার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তাদের রাজা-রাজড়ারা শুধু সংখ্যায় নয়, দাক্ষিণ্যে অগ্রগণ্য।

(১৯৪২-৪৩)

গান্ধীজী

মহাভারতের নায়ক কে? ভীম নন, অর্জুন নন, এমন কি ভগবানের অবতার যে কৃষ্ণ তিনিও নন। মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির। ব্যাসদেব তাঁকে ভারতের সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, ভাবলেন ভারতের সিংহাসনে তো কত লোক বসেছে, যুধিষ্ঠিরকে দিতে হবে আরো বড় সম্মান, যে সম্মান আর-কোনো মানুষ কোনো কালে পাননি। যুধিষ্ঠিরকে তিনি নিয়ে চললেন হিমালয়ের শিখরের পর শিখর অতিক্রম করিয়ে এমন এক দুর্গম স্থলে যার নাম স্বর্গ, যেখানে কেউ কোনোদিন সশরীরে যায়নি। সেকালে যাঁরা অমর হবার বর পেয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মর্ত্যে অমর, ব্যাসদেব ইচ্ছা করলে যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের মতো অমর করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা তো কেউ সশরীরে স্বর্গপ্রবেশ করেননি, সে সম্মান একমাত্র যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য। কারণ যুধিষ্ঠির ছিলেন সত্যবাদী।

আজকাল আমরা সাম্রাজ্যবাদ সাম্যবাদ প্রভৃতি কতরকমের বাদ নিয়ে বিবাদ করছি, কিন্তু ব্যাসদেব যদি থাকতেন তিনি বলতেন সবচেয়ে বড় বাদ সত্যবাদ। সবচেয়ে বড় বাদী সত্যবাদী। ব্যাসদেব যদি বিংশ শতাব্দীর মহাভারত লিখতেন তো তার নায়ক করতেন এ-যুগের যুধিষ্ঠিরকে। গান্ধীজীকে। যে পুরস্কার কখনো কোনো মানুষ জীবিতকালে পায়নি তেমনি কোনো সম্মান কল্পনা করতেন তাঁর জন্যে। সত্যবাদীর জন্যে।

সত্যকে ভারতের লোক সবচেয়ে উচ্চ আসন দিয়ে এসেছে, নতুবা মহাভারতের নায়ক হতেন কৃষ্ণ কিংবা অর্জুন। ভবিষ্যতে যখন মহাকাব্য রচিত হবে তখন

ভারতের মহাকবি সত্যকেই শীর্ষস্থান দেবেন, নায়ক করবেন গান্ধীজীকে। সত্যের সঙ্গে সমান ওজন অহিংসার। অহিংসাকে ভারতের লোক পরম ধর্ম বলে গণ্য করে এসেছে। অজন্তার গুহাচিত্রে পরম ধার্মিক বুদ্ধদেবের মূর্তি আর-সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। তাঁর পাশে আর সকলে যেন বামন। ভবিষ্যতে ভারতের চিত্রকর গান্ধীজীকে তেমনি করে আঁকবেন অহিংসার মাহাত্ম্য পরিস্ফুট করতে। হাজার হাজার বছর পরে যারা দেখবে তারা অহিংসার মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে। যুধিষ্ঠির আর বুদ্ধ উভয়ের উত্তরাধিকারী গান্ধীজী ভারতের দুটি সনাতন প্রবাহের যুক্তবেণী।

(১৯৪৬)

গান্ধীজীর লক্ষ্য

সব দেশেই একদল লোক কর্তৃত্ব করে, আরেক দল করে সমালোচনা। কর্তারা যদি সমালোচকদের সঙ্গে বনিয়ে চলেন তো গোলমাল বাধে না। কিন্তু অনেক সময় উভয় দলের পেছনে থাকে বিপরীত স্বার্থ। স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের বনিবনা অত সহজ নয়। সেইজন্যে সমালোচকরা ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষই বাহুবলের আশ্রয় নেয়। যে পক্ষ জেতে সে পক্ষ কর্তা হয়। বিদ্রোহীরা কর্তা হলে অপর পক্ষ করে সমালোচনা, এবং সুযোগ বুঝে পাল্টা বিদ্রোহ। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিদেশীরা উভয় পক্ষে বা এক পক্ষে যোগ দেয়। ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অঙ্কে বিদ্রোহের রূপ হয় বৈপ্লবিক। পাল্টা বিদ্রোহের রূপ হয় প্রতিবৈপ্লবিক। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে জটিল আকার ধরে। ক্রমশ পরিণত হয় গৃহযুদ্ধে, পরিশেষে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে। আমাদেরই জীবনকালে এরকম ঘটতে দেখা গেল রুশদেশে। রুশদেশের প্রতিবিপ্লবীরা সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সব দেশ বিপ্লবের ভয়ে প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে আরেক বার ঝাঁপিয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধে প্রতিবিপ্লব ফ্রান্সের বেলা সফল হয়েছিল, রাশিয়ার বেলা যদি সফল হয় তো বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। বিপ্লব যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্যে একশো বছর আগে থেকে চিন্তা করে গেছেন মার্ক্স্। ফরাসী বিপ্লব কেন ব্যর্থ হলো তা নিয়ে তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছিল। ভেবেচিন্তে তিনি এই বার করলেন যে বিপ্লবের পরে প্রতিবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, প্রতিবিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বিপ্লবে নামতে হবে, যারা প্রতিবিপ্লবের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে বিপ্লবে নামে তারা আখেরে পরাজিত হয়। মার্ক্স্ তাঁর শিষ্যদের মন্ত্র দেন দুইভাবে প্রস্তুত হতে। তিনি স্বয়ং একখানি শাস্ত্র রচনা করলেন, সে শাস্ত্র বেদের মতো অভ্রান্ত। একদল ব্রাহ্মণও সৃষ্টি করলেন, এঁরা কমিউনিস্ট। এঁদের যজমান হচ্ছে কারখানার মজদুরশ্রেণী। যজমানদের সংঘবদ্ধ করা ও বেদ ব্রাহ্মণে বিশ্বাসবান করা হলো প্রথম কাজ। ইতিহাসের সংকটক্ষণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করা হলো দ্বিতীয় কাজ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলতে বোঝায় পুলিশ ও

মিলিটারি। পুলিশ ও মিলিটারি হাতে এলে আর-সব আপনি আসে। কারখানার সংখ্যা বাড়িয়ে মজদুর-সংখ্যা বহুগুণ বাড়ানো যায়। রুশদেশে এখন কোটি কোটি মজদুর, কোটি কোটি সৈনিক। এদের সংঘবদ্ধ করছে কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টিকে ঠিক রেখেছে কার্ল মার্ক্সের শাস্ত্র, লেনিনের ভাষ্য, স্টালিনের টীকা। সব অভ্রান্ত। দুনিয়ার সব দেশেই এখন এঁদের অনুচর আছে। সব দেশের কারখানার মজদুর এঁদের পক্ষপাতী। ভাবী যুদ্ধে যেসব দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সেসব দেশের মজদুর অশান্ত হবে। ভাবী যুদ্ধে রাশিয়াকে হারানো জার্মানী বা জাপানকে হারানোর মতো সহজ হবে না। রুশ বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মতো নাটকীয় ঘটনা নয়। এর পেছনে একশো বছর ধরে প্ল্যান করে প্রস্তুত হওয়া চলেছে। তা সত্ত্বেও যদি রাশিয়া হারে তো বুঝতে হবে পরমাণুশক্তির কাছে হেরে গেছে। পরম হিংসার কাছে হেরে গেছে।

গান্ধীর মাহাত্ম্য এইখানে যে পরমাণুশক্তি তাঁকে হারাতে পারবে না, পরম হিংসা তাঁকে হারাতে পারবে না। পৃথিবীতে হয়তো আণবিক বোমার চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবিত হবে, কিন্তু যত মারাত্মক হোক না কেন, কোনো অস্ত্রই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। তাঁকে হারাতে পারত তাঁর নিজেরই কাম ক্রোধ লোভ, কিন্তু এসব রিপুকে তিনি জয় করেছেন, জয় করেছেন যাবতীয় দুর্বলতা, স্বার্থচিন্তা, অন্যায়চিন্তা। তাঁর নিজের বলে কিছু নেই, সুতরাং ভয় বলে কিছু নেই। সমগ্র দেশ যখন ভয়ে আড়ষ্ট তিনি তখন অকুতোভয়। তিনি যেমন অন্যায় করবেন না, তেমনি অন্যায় সইবেন না। এই অসহিষ্ণুতা থেকে এসেছে অসহযোগ। অসহযোগকে অহিংস করেছে তাঁর মানবপ্রেম। অসহযোগ ও অহিংসা দুটোই কেমন নেতিবাচক শোনায় বলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ছিল, ক্ষোভ ছিল আমারও। কিন্তু এ-দুটি নেতিবাচক শব্দের মূলে কাজ করছে ইতিবাচক প্রেরণা, সত্যাগ্রহ। গান্ধীজী সত্যের আগ্রহে অসহিষ্ণু হয়ে অসহযোগী হয়েছেন, অহিংস রয়েছেন সত্যের আগ্রহে। একটি সত্য ন্যায়বোধ, আরেকটি সত্য মানব-প্রেম। এই যুগ্ম সত্যকে এককথায় বলা যেতে পারে সকলের মধ্যে আপনাকে দেখা, আপনার মধ্যে সকলকে দেখা, অভেদ জ্ঞান। এমন মানুষের কোনো শত্রু থাকতে পারে না, দৃশ্যত যে শত্রু সেও তাঁর আপনার লোক। একদিন তিনি তাকে প্রেমের দ্বারা জয় করবেনই। যীশু যেমন শত্রুকে মিত্রের মতো ভালোবাসতে বলেছেন গান্ধীও তেমনি বলছেন। দু' হাজার বছর পরে এই একজনকে দেখা গেল যিনি যীশুর মতো শত্রুপ্রেমিক, যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যবাদী, উপনিষদের ঋষিদের মতো সকলের মধ্যে আত্মদর্শী, আত্মার মধ্যে সর্বদর্শী। জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তাঁর জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে।

গান্ধীজীর সত্যের পরীক্ষা কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নিবদ্ধ নয়, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রসারিত। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রেই সে-পরীক্ষা সব চেয়ে তাৎপর্যবান। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনা থেকে আসে বিদ্রোহ ও পাল্টা বিদ্রোহ, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। যত

অশান্তির উৎপত্তি হয় রাজনৈতিক আস্তাকুঁড়ে। সুতরাং রাজনৈতিক আস্তাকুঁড় সাফ করাও মহাধার্মিকের কাজ। এ কাজ করতে গিয়েই যীশুর প্রাণ গেল, মহম্মদের প্রাণ যেতে বসেছিল। কিন্তু এ কাজ করবার যোগ্যতা সব মহাপুরুষের নেই। অনধিকারচর্চা করতে গিয়ে বহু মহাপুরুষ অপদস্থ হয়েছেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্বন্ধে আজ কারো সন্দেহ নেই, একদিন সন্দেহ ছিল। রাজনৈতিক সংকটমুহূর্তে তিনি যেভাবে পলিসি নির্দেশ করেছেন কোনো পেশাদার রাজনীতিবিদ্ও তেমনটি পারতেন না। তিনি যদি কেবলমাত্র পলিটি-সিয়ানও হতেন, তাহলেও নিছক পলিসির বিচারে অগ্রগণ্য হতেন। জাতীয় সংগ্রামের সেনাপতি হিসাবেও যদি তাঁর বিচার করা হয় তাহলেও দেখা যাবে তাঁর পরিচালনা নির্ভুল।

ইতিহাস তাঁর প্রধানত বিচার করবে পরমাণুশক্তির চেয়ে আরো বড়ো শক্তির আবিষ্কারক তথা প্রয়োগকর্তা রূপে। এমন এক শক্তির সন্ধান তিনি পেয়েছেন যার পাল্টা নেই, সুতরাং পাল্টা বিদ্রোহ এদেশে ঘটবে না, প্রতি-বিপ্লবের পথ বন্ধ। বিপ্লবী ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত ওয়াটারলুতে হেরে গেল, বিপ্লবী রাশিয়া যদিও স্টালিনগ্রাডে জিতে গেল তবু শেষ পর্যন্ত আণবিক যুদ্ধে জয়ী হয় কি-না অনিশ্চিত। কিন্তু গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে অনায়াসেই ভবিষ্যদ্-বাণী করা যায় যে যতই বিলম্ব হবে ততই কার্যসিদ্ধি হবে। কারণ তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষের অন্তঃপরিবর্তন। অন্তঃপরিবর্তনের লক্ষণ আমরা দিকে দিকে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু এখনও দিনের আলোর মতো প্রত্যক্ষ নয়। এমন কি ভোরের আলোর মতো পরিস্ফুটও নয়। কিন্তু রাত শেষ হয়ে আসছে। কেউ জোর করে বলতে পারবে না আরো ক'বছর লাগবে অন্তঃপরিবর্তন জাজ্বল্যমান হতে। আরো ক'বার সত্যাগ্রহ করতে হবে। এ তো বারো ঘণ্টার রাত নয়, দু'শ বছরের রাত। দু'শ বছরের বেশীও বলতে পারি, কেননা গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ কেবল ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে নয়, স্বদেশী স্বার্থপরদের বিরুদ্ধেও। স্বদেশী স্বার্থান্বেষীরা হাজার বছর আগেও ছিল। দেশের সাধারণ লোক হাজার হাজার বছর ধরে সুদ মুনাফা ও খাজনা যুগিয়ে আসছে, তাদের রক্তে পুষ্ট হয়ে আসছে উপরের দিকের উপস্বত্বভুক শ্রেণী। গান্ধীজী যদি এই শ্রেণীটির রাজত্বকে স্বরাজ বলে ভুল করতেন তা হলে খদ্দরের বদলে মিলের কাপড়ের গুণগান করতেন। ইংরেজ চলে গেলে এই শ্রেণীর স্বরাজ হবে, এটা তিনি চান না বলেই তো গঠনের কাজ করতে সবাইকে বলেছেন। গঠনের কাজ এমন ভাবে কল্পিত হয়েছে যে সমগ্র দেশ যদি গঠনের কাজ করে তো কলকারখানা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে, শহরে বেশী লোক থাকবে না, উপস্বত্বভুক্দের সঙ্গে সংগ্রাম করার আগেই তারা সন্ধি করবে। ভূমি রাষ্ট্রের বকলমে প্রজার হবে, উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম উৎপাদকের হবে, উপস্বত্বভোজীরা প্রথম দিকে ন্যাসী হবে, অবশেষে উৎপাদক হবে।

টলস্টয়, থোরো ও রাস্কিন গান্ধীজীর গুরু। গান্ধীবাদের বাক্সে আনাই এই তিনজনের মতবাদ। এঁরা না হলে গান্ধীজীও হতেন না। গান্ধীজীকে

বিশুদ্ধ ভারতীয় সাধক বলে ভাবা ভুল। তিনি একটি বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সাধনার ভারতীয় সাধক। কোয়েকাররাও সে-সাধনায় তাঁর পূর্বগামী। ইংলন্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর যৌবন কেটেছে। সেই সূত্রে তাঁর মতবাদ গড়ে উঠেছে। খাঁটি ভারতীয়রা তাঁকে কোনোদিন বুঝবে না।

(১৯৪৬)

গান্ধীজীর পরীক্ষা

এক যে ছিল খোঁড়া রাক্ষস। তার এক বন্ধু ছিল, কানা রাক্ষস। খোঁড়া এমন খোঁড়া যে এক পা-ও হাঁটতে পারে না। আর কানা যদিও হাঁটতে পারে তবু হাঁটতে গেলেই খানায় পড়ে। তখন তারা দুই বন্ধুতে মিলে যুক্তি করলে যে খোঁড়া চাপবে কানার কাঁধে, আর কানা হাঁটবে খোঁড়ার হুঁশিয়ারি শুনে। তখন থেকে খোঁড়া বনল কানার সওয়ার, কানা বনল খোঁড়ার ঘোড়া।

ওদিকে কিন্তু দুই রাক্ষসের দুরন্তপনায় মানুষের পক্ষে টেঁকা দায়। মানুষের বংশ ধ্বংস হতে চলল। সেই দুর্দিনে মানুষের ঘরে দুই মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। একজনের নাম লেনিন। একজনের নাম গান্ধী।

লেনিনের দৃষ্টি সওয়ারের ওপর, গান্ধীর দৃষ্টি ঘোড়ার ওপর। লেনিন বলেন, সওয়ারটাকে সরাও, তাহলেই ঘোড়াটা খাদে পড়ে ঘোটকলীলা সংবরণ করবে। গান্ধী বলেন, ঘোড়াটাকে আটকাও, তাহলে সওয়ারটাও আটকা পড়বে। লেনিন বলেন, আমি চললাম রুশদেশে। সেদেশে আমার সওয়ার সরানোর পরীক্ষা চালাব। গান্ধী বলেন. আমি চললুম ভারতবর্ষে। সেদেশে আমার ঘোড়া আটকানোর পরীক্ষা চালাব।

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ ঘোড়াটার নাম মিলিটারিজম্ বা সংঘবদ্ধ হিংসা। আর সওয়ারটার নাম ক্যাপিটালিজম্ বা সংঘবদ্ধ শোষণ। শোষণের মহাশত্রু লেনিন আর হিংসার মহাশত্রু গান্ধী।

এর থেকে তোমাদের হয়তো মনে হবে গান্ধী বুঝি শোষণের মিত্র, লেনিন বুঝি হিংসার মিত্র। সেটা তোমাদের ভ্রম। লেনিন বার বার বলেছেন তিনি হিংসা ভালোবাসেন না, হিংসায় সায় দিচ্ছেন বাধ্য হয়ে। গান্ধীও বার বার বলেছেন, তিনি শোষণ ভালোবাসেন না, শোষণ সহ্য করছেন বাধ্য হয়ে। আসলে হয়েছে কি, তাঁদের দু'জনের দু'দিকে দৃষ্টি কিন্তু উদ্দেশ্য একই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এক রাক্ষসের থেকে আরেক রাক্ষসকে পৃথক করে দুটোকেই দুর্বল করা, পরাজিত করা। কানা সরে গেলে খোঁড়া একেবারে পঙ্গু। খোঁড়া সরে গেলে কানা একেবারে অকেজো। তখন তাদের হারিয়ে দেওয়া সোজা।

দুই পরীক্ষার জন্যে দুই স্বতন্ত্র দেশ বরাদ্দ করেছে ইতিহাস। একই যুগে দুই স্বতন্ত্র পরীক্ষা চলছে। অন্যান্য দেশের লোক চেয়ে দেখছে। যে পরীক্ষা মানুষকে সবচেয়ে কম দুঃখ দেবে, মানুষের সবচেয়ে বেশি দুঃখমোচন করবে, সেই পরীক্ষা অন্যান্য দেশের লোক মেনে নেবে। লেনিনের পরীক্ষা এখনো

শেষ হয়নি, লেনিনের শিষ্য স্টালিন এখন লেনিনের ল্যাবরেটারীতে কাজ করছেন। আর গান্ধীজীর পরীক্ষারও আরো পঞ্চাশ বছর বাকী, তাই তিনি নিজেই আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচতে চান। তাঁর ল্যাবরেটারিতে কাজ শিখছেন বিনোবা ভাবে, কৃষ্ণদাস যাজু, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি তরুণ ছাত্ররা।

গান্ধীজী কী চান? গান্ধীজী চান মিলিটারিজম্ বা সংঘবদ্ধ হিংসা ভারতের কনিষ্ঠতম শিশুর কাছে ফণা নত করুক। আত্মিক বল দৈহিক বলের উপর জয়ী হোক। পরমাত্মশক্তি পরমাণুশক্তিকে নিষ্ফল ও নিষ্প্রভ করুক। একদিকে এক বিরাট সাম্রাজ্য ও তার ভীষণ মারণাস্ত্র। অন্যদিকে শিশুর মতো সরল, শিশুর মতো নিরীহ, নিষ্পাপ, নিঃসম্বল একটি বৃদ্ধ। যাঁর দেহ বলতে বিশেষ কিছু নেই, আত্মাই সব। এই অসম সমরে চূড়ান্ত বিজয় কোন্ পক্ষের কে জানে!

হিংসা যদি অহিংসার কাছে হার মানে শোষণের বিষদাঁত ভেঙে যাবে। রণতন্ত্রের অবসান ঘটলে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটবে। মানুষকে শোষণ করে মানুষ বড়োমানুষ হবে না। বড়োমানুষীর দিন যাবে। তখন ছোট বড়ো সকলেই হবে সত্যিকারের বড়ো মানুষ। যে-মানুষ রাক্ষস নয়, পরস্বভোজী নয়, যে-মানুষ আত্মশ্রমের ফলভোজী। চরকা হচ্ছে আত্মশ্রমের ফলভোজের প্রতীক। চরকার অর্থ যে-যার উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করবে, যে-যার ভোগ্যসামগ্রী উৎপাদন করবে। অবশ্য সদলবলে উৎপাদন ও উপভোগ করতে আপত্তি নেই, যদি নিজেদের মধ্যে ভাগ নিয়ে বোঝাপড়া হয়। যেমন একান্নবর্তী পরিবারে। একান্নবর্তী পরিবারের মতো একান্নবর্তী গ্রাম, একান্নবর্তী শহর, একান্নবর্তী প্রদেশ, একান্নবর্তী দেশ, এমন কি একান্নবর্তী বিশ্ব, সবই সম্ভবপর। নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হলে বড়ো বড়ো কলকারখানাও আপোসে চলবে। কিন্তু আসল কথা হলো যে-যার আত্মশ্রমের ফলভোজী হবে, পরশ্রমের ফলভোজী বলতে কেউ থাকবে না। আর অহিংস হবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি। সংঘবদ্ধ হিংসার কথা কেউ কল্পনাও করবে না। আর ব্যক্তির উপর সমাজ বা রাষ্ট্র জুলুম করবে না। কেউ যদি সমাজের বা রাষ্ট্রের বাইরে থেকে চরকা কেটে জীবিকা অর্জন করতে যায় তো সে স্বাধীন।

(১৯৪৭)

আমাদের স্বাধীনতা

বিনু বলছিল তার বন্ধুদের।

ইংরেজ সহজে মনঃস্থির করে না, কিন্তু একবার মনঃস্থির করলে সহজে নড়চড় করে না। এইখানে ওদের বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষ থেকে অপসরণের প্রস্তাবে একদা ওরা মারমুখো হয়েছে, কারণ তখনও ওদের ধারণা ছিল ওদের ভারতীয় সিপাহীরা পরম রাজভক্ত। কিন্তু যেদিন প্রত্যক্ষ করল ভারতীয় নৌসেনা বিদ্রোহী হয়েছে• সেইদিন ওদের প্রত্যয় জন্মাল যে আর দেরি করলে স্থল-

সৈন্যেরাও বিদ্রোহী হবে। সেইদিনই ওরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ভারত থেকে অপসরণের।

অপসরণের ঐ মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রশ্ন উঠল, ভারতের ভার কার হাতে অর্পণ করে অপসরণ করবে? কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবে? চিরশত্রু কংগ্রেসকে? চিরমিত্র লীগকে? বহু কালের ব্রিটিশ পলিসি, ভারতবর্ষে ওরা কোনো-একটা শক্তিকে একচ্ছত্র হতে দেবে না। ইউরোপেও ওদের ঐ একই পলিসি। এবং ঐ পলিসি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে এক কালে স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ, পরবর্তীকালে ফ্রান্সের সঙ্গে সমর, এবং বর্তমান শতাব্দীতে জার্মানীর সঙ্গে সংঘাত। আজ না-হয় ইংলণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু কূটনীতিতে এখনও তেমনি পরিপক্ক। ভারতবর্ষে সে কখনও কংগ্রেসকে একচ্ছত্র হতে দেবে না। সুতরাং স্থির করল কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের মিলিত হস্তে ক্ষমতা সম্প্রদান করবে। ইণ্টেরিম গভর্ণমেণ্ট গড়তে কংগ্রেসনেতাদের আমন্ত্রণ করল এবং সামনের দরজা দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে খিড়কির দরজা দিয়ে ডেকে আনল লীগনেতাদের—যাতে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের হাতাহাতি বাধে ও তার ফলে কংগ্রেসের শক্তি খর্ব হয়।

হলোও তাই। কেবল যে গভর্ণমেণ্টের ভিতরে হলো তাই নয়, সারা দেশ জুড়ে শহরে গ্রামে পথে ঘাটে আবালবৃদ্ধবনিতার জীবনে হলো। লুটতরাজ খুনজখম নারীধর্ষণ শিশুমেধ ভারতবর্ষে মধ্যযুগ ফিরিয়ে আনল। শক্তির অপচয় দেখে কংগ্রেস তার মনঃস্থির করে ফেলল। যেসব অঞ্চলে কংগ্রেস দুর্বল লীগ প্রবল সেসব অঞ্চল লীগকে ছেড়ে দিয়ে অবশিষ্ট ভারতে লীগবিবর্জিত গভর্নমেণ্ট গঠনের সংকল্প নিল। ইংরেজ এতে মহা খুশি। এই তো ভালো ছেলের মতো। পাছে কংগ্রেস তার মত বদলায়, মহাত্মার পরামর্শ শোনে, সেই-জন্যে রাতারাতি দেশটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে দুখানা করে দিল। যেন সেটা মাটি নয়, কাগজ।

চার্চিল যেমন পুলকিত হলেন, গান্ধী হলেন তেমনি ব্যথিত। কিন্তু যে সিদ্ধান্ত কংগ্রেস সব দিক ভেবে গ্রহণ করেছে ও যা পালন করবে বলে বাক্য দিয়েছে গান্ধীজী তার বিরুদ্ধতা করা সমীচীন মনে করলেন না। কৈকেয়ীর কাছে দশরথ সত্য করেছিলেন, সত্যরক্ষা করতে হলো রামচন্দ্রকে। তেমনি গান্ধীজীকে।

আমাদের স্বাধীনতা বিনা সর্তে স্বাধীনতা নয়। আমাদের স্বাধীনতা সর্তাধীন স্বাধীনতা। যতবার গান্ধীজী জনগণকে সংগ্রামে আহ্বান করেছেন, যতবার ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছেন ততবারই দাবী করেছেন বিনা সর্তে স্বাধীনতা। সর্তাধীন স্বাধীনতার প্রস্তাব তিনি বার বার প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবারেও করতেন যদি প্রস্তাবটা তাঁর কাছে করা হতো। কিন্তু কথাবার্তা চলছিল তাঁকে দূরে রেখে ইংরেজে কংগ্রেসে। কংগ্রেসে যখন তাঁকে দূরেই রাখতে চায় তখন তিনি গায়ে পড়ে হস্তক্ষেপ বা কণ্ঠক্ষেপ করবেন কেন?

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। স্বাধীনতাহীনতার চেয়ে সর্তাধীন স্বাধীনতা ভালো। কিন্তু এ-কথা যেন এক মুহূর্তের জন্যে ভুলে না যাই যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের জনগণের পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী সংগ্রাম সর্তাধীন স্বাধীনতার জন্যে নয়। এ স্বাধীনতার জন্যে গান্ধীজী গৌরব বোধ করেন না। এটা গান্ধীজীর জয় নয়। তা বলে তিনি তাঁর সহকর্মীদের জয়গৌরব থেকে বঞ্চিত করতে চান না। সর্তাধীনতা সত্ত্বেও এটা স্বাধীনতা তো বটেই। কেউ তো বলবে না যে, আমরা পরাধীন। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা অগ্রসরই হয়েছি। তফাৎ শুধু এই যে আমরা গান্ধীজীকে মৌখিক আনুগত্য জানিয়ে মনে মনে উপেক্ষা করেছি। গান্ধীজী ও ভারতের জনগণ যেহেতু অভিন্ন সেহেতু আমরা জনগণকে উপেক্ষা করেছি। একদিন জনগণও আমাদের উপেক্ষা করবে, যদি সময় থাকতে গান্ধীজীর পরামর্শ না শুনি। মহাত্মা অবশ্য আমাদের সত্যভঙ্গ করতে বলবেন না। ভারতভঙ্গ বা বঙ্গভঙ্গের চেয়ে সত্যভঙ্গ আরো খারাপ। পাকিস্তান আমাদের শিরোধার্য করতেই হবে। এবং পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ নিতে হবে আমাদের মধ্যে যাঁদের সম্পত্তি বা যাঁদের জীবিকা পাকিস্তানে তাঁদের প্রত্যেককেই। বলা বাহুল্য তাঁরা স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন না। পাবেন না, যতদিন না লীগের মতিগতি বদলায়। কিংবা যতদিন না মুসলমানদের লীগের প্রতি অনাস্থা জন্মায়।

আপাতত গান্ধীজীর পরামর্শ, মাইনরিটির প্রতি সমান ব্যবহার। তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে রাষ্ট্র কেবল হিন্দুর বা কেবল মুসলমানের নয়। রাষ্ট্রমাত্রেই হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সর্বসাধারণের। স্বাধীনতা বলতে যদি কেবল মেজরিটির স্বাধীনতা বোঝায় তবে মাইনরিটির অভিশাপ কুড়িয়ে কত দিন তা টিকবে! স্বাধীনতাকে চিরস্থায়ী করতে হলে মাইনরিটির আশীর্বাদ সঞ্চয় করতে হবে। এর মানে এ নয় যে মাইনরিটির উপদ্রব সহ্য করতে হবে। আমরা অন্যায় করবও না, অন্যায় সইবও না। এবং আমরা প্রত্যাশা করব যে অন্যেরাও অন্যায় করবে না, অন্যায় সইবে না। মিটমাট যদি হয় তো এই মর্মেই হবে। মাইনরিটি সমস্যার আর-কোনো সমাধান আমার জানা নেই। গান্ধীজীও আর-কোনো সমাধানের কথা বলছেন না। আমরা যদি অন্য কোনো সমাধানে রাজি না হই তো অপর পক্ষ একদিন এই সমাধানেই রাজি হবে।

আমি পূর্বেই বলেছি যে আমাদের স্বাধীনতা সর্তাধীন স্বাধীনতা। অর্থাৎ এই সর্তে আমরা স্বাধীন হয়েছি যে কংগ্রেস কোনোদিন সারা ভারতের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হবে না। তার মানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কোনোদিন সমগ্র ভারতবর্ষের উপর একচ্ছত্র হবে না। যদি কোনোদিন হয় তবে ইংরেজ তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে, তার বিরুদ্ধে লীগ ইত্যাদি দলকে উত্তেজিত করবে, অস্ত্র যোগাবে, যুদ্ধ বাধাবে। যেমন করে স্পেনকে, ফ্রান্সকে, জার্মানীকে ইউরোপের উপর একচ্ছত্র হতে দিল না তেমনি করে কংগ্রেসকে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে, ভারতের ওপর সার্বভৌম হতে দেবে না। নিজের সামর্থ্যে যদি না কুলোয় মামার সাহায্য নেবে। মার্কিনকে ডাকবে। অথচ ভারতীয় জাতীয়তা-

বাদ চিরকাল এভাবে আপনাকে সংকুচিত করতে পারবে না। তার ঐতিহাসিক ব্রত হচ্ছে নিখিল ভারতকে এক সূত্রে গ্রথিত ও বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত করা। যে ব্রত সে ষাট বছর আগে গ্রহণ করেছে সে ব্রত যতদিন অসমাপ্ত রয়েছে ততদিন তার নিষ্কৃতি নেই। হয়তো আরো ষাট বছর লাগবে ব্রত পূর্ণ হতে। হয়তো এর জন্যে আবার সংগ্রাম করতে হবে বিদেশীর সঙ্গে। চাই কি স্বদেশবাসীর সঙ্গে। ইতিহাসের কাছে সত্যভঙ্গ করা ব্রিটেনের কাছে সত্যভঙ্গ করার চেয়েও ভয়াবহ।

ব্রিটেন এখনও ভারত মহাসাগর পাহারা দিচ্ছে। তার নৌবহর আমাদের নৌবহরকে কোনোদিনই ভারত মহাসাগরে প্রবল হতে দেবে না। তার যুদ্ধ-জাহাজের কামানগুলো আমাদের বন্দরগুলোর উপর গোলাবর্ষণের জন্যে সমস্ত-ক্ষণ প্রস্তুত থাকবে। তার বিমানবহর আমাদের শহরগুলোর ওপর বোমা বর্ষণের জন্যে উদ্যত থাকবে। ব্রিটেনের সঙ্গে বলপরীক্ষা আর যেভাবেই হোক হিংসার দ্বারা হবে না। হলে মহতী বিনষ্টি। আমাদের একমাত্র আয়ুধ চল্লিশ কোটির অহিংসা। সেই চল্লিশ কোটির মধ্যে দশ কোটি মুসলমানও থাকবে। সাম্প্র-দায়িকতায় অন্ধ হয়ে আমরা যেন তাদের চিরশত্রু না করি। তারা যদি আমাদের চিরশত্রু করতে যায় তা হলে দেখবে আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি বন্ধুভাব রয়েছে। বৈরীভাব নেই। কিন্তু অন্যায় আমরা সহ্য করব না। বন্ধুতার খাতিরেও অন্যায় সহ্য করা যায় না। একজাতীয়তার খাতিরেও না।

সর্তাধীন স্বাধীনতা আমাদের কিছুদিন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় দেবে। এই সময়টা যেন আমরা নাচানাচি করে নষ্ট না করি। যে জনসাধারণ আমাদের চরম আশাভরসা, যাদের আমরা নারায়ণ বলে থাকি, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে তাদের সেবা করে যেন আমাদের সময় কাটে। গঠনের কাজই তাদের সেবা। রাজনীতি যেন গঠননীতি হয়। নইলে অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়। পৃথিবীতে দুর্বলের স্বাধীনতা নেই। দুর্বল হলে আমরা সর্তাধীন স্বাধীনতাও হারাব।

(১৯৪৭)

হিংসা ও অহিংসা

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে পৃথিবীর লোক তার সাক্ষী। কিন্তু যেভাবে স্বাধীন হয়েছে তাতে অহিংসার জয় প্রমাণিত হয় না। দুনিয়ার লোক তা দেখে অহিংসার শক্তি উপলব্ধি করবে না, অহিংস শক্তির ওপর আস্থাবান হবে না। পনেরোই অগাস্টের পূর্বে তাদের বিশ্বাস ছিল আণবিক বোমাই মানবিক শক্তির চরম উৎকর্ষ। পনেরোই অগাস্টের পরে কি তাদের বিশ্বাস শিথিল হয়েছে? শিথিল হতো, যদি স্বাধীনতার সঙ্গে অহিংসার সংযোগ ঘটত। একটা দেশ যদি অহিংস-ভাবে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে তাহলে আরেকটা দেশ কেন অহিংসভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না, এ কথা চিন্তা করে তারা সামরিকতায় সন্দিহান হতো। একবার যদি তারা সামরিকতায় সন্দিহান হতো তাহলে

সামরিকতার প্রস্তুতির পিছনে যে ধনরাশি জলের মতো ব্যয় হচ্ছে, যে মুদ্রাস্ফীতি এক হাতে দুর্মূল্যতা ও অন্য হাতে দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করছে, যে আর্থিক অনর্থ ধনীকে আরো ধনী দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত সব দেশে।

বলত, আমরা সহিংসভাবে লড়ব না। লড়তে হয় তো অহিংসভাবে লড়ব। এই যে প্রস্তুতি এ আমরা চাইনে। এর জন্যে যে অর্থব্যয় এ আমরা চাইনে। এই যে মুদ্রাস্ফীতি এ আমরা চাইনে। এই যে অনর্থকারী অর্থনীতি এ আমরা চাইনে। এর নাম যদি ক্যাপিটালিজম হয় এ আমাদের দু'চক্ষের বিষ। এর নাম যদি সোশ্যালিজম হয় এ আমাদের দিল্লীকা লাড্ডু।

ভাবত, আর কি কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না? এমন কোনো ব্যবস্থা যাতে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা নিহিত নেই, যদি বা থাকে তবে তা অহিংস প্রণালীতে পরিচালিত হতে পারে? এমন কোনো ব্যবস্থা যাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আণবিক শক্তির আশ্রয় নিতে হয় না, আত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করাই যথেষ্ট?

খুঁজতে খুঁজতে নতুন ব্যবস্থার সন্ধান পেত। সে ব্যবস্থা ক্যাপিটালিজমও নয়, সোশ্যালিজমও নয়, উভয়ের গোঁজামিলও নয়, অন্য জিনিস। ক্যাপিটালিজম কেন নয় তার কারণ উক্ত ব্যবস্থা মিলিটারিজমের সাহায্য বিনা টিঁকতে পারে না। জমিদারি চলে না পাইক না হলে, বরকন্দাজ না হলে, পুঁজিদারি চলে না ফৌজ না হলে, কামান বন্দুক না হলে, গোলাবারুদ বোমা না হলে। সোশ্যালিজম কেন নয়, তার কারণ সোশ্যালিজম হচ্ছে রাষ্ট্রের জমিদারি, রাষ্ট্রের পুঁজিদারি। কর্তা রাষ্ট্র, কিন্তু কর্ম তো সেই একই। রাষ্ট্র অবশ্য একান্নবর্তী। তাহলেও জমিদারি ও পুঁজিদারির মতো বাহুবল-নির্ভর। নইলে কাজ চলে না।

সত্যিকারের নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যাকে খাড়া রাখতে বাহুবলের প্রয়োজন হয় না, তা সে হোক না কেন একান্নবর্তী রাষ্ট্রের বাহুবল। যে দেশে পুলিশ নেই, মিলিটারি নেই, সে দেশে যে ব্যবস্থা আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াতে পারবে, অধিকাংশের আন্তরিক সহযোগিতা পাবে, অল্পাংশের বাধা ও ব্যাঘাত হাসিমুখে সহ্য করবে সেই ব্যবস্থাই সত্যিকারের নতুন ব্যবস্থা। তেমন ব্যবস্থার দিকে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে অহিংসার জয়।

ভারতের স্বাধীনতা অহিংসার জয় প্রমাণিত করছে না। তা বলে অহিংসার পরাজয় ঘটেনি। অহিংসা জয়ী না হলেও অপরাজিত। অহিংসাবাদীদের বিশ্বাস অহিংসা অপরাজেয়। উপরন্তু তাদের বিশ্বাস জনসাধারণ দশচক্রে সহিংস হলেও স্বভাবত অহিংস। অহিংসাই তাদের স্বধর্ম, হিংসা পরধর্ম। যদিও এর কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় জমেনি, তবু এটা সত্য, যেমন সত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামে জনসাধারণের যোগদান ষোল আনা অহিংস নয়, তবু ষোল আনা অহিংসার উচ্চতায় ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। জনসাধারণের পরম সম্ভাবনাময় অহিংসায় যাদের বিশ্বাস অটুট নয় অহিংসার অপরাজেয়তায় তাঁদের বিশ্বাস অটল হতে পারে না। অহিংসাবাদীরা সেইজন্যে জনসাধারণের সঙ্গে অভিন্ন হবার সাধনায় নিযুক্ত। জনসাধারণের থেকে

বিচ্ছিন্ন হলে তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তি দুর্বল হয়। অহিংসার জয় যদি কোনো-দিন সুপ্রমাণিত হয় সেদিন দেখা যাবে জনসাধারণ চূড়ান্ত হিংসার সম্মুখে চূড়ান্ত অহিংসার পরিচয় দিয়েছে।

অহিংসা যে পরাজিত হয়নি, এখনো জয়ী হবার আশা ও বিশ্বাস রাখে, আপাতত এই আমাদের যথেষ্ট। এই ভরসায় আমরা নতুন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখব। রাত্রি এখনো অনেক। ভোরের দেরি আছে। স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু জনজাগরণ আসেনি। এই যে সর্বব্যাপী বিক্ষোভ এর নাম জাগরণ নয়। এটা আপনি থেমে যাবে। একদিন মহাসাধকের ইঙ্গিতে মহাসমুদ্র উদ্বেল হবে। অহিংসার জয় প্রত্যক্ষ করবে পৃথিবী।

(১৯৪৭)

ভারতের স্বরাজ

ছেলেবেলায় আমার ধারণা ছিল পৃথিবীতে দু'রকম রাষ্ট্র আছে। মনার্কি অর্থাৎ রাজতন্ত্র। রেপাবলিক অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র। মনে মনে রেপাবলিক কামনা করতুম।

বড় হয়ে দেখলুম এহো বাহ্য। আছে দু'রকম রাষ্ট্র। ডেমোক্রেসী অর্থাৎ গণতন্ত্র। ডিকটেটরশিপ অর্থাৎ কর্তৃতন্ত্র। মনে মনে ডেমোক্রেসী কামনা করলুম।

আরো বড় হয়ে আরো দেখলুম। দু'রকম রাষ্ট্র আছে। ক্যাপিটালিস্ট অর্থাৎ ধনতন্ত্র। সোশ্যালিস্ট অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের শুভকামনা করলুম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমার চোখ ফুটল। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই প্রাণ রণতন্ত্র। যুদ্ধ আছে বলেই তারা বেঁচে আছে। যুদ্ধ উঠে গেলে তারা বাঁচত না। কেন তা বলছি।

যেমন ধনতন্ত্র তেমনি সমাজতন্ত্র উভয়েরই লক্ষ্য অল্পলোকের দ্বারা অধিক উৎপাদন। দু'লাখ শ্রমিক যদি চল্লিশ কোটি বস্ত্রহীনকে বস্ত্র যোগাতে পারে তাহলে ধনতন্ত্র দু'লাখ শ্রমিকের উপযোগী যন্ত্রপাতি উদ্‌ভাবন ও নির্মাণ করে। সমাজতন্ত্রও তাই করে। বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের যে নীতি অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সেই নীতি। সেই নীতি অনুসরণ করতে করতে উভয়েই এমন এক বেকায়দায় পড়ে যে উভয়েরই সামনে লক্ষ লক্ষ বেকার। এই হতভাগ্যদের জন্যে কাজ সৃষ্টি করতে গিয়ে দেখে কাজ নেই, যন্ত্রপাতি নেই, মূলধন নেই। তখন এদের বেগার খাটানোর মতলব আঁটতে হয়। খাল কাটো, রাস্তা তৈরি করো, কচুরীপানা ধ্বংস করো, বাড়ি বানাও, বাড়ি ভাঙো, আবার বানাও, আবার ভাঙো, নিত্য নতুন কাজ সৃষ্টি করো, মনে হোক যেন খুব প্রগতি হচ্ছে। রাষ্ট্র তোমাদের খোরাকপোষাকের ভার নেবে। তোমাদের জন্যে বাজেটে থাকবে মোটা বরাদ্দ। কিন্তু কোনো কোম্পানি বা কারখানা

তোমাদের দায়িত্ব নেবে না। তোমরা অতিরিক্ত।

এই যে বিরাট অতিরিক্ত জনরাশি, এরাই ক্রমে ক্রমে সামরিক প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত হয়। বাজেটে দেখানো হয় যুদ্ধের খরচ এত কোটি টাকা। সেই অতি পরিস্ফীত মুদ্রারাশির একাংশ যায় এদের জন্যে। যুদ্ধের একটা মস্ত সুবিধা এই যে কচুরীপানা ধ্বংস করতে গিয়ে যত লোক সাপের কামড়ে মরে, জার্মান বা রাশিয়ান ধ্বংস করতে গিয়ে তার চেয়ে বহুগুণ ব্যক্তি কামান বন্দুক বোমার মুখে মরে। তাতে অতিরিক্তদের সংখ্যা কমে। রাষ্ট্রকে আর তাদের জন্যে ভাবতে হয় না। পক্ষান্তরে যুদ্ধের কিছু অসুবিধাও আছে। যুদ্ধ তো কেবল অতিরিক্তদের মারে না। আবশ্যকদেরও মারে। উপর থেকে যখন বিস্ফোরক নামে, তখন বস্ত্রের উৎপাদক অন্নের উৎপাদক ইস্পাতের উৎপাদককেও মেরে সাবাড় করে দেয়। সেইজন্যে যুদ্ধ যে ধনপতি বা সমাজপতিরা পছন্দ করেন তা নয়। কিন্তু উপায় কী! কচুরীপানায় এমন কী প্রেরণা আছে যে লক্ষ লক্ষ অতিরিক্ত মানুষ নিত্য নিত্য ঐ কর্ম করবে! বাজেটে প্রতি বছর ঐ খাতে টাকা রাখলে করদাতারাও কলরব করবে না এর নিশ্চয়তা কোথায়! রাস্তা কাটো বলার চেয়ে লড়াইয়ের জন্যে রাস্তা কাটো বললে কতখানি প্রেরণা জাগে ভেবে দেখুন দেখি! আর করদাতাদেরও কীরকম ঠাণ্ডা করা যায়!

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এক জিনিস নয়। মস্ত তফাৎ একটার সঙ্গে অপরটার। তুলনায় সমাজতন্ত্রই ভালো। কিন্তু উভয়েরই প্রাণ হচ্ছে রণতন্ত্র। মানুষকে প্রথমত বেকার করে উভয়েই। তারপর বেগার খাটায় উভয়েই, অবশ্য পেটে-ভাতে খাটায়। অবশেষে যুদ্ধে পাঠায় উভয়েই। এর মূল কারণ তাদের উভয়েরই মূলনীতি। অল্প লোককে দিয়ে অধিক লোকের জন্যে উৎপাদন। দু'লাখকে দিয়ে চল্লিশ কোটির জন্যে উৎপাদন এবং সেই উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও নির্মাণ। নিছক যন্ত্রপাতির বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তার উদ্ভাবন, নির্মাণ ও ব্যবহার সে উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে বলবার আছে অনেক কথা।

সমাজকে এমন করে ঢেলে সাজাতে হবে যার ফলে যে যার নিজের অন্নবস্ত্র উৎপাদন করবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত, নির্মিত ও ব্যবহৃত হবে। একই ব্যক্তি সব রকম উৎপাদন একা পারবে না তা জানি। সেরূপ ক্ষেত্রে সমিতি গঠনের ব্যবস্থা থাকবে। তা ছাড়া পালা করে সবাই রাস্তা কাটবে, কচুরীপানা ধ্বংস করবে, ইমারত বানাবে। অতিরিক্ত বলে একপাল মানুষকে পুষতে হবে না ও বাজে কাজে লাগাতে হবে না। যুদ্ধের ছল করে তাদের মাথা কাটতে ও সংখ্যা কমাতে হবে না। যেখানে সকলেই আবশ্যক, কেউ অতিরিক্ত নয়, সেই রাষ্ট্রই ভারতের স্বরাজ।

(১৯৪৭)

ভারতের ঐক্য

ভারতের ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে, কোনো পরাক্রান্ত সম্রাট যদি উপর থেকে চাপিয়ে না দেন তাহলে ঐক্য জিনিসটা ভারতের স্বভাবে সয় না। ভারতকে ছেড়ে দিলে ভারত সহজেই ছত্রভঙ্গ হয়। তার পরের অধ্যায় আত্মকলহ এবং তার অনিবার্য পরিণাম বৈদেশিক প্রভুত্ব। আবার সেই চাপানো ঐক্য যার জন্যে আমাদের লেশমাত্র কৃতিত্ব নেই, যা গোলামের ঐক্য।

আমরা স্বাধীন হয়েছি এবং উপর থেকে চাপ সরে যাওয়ায় বিভক্ত হয়েছি। এর পেছনে বিদেশীরও কারসাজি আছে, কিন্তু দেশবাসীর উৎসাহ আরো বেশি স্পষ্ট। আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীদের আন্তরিক বিশ্বাস, স্বাধীন ভারত যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে হবে হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র। সেখানে মুসলমানদের দশা হবে গোলামের মতো। তার চেয়ে বিভক্ত ভারত ভালো। তাহলে ভারতের একাংশে তারা স্বাধীন মানুষের মতো বাস করবে এবং অপর অংশে যদি গোলামের মতো ব্যবহার পায় তবে সে অংশ ত্যাগ করবে। এই যখন তাদের আন্তরিক বিশ্বাস তখন তাদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই এবং তর্ক থেকে একটু এগিয়ে দ্বন্দ্ব করেও লাভ নেই। তার চেয়ে ভারতবিভাগ ভালো এবং সেইসঙ্গে বঙ্গবিভাগ, আসাম-বিভাগ, পাঞ্জাববিভাগ। এসব চিন্তা করে আমরা ঐক্যবদ্ধ ভারতের সংকল্প স্থগিত রেখেছি। বর্জন করেছি বললে ভুল হবে, কারণ বর্জন করা আমাদের হাতে নয়। ভারত যে ঐক্যবদ্ধ হবে এটা ইতিহাসের ইচ্ছা। ভারতবাসীর দ্বারা যদি এ ইচ্ছা পূর্ণ না হয় তবে বিদেশীর দ্বারা হবে। যেমন অতীতে হয়েছে তেমনি ভবিষ্যতেও। আবার এ দেশ বিদেশীর পদানত হোক এটা যখন চাইনে তখন একে ঐক্যবদ্ধ করার দায় আমাদেরই বহন করতে হবে। কিন্তু এখন নয়।

আপাতত আমরা হিন্দু-মুসলমানের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করছি। তাদের বিশ্বাস করতে বলছি যে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, পাড়াপড়শীর সম্পর্ক। ভাই-ভাই বলতে চাইলেও বলতে পারছিনে। মুসলমানের উপর শোধ তুলতে গিয়ে হিন্দুরাও বহু স্থলে নৃশংস ব্যবহার করেছে। ভাই কখনো ভাইয়ের সঙ্গে তেমন ব্যবহার করে না। দেশে যখন শান্তি ফিরে আসবে তখন বলব হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই বটে। একই বংশের সন্তান তারা। একই পূর্বপুরুষের রক্ত তাদের দেহে। এ সত্য তাদের চেহারায় আঁকা রয়েছে। এক পোষাক পরলে চেনবার যো নেই কে হিন্দু কে মুসলমান। সেই-জন্যে সাহেবী পোষাক পরে নিরাপত্তা খোঁজে উভয়ে। এটা অবশ্য লজ্জার কথা, তবু এতে প্রমাণ করছে তাদের পারিবারিক সাদৃশ্য। এত বড় সত্য কি একদিন স্বপ্রকাশ হবে না ? এর জন্যে কি আমাদের বক্তৃতা দিতে হবে, বিবৃতি ছাপাতে হবে ?

আমরা ভাই-ভাই না হই, পাড়াপড়শী তো বটে। কী করে এ কথা মাথায় আসে যে হিন্দুরা মুসলমানদের গোলাম, মুসলমানরা হিন্দুদের গোলাম ? খ্রীষ্টানরা তো সর্বত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ। তবে কি তারা সর্বত্র অপরের গোলাম ? গোলাম কথাটাকে অকারণে গায়ে পেতে নিলে আলাদা একটা রাষ্ট্র পত্তনের সুবিধা হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের ইচ্ছার প্রতিকূলতা করে কতকাল

আলাদা রাষ্ট্র খাড়া থাকবে ? একদিন-না-একদিন ইতিহাসের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ভারত ঐক্যবদ্ধ হবে। স্বদেশীরা যদি না করে বিদেশীরা ঐক্যবদ্ধ করবে। আমরা ভাই-ভাই মিলে যদি না করি, পাড়াপড়শী মিলে যদি না করি, বাইরের লোক এসে করবে। সেটা হবে চাপানো ঐক্য। গোলামের ঐক্য। তার চেয়ে ঢের ভালো ঘরোয়া ঐক্য, আপনা-আপনি ঐক্য।

আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুকে একবার আমি লিখেছিলুম (তিনি যে মুসলমান এ কথা অবান্তর হবে না) বাংলার হিন্দু-মুসলমান সংখ্যায় কম-বেশি হলেও শক্তিতে সমান। কেন তবে তারা বলপরীক্ষায় নামে ? যতবার বলপরীক্ষা করবে ততবার দেখবে কেউ হারবে না, কেউ জিতবে না। দু'পক্ষই সমান। বাংলার সমস্যা ও-ভাবে মিটবে না। বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের শক্তি স্বীকার করে নিতে হবে। যখন লিখেছিলুম তখন এটা স্বীকৃত হয়নি। এখনো হয়নি। কিন্তু একদিন হবে। এই স্বীকৃতি থেকে আসবে শান্তির স্থায়িত্ব। তার পরের অধ্যায় ঐক্য। পাঞ্জাবেরও সমাধান একই পথে। সেখানেও মুসলমান অমুসলমান সমান সমান। বাংলায় ও পাঞ্জাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ঐক্যের জন্যে কাউকে খোসামোদ করতে হবে না। ঐক্য আপনি আসবে।

ভারতের ঐক্য অবশ্যম্ভাবী এবং এর কৃতিত্ব ভারতবাসীরই প্রাপ্য। একবার এটা হৃদয়ঙ্গম হলে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের করমর্দন করবে। তখন তারা আন্তরিক বিশ্বাস করবে যে কেউ কারো গোলাম নয়। তখন জাতীয়তার ভিত্তিতে মাইনরিটি অধিকার দাবী করবে এক ভাই, মঞ্জুর করবে অপর ভাই।

(১৯৪৭)

জাতীয় প্রায়শ্চিত্ত

যাঁর অনির্বাণ তপস্যার ফলে স্বাধীনতার স্বাদ পেলুম তাঁরই জীবনশিখা নির্বাপণ করে ও করতে দিয়ে মহাপাতকের ভাগী হলুম আমরা চল্লিশ কোটি নরনারী। সময় থাকতে যদি মহাপ্রায়শ্চিত্ত না করি তবে স্বাধীনতা আমাদের ছাড়বেই, লক্ষ্মী তো অনেকদিন ছেড়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ মহাপাপের তুলনা নেই, কারণ এ অকৃতজ্ঞতার তুলনা নেই। বার্তা যখন কানে এলো প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস যখন হলো বার বার প্রার্থনা করলুম, হে ভগবান, আমাদের মার্জনা করো। আমাদের ক্ষমা করো।

ইহুদীরা এখনো ক্ষমা পায়নি, দু'হাজার বছর ধরে সাজা পেয়ে আসছে। মান নেই, ইজ্জৎ নেই, বাসভূমি নেই, এক স্থান থেকে অপর স্থানে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, নিহত। কেন তাদের এই শাস্তি ? কারণ তারা তাদের প্রেমিককে বধ করেছিল। আমরাও তাই করেছি। আমাদের পাপের পরিমাণ বেশি, কারণ আমাদের প্রেমিক আমাদের মুক্তির স্বাদ দিয়ে গেছেন।

জগতের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে মাথা আমাদের আবার হেঁট হলো। এই অর্ধ অবনমিত জাতীয় পতাকা কি আবার সগর্বে উড়বে? কে জানে সে কতকাল পরে! তেরো দিন, না তেরো বছর, না তেরো শ বছর!

জনগণের শাশ্বত ক্ষুধা তিনটি। স্বাধীনতার ক্ষুধা, শান্তির ক্ষুধা, অন্নের ক্ষুধা। স্বাধীনতার ক্ষুধা তাঁরই সাধনায় মিটেছে। শান্তির ক্ষুধা তাঁরই প্রভাবে মিটতে যাচ্ছিল। অন্নের ক্ষুধা তাঁরই গঠনপ্রতিভায় মিটত। তাঁকে যারা অকালে অপসারণ করল তারা কোটি কোটি নিরন্নের মুখের গ্রাস কেড়ে নিল। আর কেড়ে নিল জীবনের শান্তি।

জানিনে প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতি কী, মেয়াদ কতকাল। যে অধর্মবুদ্ধি, যে বিবেকহীনতা সমাজের উচ্চতম স্তর থেকে এ অপকর্মের প্রেরণা ও প্ররোচনা দিয়েছে, হয় তার সংশোধন ঘটবে, নয় তার আশ্রয় ভাঙবে। সমাজের উচ্চতম স্তর ধুলোয় লুটোবে, রাশিয়ার মতো।

হয় চিত্তবিপ্লব, নয় সমাজবিপ্লব। আর নয়তো স্বাধীনতা বিলোপ। সেই সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ, মন্বন্তর। নৈতিক অধঃপতনের শাস্তি এমনি নিষ্ঠুর।

(১৯৪৮)

অপসারণ

মাস ছয়েক আগে যখন ময়মনসিংহ থেকে চলে আসি তখন জনকয়েক বন্ধু বিদায় দিতে এসেছিলেন। তাঁদের বলেছিলুম, 'দ্বাপর যুগে তিনি মহাভারতের যুদ্ধ বাধতে দিয়েছিলেন। এবার কিন্তু তিনি মহাভারতের যুদ্ধ বাধতে দেবেন না। বাধা দেবেন।'

বন্ধুরা তা শুনে প্রসন্ন হননি। যুদ্ধ অনিবার্য বলেই তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন। গান্ধীজী বাধা দিলে গান্ধীজীকে তাঁরা বাধা দিতেন। আমার সঙ্গে তাঁদের মতভেদ ঘটলো। মতভেদের মধ্যে আমার বিদায়। তারপরে আমি নিজেই অনেকবার ভেবেছি যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত না হলে কাশ্মীরের মতো দশা হবে কলকাতার, দিল্লীর। মনটাকে প্রস্তুত করেছি যুদ্ধের জন্যে। অথচ অন্তরাত্মার সমর্থন পাইনি। গান্ধীজী আমাদের সকলের ঘনীভূত বিবেক। বিবেকের সমর্থন পাইনি। যুদ্ধ বাধবে আর গান্ধী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন এ কখনো হতে পারে কি? তিনি সহ্য করবেন না, প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধ করবেন। জগতের যুদ্ধবিরোধী বিবেকীদের তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্রতিরোধের চূড়ান্ত দেখিয়েছেন। সেই তিনি কখনো সহ্য করবেন আমাদের মহাভারতের যুদ্ধ!

আর এ কি শুধু মহাভারতের যুদ্ধ হয়েই ক্ষান্ত হতো? ছড়িয়ে পড়ত না দেশে দেশে? জড়িয়ে পড়ত না ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া? তৃতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত হতো না? মহাযুদ্ধের দিন কে কার স্বাধীনতার মর্যাদা রাখে! যুদ্ধের ফলে স্বাধীনতা বিপন্ন হতো আমাদের। নবলব্ধ স্বাধীনতা আমরা পোলাণ্ডের

মতো হারাতুম। দুইদিক থেকে দুই শক্তি এসে ভাগ করে নিতো ভারত।

হ্যামলেটের মতো প্রশ্ন করছি, যুদ্ধ করব? করব না? করব? করব না? সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিনে। গীতা বলছে, করো। গান্ধী বলছেন, কোরো না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে U. N. O.র দিকে তাকাচ্ছি। ভাবছি, U. N. O. হয়তো এ সমস্যার সমাধান করবে। বৃথা আশা।

ঠিক এই সংকটে— এই উভয়সংকটে— গান্ধীজীর অপসারণ। যারা যুদ্ধ করবে বলে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারাই তাঁকে সরিয়েছে। তাদের পথের কাঁটা তিনি। পরম বাধা তিনি। তারা তো তাঁকে সরাবেই। আমরা দোদুল্যমানরা তাঁকে ধরে রাখব কী করে! ধরে রাখতে পারতুম যদি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতুম যে যুদ্ধ করব না। যুদ্ধের বদলে সত্যাগ্রহ করব। কিন্তু অহিংসার উপর সে জ্বলন্ত বিশ্বাস কোথায়! সত্যাগ্রহের জন্যে সে ব্যাপক প্রস্তুতি কোথায়! কাজেই কোনো স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিনি, অথচ মূঢ়ের মতো প্রত্যাশা করেছি যে যুদ্ধবিরোধীদের মুকুটমণিকে যুদ্ধকামীদের অধীর হস্ত অপসারণ করবে না, যেহেতু তিনি আমাদের প্রিয়তম আত্মীয়।

প্রাণভরে কাঁদতে চাই, কিন্তু কাঁদিব কখন? আগে তো একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিই, তারপরে কাঁদব। যুদ্ধ না করাই যদি স্থির হয় তবে কাঁদব এই বলে যে সত্যাগ্রহের দিন তোমার মতো ধ্রুবতারা পাব না। আর যদি স্থির হয় যে যুদ্ধ করতেই হবে তবে কাঁদব এই বলে যে, তোমাকে আমরা পরিত্যাগ করেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা করো।

সেবার তিনি পার্থসারথি ছিলেন, সেই দ্বাপর যুগে। এবার তিনি পার্থসারথি নন। সব চেয়ে দুঃখ হয় জবহরলালজীর জন্যে।

(১৯৪৮)

আবার এক হাজার বছর

অমন মানুষ এক হাজার বছরে একজন আসেন। আর যে তাঁর মতো মানুষ দেখব না, এ-কথা জানতুম বলে তাঁর শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করেছি। তাঁর শরীরমনের গাঁথুনি যেমন তাতে তাঁর পক্ষে শতবর্ষ জীবিত থাকা বিচিত্র ছিল না। তাঁর নিজেরও কামনা ছিল একশো বছর বাঁচতে, তাঁর সত্যের পরীক্ষা সমাপ্ত করতে। সে পরীক্ষা কেবল ভারতের জন্যে নয়, সারা পৃথিবীর জন্যে। এক-আধ শতাব্দীর জন্যে নয়, এক হাজার বছরের জন্যে। তাঁর উপর, তাঁর পরীক্ষার উপর নির্ভর করছিল কোটি কোটি মানুষের পুরুষানুক্রমিক ভাগ্য। তাদের পরম ভাগ্য থেকে তাদের যারা বঞ্চিত করেছে, সেই হীন আততায়ীর দল এবং তাদের পিছনে যারা কলকাটি নেড়েছে সেই স্বার্থসর্বস্ব উচ্চশ্রেণী একদিন ইতিহাসের দ্বারা দণ্ডিত হবে নিশ্চয়। ইতিহাস তাদের নিজেদেরই বুকে তিনটি বুলেট বিদ্ধ করেছে। এবং ঘড়ি ধরে দাঁড়িয়ে দেখছে শেষ নিঃশ্বাস পড়তে কত দেরি।

তাদের তো যা হবার তা হবে, কিন্তু আমাদের কী হবে—আমরা যারা তাঁর সত্যের পরীক্ষার দিকে সূর্যমুখীর মতো দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিলুম? আমাদের পরম ভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি বলে কি আমরা হতাশের মতো হাল ছেড়ে দেব, হাজার বছর হালছাড়া হয়ে কাটাব? না, আমরা হাল ছেড়ে দেব না। আমরা সেনাপতিহারা সৈনিকের মতো সামনের দিকে এগিয়ে যাব। সেনাপতি নেই, কিন্তু তাঁর রণপদ্ধতি জানা আছে। সেই রণপদ্ধতির আদি-অন্ত তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন। কেমন করে বাঁচতে হয়, তাও আমরা শিখেছি। কেমন করে মরতে হয় তা-ও। এ শিক্ষা যদি আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয়, তবে তা আমাদেরই দীনতা। আর-কোনো জাতি এ শিক্ষা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আর-কোনো দেশ গান্ধীবাদী হবে। আমাদের জীবনে যা ব্যর্থ হবে, আর-কারো জীবনে তা সার্থক হবে। ইতিহাস তাকে সার্থক করবেই।

ইতিহাসের গান্ধীযুগ শেষ হয়নি. শেষ হতে অন্তত এক হাজার বছর। আমরা সে যুগের প্রারম্ভ দেখেছি। পরিণতি দেখবে ভাবীকালের মানুষ। এই অবিশ্বাস্য নিয়তি, এই সীমাহীন শোক, এই অন্তহীন অবসাদ, এই অনপনেয় কলঙ্ক, এই গভীর লজ্জা, এই দুর্জয় ক্রোধ সবই কাজে লাগবে, সক্রিয় হবে। পরিণতির দিক থেকে দেখলে সব কিছুরই মূল্য আছে।

(১৯৪৮)

মর্ত্য হইতে বিদায়

শান্তি যদি কারো প্রাপ্য হয় তবে তা রবীন্দ্রনাথের। কারণ তাঁর সমস্ত জীবন কেটেছে নিরবচ্ছিন্ন শ্রমে। যে বয়সে লোকে অবসর ভোগ করে, সে বয়সেও তাঁর একদিনও বিরাম ছিল না। লেখনী তুলে রাখলে তুলি তুলে নিতেন, তুলি যদি থামল গানের আসর কিংবা নাচের আয়োজন তাঁকে ব্যাপৃত রাখল। গত বছর এমন সময়েও তিনি সাহিত্যের ক্লাস করেছেন। কোনো দিন দিবানিদ্রাকে প্রশ্রয় দেননি, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সমানে কাজ করেছেন। রোগশয্যাকেও তিনি কর্মক্ষেত্র করতে পারলে ছাড়তেন না। ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' তো রোগ-শয্যার কীর্তি। এমন অক্লান্ত ও একাগ্র তপশ্চর্যা সব দেশেই সব যুগেই বিরল। আমাকে বলেছিলেন, "আমিও কি লিখতে চাই হে? সম্পাদকরা জোর করে লিখিয়ে নেয়।" এই বলে ছবি আঁকতে বসলেন। আসলে তাঁর স্বভাবটা ছিল শ্রমিকের। অবসর তিনিও চাননি, তাঁকেও কেউ দেয়নি। কোথায় চীন, কোথায় আর্জেণ্টাইনা—কারো মেয়ের বিয়ে, কারো ছেলের নামকরণ—ডাক রবি ঠাকুরকে। রবি ঠাকুরও 'না' বলবার পাত্র নন। গত বছর চীনদেশের মন্ত্রী এসে বলে গেলেন, "আপনার জন্যে পুষ্পক বিমান পাঠাব। আপনি যাবেন তো?" ইনিও রাজি হলেন। চীনদেশের কথায় মনে পড়ল কয়েক বছর আগে আমাকে বলেছিলেন, "একটা লোভনীয় নিমন্ত্রণ এসেছে হে। চীনদেশ থেকে। কিন্তু

কী করে যাই ? যুদ্ধ বাধবে শুনছি।" চীনদেশের প্রতি তাঁর প্রগাঢ়তম শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। অন্য কোনো দেশকেই তিনি এত ভালোবাসেননি, ভারতকে বাদ দিলে। চীনা অধ্যাপক যখন প্রস্তাব করলেন গত বছর, "গুরুদেব, খাবার তৈরি করে পাঠাব ?" গুরুদেব খুশি হয়ে বললেন, "নিশ্চয়।" কী জানি কী সে খাদ্য! পাঁচশ বছরের পুরানো ডিম না পাখির বাসা!

স্বর্গ যদি কারো প্রাপ্য হয় তবে তা রবীন্দ্রনাথের। কারণ সমস্ত জীবন কেউ এমন সুন্দর ভাবে কাটায়নি। অসুন্দর কাজ, অসুন্দর কথা, অসুন্দর চিন্তাকে তিনি অশুচি জ্ঞান করতেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের অভিজাত, ইংরেজীতে যাকে বলে nobleman, তাঁর নোবিলিটি শত্রু মিত্র সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে। লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' পত্রিকা পর্যন্ত। তিনি যখন রাগতেন তখন দারুণ রাগতেন, কিন্তু ভুলেও অশোভন উক্তি করতেন না। মুখের উপরে লেখনীর উপরে তাঁর কঠোর শাসন ছিল। জীবনের কোনো অবস্থাতেই তিনি আপনাকে খেলো হতে দেননি। অথচ তিনি বেশ সহজ মানুষ ছিলেন, হাস্য পরিহাসে তাঁর দোসর ছিল না। গান্ধীজীকে একটি মেয়ে কেমন জব্দ করেছিল সে গল্প তাঁর কাছে দুবার শুনেছি। অবশ্য বলতে সাহস হয়নি যে জব্দ হয়েছিল সেই মেয়েটিই—গান্ধী নন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ করা সকলের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তবে তাঁর নিজের কাজ নিয়ে এতটা তন্ময় থাকতেন যে, সামাজিক মানুষের স্নেহের দাবি মেটাতে সময় পেতেন না। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করলে তবেই তাঁর স্নেহপরায়ণতার পরিচয় ধীরে ধীরে প্রকট হতো। তাঁর স্নেহপরায়ণতার অন্যায় সুযোগ নিয়েছেন অনেক প্রিয়পাত্র। প্রমাণ না পেলে তিনি কাউকে সন্দেহ করতেন না, মানুষের উপরে তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। জীবনে তিনি বহু বঞ্চনা সয়েছেন, অপবাদ তো তাঁর চিরসঙ্গী ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি মানুষের উপর বিশ্বাস হারাননি, সেই বিশ্বাস তাঁকে শেষ দিন পর্যন্ত তিক্ততা হতে রক্ষা করেছিল। তাঁর কর্মজীবন ছিল যেমন অবসাদহীন, তাঁর মনোজীবন ছিল তেমনি তিক্ততাহীন। সেইজন্যে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কায়িক ও মানসিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথ যা সমস্ত জীবন ধরে অর্জন করেছেন এখন তিনি তা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করুন। উপভোগ করুন শান্তি, উপভোগ করুন স্বর্গ। মুক্ত আত্মারা, দেবতারা তাঁকে নিজেদের মধ্যে লাভ করলেন। আমরা মানুষেরা তাঁকে হারিয়েছি বটে, কিন্তু যে পথ দিয়ে তিনি সেখানে গেছেন সেখানকার সেই পথ তো পড়ে রয়েছে। পুনর্দর্শন কি কোনো দিন হবে না যে শোকে মুহ্যমান হব ?

"দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হলো শেষ
বুকে লও তারে।
শান্তি অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি উৎস ধারে।

সীমন্তে গোধূলি লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত সঙ্গীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥"

(১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথের পরিচয়

অন্যান্য মহাশিল্পীদের মতো রবীন্দ্রনাথেরও দ্বিবিধ পরিচয়। এক দিক থেকে তিনি দেশকালের অধীন, আর এক দিক থেকে দেশকালের উর্ধে।

যে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, বাংলাদেশের কবি, ভারতবর্ষের কণ্ঠস্বর, বিশ্বমানবের মিলনদূত, যিনি সমাজ ধর্ম শিক্ষা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে চিন্তা করেছেন, যিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রমগুরু ও বিশ্বভারতীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, যিনি যে দেশেই গেছেন সে দেশেই রাজসম্মান লাভ করেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের সৃষ্টি ও ইতিহাসের পাত্র। কী করে তিনি সম্ভব হলেন, কী করে তাঁর বিকাশ হলো, কী খেয়ে তিনি 'উবশী' লিখেছিলেন, কী পরে-ছিলেন 'বিসর্জন' অভিনয়কালে, কোন সাবানে হাত ধুয়ে কোন কলম হাতে নিতেন, এ সব তথ্য ক্রমে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হবে। কত লোক "এ সব করিয়া বাহির বড়ো বিদ্যা করিবে জাহির"। পণ্ডিতেরা বিবাদ করবেন "লয়ে তারিখ সাল।" সমাজনীতির অধ্যাপক বলবেন, রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে তাঁর পশ্চাতে ছিল বহু পুরুষের সঞ্চিত বিত্ত, জমিদারী ও কাটাকাপড়ের একচেটে কারবার—এবং বিত্তসাপেক্ষ সংস্কৃতি। ছাত্রেরা বলবে, এখন ঠিক বুঝেছি 'গীতাঞ্জলি'র অর্থ কী। 'বলাকা'র কী তাৎপর্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, "কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে"। অথবা তাহার যুগের চরিতে। অথবা তাহার দেশের চরিতে। কবির অন্তরে যে চির বসন্ত ছিল সেই স্বর্গীয় শক্তি ইতিহাসের বন্দী নয়। পৃথিবী তার যাত্রাপথের এক প্রান্তের ব্যাকুল বেণু। বাঁশের বাঁশিতে বাজে নন্দনের পূর্ণশ্বাস ভরা অপার্থিব সুর। অনুরণন ফুরোয় না বসন্ত-বিদায়ের বহুকাল পরেও। তাকেই বলা হয় কাব্যের অমরতা। যে রবীন্দ্রনাথ বসন্তপ্রতিম, যিনি তরুণতম, ঐতিহাসিকেরা তাঁকে চিনবেন না, পণ্ডিতেরা তাঁকে বুঝবেন না। যারা তাঁরই মতো যাত্রাপথিক তারাই শুধু নিজ নিজ অনুভবের আলোয় তাঁকে আবিষ্কার করবে।

(১৯৪১-৪২)

রবীন্দ্রাদিত্য

আজ যতক্ষণ কুয়াশা ছিল ততক্ষণ সবটা জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে কুয়াশার ওপারে কোটি সূর্যের শোভাযাত্রা চলেছে, তারা সবাই মিলে এত আগুন জ্বালিয়েছে যে সেই আগুনের ধোঁয়ায় আকাশ হয়ে গেছে কালোয় কালো। ততক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল আমার চোখে' যেন কে একখানা glare protector চশমা পরিয়ে দিয়েছে, যেদিকে তাকাই সেই দিকে ছাইরঙ।

সন্ধ্যাবেলা সে চশমা সরিয়ে নিলে। দেখলাম চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নার লহর ছুটেছে, আকাশ-সরোবর এত নির্মল যে তল পর্যন্ত চোখ যায়। তখন মনে হলো আমি এই তুচ্ছ লণ্ডন শহরের বাসিন্দা নই, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটিতেও আমাকে ধরছে না, ঐ যে আকাশ-সরোবরের তলে স্ফটিক নির্মিত স্তম্ভ, ওরই ভিতরে লুকোনো একটি কৌটোয় আমার প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে, সেই স্পন্দন আমি বুকে হাত রেখে গুনতে পারছি। তখন মনে হলো আমি কী বিরাট, আমি কী অমেয়! আমার বুকের সঙ্গে আমার হাতের ব্যবধান এক আধ ইঞ্চি নয়, নিযুত নিযুত যোজন, একের স্পন্দন আর-একের কাছে ধরা পড়তে এক আধ সেকেণ্ড নয়, শত শত সহস্র বছর লাগে। আমি কালাতীত, আমি চিরন্তন।

নিজের এই বিশ্বরূপ দর্শন জীবনে প্রতি দিন ঘটে উঠে না। লণ্ডনে যেমন কুয়াশা লেগেই থাকে জীবনেও তেমনি আত্মবিস্মৃতি লেগেই থাকে। কদাচ এক আধ দিন আবছায়া মতন মনে হয় আমি অমৃতস্য পুত্রঃ, আমার দেহ মন আমার পৃথিবী আমার আকাশ—সবই যেন একখানা কুয়াশা মাত্র, এ সবকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ করে আমি কোটি সূর্যের মুকুট পরে জ্বলছি, আমি দিব্যতেজাঃ, আমি চিরযৌবন।

পরমুহূর্তেই অবিশ্বাসের ভারে নুয়ে পড়ি। তখন কিছুতেই ধারণা হয় না যে আমি স্থান কালের কুয়াশায় বদ্ধ কত লোকের অনুগ্রহনির্ভর সামান্য একটা মানুষ ছাড়া আর কিছু, এত অসহায় যে আমার জীবনটাই যেন একটা ঘটনাচক্রে ঘটে যাচ্ছে গোছের ব্যাপার, উপর দিয়ে একখানা মোটর চলে গেলে কিংবা ভিতরে গোটাকয়েক ব্যাসিলি বাসা বাঁধলেই সব শেষ। যেন আমি নিয়তির হাতের একটা কলের পুতুল, সেও যেমন অন্ধ আমিও তেমনি মূক, সে যখন আমাকে ভুল করে ভেঙে ফেলে আমি তখন তাকে নালিশটাও জানাতে পারিনে। এমন আত্ম-অবিশ্বাসের সময় ওমর খৈয়াম খুলে বসি, তাঁর রচনা এক পেয়ালা মদের মতো সব গ্লানি ভুলিয়ে দেয়। কিংবা এইচ. জি. ওয়েল্‌সের সঙ্গে আফিং খেতে বসে যাই, মন উড়তে থাকে সুদূর ভবিষ্যতে, যেখানে সবই কেমন করে ঠিক হয়ে গেছে, মাটির উপরে স্বর্গ নেমে এসেছে, দুঃখ দ্বন্দ্ব দুর্ভাবনা চিরকালের মতো শেষ।

কিন্তু মদ বা আফিং খাবার মতো বিলাসিতাও আমাদের সাজে না। আমাদের কুয়াশা-ঢাকা প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মতো

ঘুরে মরি। উদরান্নের তাড়নার উপরে একটু রংচং ফলিয়ে গাধা খাটুনির গাধার টুপীর উপরে "dignity of labour" এঁকে, কাজের মানুষ আমরা কেবল কাজই করি, কাজের ঘণ্টা থেকে চুরি করে যদি-বা এক আধ ঘণ্টা খেলা করি তো অমনি বিবেকে বাধে, সেজন্যেও নিজের কাছে ও পরের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় যে সেটা নিছক সময় নাশ নয়, সেটা efficiencyরই অঙ্গ, সেটাও দরকারী। আমাদের জীবনের আগাগোড়াই যে দরকারী, আমরা যে অদরকারের ধার দিয়েও যাইনে, এই আমাদের প্রধান গর্ব, এবং অদরকারী কিছু দৈবাৎ করে বসি তো আমাদের লজ্জার সীমা থাকে না।

এই যে দাস-মৌমাছির মতো দরকারী হবার গর্ব, এ যে আসলে কত বড়ো একটা গ্লানি তা আবছায়ামতন মনে হয় যেদিন কুয়াশার ঠুলি খসে পড়ে, জগতের ঐশ্বর্যময় রূপ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, সহসা আবিষ্কার করি আমরা রাজা, আমাদের এই সাতমহলা প্রাসাদের যেখানে চোখ পড়ে সেখানে কোহিনুর সেখানে ময়ূর সিংহাসন। তখন একটি মুহূর্তে আমরা নিরবধি কালের রাজত্ব ভোগ করে নিই, কোথায় ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যায় সমাজের দরকারী চাকর হবার ইতর গর্ব, তখন আমরা লীলাময়, লীলার আনন্দে কোটি মন্বন্তর অতিবাহিত করি, কিন্তু এমনি নিবিড় সে আনন্দ যে দেখতে দেখতে কোটি মন্বন্তর কেটে যায়, ঘড়ি খুলে দেখি মাত্র একটা মিনিট কেটেছে।

২

আমরা কাজের মানুষ। আমাদের জীবনের ঘড়িতে এমন একটা মিনিট কদাচ বাজে কি-না সন্দেহ। কিন্তু মনে করা যাক এমন একজন মানুষ আছেন যাঁর ঘড়িই নেই, যাঁর সময় মিনিট দিয়ে ভাগ করা যায় না। মিনিট তো পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের ২৪ ভাগের ৬০ ভাগ। যাঁকে পৃথিবীতে ধরে না, যিনি অসীম জগতে বাস করেন তাঁর জীবনকে মিনিট দিয়ে ভাগ করাও যা মন্বন্তর দিয়ে ভাগ করাও তাই। তিনি মহাকালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিজের পরমায়ুটাকে কেবল অসংখ্য মুহূর্ত দিয়ে নয় অসংখ্য মন্বন্তর দিয়ে গেঁথেছেন এবং অসমাপ্য মালাখানিকে স্বরং মহাকালের কণ্ঠে দিয়েছেন।

এমন মানুষকে আমরা ভালো বুঝতে পারিনে, আমাদের সঙ্গে এঁর এতই অমিল। ইনি স্কুলে কলেজে পড়তে যাননি, আপিসে আদালতে খাটতে যাননি, সামাজিকতা করতে পার্টিতে যাননি, ইনি অপথে বিপথে বেকার বেড়িয়েছেন, পথের শেষে যে কোথাও একটা পৌঁছোতে হবে এমন তাড়া ইনি একেবারেই বোধ করেননি, এঁর জীবনটাই একটা খেলার ছুটি। লোকে ঘর বাঁধে আকাশ বাতাসকে বাইরে রাখতে, ইনি নদীতে নদীতে নৌকোয় নৌকোয় ভেসেছেন আকাশ বাতাসকে অন্তরে রাখতে। দিনের পর দিন এই বিশাল জগৎ এর সূর্য নক্ষত্র আলোক অন্ধকার শরৎ বসন্ত ফুল পাখি নিয়ে এঁর অণুতে অণুতে অনুপ্রবিষ্ট হলো এবং এঁকে আপনার মতো বিশাল করে তুলল। যে-দেশে এঁর

বাস সে-দেশের আকাশে রাত্রিদিন উৎসব চলে, যেন ইন্দ্রসভা। জন্মক্ষণ থেকে সেই সভার নিমন্ত্রণ যিনি পেয়েছেন তিনি কি কখনো সেখান থেকে নড়তে পেরেছেন, ফিরতে পেরেছেন? সামান্য পৃথিবীর সামান্য তর্কসভায় কি কেউ কোনো দিন তাঁকে দেখতে পেয়েছে? তিনি ইন্দ্রসভার সভাসদ, তিনি তেত্রিশ কোটি অদিতি সন্তানের একতম, তিনি আদিত্য। আকাশের সূর্যদেবের সঙ্গে এক সারিতে তাঁর আসন। ঐশ্বর্যের অমৃত সেবন করতে করতে তিনি মুহূর্তে মুহূর্তে অমর হলেন। সেই অমরত্বের কতক ধরা পড়ল তাঁর সৃষ্টিতে, কতক থেকে গেল সৃষ্টির অতীত। ব্যক্ত করবার পক্ষে এত আনন্দ তিনি পেয়েছেন যে কবিতায় প্রবন্ধে গল্পে ও গানে লক্ষ বার লক্ষ ভাবে লক্ষ ভঙ্গিতেও ব্যক্ত করে উঠতে পারেননি, ব্যক্ত করবার আবেগে বাষ্পাকুল হয়েছেন। এই বাষ্পাকুলতা তাঁর রচনাকে চিত্র-বিচিত্র করেছে, আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো, সত্যের সঙ্গে হেঁয়ালির মতো, জীবনের সঙ্গে মরণের মতো।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এই বিশ্বসৃষ্টির মতো। বিশ্বস্রষ্টার অন্তরে নিজেকে ব্যক্ত করবার যে প্রচণ্ড আবেগ আছে সে আবেগের যতটুকু তিনি ব্যক্ত করেছেন তার তুলনায় অনেক অনেক বেশী তিনি ব্যক্ত করতে চাইছেন; বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে যা হয়েছে ও যা হতে চাইছে দুইয়ের সমন্বয়; একাধারে মর্ত্য ও স্বর্গ, মাটি ও বাষ্প, বৃক্ষ ও বীজ। যারা নাস্তিক তারা স্রষ্টার সৃজনাবেগ সম্বন্ধেই নাস্তিক, তারা গানটুকু শোনে রেশটুকু শোনে না, রূপটুকু দেখে ইঙ্গিতটুকু দেখে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরু বিশ্বকবির কাছে পাঠ নিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির মতোই সৃজনের আবেগে পরিপূর্ণ, তাঁর রচনায় ব্যক্তির চেয়ে ব্যঞ্জনাই বেশী। সেইজন্যে তাঁর রচনাকে একবার পড়ে শেষ করে দেবার উপায় নেই। লক্ষ বার পড়তে হয়, লক্ষ বার বুঝতে হয়। যাদের ধৈর্য অল্প তারাই নাস্তিক হয়ে একরকম শস্তা শান্তি পায়, তারাই লেখা পড়ে ঐ কাগজের আগুনে চায়ের জল গরম করতে বসে। তারা খোঁজে একটা হাতে হাতে পাবার মতো অর্থ, একটা practical use, একটা উপকার। এসব লোকের পক্ষে 'গীতিমাল্যে'র চেয়ে 'কথামালা' বড়ো, 'ফাল্গুনী'র চেয়ে 'নীলদর্পণ' বড়ো। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বার্নার্ড শ বড়ো।

আর যারা অমৃত চায়, যাদের ধৈর্য অসীম, যারা ওঁ নামক একটিমাত্র শব্দের জন্য একটা জীবন দিয়ে ফেলাকে সামান্য দান মনে করে তাদেরই জন্যে রবীন্দ্রনাথ। তারা তাঁর এক-একটি রচনাকে এক-একটি ফুল বা এক-একটি তারার মতো ভোগ করে, গন্ধ থেকে রূপ থেকে বুঝতে পারে এর শিরায় শিরায় জীবন শিহরিত হচ্ছে, জীবনেরই মতো এ এক মরণাতীত রহস্য। রসিকের জন্যে এর সৃষ্টি। ক্ষুধার্তের জন্যে এ নয়। যে মানুষ ক্ষুধার দাস, জরা ব্যাধি মৃত্যুর শাসনাধীন, কর্মচক্রের মৌমাছি, সে তো রাজা নয়, রাজভোগের মূল্য সে কী বুঝবে? তাকে আকাশভরা তারার সঙ্গে ভোগে না বসিয়ে দিয়ে কাঙালী-ভোজনে পাঠিয়ে দিলে সে খুশি হয়।

আমরা যখন খেলার আনন্দে খেলা করি তখনি আমরা মুক্ত, আমরা রাজা,

আমাদের হাতে যুগ-যুগান্তকাল সময়, আমাদের হাতে জগৎ ভাণ্ডারের সোনার চাবি। আমাদের কিসের অভাব যে অভাব হাতে করে কবির সম্মুখে দাঁড়াব, বলব আমাদের ক্ষুধা মেটাবার মতো কিছু ভিক্ষা দাও, কাজে লাগাবার মতো কিছু পরামর্শ দাও। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাক্ষাৎকারের জন্যে যখন যাই তখন আমাদের রাজবেশ পরে যেতে হয়, সেই রাজবেশ যে-বেশ আজ সন্ধ্যাকালে আমি পরেছিলাম, যে-বেশ সকলেই আমরা মাঝে মাঝে পরে থাকি। রাজবেশ বললাম বটে, কিন্তু কাঞ্চনমূল্য এর নেই, এ বেশ ধূলায় ধূসর শিশুর অঙ্গেও আছে। রবীন্দ্রনাথের খাঁটি সমজদার আমি অত্যন্ত অল্পশিক্ষিত চাষার মধ্যেও দেখেছি। সে যেমন মেঠো ফুলের কিংবা বাঁশের বাঁশি কিংবা বৈশাখী ঝড়ের কিংবা বেনো জলের সমজদার তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও সমজদার। সে যেমন লাঙল ঠেলে, মৃদঙ্গ বাজায়, হা-ডু-ডু খেলে ও ধানে বোঝাই নৌকা চালিয়ে শহরে শহরে যায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গান গায়, সেটাও তার পক্ষে একটা adventure। সে তো অভাবগ্রস্তের মতো অর্থ চায় না, সে চায় উদ্বৃত্ত।

যত বিপদ কেবল আমাদের মতো Philistineদের বেলা, আমরা যারা হক্ পয়সা দিয়ে 'value' কিনি, কাগজের দর কালির দর হিসাব করে লেখার দর কষি, আমরা যারা রাজসাক্ষাৎকারে যাবার সময় তারা-ঝলমল উন্মুক্ত আকাশের উদার রাজবেশখানি পরতে ভুলে যাই, আমরা যারা শ্রদ্ধার পাত্রকে শ্রদ্ধা দেখাতে কুণ্ঠিত হয়ে নিজেকে শ্রদ্ধেয় করে তুলতে পারিনে। আরো বিপদ আমরা যখন একো জনা একো রকম দাবি নিয়ে কবিকে ব্যতিব্যস্ত করতে যাই; যখন একজন বলি, তোমার লেখায় দেশের সুবিধা কতটুকু হলো; একজন বলি, তোমার লেখায় দীনদরিদ্রদের proletarianদের অভাব অভিযোগ ফুটে উঠল না কেন; একজন বলি, তোমার লেখায় জীবনের বাস্তব প্রতিকৃতি কোথায়? এত প্রশ্নের ঝাপটা সয়েও কবি নিরুত্তর থাকেন—থাকতে পারেন! এও তাঁর ক্ষমতার পরিচায়ক। "Others abide our question. thou art free!"

৩

যে নারী নিজে মা হয়েছে যে-কোনো মায়ের ছেলের প্রতি তার একটি স্বাভাবিক দরদ আছে, যেন তার জন্যে সেও দায়ী। কোনো মতেই সে নিরপেক্ষ বিচারকের মতো আর-এক মায়ের ছেলের দোষগুণ তৌলে দেখতে পারে না, কেমন করে দোষগুলো তার চোখ এড়াতে চায় কিংবা তার হৃদয় থেকে সমর্থন টেনে আনে। আর সে যদি তার প্রিয়সখীর ছেলে হয়ে থাকে তো তার সাত খুন মাপ, সে নিজের ছেলেরও বাড়া।

রবীন্দ্রনাথ স্রস্টা। এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির প্রতি তাঁর একটি অহেতুক দরদ আছে, এ-ও যে আর-এক স্রষ্টার বড়ো বেদনার সৃষ্টি। সেই আর-এক স্রষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়তম বন্ধুর মতোই চেনেন এবং ভালোবসেন, আজন্ম তিনি তারই সঙ্গে তো অপথে বিপথে ঘুরেছেন আকাশে বাতাসে মাটিতে নদীতে; সকল আত্মীয়ের মধ্যে তিনিই তো তাঁর আত্মীয়তম। রবীন্দ্রনাথ জীবনে একটা

দিনও নাস্তিক হতে পারেননি, সংশয়ী হতে পারেননি, একটা দিনও ভাবতে পারেননি যে জগৎ একটা মায়া কিংবা একটা প্রাণহীন আত্মাহীন জড়পিণ্ড। গানের বেদনা কণ্ঠে নিয়ে তাঁর জন্ম, প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছেন তাঁরই গানের মতো এই জগৎটিও কার একখানি গান, মমতায় দরদে দায়িত্বে তাঁর স্রষ্টা-হৃদয় একে একবারও বিচার করেনি, সন্দেহ করেনি, একে ভালোবেসেছে বিশ্বাস করেছে সমর্থন করেছে। জীবন ভরে তিনি অনেক দুঃখও পেয়েছেন, অনেক দুঃখই দেখেছেন, বন্ধুর উপরে অভিমানও বড়ো কম করেননি, কিন্তু বন্ধুর সৃষ্টি তাঁর এত প্রিয় যে একবারও তিনি তাকে দূর দূর করে সংস্কারকের মতো ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করলেন না কিংবা তার থেকে দূরে পালিয়ে বৈরাগীর মতো শবাসীন হলেন না। তিনি তার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন, তার অসংখ্য বন্ধন। সে যেন তাঁরই একখানি গান, তাঁরই একখানি কবিতা, তার কত ছন্দপতন, কত বেসুর, কত ত্রুটি, তবুও সে সুন্দর, সে ভালো, সে সত্য।

নিখিল বিশ্বকে একান্ত আপনার করতে পেরেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন তথাকথিত realist হতে পারেন নি। তিনি ঠিক জেনেছেন কুয়াশার ওপারে কোটি সূর্যের শোভাযাত্রা, দুঃখের আড়ালে পরম আনন্দের আয়োজন, মৃত্যুর মুখোশ পরে নবজাত শিশুর হাসি। বৃহৎ জগতে ও বৃহৎ কালে বাস করতে করতে রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দুই-ই হয়েছে বৃহৎ। তিনি যা দেখেছেন তাই বৃহত্তর reality—তার "কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই"। তিনি ঠিক জেনেছেন আমরা ছদ্মবেশী রাজা, আমাদের মধ্যে যে নিকৃষ্টতম সে-ও। আমাদের দোষগুলো রাজকীয় রকমের, আমাদের দুঃখগুলোও রাজকীয়। একবার যদি আমরা নিজের গভীরতম পরিচয়টিকে নিজের হৃদয়ে সত্য করে পাই তবে কি আমরা সহস্র বন্ধনের মাঝে মুক্তির স্বাদ পাইনে! তবে কি আমরা একে-তাকে-ওকে দোষ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টির বিরুদ্ধে মূর্তিমান নালিশের মতো দাঁড়াই! এর কাছে তার কাছে ওর কাছে হাত পেতে সমস্ত সৃষ্টির চোখে হেয় হই!

আমাদের প্রত্যেকের যে আইডিয়াল দিকটি আছে, যেখানে আমরা সৃজনের আবেগ নিয়ে বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টিতে রত, যেখানে আমরা যা হয়েছি তার অনেক বেশী হতে চাইছি সেই দিকটির ছবি আমাদের হয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন। মানুষকে এত বড়ো সত্য করে অতি অল্প লোকই দেখেছেন। মানুষের প্রতি অসীম দয়া তো কত মহাত্মা জনের আছে, কিন্তু অসীম শ্রদ্ধা আছে রবীন্দ্রনাথের মতো জনা কয়েক দ্রষ্টার। এতটা শ্রদ্ধা আছে বলেই তিনি মানুষের তুচ্ছ অভাব অভিযোগ ও তুচ্ছ আবেদন নিবেদনগুলোকে তুচ্ছ বলতে পেরেছেন। তাই নিয়ে মানুষকে দরিদ্র বা কুৎসিত বলতে তাঁর লেখনীতে বেধেছে, কোনোদিন একটি মানুষকেও তিনি কাব্যে উপন্যাসে অপমান করেন নি, প্রত্যেকেরই স্বপক্ষে কোনো-না-কোনো বক্তব্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর রচনায় 'devil' নেই। কেননা বিশ্বসৃষ্টিতে 'devil' নেই। সবাই ভালো, কেউ এক-রকম, কেউ অন্যরকম। সবাই সুন্দর, কেউ একরকম, কেউ অন্যরকম। এবং

সবাই রাজা—"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"।

রবীন্দ্রনাথের দেশ ও রবীন্দ্রনাথের কাল আমাদের দেশ-কালের সমার্থক না হয় তো ছোট আমরাই, তিনি নন। আমরা অল্প একটু জায়গায় ও ছোট একটি শতাব্দীতে থাকি। তিনি এত বড়ো জগতে ও এত বিস্তৃত কালে থাকেন যে তাঁর কাছে একটি যুঁই ফুলের সুখ-দুঃখ ত্রিশকোটি মানুষের সুখ-দুঃখকে ছাড়িয়ে যায়, আকাশের যতগুলি তারাকে তিনি চেনেন পৃথিবীর ততগুলি মানুষকে তিনি চেনেন না, এবং হাজার বছর পরে যে অমৃতপিয়াসীরা জন্মাবে তাদের অমৃত দেবার দায়িত্ব তাঁর যত আমাদের খাদ্য পানীয় দেবার দায়িত্ব তাঁর তত নয়। তাঁর পরিপ্রেক্ষিত সর্বদেশ ও সর্বকালব্যাপী, তাই তাঁর রচনায় কোনো দেশ ও কোনো কালের প্রতি অন্যায় পক্ষপাত নেই, তিনি তাঁর বন্ধু বিশ্বস্রষ্টার মতো ন্যায়নিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের বাণী সর্বদেশের ও সর্বকালের মর্মের বাণী। এ বাণী যে আমাদেরও অন্তরতম বাণী এ আমরা ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু যখনি শুনি তখনি হৃদয় দুলে ওঠে। এ বাণী যদি খুব ছোট হতো, যদি আমাদের উপস্থিত সমস্যাগুলোকে এক নিঃশ্বাসে সমাধান করে দিত, তবে আমরা খুশি হতুম, কিন্তু আমাদের খুশির জন্যে এই বিচিত্র বিশ্ব-সৃষ্টির যেমন মাথাব্যথা নেই, এর সঙ্গে যিনি আপন সৃষ্টি মিলিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিরও তেমনি মাথাব্যথা নেই, তিনি সমধর্মার জন্যে নিরবধিকাল অপেক্ষা করতে পারেন। আমাদের খুশি করা তো বিদূষকের কাজ। ইনি যে রাজা, এঁর আহ্বান আমাদের রাজ্যভার গ্রহণ করতে, বৃহৎ জগতে ও বৃহৎ কালে সকল আদিত্যের শ্রদ্ধাযোগ্য হয়ে সমান সারিতে বসতে, এঁর বাণী—"আপন মাঝারে গোপন রাজারে প্রাণ যেন তোর পায় রে"।

(১৯২৮-২৯)

বার্নার্ড শ

বছর চারেক ব্যাঙ্কের চাকুরি করে বিশ বছর বয়সে বার্নার্ড শ ডাবলিন ছাড়লেন। ব্যাঙ্কের কাজে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে মার্গে সাফল্য ছিল তাঁর করায়ত্ত। কিন্তু তাঁর প্রতিভার মার্গ অন্যতর, ক্ষেত্রও অন্যত্র। এরূপ অস্পষ্ট বোধ নিয়ে তিনি লণ্ডনে গেলেন। সেখানে তাঁর মা ছিলেন সঙ্গীতের শিক্ষয়িত্রী। বড়ো ঘরের মেয়ে, স্বামী মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছেন বলে নিজেকে উপার্জনের উপায় দেখতে হয়।

হিতৈষীরা পরামর্শ দিলেন চাকুরি করো, মায়ের সাহায্যে লাগো। কেউ কেউ চাকুরিও যোগাড় করে দিলেন। শ কিন্তু দরিদ্রা মায়ের গলগ্রহ হয়ে বছরের পর বছর কাটালেন। এটা ওটা খুচরো কাজ করেন, কোনো গানের আসরে পিয়ানো বাজান, কোনো সঙ্গীত সমালোচকের সহকারী হয়ে সমালোচনা লিখে দেন। টেলিফোন কোম্পানিতে যোগ দিয়ে বেশী দিন মন লাগে না, তবু

সেই উপলক্ষে লণ্ডনের সর্বত্র ঘুরে দেখা হয়। মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারী যেদিন বিনা মাশুলে খোলা থাকে সেদিন মূর্তি বা ছবি দেখে বেড়ান।

প্রতি রাত্রে পাঁচ পৃষ্ঠা করে লিখতে লিখতে পাঁচ বছরে পাঁচখানা নভেল লিখে ফেললেন। কোনো প্রকাশক সেসব নভেল ছাপল না। তখন তিনি লিখলেন খবরের কাগজে রঙ্গ সমালোচনা। থিয়েটারের, কনসার্টের, প্রদর্শনীর। পাঁচ বছরের নীরব সাধনায় ভাষা শিখেছিলেন। সঙ্গীত তাঁর মায়ের কাছে শেখা, অভ্যাস করে আসছিলেন। আর তাঁর হাস্যরস তাঁর স্বভাবগত। লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ বিদূষক বলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। অমনি তাঁর উপর হলো অর্থবৃষ্টি।

ইতিমধ্যে তিনি কার্ল মার্ক্স্ পড়েছিলেন। সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। ব্যক্তিগত সাফল্যের মোহ তাঁর ছিল না। নতুন সমাজের আইডিয়া তাঁকে সম্পূর্ণ অধিকার করেছিল। তিনি সুযোগ পেলেই বক্তৃতা দিতেন। সেই বক্তৃতাই হাস্যরসের সহিত ওতপ্রোত হয়ে অভিনয়-সমালোচনা আকারে পত্রিকার পাতে পরিবেশিত হতো। যে মানুষের নিজের কোনো বাঁধন নেই লোভ নেই সংস্কার নেই তাকে ঠেকায় কিসে? তার উপর রাগ করলে সে ভয় পায় না, তাকে গালাগালি দিলে সে তামাশা করে, তার সঙ্গে তর্কে নামলে সে নাকাল করে ছাড়ে।

একটি ছোট থিয়েটারে ইবসেনের নাটক অভিনীত হয়। ইংলণ্ডে কেন অমন নাটক লেখা হয় না? শ বললেন, আচ্ছা, আমি লিখছি। তাঁর প্রথম নাটক 'Widowers' Houses' চারিদিকে নিন্দার ঝড় তুলল। তিনি আবিষ্কার করলেন যে তিনি নাটক লিখতে পারেন এবং যা আজ নিন্দার ঝড় তাই কাল স্তুতির ঝড় হবে। তিনি আবিষ্কার করলেন যে থিয়েটারই তাঁর চার্চ, নাটকই তাঁর সার্মন। একদিন চার্চ খালি করে লোক থিয়েটারে আসবে ধর্মের ব্যাখ্যান শুনতে।

তাঁর ধর্ম তিনি ইতিমধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। সে-ধর্মের তত্ত্ব হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ইভলিউশন, আর কর্মকাণ্ড হচ্ছে সোশ্যালিজম্। বিবর্তনবাদ প্রচলিত হয়ে অবধি পরমপিতা পরমেশ্বর যে ক্ষুদ্র কীট থেকে বৃহৎ তিমি পর্যন্ত সকলের এককালীন স্রষ্টা এ ধারণা সুধীজনের পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু বিবর্তন সম্বন্ধে সেকালের লোক ডারউইনকে একমাত্র প্রামাণিক বলে গ্রহণ করায় ব্যক্তিসম্পত্তিবাদীদের বিবেক দরিদ্রের দুঃখ দেখে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করছিল না। অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন। ধনিকরাই যোগ্যতম, তারাই থাকবে। শ্রমিকরা মরবে। প্রকৃতির নিয়ম যন্ত্রের মতো অমোঘ ও নির্মম। সেই যন্ত্রের দ্বারা প্রতিনিয়ত বাছাইয়ের কাজ চলেছে। যারা প্রকৃতির আপন হাতে নির্বাচিত হলো তারা পৃথিবীর প্রভু ও ভোক্তা। যারা বাতিল হলো তারা ভারবাহী, তারা ভোগ করবে তা, তারা ভুগবে।

ডারউইন-কথিত বা ডারউনের প্রতি আরোপিত এই হৃদয়হীন সমাচার কখনো মানুষের নব ধর্ম হতে পারে না, পুরাতন ধর্মের স্থান পূরণ করতে পারে না। এটা ধর্ম নয়, এটা ধনিকতন্ত্রের সাফাই। এ যদি ধর্ম হয় তবে

চুরি ডাকাতিও ধর্ম। বার্নার্ড শ তাই ডারউইনকে উপহাস করলেন। তিনি গেলেন ডারউইনের পূর্বগামী লামার্কের কাছে। প্রাণী আপনাকে ইচ্ছানুযায়ী বিবর্তিত করতে পারে, এতকাল তাই করে এসেছে। চিরকাল তাই করবে। প্রকৃতি একটা যন্ত্র নয়, প্রকৃতি পরীক্ষা করছে, ভুল করছে, ভুল করতে করতে ঠিক করছে, যা ঠিক করছে তাকে বংশানুক্রমিক বৃত্তিতে পরিণত করছে। ইচ্ছা করলেই আমরা আমাদের সমাজের গঠন পরিবর্তন করতে পারি, তার দ্বারা বংশের বিবর্তন ঘটাতে পারি, অতিমানব হয়ে উঠতে পারি। আর তা যদি না করি, যদি যন্ত্রের হাতে আত্মসমর্পণ করি, তবে পরিবর্তনশীল পরীক্ষাপরায়ণা প্রকৃতি একদিন আমাদের উপর আস্থাহীন হয়ে অন্য কোনো প্রাণীকে শ্রেষ্ঠতায় উন্নীত করবে। আমাদের প্রতি তার পক্ষপাতের হেতু নেই।

সমাজের গঠন কীরূপ হবে পুরাতন ধর্মপ্রবর্তকগণ তার সূচনা দিয়ে গেছেন। আমরা তার কালোপযোগী সংস্কার সাধন করলে তাই হয়ে দাঁড়ায় সোশ্যালিজম্। সঞ্চয় ও সম্পত্তি প্রায় প্রত্যেক প্রবর্তকের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। যীশু বলেছেন উটের পক্ষে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু বড়ো লোকের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ দুষ্কর।

অথচ সম্পত্তি না হলে মানুষের চলে না। চাষ করব, তার জন্যে হাল লাঙল চাই। বাস করব, তার জন্যে এক কাঠা জমি চাই। সম্পত্তি দোষের নয়, দোষের হচ্ছে ব্যক্তির স্বত্ব। সেইজন্যে সোশ্যালিস্টদের প্রস্তাব সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধিকারে যাক, ব্যক্তির যা দরকার তা ব্যক্তি নিক রাষ্ট্রের ভাণ্ডার থেকে। তা নইলে ধনী দরিদ্রের উপর প্রভুত্ব করতে থাকবে, দরিদ্রের সম্পত্তি কিনে নিয়ে তার স্বাধীনতা কিনে নিতে থাকবে। রাষ্ট্র সকলের সম্পত্তি গ্রহণ করে তার পরিচালনা করবে ও লাভ হতে সকলকে সমান ভাগ দেবে। ব্যক্তির নিজের সঞ্চয় বলে কিছু থাকবে না, কারণ সঞ্চয়ই তো মূলধন, মূলধন থেকেই তো পরকে খাটিয়ে স্বয়ং লাভমান হওয়া। উৎপাদনের উপায় ব্যক্তির হাতে দেওয়া যাবে না, ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে কেবল সম্পত্তির ব্যবহার।

রাষ্ট্রের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করার আনুষঙ্গিক বিপদ এই যে রাষ্ট্রের চালক যারা হবে তারা চালনকার্যে অনিপুণ হতে পারে। নাবিক অনভিজ্ঞ হলে জাহাজের ভরাডুবি। সাধারণত যারা ভোটের জোরে পার্লামেণ্টে যায় ও পার্টির জোরে গভর্নমেণ্ট দখল করে তাদের মূঢ়তা, অদূরদর্শিতা ও হৃদয়হীনতা এত বেশী যে তাদের স্কন্ধে সকল সম্পত্তি ন্যস্ত করলে সর্বনাশ অনিবার্য। অতএব এক দল অতিমানব চাই। এদের প্রজনন করতে হবে যেমন করে উৎকৃষ্ট বৃষ বা উৎকৃষ্ট অশ্ব প্রজনন করা হয়। সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের দ্বারা হবে আধান, শ্রেষ্ঠ নারীদের দ্বারা ধারণ। পরস্পরের সহিত দাম্পত্য জীবন-যাপনে এদের অরুচি থাকতে পারে, কিন্তু সমাজহিতায় জগদ্‌হিতায় চ এরা সাময়িকভাবে সংগত হবে। ফলে যেসব সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তারাই হবে সকলের ভাগ্যবিধাতা।

বার্নার্ড শ-র মতবাদের থেকে অতিমানবের আবশ্যকতা এমন অবিচ্ছেদ্য বলে সে মতবাদ সোশ্যালিস্ট মহলেও উপেক্ষিত। ইংলণ্ডের সোশ্যালিস্টরা

অতিমানব চায় না, তারা চায় পক্ষপাতী ভোটার। বেশীর ভাগ ভোট যেদিন তাদের হস্তগত হবে সেদিন তারা অর্থাৎ তাদের নায়করা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে ভোটারের নির্দেশ অনুসারে। ইংলণ্ডের সোশ্যালিস্টরা ডেমোক্রেসির ওপর আস্থা রাখে। তার মানে বেশীর ভাগ লোকের মত যে একদিন তাদের মতবাদের অনুকূল হবে এ তাদের ধ্রুব বিশ্বাস। তা যদি হয় তবে একে একে রেলপথ, খনি, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, জমি ইত্যাদি রাষ্ট্রের হাতে আসবে, যেমন ইতিমধ্যে ডাকঘর, বেতার ইত্যাদি এসেছে।

রাশিয়ার ওরাও অতিমানবের জন্যে অপেক্ষা করেনি। লেনিনকে যদিও শ্রদ্ধা করে তবু লেনিনকে ওরা অতিক্রম করেছে। অতিমানব আর যাই হোন, তিনি ব্যক্তিবিশেষ। ব্যক্তিবিশেষের জন্যে কমিউনিস্ট দর্শনে স্থান নেই। ব্যক্তিকে হতে হবে সমস্টির সহিত একান্ত। সমষ্টির চিত্তে যে চেতনা, সমষ্টির মানসে যে কল্পনা, সমষ্টির হৃদয়ে যে আবেগ, সমষ্টির জীবনে যে-উদ্দেশ্য, তোমার আমার ব্যক্তিত্বের শিশিরবিন্দু তাই প্রতিফলিত করবে। তুমি আমি সমষ্টির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তুমি আমি ইউনিট নই, ইউনিট হচ্ছে সমষ্টি। কাউকে যেমন মুখ দেখেই চেনা যায়, কাউকে গলা শুনে, তেমনি সমষ্টিকে চেনা যায় তোমাকে আমাকে দেখে। আমাদের আপন আপন পরিচয় নেই, আমরা সমষ্টির পরিচায়ক।

সমষ্টির উদ্দেশ্য যাদের মধ্যে প্রতিমূর্ত হয়েছে, যারা সমষ্টির অন্তঃকরণ-স্বরূপ, তারা সমষ্টির পক্ষ থেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে, নাই-বা হলো তারা মেজরিটির প্রতিনিধি। তাদের নিজের বলতে কিছু নেই, না ধন, না মন। কমিউনিস্ট রাশিয়া, ফাসিস্ট ইটালী ও নাৎসী জার্মানী এক্ষেত্রে একমার্গী। তবে এদের প্রত্যেকে রাষ্ট্রসম্পত্তিবাদী নয়। দ্বিতীয় দুই দেশ কণ্টকের দ্বারা কণ্টকের উচ্ছেদ চায় বলে কণ্টকের অনুকরণ করেছে।

কাজেই প্লেটো যে আশা করেছিলেন দার্শনিকরা শাসক হবে, পোপরা যে মনে করেছিলেন যাজকরা হবে শাসক, বার্নার্ড শ যে প্রস্তাব করেছেন অতি-মানবরা শাসন করবে এর কোনোটার ললাটে সিদ্ধি লেখা নেই।

তারপর অতিমানবের জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও আশঙ্কার কারণ রয়েছে। উৎকৃষ্ট ব্যাঘ্র প্রজনন করা যায় না। চিড়িয়াখানায় যে বাঘ জন্মায় সে যতই খাক যতই বাড়ুক যতই শিক্ষা পাক তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিলে সে খাস জংলী বাঘের এক আঁচড়ে মারা পড়বে। তোমার অতিমানব উকীলের সঙ্গে বুদ্ধির দ্বন্দ্বে জিতবে না, বেনের সঙ্গে দরাদরির খেলায় হার মানবে, সৈনিকের উচ্চাভিলাষের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, পলিটিসিয়ানের চালবাজিতে মাৎ হবে।

শ আক্ষেপ করেছেন, তাঁর পুরোনো কথা আজও পুরোনো হয়নি, সমাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, আগে চলছে না, মিথ্যা বড়াই করছে প্রগতির নামে।

এ কথা সত্য যে পৃথিবীতে দারিদ্র্য রয়েছে, এবং দারিদ্র্য একটা নিবার্য ব্যাধি। এদিক থেকে দারিদ্র্যের শত্রু ও মানবের মিত্র বার্নার্ড শ-র শেষ বয়সের আক্ষেপ তাঁর প্রথম বয়সের আপত্তির মতোই সহেতুক। (১৯৩৫)

আজ ও আগামী কাল

নানা জনের নানা স্বপ্ন। এ পর্যন্ত প্রায় সকলেই নিশ্চিত জানতেন যে স্বপ্নের সার্থকতার জন্যে আছে স্বর্গ। মর্ত্য কোনো মতে জীবনের দুটো দিন কাটিয়ে যাবার পান্থশালা। দু দিনের বাসাকে পাকা করে গড়ে কী হবে? তাই পার্থিব অসুবিধা ও অবিচারগুলোর হাতে হাতে প্রতিকার না করে মানুষ ভাবত একবার স্বর্গে পৌঁছোতে পারলে হয়। সেখানে পাপীকে সাজা ও পুণ্যবানকে পারিতোষিক দেওয়া হবে। দরিদ্রের জন্যে তো সেখানকার জায়গা রিজার্ভ করা রয়েছেই। "Theirs is the Kingdom of Heaven." অতএব ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণু হয়ে ধরিত্রীকে সহ্য করা যাক।

পৃথিবীর ছোট বড়ো ধর্মমতগুলোর রাশি রাশি স্বপ্ন যেখানে আশ্রয় লাভ করে বিশ্বাসীকে বাঁচবার বল যুগিয়ে আসছিল সেই স্বর্গকে ও জন্মান্তরকে সংশয়ের বিষয় করে বিজ্ঞান মানুষকে ইহসর্বস্ব করে তুলেছে। আপাতত ইহলোক ও ইহজন্মই একমাত্র সত্য। অতএব স্বপ্নগুলোর আশ্রয়ভূমি হয়েছে এই একটুখানি পৃথিবী। নানা মানুষের নানা স্বপ্ন পৃথিবীতে নেমে এসে কল্পনা খেলাবার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা না পেয়ে ঠোকাঠুকি বাধিয়েছে। এইখানেই দরিদ্র পাবে তার স্বাচ্ছন্দ্য, নির্যাতিত পাবে তার ক্ষতিপূরণ, ক্রীতদাস পাবে তার মুক্তি, অন্ধ পাবে তার দৃষ্টিশক্তি, সবাই পাবে সবাইকার মন যা চায় তাই। এই আদালতে যদি ন্যায়বিচার না ঘটে তবে এর পরে আপীল নেই। সমস্ত ইতিহাসে এই হতভাগিনী পৃথিবীর কাছে এতখানি প্রত্যাশা কেউ পোষণ করেনি।

রাতারাতি স্বর্গ রচনা করবার বায়না নিয়ে বিস্তর লোক বিস্তর প্ল্যান হাজির করেছেন, কিন্তু কার্ল মার্কসের সঙ্গে হেনরি ফোর্ডের, মুসোলিনির সঙ্গে এইচ. জি. ওয়েলসের, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কাউন্ট কাইজারলিঙের, নলিনীকান্ত গুপ্তের সঙ্গে শিবরাম চক্রবর্তীর গোড়াতেই গরমিল।

"আজকের জগৎ থেকে অতীতের বীজ সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করা"— এই যদি হয় শিবরামের প্ল্যান* তবে এর লজিক-সম্মত পরিসমাপ্তি আত্মহননে। শুধু আত্মহননে নয়, বংশরক্ষা করার আগে আত্মহননে। নতুবা অতীতের বীজাণুর দ্বারা উত্তর পুরুষ ও ভাবীকাল সংক্রামিত হবে।

পুরাতন বছরের ফসলের বীজ থেকে নতুন বছরের ফসল গজায়। সেই বীজ যদি কেবলমাত্র পুরাতন হতো তা হলে ভয়ের কথা ছিল। কিন্তু তার পিছনে আছে অনাদি কালের সংহত সাধনা ও তার ভিতরে একটা ব্রহ্মাণ্ড আত্মবিকাশের অপেক্ষা করছে। কে তাকে বিনষ্ট করবার স্পর্ধা রাখে? বনস্পতি অঙ্কুরিত হবার সময় বীজের ভিতরকার শাঁসকে অঙ্গীভূত করে এবং সেই বীজের শক্তিতে বনস্পতিত্ব পায়। শক্তি যত কালের পুরাতন হোক তাকে অবজ্ঞা করতে নেই। তাকে ভস্মসাৎ করে নয় আত্মসাৎ করেই আমাদের বৃদ্ধি।

তবে কি আমরা হাত জোড় করে অতীতের উপাসনা করব? না। তা-ই

---

* আজ এবং আগামী কাল—শিবরাম চক্রবর্তী প্রণীত।

করে এসেছি এতকাল—যে সম্পত্তিকে ভোগ করার কথা তাকে সিন্দুকে তুলে রেখেছি। এখন আমাদের প্রাচীন সভ্যতাটাকে ভেঙে সেই সোনা দিয়ে নতুন সভ্যতা গড়তে হবে। আহা, থাক, থাক, পুরাতন প্যাটার্নের অলংকার, তাকে তার আদিম অবস্থায় অক্ষত রাখো—এ কথা গ্রাহ্য করব না। আবার এমন কথাও গ্রাহ্য করব না যে, প্যাটার্নটা সেকেলে ও জিনিসটা ফিট করছে' না বলে দাও অতখানি সোনা বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে। ওটা রাগের কথা, অভিমানের কথা। যারা সৃষ্টি করতে চায় তারা রিপুকে প্রশ্রয় দিলে রিপুর হাতেই মরে। সৃষ্টির চেয়ে অনাসৃষ্টিই করে যায় বেশী।

কেবল ভারতবর্ষের অতীত নয়, সমগ্র পৃথিবীর অতীতও আমাদের অতীত। আমরা কেবল ভারতবর্ষীয় নই, আমরা মানুষ। আমাদের জন্যে গ্রীক রোমান ঈজিপ্সিয়ানরাও তপস্যা করে গেছেন। আমাদের সৃষ্টিকে অতিদূর ভবিষ্যতের যেখানে যত মানুষ আছে সকলের হাতে দেবার মতো করে যেতে হবে। তারাও জিনিস ভাঙবে বটে, কিন্তু ওর ভিতরে যেটুকু খাঁটি সোনা থাকবে সেটুকুকে ফেলে দেবে না।

রাশিয়ার প্রতি পক্ষপাতের কারণ দেখিনে। আর সাম্যবাদও সমাজ সৃষ্টির সুসমঞ্জস আদর্শ নয়। মানুষ যে মনে মনে সাম্যকেই একমাত্র ভালোবাসে এর প্রমাণ তার আবহমান কালের ইতিহাসে নেই। সাম্য ও বৈষম্য দুইয়ের প্রতি তার সমান আকর্ষণ। প্রজারঞ্জক রাজাকে সে মাথায় করে রাখে, লোকহিতৈষীর জন্যে প্রাণটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আবার, মায়ের কাছ থেকে বন্ধুর কাছ থেকে আদায়ও করে নেয় তেমনি। এই সব বৈষম্য লোপ পেলে সে ক্ষুব্ধই হবে, একটা সর্দারের জন্যে একটি সর্বস্ব দাবি-করা প্রিয়ার জন্যে তার আকাঙ্ক্ষা অচরিতার্থ থেকে যাবে।

সাম্য ও বৈষম্য এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে হবে। আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও এ তত্ত্ব জানতেন। কেবল পৃথিবীকে দু দিনের মনে করায় তাঁদের সামঞ্জস্যের আইডিয়া আর-একটা পৃথিবীর অপেক্ষা রেখেছে। তা সত্ত্বে আইডিয়াটার কাঁচা রকম পরিব্যাপ্তি চিরকালই কোনো-না-কোনো সমাজে দেখা গেছে সত্য, কিন্তু আধুনিক মানব যেমনটি চায় তেমনটি নয়। পাছে বড়ো বেশী নিরাশ হতে হয় সেজন্যে আধুনিক মানবকেও একটি কথা মনে রাখতে হবে। পৃথিবীর প্রতি যেন সে আসক্ত না হয়ে পড়ে। পৃথিবী তাকে মৃত্যুর হাত থেকে সাবিত্রীর মতো ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পৃথিবী তাকে প্রিয়-বিয়োগে সান্ত্বনা ও প্রিয়বিরহে উদ্বেগরাহিত্য দিতে জানে না। পার্থিব অবস্থা তার কল্পনাকে ও পার্থিব কর্তব্য তার স্বাধীনতাকে পদে পদে প্রতিহত করবে। পরিশেষে, মানুষে মানুষে যেমন একটা সহজ ঐক্য আছে তেমনি নিগূঢ় বিরোধও আছে। সেটা প্রকৃতিগত এবং ব্যক্তিত্বের শামিল। মানুষ দল বাঁধতে পারে বটে কিন্তু কোনো দলে স্থায়ী হতে পারে না। প্রিয়পরিবৃত হয়েও সে অন্তরে একাকী। সমাজ মানুষকে চরম জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে না।

সুতরাং মোহমুক্তভাবেই নতুন সমাজ রচনা করতে হবে। (১৯৩০)

প্রত্যয়

গান্ধীজীর সংগ্রাম

গান্ধী-পরিচালিত সংগ্রাম ছিল একই সঙ্গে দুই মহাশক্তির বিরুদ্ধে। একটার নাম তো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, অপরটার নাম সব দেশের ও সব কালের সমরবাদ। প্রথমটাকে তিনি ভারতছাড়া করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়টাকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছিলেন। তাঁর সহযোদ্ধারা শাসনযন্ত্রের ভার পেয়ে দেখলেন সমরযন্ত্রের সাহায্য বিনা শান্তিরক্ষা সম্ভব নয়। দেশরক্ষা তো নয়ই। এ কথা যদি সত্য হয় তবে সমরবাদ এদেশে চিরস্থায়ী হতে বাধ্য। কিন্তু গান্ধীজী এ কথা সত্য বলে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। যার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম সে-ই যদি চিরস্থায়ী হয় তবে সংগ্রাম বৃথা।

সহযোদ্ধারা যখন দিল্লীর সিংহাসনে তিনি তখন নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সমরযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে প্রমাণ করতে। নোয়াখালী থেকে বিহার, বিহার থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লী, যেখানেই যান সেখানেই তাঁর একমাত্র ধ্যান কী করে তিনি প্রমাণ করবেন যে শান্তিস্থাপনের জন্যে সমরযন্ত্রের সাহায্য নেবার দরকার নেই। তাঁর উপরেই প্রমাণের সবটা দায়, তাঁর সহযোদ্ধাদের উপরে একটুও না। যতদিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল ততদিন তাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলে তাঁরাও যে তাঁর মতো সমরবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করছিলেন তা তো নয়। তাঁরা তাঁকে ছেড়েছিলেন। কেবল তিনিই তাঁদের ছাড়তে পারছিলেন না ভালোবাসার খাতিরে।

প্রমাণ করতে তিনি একেবারেই পারলেন না, কেমন করে বলি ? কলকাতার শান্তি, দিল্লীর শান্তি বহু পরিমাণে তাঁরই চেষ্টার ফল। বেঁচে থাকলে শান্তিরক্ষার কাজ আরো অগ্রসর হতো। তবে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ এই দুই কুরুক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। জনশক্তি পিছনে ছিল না। যতদিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল ততদিন পিছনে ছিল, তারপরে তাঁকে ছেড়েছিল। নয়তো অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে আসত না। শেষের দিকে তিনি ছিলেন একান্ত নিঃসঙ্গ, তাঁর সংগ্রাম যেন তাঁর একার সংগ্রাম। যেন জনগণের নয়।

এখন তো তিনি নেই, প্রমাণ করবার দায় তাঁর অবর্তমানে তাঁর শিষ্যদের। প্রমাণ করা মুখের কথা নয়, করতে হবে জীবন আহুতি দিয়ে। জনগণ যাতে পিছনে দাঁড়ায় তার আয়োজন করতে হবে। নইলে শান্তির কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হবে না। নিঃসঙ্গ মানুষের চেষ্টা পদে পদে ব্যাহত হবে। জনগণ সজাগ না থাকলে তিনি হয়তো নিহত হবেন।

শান্তিবাদ হচ্ছে শান্তির জন্যে সংগ্রাম। অন্যান্য সংগ্রামের মতো এখানেও সেনাপতি হবেন একজন, কিন্তু সেনা হবে অগণ্য। জীবন দান করতে প্রস্তুত হতে হবে প্রত্যেককে এবং তেমন সুযোগ জুটবে অনেকেরই ভাগ্যে। এই পরীক্ষা আরম্ভ করে গেছেন গান্ধীজী, সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। সমাপনের ভার তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের উপরে। তাঁরা যদি তাঁদের কর্তব্য না করেন আর কেউ

করবেন আর-কোনো দেশে। হয়তো এই যুগেই, নয়তো আর-কোনো যুগে। তাঁর আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত থাকবে না চিরকাল। সমরবাদ চিরস্থায়ী হবে এ কখনো সত্য নয়। সাম্রাজ্যবাদের মতো সেও একদিন যাবে।

(১৯৪৮-৪৯)

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

ক্যাপিটালিজম ও কমিউনিজম এই দুই চরম পন্থার মাঝখানে হয়তো একটা নরম পন্থা আছে, কিন্তু সেই মধ্যপন্থার নাম গান্ধীপন্থা নয়। গান্ধীপন্থাও একপ্রকার চরম পন্থা। মধ্যপন্থাকে যাঁরা উত্তম পন্থা বলে বরণ করেছেন তাঁরা যেন তাকে গান্ধীপন্থা বলে ভুল না করেন। অথবা অপর দশজনকে ভুল না বোঝান।

গান্ধীপন্থাও একপ্রকার চরম পন্থা। ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে এর সেই সম্পর্ক যে-সম্পর্ক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। অর্থাৎ আপোসহীন বিরোধ। এই ভাবটাই ব্যঞ্জিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধ্বজার উপর চরকার বজ্রাঙ্কুশ এঁকে। যাঁরা বিরোধে বিশ্বাস করেন না, আপোসে বিশ্বাস করেন, তাঁরা তাঁদের পতাকা থেকে চরকাকে সরিয়েছেন। চরকাকে সরানো মানে গান্ধীবাদকে সরানো। গান্ধীবাদকে সরানো মানে গান্ধীজীকে সরানো। গান্ধীজীকে সরানোর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম গান্ধীহত্যা। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হবে যদি তাঁরা মধ্যপন্থার নাম রাখেন গান্ধীপন্থা।

যেদিন ভারতের গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে খদ্দর তৈরি হবে সেদিন শহরের কাপড় তৈরি করার জন্যে হয়তো কয়েকটা কাপড়ের কল থাকবে, কিন্তু গ্রামের কাপড়ের জন্যে একটিও কল থাকবে না। আপোস বলতে এই পর্যন্ত। এর বেশি না। মধ্যপন্থীরা কিন্তু প্রত্যেকটি কল চালু রাখতে চাইবেন, সুযোগ পেলে আরো কয়েকটা বাড়াবেন, তবে তাঁতির উপর দয়া করে কিছু জায়গা ছেড়ে দেবেন। সুতো যোগাবে কিন্তু চরকা নয়, কল। গ্রাম নয়, শহর।

শহরের কাপড়ের কলগুলোতে যে কোটি কোটি টাকার মূলধন খাটছে সেই কোটি কোটি টাকার মূলধন বিপন্ন হবে যদি সাত লক্ষ গ্রামে সাত কোটি চরকা চলে। সুতরাং চরকার সঙ্গে মিলের অহিনকুল সম্পর্ক। চরকাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেই মিলওয়ালাদের মূলধন নিষ্কণ্টক হয়। মিলওয়ালাদের কাছে যাঁরা শেয়ার কিনেছেন তাঁদেরও ডিভিডেন্ড নিরাপদ হয়। অতএব চরকাকে তাঁরা জায়গা ছেড়ে দিতে পারেন না। এতদিন যে সহ্য করেছেন সে শুধু গান্ধীজীর হাতে ক্ষমতা ছিল না বলেই। ক্ষমতা যেদিন এলো সেদিন চরকাকে সরিয়ে সমঝিয়ে দেওয়া হলো যে ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই। তিনি যেমন অক্ষম ছিলেন তেমনি অক্ষম রয়ে গেলেন। না, তার চেয়েও অক্ষম, কেননা দেশ স্বাধীন হবার পরে তো আর অসহযোগ করা চলে না।

চরকা সম্বন্ধে যা বলা গেল ঘানি ঢেঁকি প্রভৃতি গ্রাম্য যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেও

তাই বলা যায়। এসব যদি গ্রামে গ্রামে চলে তবে শহরের ধানকল তেলকল ইত্যাদিতে যে মূলধনটা খাটছে সেটা বিকল হয়। যাঁরা শেয়ার কিনেছেন তাঁদের ডিভিডেন্ড মারা যায়। গ্রামগুলো যদি প্রত্যেক বিষয়ে স্বাবলম্বী হয় তাহলে কোটি কোটি টাকার মূলধন বেকার হয়। যাঁরা মূলধনের জন্যে আমেরিকার কাছে দরবার করছেন তাঁরা তো ইচ্ছা করলে এই স্বদেশী মূলধনটাকে টেনে নিতে পারতেন। তাহলে গ্রামও বাঁচত, শহরও বাঁচত। এই মর্মে আপোস করলে গান্ধীপন্থার সঙ্গে বেখাপ হতো না।

(১৯৪৯)

তিরিশে জানুয়ারি

বিনু ভাবছিল মনে মনে। এসব কথা কাউকে বলবার নয়, বলে লাভও নেই।

বাপ মারা গেলে ছেলেরা কাঁদে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বাপ যদি খুন হয় তাহলে কি তারা কাঁদে, না জ্বলে পুড়ে মরে? গান্ধীজী যদি দেশসুদ্ধ লোকের বাপু হয়ে থাকতেন তা হলে গান্ধীহত্যার পরে আমরা অন্য দৃশ্য দেখতুম। দেখতুম দেশের লোকের চোখে জল নেই, চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। সে আগুন অহিংস হতে পারে, তবু তা আগুন। তা জল নয়।

কিন্তু দেখা গেল তাদের চোখে আগুন নেই। অধিকাংশের চোখে জল। অনেকের চোখে কুটিল হাসি। তাদের কেউ কেউ মিষ্টান্ন বিতরণ করেছে, কেউ কেউ মিষ্টিমুখ করেছে। আওরঙ্জেবের অবতার হিন্দুর সর্বনাশ করতে জন্মেছিলেন, বেঁচে থাকলে সর্বনাশ করতেন। শিবাজীর অবতার তাই তাঁকে বিনাশ করেছে। কে কার উপর রাগ করবে!

গান্ধীহত্যার পর দু'বছর কেটে গেছে। এই দু'বছরে অন্তত এইটুকু উন্নাত হয়েছে যে গান্ধীজী যে হিন্দুর শত্রু এ কথা লোকে সহজে বিশ্বাস করে না। বছর দু'তিন বাদে একেবারেই বিশ্বাস করবে না। তখন আসবে রাগ করার সময়।

সে রাগ জোয়ারের মতো আসবে। হয়তো হিংসার আকার নেবে। অহিংসার রূপ নিলেও সে রাগ জোয়ারের মুখে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সেই শক্তিকে যে-শক্তি জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ পথে।

বিপ্লবকে বেশি দিন বিভ্রান্ত করা যায় না। এক বছর, দু' বছর, তিন বছর, চার বছর, পাঁচ বছর। না, তার বেশি নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দেশবাসীর বিচ্ছেদ, নেতার সঙ্গে তাঁর অনুবর্তীদের বিচ্ছেদ কখনো এতকাল স্থায়ী হতে পারে না। তা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে দেশ ও কাল গান্ধীজীর জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তিনি এ দেশের ও এ যুগের মানুষ ছিলেন না। আমি কিন্তু অবুঝ। আমি কিছুতেই মানব না গান্ধীজী এ যুগের বা এ দেশের নন। এ যুগের সঙ্গে, এ দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আকস্মিক নয়। এ যোগাযোগ এত গভীর যে ভারতবর্ষ একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে আবিষ্কার করবে তাকে গান্ধী-

নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলেই সে অন্ধকারে পথ খুঁজে মরছে।

জনগণের সেই ক্রোধ কেউ রোধ করতে পারবে না। তবে ইচ্ছা করলে তাকে অহিংস প্রণালীতে পরিচালিত করা যায়। তা হলেই তা ধ্বংসের জন্যে উন্মাদ না হয়ে সৃষ্টির জন্যে উদ্যোগী হবে। তখন সেই সৃষ্টিও হবে বৈপ্লবিক। জ্বালা না থাকলে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি করতে পারে সেই ব্যক্তি বা সেই দেশ যে জ্যোতিষ্কের মতো জ্বলছে।

(১৯৫০)

বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা

আশাবাদী হয়তো আরো কিছুক্ষণ বসতেন, কিন্তু নিরাশাবাদীকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল কোথায় যেন কী কাজ আছে। তিনি যাবার সময় বললেন, 'ভুলে যাবেন না, এটা হচ্ছে যাকে বলে ট্রানজিশন পিরিয়ড। ও রকম একটু-আধটু হবেই। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এবং তার সূচনা', তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, 'আর পাঁচ বছরের মধ্যে পরিস্ফুট হবে। এদেশের উপর ভগবানের বিশেষ করুণা আছে।'

নিরাশাবাদী এর উত্তর দেবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, আশাবাদী তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'আমি ইনটেলেক্ট দিয়ে এই প্রত্যয়ে পৌঁছই নি। আমার কিছু অকাল্ট পাওয়ার আছে। আমি দিব্য চক্ষে ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। ভারত যে স্বাধীন হবে এও আমি দেখতে পেয়েছিলুম ঘটনার ঠিক পাঁচ বছর আগে। সেই ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে।'

তাঁকে ধরে রাখা গেল না। নিরাশাবাদী তর্কের সুযোগ হারিয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'বেশ আছেন ভদ্রলোক।' তারপর বললেন, 'কেন এমন হলো? একটা স্বাধীন দেশ, এই তার স্বাধীনতার চেহারা! এরই জন্যে তপস্যা করেছিলুম কৈশোরকাল থেকে! কোথাও এতটুকু উৎসাহ নেই, প্রেরণা নেই। হিমালয়ের মতো অবিচল কঠোর—করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গের সংকল্প নেই। আছে কেবল অকর্মক চিন্তা, অকাল্ট পাওয়ার! ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল!'

বিনু চুপচাপ বসেছিল। বহুদিন ধরে ভাবছে, কিন্তু ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছে না। যেখানে বিশ্বাসের জোর নেই সেখানে চিন্তা একপ্রকার চিত্তবিনোদন। বলল, 'পরিবর্তন হবেই।'

নিরাশাবাদী বিশ্বাস করলেন না। বললেন, 'পরিবর্তন তো মন্দের দিকে হতে পারে।'

বিনু বলল, 'তবে শোন। আজকে আমার পালা বলবার, তোমার পালা শোনবার। কাল পালাবদল হবে।

'আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, যে-বিশ্বাস আমাদের ছিল। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে বিধাতা এক-একটা দেশ সৃষ্টি করেছেন এক-একটা পরীক্ষার জন্যে। ইংলণ্ডে তাঁর যে পরীক্ষা চলেছে তার নাম

ডেমক্রেসি। আগে ছিল পলিটিকাল ডেমক্রেসি। এখন সোশ্যাল ডেমক্রেসি। রাশিয়ায় তাঁর পরীক্ষা কমিউনিজম। কমিউনিজমের বীজ সেদেশের মাটিতে ছিল, কিন্তু সেটা ছিল ইউটোপিয়ান। এখন হয়েছে সায়েণ্টিফিক। তেমনি ভারতবর্ষেও তাঁর পরীক্ষা চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। তাঁর এই পরীক্ষার নাম অহিংসা। আগে ছিল ব্যষ্টিগত। এখন সমষ্টিগত। আমাদের জীবনে আমরা এর যেটুকু দেখেছি হয়তো তার বেশি দেখতে পাব না। হয়তো এর পরে যা আসছে তা এর বিপরীত। কিন্তু আমাদের জীবন দিয়ে জাতির জীবনের ইয়ত্তা হয় না। জাতির জীবনে অহিংসার পরীক্ষা বারংবার হবে, হয়তো কোনোবারই নিখুঁত হবে না, তবু হবে, হবে, হবে। মহাত্মার মতো এত বড়ো নেতা আর আসবেন না, কিন্তু বিধাতার কাজ মহাপুরুষের জন্যে অপেক্ষা করে না, সামান্য মানুষকে দিয়েও তিনি তাঁর কাজ করিয়ে নেন।

'সমষ্টিগত অহিংসার জন্যে ভারতের মুখ চেয়ে আছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ। তাদের সেই প্রত্যাশা আমরা পূরণ করতে পারছিনে। মহাত্মাকেও শেষে স্বীকার করতে হলো যে আমাদের এই অহিংসা সত্যিকার অহিংসা না, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। সত্যিকার অহিংসা প্রেমিকের ধর্ম, বীরের ধর্ম। আমরা তার পরীক্ষা দিইনি। আমাদের হয়ে তাঁকেই তার পরীক্ষা দিতে হলো। অগ্নি-পরীক্ষা। সমষ্টির জীবনে এ শিক্ষা ব্যর্থ হবে না। আমাদের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী নয়। হলে দেখতে পেতুম এ শিক্ষা জাতির অন্তরে প্রবেশ করেছে, অন্তরালে কাজ করছে। সময় না হলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না। কবে সময় হবে তা কেউ বলতে পারে না। পঞ্চাশ বছরও তার পক্ষে বেশি সময় নয়। মহাত্মা তো আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচতেই চেয়েছিলেন তাঁর দেরী আছে আন্দাজ করে। হয়তো অত দেরী হবে না, তাঁর দীর্ঘ জীবনের চেয়ে তাঁর হত্যাই তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক হবে। তিনি বেঁচে থাকলে যার জন্যে পঞ্চাশ বছর লাগত তিনি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন বলেই তা দশ বছরে হবে।

'আমার নিজের বিশ্বাস গান্ধীজীর পরীক্ষার সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক আকস্মিক নয়। যেমন লেনিনের পরীক্ষার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক আকস্মিক নয়। আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের ষোলো আনার নাড়ীনক্ষত্র জানিনে। যেমন রাশিয়ার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী জানত না। তাদের মতো আমাদেরও অহংকার আমরাই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার মালিক। এ অহংকার অজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়েছে। একটা ভূমিকম্পেই এর পতন ঘটবে। গান্ধীজী এ দেশকে সমস্ত সত্তা দিয়ে চিনেছিলেন, তাই অত বড়ো একটা পরীক্ষায় নামতে সাহস পেয়েছিলেন। দেশের ষোলো আনার উপর তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি কোনোদিন হতাশ হননি। আমরা তো একটুতেই হতাশ হই। আমাদের আশাবাদীর অকাণ্ট পাওয়ার তাঁকে হতাশার হাত থেকে বাঁচাবে না, যখন দেখবেন মধ্যবিত্ত-নেতৃত্ব সংকটের দিনে ছত্রভঙ্গ হয়েছে। আসলে আমাদের আশাবাদও এক প্রকার নিরাশাবাদ, কারণ এর পিছনে কোনো সত্যিকার শক্তি নেই, যা আছে তা ঐ অকাণ্ট পাওয়ার। বিপদের দিন ও শক্তি আমাদের পূর্ববঙ্গ

থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঘোড়দৌড় করিয়েছে, এর পর করাবে হিমালয়ে ভোঁ দৌড়।

'শক্তি আসে জনগণের সঙ্গে অভিন্ন হলে। শক্তি আসে বিধাতার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গত হলে। এর কোনোটাতে আমাদের বিশ্বাস নেই। আমাদের বিশ্বাস পুলিশে, আমাদের বিশ্বাস ফৌজে। অবস্থা আর একটু খারাপের দিকে গেলেই আমরা মিলিটারির হাতে শহর তুলে দেব। মিলিটারি যদি অক্ষম হয় তাহলে আমাদের দশা হবে চীনা মধ্যবিত্তদের মতো। ওরা এখন সন্ধির জন্যে আকুল। এই আকুলতা পাঁচ বছর আগে ছিল না। তখন অকাল্ট পাওয়ার ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর করেছিল। তার পিছনে ছিল মিলিটারি পাওয়ার সম্বন্ধে পরম নির্ভরতা।

'গান্ধীজী জানতেন যে, সংকটের দিন পুলিশ বা মিলিটারির উপর একান্ত নির্ভর করা যায় না। নির্ভর করতে হয় ভগবানের উপর তথা জনগণের উপর। ভগবানের বিশেষ করুণার উপর নয়, তাঁর ঐতিহাসিক ইচ্ছার উপর। সে ইচ্ছা রাশিয়াতে, ইংলণ্ডে, চীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, আফ্রিকায় কাজ করছে, কেবল ভারতবর্ষে নয়। বিশেষ করুণা তাঁর কারো উপর নেই। তবে বিশেষ দেশে তাঁর বিশেষ পরীক্ষা। আমাদের এখানে কিসের পরীক্ষা হচ্ছে তা যদি জানি ও তার সহায়তা করি তবেই তাঁর করুণা পাব।'

(১৯৫০)

বাস্তববাদী

বাস্তববাদী বললেন, 'দেশ যখন পরাধীন ছিল, নিজেদের যখন সৈন্যদল ছিল না, যখন হিংসার নাম করলে পুলিশে ধরে নিয়ে যেত তখনকার দিনে অহিংসার হয়তো কোনো প্রয়োজন ছিল। এবং চরকার। যদিও অহিংসার সঙ্গে চরকার যে কী সম্পর্ক তা আমার জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, নিজেদের একটা সৈন্যদল রয়েছে, কলকারখানা বিদেশীর হাত থেকে দেশের লোকের হাতে আসছে। এখন অহিংসার কী প্রয়োজন, চরকার কী দরকার, বলতে পারো?'

বিনু বললে, 'আমরা জানতুম যে দেশ স্বাধীন হলে এ প্রশ্ন একদিন উঠবে। সেইজন্যে আজ দেশের মতিগতি দেখে অবাক হচ্ছিনে। হচ্ছি তাঁদের মতিগতি দেখে যাঁরা ত্রিশ বছর ধরে গান্ধীজীর কাছে মূলনীতির পাঠ নিয়েছিলেন। না, অহিংসার কোনো প্রয়োজন নেই, চরকার কোনো দরকার নেই, গান্ধীজীও গেছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধনাও গেছে। তোমরা যত শীগগির পারো তাঁকে ভুলে যাও, ভুলে যাও যে তাঁর সহকর্মী হিসাবে তোমাদের উপর তাঁর সাধনার দায় বর্তেছে। শুধু দয়া করে একটি কাজ করো। জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে বলো যে গান্ধীজীকে তোমরা ছেড়েছ।'

'জনগণ', বাস্তববাদী বললেন, 'এখনো গান্ধীজীর নামে ভোট দেয়। আমরা যদি বলি যে আমরা গান্ধীজীকে ছেড়েছি তাহলে তারা আমাদের ছাড়বে।

কাজেই আমরা অমন কথা মুখ ফুটে বলতে পারিনে। তা বলে যা কার্যক্ষেত্রে অচল তা চালাতে গিয়ে নাকাল হই কেন? তুমি কি মনে করেছ কলকারখানা উঠিয়ে দিতে চাইলেই উঠে যাবে? কলকারখানা উঠিয়ে দিলে সৈন্যদলকে অস্ত্র যোগাবে বস্ত্র যোগাবে কী করে? আর সৈন্যদল ভেঙে দিলে পাকিস্তানকে ঠেকাবে রাশিয়াকে ঠেকাবে কী দিয়ে? আমাদের উপর এখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমরা কি ওসব এক্সপেরিমেণ্ট চালাতে পারি?'

'তা কি আর বুঝিনে?' বিনু বলল, 'গান্ধীজীর পরীক্ষা তোমরা যে চালাবে না তিনিও সে কথা বুঝতেন। তার জন্যে তাঁর মনে দুঃখ ছিল। কিন্তু পরীক্ষার দরকার থাকলে চালাবার লোকেরও দরকার থাকে। ভগবান তাঁদের জোটাবেন। তেমন লোক যে আজ নেই তা নয়। তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন পরীক্ষা। যে কোনো একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সঙ্গে এর তুলনা করলে দেখবে যে ত্রিশ বছরে এ পরীক্ষা অনেক দূর এগিয়েছে, আরো এগোবে সামনের দশ বছরে। তোমাদের জন্যে এ পরীক্ষা বসে থাকবে না। তোমরা যখন থাকবে না তখনো এ পরীক্ষা চলতে থাকবে। জনগণের আধ্যাত্মিক তথা আধিভৌতিক প্রয়োজন মিটছে এ দিয়ে। যদিও তারা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না কেন এর দরকার। কার্যকালে তারাও অহিংসা মানে না, চরকা মানে না, কিন্তু তারা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে এসব তাদেরই জন্যে। তোমাদের মতো তাদের মনে অবিশ্বাস নেই। সেইজন্যে তারা গান্ধীজীকে ছাড়েনি। ছাড়বেও না কোনোদিন, যদি তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে যাবার মতো দশ-বিশজন অনুচর থাকেন।'

বাস্তববাদী বললেন, 'গান্ধীজীকে তারা ভালোবাসে, কিন্তু গান্ধীবাদ হলো অন্য জিনিস। গান্ধীবাদের উপর তাদের বিশ্বাস কতদিন থাকবে? ইতিমধ্যেই তাদের বিশ্বাস টলেছে। তারা চায় পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ। তারা চায় ভারতকে নির্মুসলমান করতে। তার প্রমাণ তারা নিজের হাতে দিচ্ছে। গুলি চালিয়ে তাদের নিরস্ত করছি আমরা, নইলে তাদের নিরস্ত করা শিবের অসাধ্য। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে এবার অনশনে মরতেন। এবার তিনি বাঁচতেন না।'

'কী জানি, আমি অতটা নিশ্চিত নই। উত্তেজনার মুখে মানুষ অনেক কিছু চায়। নিজের হাতে স্ত্রী-পুত্রকে বিষ খাইয়ে মারে, নিজেও মরে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া, ভারতকে নির্মুসলমান করতে যাওয়া সেই জাতীয় ব্যাপার। পাগলামি একদিন সারবে। সেদিন অনুতাপ করবে।'

'তুমি তো বাস্তববাদী নও। যদি দেখতে তাদের চেহারা তাহলে নিশ্চিত হতে। তোমার পাকিস্তানের জনগণ তো জানোয়ার। আর এখানকার নেড়েরা—'

'যাক, তাহলে আসছে বারের ভোটের সময় গান্ধীজীর নাম মুখে আনবে না তোমরা। কেমন, ঠিক তো?' বিনু তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

'ভোটের সময়', তিনি বললেন, 'ওদের অন্য রকম চেহারা। যে হাত দিয়ে মানুষ খুন করেছে, ঘরে আগুন লাগিয়েছে, সেই হাতেই গান্ধীবাবার বাক্সে ভোট দেবে ওরা। আমরা বাস্তববাদী কিনা, তাই কার কোথায় দুর্বলতা ঠিক ধরতে পারি।'

'তোমরা যেমন তাদের এক ধরনের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছ তেমনি তাদের আরেক ধরনের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে অন্য লোক। নইলে তারা এমন বর্বর হতো না। কিন্তু মানুষের দুর্বলতার উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সে রাজ্য টেকে না। দেখলে না ইংরেজের দশা? দেখে শিখলে না? বাস্তববাদী হিসেবে ওদেরও সুযশ ছিল, কিন্তু অপরের দুর্বলতার সুযোগ নিলে প্রবল প্রতাপেরও পতন হয়।'

'তা বলে', বাস্তববাদী অনুযোগ করলেন, 'কেমন করে আমরা গান্ধীজীর পরীক্ষা চালাতে যাই? রাষ্ট্রের দায়িত্ব যাদের কাঁধে কেমন করে তারা অহিংস নীতি প্রয়োগ করবে? কেমন করেই বা তারা মিলের বদলে চরকা, রেলের বদলে গোরুর গাড়ি ব্যবস্থা করবে? করতে গেলে দেখবে লোকে নারাজ। ধনিকদের দিক থেকে বাধা আসবে, তা তো বুঝতেই পারো। বাধা আসবে শ্রমিকদের দিক থেকেও। তারা গ্রামে ফিরে গিয়েও অত মজুরি পাবে না। এমন স্বাচ্ছন্দ্য পাবে না। কেবল যে উৎপাদকরাই বাধা দেবে তা নয়, বাধা দেবে উপভোক্তারাও। মিলের কাপড় যেমন সস্তা, যেমন হাল্কা, যেমন সহজে কাচা যায়, যেমন ছেঁড়ে কম, চরকার সুতোর খদ্দর তেমন নয়। তুমি যদি আইন করে গ্রামের লোকের উপর খদ্দর চাপিয়ে দিতে যাও তাহলে দেখবে খদ্দরের খাণ্ডবদাহন হবে। আমরা বলি আগে জনমত গঠন করো, তার পরে ধীরে ধীরে—'

'ধানকল তেলকল চিনির কারখানা সম্বন্ধেও তুমি সেই কথা বলবে। তার মানে সবুর করতে হবে অনন্তকাল। হাতে গবর্নমেণ্ট এসেও কোনো পরিবর্তন ঘটল না। এর কারণ কী, বলব? ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। তোমাদের যে ইচ্ছাই নেই। তোমরা বোঝ লোকের দুর্বলতা। লেনিন যদি তাই বুঝতেন তাহলে ইতিহাসে এত বড়ো একটা পরিবর্তন আনতে সাহস পেতেন না। গান্ধী যদি তাই বুঝতেন তা হলে সশস্ত্র সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে নিরস্ত্র জনতাকে আহ্বান করতেন না। জনগণ দুর্বলও বটে, সবলও বটে। তাদের সবলতার কাছে আবেদন করলে দেখবে তারা সবরকম ত্যাগ স্বীকারে রাজি। মিলের কাপড় ত্যাগ করতে পারবে না? কারখানার রোজগার ত্যাগ করতে পারবে না? পারবে সবই, যদি বিশ্বাস করে যে এসব তাদের দেশের জন্যে ত্যাগ। কিন্তু আজ যারা তাদের কাছে আবেদন করছে তারা করছে ধর্মের নামে, দলের নামে। স্বাধীনতার পরে দেশকে তো তারা ভুলে যেতে বসেছে।' বিনু আক্ষেপ করল।

বাস্তববাদী বললেন, 'হাঁ, তোমার কথা হয়তো সত্য। কিন্তু এসব করতে গেলে কলওয়ালাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কী রকম দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছ?'

'চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে তাঁর শ্বশুরগোষ্ঠীর মতো নয়।' বিনু পরিহাস করল।

'তুমি কি মনে করো, শ্বশুরগোষ্ঠীর সঙ্গে ঝগড়া করলে চিয়াং টিকে থাকতে পারতেন?'

'পারতেন না হয়তো, কিন্তু এখন যে সবান্ধবে পলায়ন।'

'না, না, হাসির কথা নয়। ধনীর সঙ্গে ঝগড়া করা গান্ধীজীও পছন্দ করতেন না।'

বিনু বলল, বিনা কারণে কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ লোক বাস করে গ্রামে। অথচ সেখানে তাদের জীবিকা বলতে আছে একমাত্র কৃষি। তাও বছরে ছ'মাস। কৃষির সঙ্গে শিল্প যতদিন ছিল ততদিন তারা স্বাবলম্বী ছিল। এখন তারা বাইরে থেকে শিল্পজাত দ্রব্য নেয়, তার বিনিময়ে দেয় কৃষিজাত দ্রব্য। ফলে তাদের খোরাক কম পড়ে। উন্নততর কৃষি দিয়ে এর সমাধান আংশিকভাবে হবে। কিন্তু পূর্ণ সমাধান হবে গ্রামে গ্রামে শিল্প প্রবর্তন করলে। তাহলে গ্রামের অন্ন গ্রামে থাকবে। গ্রামের লোক খেয়ে বাঁচবে।'

'আর আমরা ?' বাস্তববাদী আঁতকে উঠলেন, 'আমরা না খেয়ে মরব ?'

'আমরা', বিনু হেসে বললে, 'তখন হোটেলে না গিয়ে গ্রামে যাব খেতে। মানুষ যেখানে খেতে পায় সেখানে ঘর বাঁধে। শহরে খেতে পাচ্ছে বলে শহরে বাসা করেছে, খেতে না পেলে শহর খালি করে গ্রামে গিয়ে জুটবে। তবে তোমার ভয় নেই, গ্রামে যেসব জিনিস তৈরি হবার নয়, অথচ চাইই চাই, সেসব জিনিসের বিনিময়ে গ্রামের লোক তাদের বাড়তি খাদ্য শহরের জন্যে ছাড়বে। শহরের লোকসংখ্যা কমবে, কিন্তু শহর একেবারে উজাড় হবে না। কলকাতায় লাখ দশেক লোক যথেষ্ট।'

বাস্তববাদী কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসলেন। তারপরে বললেন, 'তা হলে তুমি ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে চাও ? ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন উল্টে দিয়ে দেশকে ফিরে যেতে বল অষ্টাদশ শতাব্দীতে ? এটা কি সম্ভব না সঙ্গত ?'

'সম্ভব ও সঙ্গত। কিন্তু গ্রামে ফিরে যাওয়া মানে পিছনে ফিরে যাওয়া নয়। এটাও অগ্রগতি। আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবন একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকবে না। এতদিন সে শহরের সেবায় লেগেছে, এখন থেকে লাগবে গ্রামের সেবায়। তার ফলে যা ঘটবে সেটাও এক প্রকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন। চরকা বলতে আমি শুধু চরকা বুঝিনে, বুঝি গ্রামের লোকের নিত্য ব্যবহার্য যে কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—বিদ্যুতের দ্বারা, বাষ্পের দ্বারা চালিত হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু একই লোক হবে একাধারে মালিক ও শ্রমিক। যে ক্ষেত্রে ষোল আনা মালিক হওয়া সম্ভব নয় সেখানে অংশীদার হবে, তথা শ্রমিক হবে। শ্রম ও ধন দুই স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হবে না। তা যদি হয় তবে গ্রামে ফিরে যাওয়া ব্যর্থ হবে।'

'আমি কেবল ভাবছি এর চেয়ে কমিউনিজম ভালো। ওরা তো আমাকে শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করবে না। কলকাতা ছেড়ে আরামবাগ যেতে হবে শুনলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। সেখানে গিয়ে বাস করতে হবে! তা হলেই হয়েছে।'

'কিন্তু ভোটের সময় ?'

'ভোটের সময় !' বাস্তববাদী চাঙ্গা হয়ে উঠলেন, 'ভোটের সময় আমি

যে কোনো চুলোয় যেতে রাজি। হাইকমাণ্ড যদি টিকিট দেয় তাহলে আমি আলিপুর ডুয়ার্স থেকে দাঁড়াব। যমে মানুষে টানাটানি করলেও আমি বেঁচে ফিরে আসব কলকাতায়। তারপরে আবার পাঁচ বছর পরে আমার ভোটারদের সঙ্গে দেখা।'

(১৯৫০)

আমরা তা হলে কী করব

১৯১৭ সালে দুনিয়ার যেখানে যত ধনপতি ছিলেন সকলের বুকের রক্ত মুখে উঠল। তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন আকাশে এক ধূমকেতুর উদয় হয়েছে। প্রথম প্রথম তাঁদের ধারণা ছিল ইতিহাসের গগনে অমন কত উদয় হয়েছে, উদয়ের পর অস্ত গেছে। এবার কিন্তু অস্ত যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তখন তাঁরা শঙ্কিত হলেন। এ কি তাহলে সেই ধূমকেতু, জয়দেব কবির কল্পনায় যে ছিল কল্কি অবতারের প্রতিরূপ?

> ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
> ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
> কেশব ধৃতকল্কিশরীর। জয় জগদীশ হরে॥

শঙ্কা সবচেয়ে বেশি জার্মান ধনপতিদের। কারণ ১৯১৮ সালে তাঁদেরও ঘরোয়া আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয়েছিল, স্থিতি হয়নি। আবার যদি আসে? পাশের বাড়ির আকাশে যিনি জ্বলছিলেন তিনি যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তাঁরা প্রমাদ গণলেন। এই সময় এক রণপতির আবির্ভাব ঘটে। ইনি দশ-বারো বছর ধরে এই লগ্নটির জন্যে পাঁয়তারা কষছিলেন। স্বদেশের গণপতিদের ঠেঙিয়ে ঠ্যাং ভেঙে দেবার পর এঁর এমন বাড় বাড়ল যে ধনপতিরা সহজেই বিশ্বাস করলেন এঁর মতো লাঠিয়াল থাকতে ধূমকেতুর ভয় নেই।

কিন্তু জার্মানীকে শক্তিসঞ্চয় করতে দেখে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিশ্বাস হলো না যে মুদ্গরটি শুধু স্বদেশের গণপতিদের উরুভঙ্গের পর শান্ত হবে। রাশিয়ারও বিশ্বাস হলো না যে জার্মানীর রণবল সন্ধিনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে। আরেক দফা বল পরীক্ষার জন্যে ইউরোপের মহাশক্তিরা প্রস্তুত হতে লাগলেন। তারপর যা ঘটল তা ধাপে ধাপে যুদ্ধের দিকে এগোনো। শেষে যুদ্ধ।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রমিকরা যেভাবে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে কাজে লেগে গেল তা লক্ষ করে সেসব দেশের ধনপতিদের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ধরো, যুদ্ধের পরে যদি এই লক্ষ্মী ছেলেগুলিকে অধিকতর অন্নবস্ত্র দেওয়া হয় তাহলে কি এরা অধিকতর পরিশ্রম করে অধিকতর উৎপাদন করবে না? তা যদি করে তবে আর ভাবনা কিসের? সমস্যার সমাধান তো হয়েই রয়েছে। ইংলণ্ড আমেরিকার ধনপতিদের সঙ্গে সেসব দেশের গণপতিদের

যেমন গলায় গলায় ভাব তা দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না যে মার্ক্স্ মুনির ভবিষ্যদ্বাণী সেসব দেশেও সত্য হবে। কিন্তু যদি জার্মানীতে হয়! না, তা হতে দেওয়া হবে না। জার্মানী দখল করতে হবে। ততকাল ধরে দখল যতকাল সংকটের আশঙ্কা। জার্মানী যদি রাশিয়ার পথ ধরে তবে ফ্রান্স কি ধরবে না? ফ্রান্স যদি সে পথের পথিক হয় তবে ইংলণ্ড কি বিপথগামী হবে না? আর ইংলণ্ড যদি গোল্লায় যায় আমেরিকা কি সঙ্গদোষ এড়াতে পারবে?

সেইজন্যে জার্মানী দখল করার জন্যে যেন আমেরিকারই গরজ সব চেয়ে বেশি। অবশ্য এর সঙ্গে জুটেছে প্রতিযোগী যন্ত্রশিল্পকে করতলগত করার অভিসন্ধি। এবং রাশিয়ার সঙ্গে ব্যালান্স অফ পাওয়ার। আস্ত জার্মানীটাই যদি রাশিয়ার দিকে ঝোঁকে তাহলে বাটখারার ভারসাম্য থাকে না। সমস্তটা দখল করতে পারলেই চমৎকার হতো, কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

ওদিকে যেভাবে উৎপন্ন সামগ্রী অগ্নিসাৎ হচ্ছে অধিকতর উৎপাদন সত্ত্বেও উৎপাদক শ্রেণীর উদর ও পৃষ্ঠ অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে আসছে। যুদ্ধটা এইবেলা মধুরেণ সমাপয়েৎ হলেই বাঁচি। যদি আরো দু'বছর গড়ায় তাহলে ঐ যে মধুর সমাধানটি ওটি তেমন মুখরোচক হবে না। শ্রমিক যখন বখরা চাইবে ধনিক বলবেন, 'তুমি তো বড় লক্ষ্মী ছেলে নও হে।' তখন ক্যাপিটালিজম ছদ্মবেশী ফ্যাসিজম হয়ে উঠবে। ঠিক এই অভিজ্ঞতাটি ভারতবর্ষেরও হতে পারে। যদি হয়, তবে আমরা কিন্তু উভয়সংকটে পড়ব।

সংকটের দিন আমরা যারা মধ্যবিত্ত আমরা কি কোনো-একটা পক্ষ নেব? না আমরা বরের ঘরের পিসী ও কানের ঘরের মাসী হব? এ ছাড়া আরো দুটো বিকল্প আছে। এক, দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখা। দুই, দু'হাত দিয়ে দু'পক্ষকে ধরে ছাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তাতে বিপদ আছে। দু'পক্ষের চাপে গুঁড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর। পাঠক, তুমি হয়তো সরে দাঁড়াবে, আমি কিন্তু সেটি পারব না। আমি ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হয় দু'হাত দিয়ে ওদের ছাড়াছাড়ি ঘটাব, নয় দুপক্ষের চাপে গুঁড়ো হয়ে যাব। আমি মধ্যবিত্ত না, মধ্যস্থ হব বলে স্থির করে রেখেছি। যদি দরকার হয়। মধ্যবিত্তরা দু'পক্ষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। আর মধ্যস্থরা খায় দু'দিক থেকে মার। মধ্যস্থ যারা হবে তারা ন্যায়পরায়ণ হবে। তারা পদে পদে ন্যায় অন্যায় বিচার করবে, যার অন্যায় তাকে সেকথা বোঝাবে, যার দিকে ন্যায় তাকে নৈতিক সমর্থন জানাবে, এবং এর দরুন উভয় পক্ষের লাথিটা কিলটা বখশিশ পাবে। তাদের কপালে আর-কোনো পুরস্কার নেই।

২

উপরের অংশটি যুদ্ধের সময় লেখা। বোধহয় ১৯৪৪ সালের শেষে কিংবা ১৯৪৫ সালের প্রারম্ভে। তারপর আমার অলক্ষে আমার একখানা পুরোনো খাতার পাতায় লুকিয়েছিল। এই সেদিন নজরে পড়ল। অল্পস্বল্প পরিবর্তন

করে প্রকাশ করছি।

এখন এই পাঁচ বছরের হিসাব-নিকাশ করা যাক।

আমেরিকা যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। জার্মানীর আধাআধি দখল করে বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু ইংলণ্ড যা চেয়েছিল তা পায়নি। বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। তার নিজের ঘরেই ছোটোখাটো একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। তার সাম্রাজ্যের একাংশ স্বাধীন হয়েছে। সেও একরকম বিপ্লব। তা হলেও ইংলণ্ড এখনো তার সনাতন ব্যালান্স অফ পাওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসবান। জার্মানীকে সে উঠতে দেবে না। জার্মানদের শক্তিবৃদ্ধি দেখলেই সে ভয় পাবে। তারা নাৎসী হলেও যে ভয় তারা কমিউনিস্ট হলেও সেই ভয়। এমন কি তারা অখণ্ড হলেও সেই ভয়। জার্মান জাতিটাই একটা আতঙ্ক, কেবল ইংলণ্ডের চোখে নয়, ফ্রান্সের চোখেও! অথচ জার্মানীকে চিরকাল পার্টিশন করে রাখা যাবে না। ইংরেজ ফরাসী কি তা বোঝে না? বোঝে ঠিকই। কিন্তু ভয় যে যায় না।

জার্মানীর বল ধীরে ধীরে ফিরছে। আর কয়েক বছর পরে সে যদি ইচ্ছা করে তবে নিজের চেষ্টায় অখণ্ড হতে পারে। কিন্তু ইচ্ছা কি তার আছে? ইচ্ছা যেমন বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের নেই তেমনি জার্মান নাৎসী কমিউনিস্টের নেই। একদা যেমন প্রোটেস্টাণ্টে ক্যাথলিকে মিলে জার্মানীকে খণ্ড খণ্ড করেছিল এখনো তেমনি নাৎসীতে কমিউনিস্টে মিলে করতে পারে। জার্মানীর নিজস্ব অন্তর্বিরোধ তার অখণ্ড হবার ইচ্ছা কেড়ে নিয়েছে। তার অন্তর্বিরোধের নিষ্পত্তি সেবারে তো হয়নি, এবারে কি হবে! যতদূর দৃষ্টি যায় জার্মানীকে বিভক্ত হয়েই থাকতে হবে, তবে পরাধীন হয়ে নয়। তার পরাধীনতার শিকল খসে পড়বে।

ওদিকে বৃহত্তর পটভূমিকায় শক্তিপরীক্ষার যে আয়োজন চলছে তা লক্ষ করে কেউ স্থির থাকতে পারছে না। প্রত্যেককেই চিন্তা করতে হচ্ছে, আমি কোন্ পক্ষে যাব। চীনারা ইতিমধ্যেই এর একটা উত্তর দিয়েছে। ওরা কমিউনিস্ট হয়েছে, রুশ-পক্ষে যাবে। ভারতীয়রা মুখে বলছে, আমরা কোনো পক্ষে যাব না। আমরা কমিউনিস্টও না। কথাটা সত্য। সুতরাং অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। কিন্তু এখনো আমাদের টিকি ইংরেজদের পাউণ্ড-স্টার্লিঙের সঙ্গে বাঁধা। আর্থিক বিপর্যয়ের ভয়ে আমরা কোন দিন কী করে বসব তা আমরাই চব্বিশ ঘণ্টা আগে জানতে পাব না। এটা যে সত্য তা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে? ডিভ্যালুয়েশনের নাটকীয়তা এখনো বাসি হয়নি।

আর্থিক বিপর্যয় এড়িয়ে চলতে চাই, এই যদি আমাদের মনের কথা হয় তবে মুখের কথা যাই হোক না কেন, যুদ্ধে আমরা জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হব। অপরপক্ষে, যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চাই, এই যদি আমাদের মনের কথা হয় তা হলে আর্থিক বিপর্যয়ের জন্যে এখন থেকে মনটাকে তৈরি করতে হবে। তার মানে পাউণ্ড-স্টার্লিঙের সঙ্গে টাকার সাত পাকের সম্পর্ক একদিন-না-একদিন কাটাতে হবে ও তার ফলভোগ করতে হবে। পাকিস্তান পাউণ্ডের মায়া

কাটিয়েছে, কিন্তু ডলারের মায়া কাটায়নি। ডলারের সঙ্গে তার সম্পর্ক তেমনি রয়েছে। তার দাড়ি ডলারের সঙ্গে বাঁধা। তাকেও মনঃস্থির করতে হবে, কোনটা শ্রেয়। যুদ্ধে যোগদান, না আর্থিক বিপর্যয়!

ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সম্মুখে এই একই প্রশ্ন। এত বড়ো প্রশ্ন আর নেই। কে কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেয় তার উপর নির্ভর করছে সমস্ত ভবিষ্যৎ। উত্তর দেওয়া যে কত কঠিন তা আমি জানি ও বুঝি। কিন্তু তা বলে নিরুত্তর তো থাকা যায় না। একদিন-না-একদিন উত্তর আমাদের দিতেই হবে। উত্তর যদি হয় যুদ্ধে যোগদান তাহলে আর্থিক বিপর্যয় হয়তো ঘটবে না। কিন্তু বাধবে অন্তর্বিরোধ। ভারতের আত্মা যুদ্ধ চায় না। ভারত শান্তি-কামী। ভারতের জনগণ একটা যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করেছে গান্ধীনেতৃত্বে। আরেকটা যুদ্ধের প্রতিকূলতা করবেই, কার নেতৃত্বে জানিনে।

পক্ষান্তরে যুদ্ধে যোগদান না করলে আর্থিক বিপর্যয়ের জন্যে দেশসুদ্ধ লোককে সময় থাকতে প্রস্তুত করতে হবে। অতি দুরূহ কাজ। খাদ্য আমদানি বন্ধ হতে যাচ্ছে, এক-এক করে অনেক কিছুর আমদানি বন্ধ হবে। আমদানি বন্ধ হলে রপ্তানি বন্ধ হতে বাধ্য। দেশের কাঁচামাল দেশের কলকারখানায় ব্যবহার করতে হবে। কলকারখানারও বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন হবে। তাতে বণ্টনের সুবিধা।

সঙ্গে সঙ্গে টাকার পরিমাণ ও প্রচলন কমাতে হবে। বিনিময় চলবে যথা-সম্ভব বার্টার প্রথায়। এবং চরকার সুতোর মাধ্যমে। বাড়িতে বাড়িতে শিল্প ও কৃষি চর্চা ব্যাপক হবে। পরচর্চার সময় থাকবে না। সিনেমার টিকিট পেতে হলে চরকার সুতো দাখিল করতে হবে। পরিবারের সকলে যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ে খায় তাহলে রান্নার সময় বাঁচে, কয়লার খরচও। কয়েকটি পরিবার মিলে একসঙ্গে রান্নার আয়োজন করতে পারেন। রোজ না হোক হপ্তায় একদিন।

ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। যুদ্ধে যোগদান করব না এই যদি হয় সংকল্প তাহলে তার আনুষঙ্গিক আর্থিক বিপর্যয় আমাদের অকল্যাণ করবে না। বরং আমরা সেই সুযোগে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করব। সে-ব্যবস্থার সার কথা, যে কাজ করতে চায় সে কাজ পাবে, যে কাজ করতে চায় না সে দেশ ছেড়ে আর কোথাও যাবে। আমরা কাউকে বসে থাকতে দেব না। এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীকেও না। তাঁরা ইচ্ছা করলে হিমালয়ে যেতে পারেন, কিন্তু লোকলয়ে থাকলে কাজে হাত লাগাতে হবে। কয়েকজন খাটবে আর বাকী সকলে খাবে, এ ব্যবস্থা আমাদের পারিবারিক জীবন দুর্বহ করেছে, আমাদের জাতীয় জীবনকেও দুর্বহ করে তুলবে। যারা রেশন পাচ্ছে তারা খেটে খাচ্ছে কি-না খবর নিতে হবে। যদি দেখা যায় খাটছে না তাহলে খাটুনির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা যে কলকাতা শহরেই হবে এমন কোনো কথা নেই। অধিকাংশকেই গ্রামে চালান দিতে হবে। না গেলে রেশন মিলবে না।

এ দেশের প্রধান শত্রু জড়তা। স্বাধীন হয়েও এর জড়তা কাটেনি। জড়তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্ধ কুসংস্কার। ধর্মের নামে তার অসীম প্রতিপত্তি। সে

যদি দেশের চিত্ত অধিকার করে থাকে তাহলে আমাদের জড়তা ও আমাদের মূঢ়তা মিলে আমাদের দুই হাত ও দুই পা জড়িয়ে ধরবে। আমরা খাটতে পারব না, আমরা হাঁটতে পারব না। কেবল বক্তৃতা দেব, কেবল বিবৃতি ছাপাব। তারপর অবস্থা যখন ঘোরালো হয়ে উঠবে তখন ফস্ করে একদিন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব। যেন যুদ্ধই হচ্ছে সব সমস্যার সমাধান।

অবশ্য আমি ধরে নিয়েছি যে আর-একটা বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। অনেকের বিশ্বাস দু'পক্ষেরই যখন আণবিক বোমা আছে তখন কেউ সাহস করে লড়াই শুরু করবে না। কিন্তু জার্মানী কি জানত না যে প্রতিপক্ষের বিষবাষ্প আছে? কেন তাহলে লড়াই শুরু করল? করল এইজন্যে যে সেই মুহূর্তে তার বল ছিল তার প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি। দেরি করলে তার প্রতিপক্ষের বল তার চেয়ে বেশি হতো। অর্থাৎ তার প্রতিপক্ষের বল যে হারে বাড়ছিল তার নিজের বল সে হারে বাড়ছিল না। বল-পরীক্ষায় সে হেরে যেত, যদি দেরি করত। শেষ পর্যন্ত হেরে গেল এইজন্যে যে তাড়াতাড়ি শুরু করলেও তাড়াতাড়ি সারা করতে পারল না। সারা করতে তার যতই দেরি হতে থাকল তার প্রতিপক্ষের বল ততই বাড়তে থাকল। আসছে বারের যুদ্ধ সে-ই আরম্ভ করবে যার বল একটা বিশেষ মুহূর্তে প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি থাকবে, পরবর্তী মুহূর্তে থাকবে না। আণবিক বোমাই সামরিক বলের একমাত্র মাপকাঠি নয়। দু'পক্ষের বল যদি সমস্তক্ষণ সমান থাকে তাহলে অবশ্য কেউ আরম্ভ করবে না, উভয়েই অপেক্ষা করবে। কিন্তু বল কখনো সমস্ত ক্ষণ সমান থাকে না। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য।

যদি না ইতিমধ্যে অন্তঃপরিবর্তন ঘটে। তার সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। গান্ধীজী আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন অন্তঃপরিবর্তনে বিশ্বাস রাখতে। আমরা বিশ্বাস রাখব।

(১৯৫০)

আমি কী বিশ্বাস করি ও করিনে

যে কথা আমি বিশেষ করে বলতে চাই সে কথা বলার সময় হয়তো পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু সে কথা বলতে পারছিনে। আমার কণ্ঠস্বর আমাকে অর্জন করতে হবে তার আগে। যার কণ্ঠস্বর নেই তার কথা হাজার ভালো হলেও কেউ কান দিয়ে শোনে না। বন্ধুরা ব্যথা পায়, শত্রুরা ব্যথা দেয়, জনতা যেমন উদাসীন তেমনি উদাসীন থাকে।

এইজন্যে আমি নীরব। কিন্তু নীরবতাও শ্রেয়স্কর নয়। লোকে ভুল বুঝতে পারে। অনর্থের দিন যে মানুষ মৌনব্রত অবলম্বন করে তার উপর অবিচার হওয়া স্বাভাবিক। যে লেখক দুনিয়ার আর-সমস্ত বিষয়ে লিখছে অথচ নিজের দেশ সম্বন্ধে লিখছে না সে তার কর্তব্য করছে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সে যদি কোনো বিষয়ে কিছু না লিখত, লেখা একদম বন্ধ

করে দিত, তাহলে হয়তো জবাবদিহির দায়ে পড়তে হতো না। পড়লে উত্তর দেওয়া যেত, আমি তো আর লেখক নই, আমি দর্শক।

এসব ভেবে আমাকে অকালে মৌনভঙ্গ করতে হচ্ছে। কিন্তু অল্পস্বল্প মৌনভঙ্গ। এর বেশি করা উচিত নয়। এটুকু যে করছি এ শুধু নিজের উপর অবিচার খণ্ডাতে।

আমি বিশ্বাস করি যে বাংলার হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকলেই বাঙালী ও সকলে মিলে একজাতি। দেশ ভাগ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু জাতি ভাগ হয়নি। জাতি ভাগ করা শিবের অসাধ্য। যা হবার নয় তা হবেও না। মাঝখান থেকে অনাবশ্যক দুঃখ পাবে কয়েক লক্ষ অভাগা। তাদের দশা এখন গিনিপিগের মতো। তাদের উপর দিয়ে যে যা-খুশি পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব পরীক্ষার একমাত্র মূল্য এগুলির ব্যর্থতা সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীদের শিক্ষা-লাভ। তারা একদিন শিখবে যে ঘরবাড়ি ছেড়ে দৌড় দিলে লাভ যা হয় তার চেয়ে লোকসান হয় অনেক বেশি। প্রাণ হয়তো বাঁচে, কিন্তু ভিতরের মানুষটা মরে যায়। অমন করে বেঁচে থাকার চেয়ে ঘরবাড়ি মানইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দেওয়া ভালো। শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষাই মনে বসবে। তখন দৌড়োদৌড়ি আপনি কমে আসবে। তখন ঘরবাড়ি মানইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দেবার প্রতিজ্ঞা মনে জাগবে। দু'চার হাজার লোক প্রাণ দেবেও। তাদের প্রাণদান হবে এদের পলায়নের চেয়ে অনেক বেশি মহনীয়, অনেক বেশি ফলপ্রদ। সারা জগতের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাদের বীরত্ব। অন্যায়কারী তখন মুখ দেখাতে পারবে না। অন্যায়ের অন্ত হবে। যে-যার নিজের ভিটায় বাস করবে, নিজের বৃত্তি অনুসরণ করবে। জাতি যদি ভাগ না হয় তাহলে একদিন এক-জাতিবোধ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টানকে একসূত্রে বাঁধবে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাদের আলাদা করে রাখতে পারবে না। গবর্নমেণ্ট আলাদা হতে পারে, কিন্তু জীবন আলাদা হবে না। প্রকৃতি যাদের এক করেছে মানুষ তাদের ভিন্ন করতে পারে না। তা যদি পারত তবে হাজার বছরের ইতিহাস অন্যরকম হতো।

ফরাসীরা বলে থাকে তাদের দেশ এক ও অবিভাজ্য। আমিও এককালে বলেছি বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য। এখনো আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে চোখে যা দেখছি তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য। তা বলে আমি গায়ের জোরে তার মানচিত্র বদলে দিতে চাইনে। প্রথমত, আমি গায়ের জোরে বিশ্বাস করিনে। অমন করে কিছু সাময়িক সুরাহা হতে পারে, কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ বছর পরে আবার এদেশ ভাগ হবে, যদি ভাগাভাগির মনোভাব অতৃপ্ত থেকে যায়। লীগপন্থী মুসলমানদের বদ্ধমূল ধারণা চাকরিবাকরি ব্যবসাবাণিজ্য শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু হিন্দুদের একচেটে, স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়ে হিন্দুদের কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে, পাল্টা আন্দোলন করে ইংরেজের কাছ থেকে পাওয়া যাবে তার চেয়ে আরো বেশি, দেশ যদি ভাগ হয়ে যায় তাহলে তো দেশের একাংশের শিক্ষাদীক্ষা চাকরিবাকরি ব্যবসাবাণিজ্য সব কিছু হবে

মুসলমানের একচেটে। এই যে বদ্ধমূল ধারণা একে গায়ের জোরে উন্মূল করা যায় না। সাধারণ মুসলমানকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যে শিক্ষাদীক্ষায় চাকরিবাকরিতে ব্যবসাবাণিজ্যে তার যেমন ভাগ নেই তেমনি সাধারণ হিন্দুরও ভাগ নেই। অধিকাংশ হিন্দুই অধিকাংশ মুসলমানের মতো ভাগ্যহীন। এর যদি কোনো প্রতিকার থাকে তবে তা দেশবিভাগে নয়, জাতিবিভাগে তো নয়ই। সাধারণ মুসলমান যেদিন বুঝবে যে দেশবিভাগ করে লাভ যা হয়েছে তা সাধারণের নয়, অসাধারণদের, সেদিন সে নিজেই পাকিস্তানের প্রতিবাদ করবে। আর যদি বাস্তবিক সাধারণ মুসলমানের তাতে উন্নতি হয় তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রতিবাদ আমরা তা প্রত্যাহার করব। কিন্তু সে উন্নতির অংশ সাধারণ হিন্দুও যেন পায়। সাধারণ হিন্দুকে বঞ্চিত করে সাধারণ মুসলমানের যে উন্নতি বা সাধারণ মুসলমানকে বঞ্চিত করে সাধারণ হিন্দুর যে উন্নতি তা এমন অস্বাভাবিক যে তা কিছুতেই সম্ভব হবে না, যদি হয় তো স্থায়ী হবে না।

দ্বিতীয়ত, অনেকদিন থেকে আমার বিশ্বাস কলকাতা বাংলাদেশের ধনসম্পদ হরণ করে এনে স্বর্ণলঙ্কার মতো ভোগ করছে, তার ফলে পূর্ববঙ্গেরই ক্ষতি হচ্ছে সরচেয়ে বেশি। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না পেলে পূর্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গ শিল্পে বাণিজ্যে অগ্রসর হতে পারবে না। সাধারণের অবস্থার উন্নতি হবে না। তারা কেবল কাঁচামাল যোগাবে ও তৈরি মাল কিনবে। তাদের জন্যে কেউ কোনোদিন ভাবেও না। জাতীয়তাবাদীরা সবাই এসে জুটেছেন স্বর্ণলঙ্কায়। যে চিন্তা আমার মনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আকারে অস্পষ্ট ভাবে ঘুরত সেই চিন্তাই একদিন পাকিস্তানরূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাকেই দিল মর্মান্তিক আঘাত। ধাক্কা সামলাতে আমার দু'তিন বছর লাগল। এতদিনে আমি উপলব্ধি করেছি যে পূর্ববঙ্গের উত্তরবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য একটু আলাদা থাকলেই জমবে ভালো। চট্টগ্রাম একদিন বড়ো বন্দর হবে। ঢাকা হবে বড়ো শিল্পকেন্দ্র। খুলনা বরিশাল সিলেট সিরাজগঞ্জ সব একে একে মাথা তুলবে। তার ফলে হয়তো কলকাতার মাথা হেঁট হবে। কিন্তু বাঙালী জাতির সারা শরীরে রক্ত চলাচল করবে। বাংলাদেশকে সর্বাঙ্গপুষ্ট করতে হলে বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া উপায় নেই। পূর্ববঙ্গকে পৃথক করে বিধাতা তার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। এটা ইতিহাসের ইচ্ছা। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৃথা। আমার ভাঙা হৃদয়কে এই বলে আমি সান্ত্বনা দিয়েছি। আর আমি পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভাবিনে। আগে উভয় প্রদেশের শিল্প-বাণিজ্য সমান উন্নত হোক। আগে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান আর-একটু বাড়ুক। আগে হিন্দু-মুসলমানের ঈর্ষাদ্বেষ আর-একটু কমুক। তারপরে বাংলাদেশের ভৌগোলিক ঐক্য কার সাধ্য ঠেকায়! এদেশ এক এবং অবিভাজ্য ছিল এবং হবে। কিন্তু মাঝখানকার এই ভাঙনটাও বিধাতার ইচ্ছায় ঘটেছে। মানুষের ইচ্ছা যেন এর সঙ্গে শত্রুতা না করে। এর কাজ শেষ হয়ে গেলে এ আপনি চলে যাবে।

আমি বিশ্বাস করিনে যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ বাধানো দরকার। যুদ্ধ যদি বাধে সারা ভারত ও সারা পাকিস্তান জুড়ে বাধবে, হয়তো সারা দুনিয়া জুড়ে। মারাত্মক সব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দু'দিনেই মানুষ ভুলে যাবে পূর্ববঙ্গের হামলা। যুদ্ধ হয়তো পর্যবসিত হবে বিপ্লবে! তখন কে কাকে আশ্রয় দেবে! এখন যারা আশ্রয়দাতা তখন তারাও হবে আশ্রয়প্রার্থী। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটের ছোবল খেতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি যে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান এখনো ইচ্ছা করলে মিটমাট করতে পারে। এটা বাঙালীর ঘরোয়া ব্যাপার। এর জন্যে করাচীর বা দিল্লীর দ্বারস্থ হওয়া লজ্জার কথা। হৃদয়ে প্রেম থাকলে, মস্তিষ্কে শুভবুদ্ধি থাকলে ঢাকা ও কলকাতা ডান হাত ও বাম হাতের মতো অঞ্জলিবদ্ধ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঘটবেও তাই। আমি বিশ্বাস করিনে যে বাঙালীর ঘরোয়া ঝগড়া আর-কেউ মিটিয়ে দিতে পারবে। বা আর-কেউ এর দরুন যুদ্ধে নামতে রাজি হবে। যাঁরা চুক্তির উপর ভরসা রাখেন ও যাঁরা যুদ্ধের উপর বাজি রাখেন তাঁদের উভয়ের কপালে আছে হতাশা। অবাঙালীরা একদিন সরে দাঁড়াবেন, তখন বাঙালীরই উপর পড়বে সম্পূর্ণ দায়িত্ব। যেদিন আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধ জন্মাবে সেদিন প্রেমও জাগবে, শুভবুদ্ধিও সক্রিয় হবে। তখন ঘটবে অঞ্জলিবদ্ধতা।

কিন্তু কবে?

এর উত্তরে আমি আবার মৌন অবলম্বন করলুম।

(১৯৫০)

সংশয়বাদী

সংশয়বাদী ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তোমরা রাজ্য চালাতে পারবে না হে, পারবে না। এই-না সেদিন বললে, আরো ফসল ফলেছে, খাদ্যের দৌড়ে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। আজ শুনছি চালের মণ চল্লিশ টাকা। কোথায় কোরিয়া বলে একটা ছোট্ট উপদ্বীপ আছে, সেখানে লড়াই বেধেছে বলে বাজার থেকে ওষুধপত্র উধাও, তার মানে চোরাবাজারে তার দাম চার-পাঁচ গুণ। বাড়িতে মশলা কেনা বন্ধ, সিদ্ধ খাচ্ছি। এখন থেকে এই, এর পরে যুদ্ধ যখন ছড়াবে তখন সিদ্ধ খাওয়া চলবে কিনা সন্দেহ। কাঁচা খেতে হবে বোধ হয়। না খাওয়া দাওয়া ঘুচে যাবে?'

বন্ধু বললেন, 'তুমি কেবল খারাপটা দেখ। ভালো কিছু তোমার চোখে পড়ে না। এই যে আমরা এত বড়ো একটা সাম্রাজ্য চালাচ্ছি, যাকে বলা হতো ভারত সাম্রাজ্য, কেবল ব্রিটিশ আমলে নয়, মোগল আমলে, এর জন্যে আমরা ট্রেনিং পেলুম কবে? বিনা তালিমে মোটর চালাতে গেলে কী হয়, জানো তো? শাসনযন্ত্র তার চেয়েও জটিল। আমরা যে এখন পর্যন্ত য়্যাক-সিডেণ্ট বাধাইনি এর জন্যে কেউ আমাদের ধন্যবাদ দেবে না। শুধু দোষ

ধরবে। যত সব ছিদ্রান্বেষীর দল !'

সংশয়বাদী বললেন, 'আহা রাগ কর কেন ? স্বাধীনতার আগে এক বছর ও পরে তিন বছর মোট চার বছর তোমরা মোটর চালাচ্ছ দিল্লীর স্টিয়ারিং হুইল ধরে। তালিমের জন্যে এর চেয়ে বেশি সময় কে কবে পেয়েছে ! তুমি যদি মনে করে থাক যে অভিজ্ঞতার অভাবে জিনিসপত্রের দাম কমছে' না, বরং বাড়ছে, তাহলে তুমি ভুল বুঝেছ। এটা অভিজ্ঞতার অভাবে নয়, এর অন্য কারণ আছে।'

'কী কারণ ?' বন্ধু প্রশ্ন করলেন।

'সে কথা যদি বলি', সংশয়বাদী উত্তর করলেন, 'তোমরা আমাকে কমিউনিস্ট বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। সেইজন্যে আগে জানতে চাই, ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব ?'

'তুমি যে কমিউনিস্ট নও তা সকলে জানে। সুতরাং নির্ভয়ে বলো।'

'তাহলে শোন।' সংশয়বাদী বলতে আরম্ভ করলেন, 'দু'রকম ক্ষমতা আছে। অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক। বণিকের মানদণ্ড আর সম্রাটের রাজদণ্ড। ইংরেজ যখন ছিল তখন তার হাতে ছিল উভয়বিধ দণ্ড। কবির ভাষায়—

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ড রূপে !

তার মানে যে-বণিক সে-ই রাজা, যে-রাজা সে-ই বণিক। রাজ্যে বাণিজ্যে একাকার। কিন্তু ইংরেজ যখন চলে গেল তখন তার রাজদণ্ড পড়ল একদল লোকের হাতে, মানদণ্ড পড়ল আর-একদল লোকের হাতে। কেবল যে কংগ্রেস নেতারাই স্বাধীনতা পেলেন তা নয়, স্বাধীনতা পেলেন দেশী ধনিকরাও। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁরাই সর্বেসর্বা। কেউ তাঁদের গায়ে হাত দিতে সাহস পান না। নেতারাও না। নেতাদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো রাজনীতি ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে। সে ক্ষমতা এত বেশি ক্ষমতা যে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে দু'শ বছর কাটিয়ে আমাদের ধারণা দাঁড়িয়ে গেছে রাজদণ্ড ও মানদণ্ড একই লোকের হাতে থাকা সম্ভব ও সঙ্গত। এতকালের বদ্ধমূল ধারণা তিন বছরেও উৎখাত হলো না। এখনও আমরা আশা করছি রাজশক্তি আমাদের ভাত কাপড়ের অভাব দূর করবে। কিন্তু পারবে কী করে ? তার হাতে যে বণিকের মানদণ্ড নেই। কোনোদিন যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা তার হাতে আসবে সে ভরসাও আর নেই। যাদের হাতে আছে সে ক্ষমতা তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে লোকের যেটুকু উপকার করা যায় সেটুকু সে করছে ও করবে। কিন্তু তাতে লোকের পেট ভরে না। লোকে বুঝতে পারে না যে এরা ইংরেজ নয়, এরা উভয়ত্র সর্বেসর্বা নয়। এরা চোরাকারবার বন্ধ করতে পারে না, সে ক্ষমতা এদের নেই। যাদের আছে তারা বন্ধ করবে না, কারণ সেই ভাবেই তারা নিজেদের মূলধন বাড়ায়। মূলধনই তো তাদের ক্ষমতার মূল। তারা তাদের ক্ষমতার মূলে আঘাত করবে কোন্ দুঃখে ! তাদের বাধ্য না করলে তারা কিছু করবে না। কিন্তু

তাদের বাধ্য করা কারো সাধ্য নয়। যতদিন না এমন একটা গবর্নমেণ্ট হচ্ছে যার হাতে উভয়বিধ দণ্ড ততদিন আমাদের চোরাবাজারের প্রজা হয়েই বাঁচতে এবং মরতে হবে।'

বন্ধু বললেন, 'এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়। চোরাবাজার কোন দেশে নেই? আছে শ্রমিকশাসিত ইংলণ্ডেও। এটা যুদ্ধের অনুষঙ্গ।'

'কিন্তু রাশিয়ায় নেই। কেউ বলছে না যে নতুন চীন রাষ্ট্রে আছে।'

'খোঁজ নিলে দেখবে সেখানেও আছে। হয়তো কম, তবু আছে ঠিক। উৎপাদন যতই বাড়তে থাকবে চোরাকারবার ততই কমতে থাকবে। এটা সময়সাপেক্ষ।'

'উৎপাদন বাড়তে দেওয়া ওদের পক্ষে লাভজনক নয়। কম উৎপাদনেই ওদের বেশি লাভ। উৎপাদন বাড়বে বলে যদি আশা করে থাকো তবে তুমি হতাশ হবে একদিন। বাড়বে অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন। অন্নবস্ত্রের নয়।'

'তুমি দেখছি সত্যি কমিউনিস্ট। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।'

'জানতুম তুমি শেষ পর্যন্ত ঐ অপবাদ দেবে। যুক্তির বদলে কটূক্তি।' এই বলে তিনি গা তুললেন।

বন্ধু বললেন, 'আরে বোস, বোস। অমনি রাগ করা হলো! তুমি কি বলতে চাও অর্থনৈতিক ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই বা আসবে না?'

'তোমাদের হাতে থাকলে তার প্রমাণ পাওয়া যেত। নেই তা তো জাজ্বল্যমান! আসবে কিনা সেটা অবশ্য বিতর্কের যোগ্য। তুমি বলবে, আসবে। আমি বলব, আসবে না। তুমি রাগ করে বলবে, কমিউনিস্ট। আমি রাগ করে বলব, পেতি বুর্জোয়া। যত রকম কটূক্তি। সময়ে বোঝা যাবে কার যুক্তি ঠিক।'

বিনু এতক্ষণ বিনা বাক্যে শুনে যাচ্ছিল। বন্ধু বললেন, 'আচ্ছা, বিনুকে সালিশ মানা যাক। কী বলো, বিনু? অর্থনৈতিক ক্ষমতা কি ইংরেজ আমাদের হাতে দিয়ে যায়নি? কার হাতে দিয়েছে তা হলে?'

'অর্থনৈতিক ক্ষমতা', বিনু বলল, 'কেউ কাউকে দেয় না, দিতে পারে না। ওটা শাসনযন্ত্রের শামিল নয়, শাসনযন্ত্রের অতিরিক্ত। তোমরা চেয়েছিলে শাসনযন্ত্র, তার অতিরিক্ত পাবে কী করে?'

'ওটা তাহলে আছে কার হাতে?'

'কিছুটা ইংরেজের হাতে, বাকীটা দেশী ধনিকদের হাতে।'

'তাদের হাত থেকে আসবে কী করে?'

'তার উত্তর', বিনু হেসে বলল, 'মার্কস্ দিয়ে গেছেন একভাবে, গান্ধী দিয়ে গেছেন আরেক ভাবে, ব্রিটিশ লেবার পার্টি দিচ্ছে আরো একভাবে। তোমাদের বিশ্বাস তোমরা চতুর্থ একটা উপায় জানো।'

সংশয়বাদী বললেন, 'চতুর্থ উপায় তো চোরের সঙ্গে সমঝোতা। অর্থাৎ চোরাই টাকার উপর ট্যাক্স বসানো। তারপর চোরকে ডেকে বলা, দিয়ে যাও বাপু যে যা পারো। আইন তোমাদের জন্যে নয়।'

বিনু বলল, 'তুমি হয়তো অবিচার করলে। যাঁরা রাজ্যের ভার নিয়েছেন তাঁরা যা ভালো বিবেচনা করেন তা করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অমন করে তাঁদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা আসবে কিনা। যদি আসে তো কবে আসবে? কেমন?'

বন্ধু বললেন, 'হাঁ, এই আমার প্রশ্ন।'

বিনু বলল, 'জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাও ওই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। ইতিহাস তাদের সুযোগ দিয়েছিল বারো তেরো বছর। তারা উত্তর দিতে পারল না বলে ইতিহাস তার পরে সুযোগ দিল নাৎসীদের। ভারতবর্ষে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা ইতিহাস জানে। অর্থাৎ ভগবান জানেন।'

'ভগবান!' সংশয়বাদী বললেন, 'কেন বেচারাকে টেনে আনছ এর মধ্যে! আর ইতিহাস! ইতিহাস কি নাৎসীদের সাফ করে দেয়নি?'

'তার মানে', বন্ধু বললেন, 'তুমি বলতে চাও যে নাৎসীরা এদেশে কোনো সুযোগ পাবে না। পাবে কমিউনিস্টরা?'

'আরে না, না।' সংশয়বাদী সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, 'এখানেও নাৎসীরা ঘোলা জলে মাছ ধরবার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু তাদের জন্যে তোমার কেন এত দরদ!'

'হুঁ! আমাকে নাৎসী বলে ইঙ্গিত করা হচ্ছে!' বন্ধু গোঁসা করলেন।

বিনু বলল, 'থাক, অমন করে পরস্পরকে আক্রমণ করে প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কথা হচ্ছিল। গান্ধীজী জানতেন যে নিছক রাজনৈতিক ক্ষমতায় দেশের কোটি কোটি লোকের পেট ভরবে না। সেইজন্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজের কাছে নয়। তিনি জানতেন যে ইংরেজ তা দিতে পারে না। সেইজন্যে দেশের লোককে বলেছিলেন, তোমরা মিল ফ্যাক্টরীর উপর নির্ভরতা ছাড়ো। দরকারী জিনিসের জন্যে ধনিকদের উপর নির্ভর কোরো না। ওদের মুখাপেক্ষী হলে ওরাই তোমাদের প্রভু হবে। তখন কোন্ কাজে লাগবে রাজনৈতিক ক্ষমতা! অন্নে বস্ত্রে স্বাবলম্বী হও। তাহলে দেখবে ওরাই তোমাদের দরজায় ধর্না দেবে। আজ গান্ধীজী নেই, কিন্তু তাঁর শিক্ষা তো আমরা ভুলে যাইনি। জিনিসপত্রের দর বাড়ছে, লোকে ভাবছে আরো বাড়বে। আতঙ্কিত হয়ে দরকারের চেয়ে আরো বেশি কিনছে। ফলে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে দর। এ ক্ষেত্রে কর্তব্য দরকারের চেয়ে বেশি না কেনা। সম্ভব হলে আদৌ না কেনা। এর নাম অহিংস অসহযোগ। কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। এই অবসরে প্রত্যেকটি দরকারী জিনিস যাতে ঘরে ঘরে বা গ্রামে গ্রামে তৈরি হয় তার জন্যে কোমর বাঁধতে হবে।'

বন্ধু এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, 'এটা একটা উত্তরই নয়।'

সংশয়বাদী বললেন, 'এইবার তোমার সঙ্গে আমি একমত।'

বিনু বলল, 'বেশ তো। একজন যাও মার্কসের কাছে, একজন যাও সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের কাছে। তার পরে যা হবার হোক। ভারতের কপালে

আছে একটা লঙ্কাকাণ্ড বা কুরুক্ষেত্র। যিনি নিবারণ করতে পারতেন তিনি খুন হয়েছেন। বোধহয় ভগবানের ইচ্ছা নয় যে কেউ নিবারণ করে। আমি আমার সাহিত্যে মন দিতে চাই। কুরুক্ষেত্রের আগে যেন আমার কাজ আমি সেরে রাখতে পারি।'

(১৯৫০)

দেশপ্রেম বনাম জাতিপ্রেম

ইংরেজিতে দুটি শব্দ আছে—পেট্রিয়টিজম ও ন্যাশনালিজম। পেট্রিয়জম মানে দেশপ্রেম। ন্যাশনালিজম মানে জাতিপ্রেম। দেশপ্রেম যে কী বস্তু তা আমরা অনেকদিন পরাধীন থেকে অনেক দুঃখ পেয়ে অনেকদিন সংগ্রাম করে হৃদয়ঙ্গম করেছি। কিন্তু জাতিপ্রেম যে কাকে বলে তা আমাদের এখনো শিখতে বাকী। শিক্ষা তো বিনা দুঃখে হয় না। বহু দুঃখ আছে আমাদের কপালে।

এদেশে এমন লোক এখনো আছে—তাদের সংখ্যাই বেশি—যারা জাতি বলতে বোঝে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ইত্যাদি। দক্ষিণ ভারতে আজকাল জাত দেখে স্কুল কলেজে ভর্তি করা হয়। চাকরির বাজারেও জাত যাচাই করা হয়, যেমন বিয়ের বাজারে। শুনতে পাই বিহারেও পদোন্নতি হয় জাত বিচার করে। অনেকদিন পর্যন্ত একটি উচ্চ পদ খালি ছিল কোন্ জাতের লোককে নিয়োগ করা হবে তা নিয়ে মতভেদ ছিল বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষিতদের মনে স্বাধীনতার রং ধরেনি। নিরক্ষরদের মনে তো নয়ই। মুসলমানের উপর রাগ করে হিন্দু জাতি বলে একটা কিছু ক্রমশ দানা বাঁধছে। হিন্দু জাতীয়তার কথা ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তা আমাদের জীবনে সত্য হয়ে উঠতে পারছে না। ভারতীয় জাতীয়তা দূরের কথা, বাঙালী জাতীয়তাও ধোপে টিকছে কই ?

বাঙালী জাতি বলে যদি কোনো জাতি থাকে তবে মুসলমান তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুসলমানকে তার থেকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না, দিলে বাঙালী জাতি বলে কিছু থাকে না, থাকে হিন্দু জাতি। অথচ লীগপন্থীদের মতো কংগ্রেসপন্থীদের কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন যে লোকবিনিময়ের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানদের বাদ দিতে হবে, পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের বাদ দিতে হবে। সমাজতন্ত্রীদের কেউ কেউ সমর্থন করছেন এ প্রস্তাব। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে চোখে পড়ে লোক বিনিময় আপনা-আপনি হয়ে যাচ্ছে। এ যে কিছুদিন পরে বন্ধ হবে তার লক্ষণ নেই। এর ফলে বাঙালী জাতি বলতে বোঝাবে হিন্দু জাতি। মুসলমানদের নিয়ে গড়ে উঠবে পাকিস্তানী জাতি। জিন্না সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বই জয়ী হবে। গান্ধীজীর একজাতিতত্ত্ব ও তার জন্যে তাঁর জীবনবলি ব্যর্থ হবে। ব্যর্থ হবে শচীন্দ্রের প্রাণদান, স্মৃতীশের প্রাণদান।

এসব দেখেশুনে আমার মনে হয়, আমাদের দেশপ্রেম খাঁটি ছিল বলে দেশ

স্বাধীন হলো, কিন্তু আমাদের জাতিপ্রেমে খাদ ছিল, তাই দেশ খণ্ডিত হলো। খাদ যতদিন থাকবে খণ্ডন ততদিন থাকবে। বাহুবল দিয়ে এর সংশোধন হবে না। বাহুবলের দ্বারা দেশকে এক করতে পারা যায়, কিন্তু জাতিকে এক করা সম্ভব নয়। তার জন্যে চাই প্রেম। যেখানে প্রেম নেই সেখানে একজাতি নেই, থাকতে পারে এক দেশ, কিন্তু তার স্বাধীনতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। আমরা দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, কিন্তু সামনে রয়েছে আর-একটা পরীক্ষা। সেটা জাতিপ্রেমের। তাতে যদি ফেল করি তাহলে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরাও এর তাৎপর্য বুঝবেন না। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তা-বাদীরাও যদি সমান অবুঝ হন তাহলে স্বাধীনতার আয়ুষ্কাল আঙুলে গুনে বলা যায়।

এমন দেশ নেই যে দেশের ইতিহাসে গৃহযুদ্ধ বা গৃহবিবাদ ঘটেনি। ইংলণ্ডে ঘটেছে, আমেরিকায় ঘটেছে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে, রাশিয়ায় ঘটেছে, এই সেদিন চীনে ঘটল, এইমাত্র কোরিয়ায় ঘটছে। তা বলে কেউ কি কোনো-দিন লোকবিনিময়ের কথা মুখে এনেছে? এ কথা যারা ভাবতে পারে তারা স্বাধীনতার ধার ধারে না। পুরুষানুক্রমে পরাধীন না হলে এমন অমঙ্গলের কথা কেউ মুখে ধরে না। এটা সেই দাস-মনোভাব যা স্বাধীনতার পরেও কাজ করছে। ভারত ও পাকিস্তান একই দেশের দুই স্বতন্ত্র খণ্ড। এরা যদি যুদ্ধ করে তাহলে সেটা হবে গৃহযুদ্ধ। এতদিন যা করে এসেছে তা গৃহবিবাদ। এর দরুন লোকবিনিময়ের প্রস্তাব তোলা ইতিহাসে অপূর্ব। যে-পথ দিয়ে লোকজন চলে যাচ্ছে সেই পথ দিয়ে ভারতীয়তাও চলে যাচ্ছে। এটুকু বোঝবার মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধিও যদি না থাকে তবে ভাবনার কথা বৈকি। তাদের বদলে যেসব লোকজন চলে আসছে তারা এলে আমরা ভারতীয় হব না, হব হিন্দু। সেভাবে যদি স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হতো তাহলে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার উৎপত্তি হতো না, হিন্দু মহাসভাই দেশকে স্বাধীন করত। সেভাবে স্বাধীনতা সংরক্ষণ করাও সম্ভব নয়।

আমরা হিন্দু জাতীয়তাবাদী হব, না ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হব এ বিষয়ে অবিলম্বে মনঃস্থির করতে হবে। যদি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হব বলে স্থির করি তাহলে তৎক্ষণাৎ লোকবিনিময় বন্ধ করতে হবে। এ খেলা বেশি দিন চলতে পারে না, কারণ এর দরুন আমরা স্বাধীনতার অযোগ্য হয়ে পড়েছি। আমরা যদি একজাতি হয়ে থাকি তাহলে লোকবিনিময়ের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আর যদি দুই জাতি হয়ে থাকি তাহলে দেশ বিভাগ তার অনিবার্য পরিণাম, লোকবিনিময় তার পরবর্তী পরিচ্ছেদ, যুদ্ধবিগ্রহ তার পরিসমাপ্তি, তার উৎসংহার স্বাধীনতা-বিসর্জন। সপ্তমী অষ্টমী নবমীর পর বিজয়াদশমী। আমরা একজাতি না দুই জাতি এইটেই আসল প্রশ্ন।

(১৯৫০)

চিড়িয়াখানা

দাদা বললেন, 'ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ভারতবর্ষ নাকি মস্ত বড়ো একটা সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে, আর-কোনো দেশ যা পারেনি। নানা বিচিত্র বেশভূষা, নানা বিচিত্র প্রথা, নানা বিচিত্র জাতি ধর্ম ভাষা। ভারতের সাধনা হচ্ছে এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে সমন্বয় দ্বারা ঐক্যবন্ধ করা। এই সাধনায় ভারত সিদ্ধিলাভ করেছে। শুধু ইংরেজের চক্রান্তে তার শান্তিভঙ্গ হচ্ছে। ইংরেজকে তাড়িয়ে দাও। দেখবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই। থাকবে কী করে? ভারত যে সমন্বয়ের দেশ! এখন দেখছি সমাধান যে করেছিল সে ভারত নয়, সে ভারতের ব্রিটিশ সরকার। যা দিয়ে করেছিল তা সমন্বয়ের আদর্শ নয়, তা নাঙ্গা তলোয়ার। ব্রিটিশ বেয়োনেট সরে গেছে, তাই দাঙ্গা-হাঙ্গামা পাঞ্জাবকে বিধ্বস্ত করেছে, বাংলাকে করছে। ইংরেজ আমলে যা ঘটেছিল সে আর কতটুকু! তারা যেতে-না-যেতে যা ঘটল তা ইতিহাসে অপূর্ব। কেবল ভারতের ইইহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে। পাঞ্জাবের হিন্দু মুসলমান শিখ দুনিয়ার রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। শুধু নরহত্যায় নয়, নারীধর্ষণে, গৃহদাহে, লুণ্ঠনে। আমরা বাঙালী হিন্দু-মুসলমান যোদ্ধা জাতি নই বলে ওদের রেকর্ড ভাঙতে পারিনি, তাহলেও যা করেছি তা বাংলাদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আমাদের আফসোস এই যে, ফস্ করে একটা চুক্তি করে দিল্লী ও করাচীর দুই সরকার আমাদের দুই হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিয়েছে। দুই জানোয়ারকে যেমন খাঁচায় পুরে তাদের রক্ষকরা পাহারা দেয় তেমনি করে পাহারা দিচ্ছেন জবাহরলাল ও লিয়াকৎ আলী। চিড়িয়াখানার শান্তি ও শৃঙখলা যেমন উপর থেকে চাপানো, লোহার খাঁচার ভিতর পুরে তালা বন্ধ করে বাইরে গুলিভরা বন্দুক হাতে টহল দিয়া আগলানো—আমাদের শান্তি ও শৃঙখলাও তেমনি। প্রহরী যদি একটু অসতর্ক হয় তাহলে প্রলয়কাণ্ড বেধে যাবে। চিড়িয়াখানার বাঘ সিংহ কুমীর অজগর মিলে আর সবাইকে নিয়ে মোচ্ছব শুরু করে দেবে। এই আমাদের বাংলা দেশ। এ দেশের হিন্দু-মুসলমান একদিন ক্লাইভের সঙ্গে লড়েছিল। এই দেশের ছেলে সুভাষ হিন্দু-মুসলমানের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে ইংরেজকে আক্রমণ করেছিল। বিশ্বাস হয় তোমাদের?'

আমরা নিঃশব্দে শুনছিলুম। বলবার ছিল অনেক কথা, প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দাদা আর কাউকে বলতে দেবার পাত্র নন। নিজেই বলে চললেন আবার, 'এখন এই তো অবস্থা। আগে একটা আশাভরসা ছিল। ইংরেজ হাজার হোক বিদেশী। সে চিরদিন থাকবে না। কিন্তু এরা আমদের স্বদেশী শাসক। এদের বলতে পারিনে যে, চলে যাও। থাকো, এ কথাও বলতে পারছি কই? দোটানায় পড়েছি।'

দাদা বিমর্ষভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তখন সুরজিৎ বললেন, 'দাদা, সত্যি করে বলুন দেখি, আপনি কী চান? কী হলে খুশি হন?'

'শান্তি। আমার প্রাণ চায় শান্তি। আমার চোখের সামনে আমার দেশ

ছারখার হয়ে যাচ্ছে, আমার জাতি আত্মহত্যা করছে, দেখছি আর দেখে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হচ্ছি। তা বলে চাপানো শান্তি চাইনে। বেয়োনেটের শান্তি, কবরের শান্তি যথেষ্ট হয়েছে। তেমন শান্তির উপর ঘেন্না ধরে গেছে। তার চেয়ে যুদ্ধ ভালো। আমি চাই সমন্বয়ের শান্তি, সামঞ্জস্যের শান্তি, আন্তরিক শান্তি, স্বতঃস্ফূর্ত শান্তি। যে-শান্তি বাইরের প্ররোচনায় ভাঙবে না, পরের চক্রান্তে টুটবে না।'

সুরজিৎ বললেন, 'দাদা, সাতশো বছর ওদের সঙ্গে আমরা বাস করছি। বলতে পারেন কবে ওরা আমাদের শান্তিতে থাকতে দিয়েছে? মোগল যুগেও ছিল চাপানো শান্তি, কবরের শান্তি। ব্রিটিশ যুগেও তাই। স্বাধীনতার পরে যা দেখছি তা নতুন কিছু নয়। নতুন বলতে এই পর্যন্ত যে, আমাদের হাতে একটা সৈন্যদল এসেছে। ছোট ছেলের হাতে ছুরি পড়লে যা হয়। সব জিনিস ছুরি দিয়ে কাটে। আমরাও সব জিনিস সৈন্য দিয়ে সমাধান করতে চাই। ট্রাম-বাস পোড়াচ্ছে, পাঠাও সৈন্য। রেল লাইন সরিয়েছে, পাঠাও সৈন্য। ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, পাঠাও সৈন্য। ফসল কাটবার লোক নেই, পাঠাও সৈন্য। এর পরে নির্বাচনের সময় সৈন্য পাঠাতে হবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাও সৈন্যরাই মেটাবে, আমাদের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। বাধাও যুদ্ধ।'

জয়ন্ত চুপচাপ বসে সিগারেট টানছিলেন! অবশ্য দাদার অনুমতি নিয়ে। বললেন, 'যুদ্ধের প্রয়োজন থাকলে যুদ্ধ বাধবেই। রাজারা যুদ্ধের দায়িত্ব না নিলে প্রজারা নেবে। আপনি কি বলতে চান যুদ্ধের প্রয়োজন নেই?'

সুরজিৎ বললেন, 'আছে বৈকি। তবে সাতশো বছর যখন সহ্য করেছি তখন আরো কয়েক বছর সবুর করে দেখি। ধৈর্য আমাদের অসাধারণ। নইলে পাঁচশো বছর কেউ মুসলমানের অধীনে, দু'শো বছর কেউ ইংরেজের অধীনে কাটায়?'

দাদা বললেন, 'কিন্তু আমার আসল কথা তা নয়। আমি যা চাই তা শান্তি, সত্যিকারের শান্তি। যুদ্ধের পথ দিয়ে কেউ কি কখনো শান্তির কুটীরে পৌঁছেছে? যাকে ওরা শান্তি বলে সেটা সাময়িক যুদ্ধবিরতি। তেমন শান্তি আমি চাইনে। তার চেয়ে যুদ্ধ ভালো। যা হবার তা হয়ে যাক, চুকে যাক। খতম হোক, সাবাড় হোক।'

নেপালদা সায় দিয়ে বললেন, 'আমিও তাই বলি। হয় হিন্দু সাবাড় হয়ে যাক, নয় মুসলমান সাবাড় হোক। সেইজন্যে বলি এখান থেকে মুসলমানদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দাও। ওখান থেকে হিন্দুদের নিংড়ে বের করে নিয়ে এসো। ও দুটো জাত একসঙ্গে থাকতে পারবে না। লোকবিনিময় হচ্ছে একমাত্র সমাধান। তাতে যুদ্ধের ঝামেলা নেই। কারো গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। তারপরে শান্তি, চিরস্থায়ী শান্তি। যে যার ঘরে আরামে বাস করবে। এখানে হিন্দু, ওখানে মুসলমান।'

দাদা বললেন, 'সেও তো সমস্যাকে ফাঁকি দেওয়া। তাতে সমন্বয়ের স্বাদ নেই। অতএব সত্যিকারের শান্তি নেই। একদিন ওদের শক্তি বৃদ্ধি হলে ওরা

এসে আমাদের ঘরে হানা দেবে। আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হলে আমরাও ওদের ঘরে চড়াও হব। তৃতীয় পক্ষ কোনো দিক থেকে ছুটে আসবে গরুড়ের মতো। গজকচ্ছপ দুটোকেই গ্রাস করবে পরম আনন্দে।'

সুরজিৎ বললেন, 'তা ছাড়া লোকবিনিময় তো মুখের কথায় হবে না। তার জন্যে অনিচ্ছুকের উপর চাপ দেওয়া দরকার। চাপ দিতে গেলে মারামারি বেধে যাবে। কে তার দায়িত্ব নেবে?'

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জয়ন্ত বললেন, 'কেউ যদি না নেয়, জনতা নেবে।'

'তার মানে অরাজকতা।' সুরজিৎ বললেন, 'কোনো রাষ্ট্রই তা বরদাস্ত করতে পারে না। তা যদি চাও তো আগে রাষ্ট্র ভেঙে দাও। যে ডালে বসেছ সেই ডাল কাটো।'

নেপালদা বললেন, 'ওটা কোনো কাজের কথা নয়। আমরা রাষ্ট্র ভাঙতে চাইনে, নিরাপদ হতে চাই। কী করে তা হব, যদি লোকবিনিময় না হয়?'

'লোকবিনিময় যদি আপনা-আপনি হয়, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু চাপ দিতে গেলে মারামারি বাধবে। রাষ্ট্র বরদাস্ত করবে না।' সুরজিৎ বললেন।

'লোকবিনিময় যদি আপনা আপনি হয়', দাদা বললেন, 'তা হলেও আমার আপত্তি। ওটা সমস্যার সমাধান নয়, সমস্যার থেকে পলায়ন। ওতে সমন্বয়ের স্বাদ নেই। বরং আরো দশ রকম ফ্যাসাদ। পূর্ববঙ্গের অর্ধেক হিন্দু যদি চলে আসে বাকী অর্ধেক আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক মুসলমান যদি চলে যায়, বাকী অর্ধেক আমাদের উপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। সংখ্যালঘুকে বিলুপ্ত করে বা উদ্বিগ্ন করে কি সংখ্যালঘু-সমস্যার সমাধান হয়? ও পথে শান্তি নেই, সদ্ভাব নেই। অন্য পন্থা চাই।'

জয়ন্ত বললেন, 'দাদা, আপনি দেখছি শান্তির কাঙাল। ওটা আপনার বয়সের লক্ষণ। আমি কিন্তু অশান্তিকে ভয় করিনে, আমার কাছে শান্তির কোনো দাম নেই, যা-কিছু দাম আত্মরক্ষার। বাঙালীকে বাঙালী না রাখলে কে রাখবে?'

দাদা বললেন, 'কেন, ওরাও কি বাঙালী নয়? বাঙালী বলতে কি শুধু হিন্দু বোঝায়? মুসলমান বোঝায় না? ক্রিশ্চিয়ান বোঝায় না?'

'বোঝায় বৈকি। কিন্তু দেখছেন না ওরা পূর্ববঙ্গের নাম রেখেছে পূর্ব পাকিস্তান। ওরা এককালে বাঙালী ছিল। এখন পূর্ব পাকিস্তানী।'

'হাঁ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যারা বাস করে সেসব মুসলমান তো বাঙালী। না তাদেরও তুমি পূর্ব পাকিস্তানী বলতে চাও?'

'ওরা তো পাকিস্তানে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে। সামান্য একটু ঠেলা দিলেই দৌড় দেবে। ওরা বর্ণচোরা আম। প্রচ্ছন্ন পাকিস্তানী।'

দাদা বললেন, 'তাহলে বাঙালীর সংখ্যা কমিয়ে এনে তুমি আড়াই কোটিতে দাঁড় করালে। বাকী তিন কোটি বাঙালীকে বানালে অবাঙালী। পূর্বপুরুষের বর্জনশীল মনোভাব একদিন হিন্দু থেকে মুসলমান সৃষ্টি করেছিল। আজ বাঙালী থেকে অবাঙালী সৃষ্টি করছে সেই একই মনোভাব। বৃথা দোষ দিচ্ছ

ওদের।'

নেপালদা বললেন, 'ওরা তো বাংলা ভাষার অনেক কিছু বাদ দিচ্ছে, তার সঙ্গে অনেক কিছু জোড়া দিচ্ছে। ফলে যা হয়ে উঠেছে তা বাংলা কি আরবী বোঝা যায় না। বোধহয় পূরবী উর্দু। দাদা, আপনি ওদের বাঙালী বলে গণ্য করলে কী হবে, ওদের গাঁটছড়া বাঁধা সিন্ধু প্রদেশের সঙ্গে।'

'সেটাও তো মহাভারতের অঙ্গ। ওরা যদি সিন্ধুর সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধে আর আমরা যদি ওদের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধি, তাহলে মহাভারতেরই গ্রন্থিবন্ধন হয়। তার জন্যে দুঃখ করিনে। দুঃখ এই জন্যে যে, কেউ কাউকে বাঁচতে দেবে না, জ্বালিয়ে মারবে। অথচ এমন করে পরস্পরকে জ্বালাতন করার কী প্রয়োজন ছিল বলতে পারো? হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষে কি দেশটা যথেষ্ট বৃহৎ নয়, যথেষ্ট ধনসম্পদ নয়? আমরা কি পরস্পরকে অংশ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারতুম না? তাড়িয়ে দেওয়ার মেরে ফেলার মতো দীনতা আমাদের হলো কবে ও হলো কেন?'

দাদা কখন একসময় উঠে পায়চারি করতে শুরু করে দিলেন। তাঁর এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, ঘরে আর-এক জন মানুষ ছিল। হঠাৎ লক্ষ করে বললেন, 'এই যে বিনু! তুমি কিছু বলছ না যে! তোমার কথাও শোনা যাক।'

বিনু বলল, 'দাদা, আমি জীবনে কখনো এমন অসহায় বোধ করিনি। আমার দেশ নেই, দেশ ভেঙে গেছে। আমার জাতি নেই, জাতি ভেঙে যাচ্ছে। আমার ভাষা নেই, ভাষার ভাঙন ধরেছে। আমার সাহিত্য নেই, সাহিত্যেও ভেদবুদ্ধি। থাকার মধ্যে আছে ধর্ম। সে ধর্মও নিত্য অধর্মের ভাগী হচ্ছে। আমার ধারণা ছিল আবার পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ঘটবে। সে ধারণা অন্তত দশ বছর পেছিয়ে গেল সম্প্রতি যে-সব ঘটনা ঘটেছে তার দরুন। পাকিস্তান কেবল ওদের সৃষ্টি নয়, আমাদেরও সৃষ্টি। আমরাই তাকে আরো দশ বছর কায়েম করলুম। মূর্খের মতো ভাবছি লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। সে ক্ষমতা আমাদের নেই। পাগলের মতো বকছি লোকবিনিময় চাই। এখানে এক কোটি আশ্রয়-প্রার্থী, ওখানে এক কোটি আশ্রয়প্রার্থী ভিড় করলে কুবেরের ভাণ্ডার ক্ষয় হয়। আমাদের ভাণ্ডারে এমন কী আছে, ওদের ভাণ্ডারেই বা আছে কী, যে দু'কোটি লোকের জীবনধারণের সুব্যবস্থা হয়। মাঝখান থেকে নষ্ট হতে বসেছে চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য।'

নেপালদা বললেন, 'সেটা গবর্নমেণ্টের ত্রুটি। আসছে বারের নির্বাচনে আমরা সে ত্রুটি সারাব।'

বিনু বলল, 'কোনো গবর্নমেণ্ট পারবে না এ বোঝা বইতে। উটের পিঠে শেষ কুটোর মতো এ বোঝা একদিন অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে দেবে। বিপ্লবকে খাল কেটে ডেকে আনছে এ সমস্যা। এ নিয়ে যারা খেলা করছে তারা জানে না যে, তারা আগুন নিয়ে খেলা করছে।'

দাদা বললেন অভিভূত হয়ে, 'কিন্তু উপায় কী আছে! সকলেই আমরা অসহায় হয়ে দেখছি দেশ চলেছে ভাসতে ভাসতে সর্বনাশের মোহানায়। যেন

একটা প্লাবনের মুখে পড়েছে। বিপ্লব আর কাকে বলে! এই তো বিপ্লব।'

জয়ন্ত বললেন, 'আমি কিন্তু ভয় পাব না কিছুতেই। আসুক না বিপ্লব।'

নেপালদা শিউরে উঠলেন, 'আমার দোকানের জন্যে মজবুত দেখে এক জোড়া তালা কিনতে হবে। কোনদিন কী হয় বলা যায় না।'

'তা হলে চিড়িয়াখানার দ্বার খুলে যাবে, দাদা?' সুরজিৎ প্রশ্ন করলেন।

'কে জানে ভাই। আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড়। এমন স্বাধীনতা কে চেয়েছিল? কোথায় সুভাষ? বেঁচে থাকলে ওর আসা উচিত ছিল এখন।' দাদা বললেন, 'ও যদি আসত তাহলে এ সমস্যা দু'দিনে মিটে যেত।'

'আমিও তাই ভাবি।' বললেন নেপালদা, 'ওকেই ভোট দিতুম।'

বিনু বলল, 'অত সহজে মিটত না, দাদা। সুভাষ এলেও মিটত না। যেসব নির্মম নিষ্ঠুর ব্যাপার সংঘঠিত হয়েছে, তার জন্যে অনুতাপ করতে হবে দুই পক্ষের লোককে। যেখানে অনুতাপ নেই সেখানে আশাভরসা নেই। আপনি কি কোথাও এতটুকু অনুতাপের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন?'

'না, তার চিহ্ন নেই।'

'এর চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল ১৯৪৮ সালের তিরিশে জানুআরি তারিখে। তার জন্যে আজ পর্যন্ত কেউ অনুতাপ করল না। আমাকে অবাক করেছে আমার দেশের এই নৃশংস মনোভাব। এ দেশ তো আমার চেনা দেশ নয়।'

'সেইজন্যেই তো বলছি চিড়িয়াখানা', দাদা আর্দ্রস্বরে বললেন।

বিনু বলল, 'আমার লক্ষ আর কিছুর উপরে নয়। আমি আমার দেশের নাড়ীতে হাত রেখে বসে আছি। দেখছি সে অনুতাপ করছে কিনা। অনুতাপ তাকে করতেই হবে যদি সে বাঁচতে চায়। কিন্তু কবে তা জানিনে। দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প প্লাবন এক-এক করে সবরকম দুর্যোগ আসছে। কাঁদতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু কার জন্যে কাঁদব! যে পাপ করেও পাপের জন্যে অনুতাপ করল না তার জন্যে কাঁদব! না, কাঁদব না। তাকে সাজা পেতে হবে।'

নেপালদা বললেন, 'ওটা তোমার বাড়াবাড়ি। কে পাপ করেছে, কবে পাপ করেছে, তার জন্যে অনুতাপ করতে হবে দেশসুদ্ধু মানুষকে? নইলে সাজা?'

জয়ন্ত বললেন, 'কিসের পাপ? আজকের জগতে পাপ বলে কিছু নেই। আণবিক বোমা ফেলে যারা লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশু হত্যা করল তারাই এখন জাতিসংঘের মোড়ল। তাদের কাছে দরবার না করলে আমরা কাশ্মীর রাখতে পারব না। কোথায় তোমার পাপ? কার জন্যে অনুতাপ করব?'

বিনু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর বলল, 'দাদা, আজ উঠি।'

'উঠবে? আচ্ছা, আর একদিন এসো। মতের সঙ্গে মত মেলে না, তাহলেও দুটো কথা বলে প্রাণটা জুড়োয়।' দাদাও উঠলেন তাকে এগিয়ে দিতে। আত্মগতভাবে বললেন, 'তিরিশে জানুআরি আমরা আমাদের বিবেক বলি দিয়েছি। বিবেকহীন সমাধান তো সমাধান নয়। আগে বিবেক ফিরে পাই, তার পরে সমাধান খুঁজে পাব।'

বিনু বলল, 'তথাস্তু।'

সুরজিৎ বললেন, 'আমিও চলি। অন্তর অন্বেষণ করতে হবে। বাইরে তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। দাদা, নমস্কার। নমস্কার, নেপালদা। জয়ন্ত, নমস্কার। চলো বিনু।'

(১৯৫০)

পনেরোই অগাস্ট

এবারকার স্বাধীনতা দিবসে তেমন কোনো উন্মাদনা দেখা গেল না। উন্মাদনা দূরের কথা, সহজ আনন্দ সাধারণ আহ্লাদ তা যেন অদৃশ্য হয়েছে। এই নিয়ে আলোচনা চলছিল চার বন্ধুতে।

পত্রনবীশ বলছিলেন, 'আমেরিকা স্বাধীন হয় পৌনে দু'শ বছর আগে। সেদিনকার উন্মাদনা এতদিনে শুকিয়ে মরে যাবার কথা। কিন্তু প্রতি বছর চৌঠা জুলাই তারিখে দেখা যায় সে মাদকতা তেমনি সরস, তেমনি ফেনিল। একটা দিনের জন্যে সারা দেশ উদ্দাম হয়ে ওঠে। আমাদের যেমন হোলিখেলার দিন তাদের তেমনি স্বাধীনতার দিন। ফরাসীদের দেশে বিপ্লব আরম্ভ হয় দেড়শো বছর আগে। এখনো তার স্মৃতি তেমনি সবুজ। প্রতি বছর চৌদ্দই জুলাই তারিখে প্যারিসের রাস্তাঘাটে নাচ-গান-হল্লার অবধি থাকে না। তুমি যদি সেখানে যাও তোমাকে নিয়ে নাচবে ওদের তরুণীরা। আমাদের যেমন রাস-লীলা তাদের তেমনি বিপ্লবের প্রথম দিবা।'

সিতাংশু বললেন, 'সেইজন্যেই তো আমরা বিপ্লব চাই। রাসলীলা।'

পত্রনবীশ বললেন, 'তার সঙ্গে তুলনা করো আমাদের পনেরোই অগাস্টের। তিন বছর যেতে না যেতে বানের জল নেমে গেছে। নদীর বুকে মস্ত চড়া। মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে দেশ। তিন বছর যদি বেঁচে থাকি হয়তো দেখব পনেরোই অগাস্ট লোকে শোকসভা করছে।'

বিমলেন্দু বললেন, 'ওটা তোমার বাড়াবাড়ি। এটা একটা দুর্বৎসর বলেই কারো মনে উৎসাহ নেই। এমন দুর্বৎসর কি আমেরিকার ইতিহাসে দেখা যায়নি?'

পত্রনবীশ বললেন, 'সেজন্যে নয়। লোকে ক্রমশ বুঝতে পারছে যে, স্বাধীনতা যতটুকু সত্য, অঙ্গহানি তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য। দেশ স্বাধীন হয়েছে এর জন্যে তারা সুখী, কিন্তু দেশ অঙ্গহীন হয়েছে তার জন্যে তাদের অসুখের অন্ত নেই। মনে করো একজনকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বারো বছর পরে। সে মুক্তির প্রথম দিনে আনন্দ করছে। কিন্তু যতই দিন যাবে ততই তার ব্যথাবোধ প্রবল হবে এইজন্যে যে বেচারার একখানা হাত কেটে রাখা হয়েছে।'

স্বয়ম্ভূ বললেন, 'আমার মনে হয়, তা নয়। বিয়ের রাতের রোমাঞ্চ কি বিয়ের তিন বছর পরে কেউ আশা করে? তখন হয়তো দেখবে একঘেয়ে

লাগছে। স্বাধীনতা দিবসে জোর করে আনন্দ করতে হবে এটা প্রাণহীন একটা প্রথা। তার চেয়ে চুপ করে চিন্তা করা ভালো এই তিন বছর আমরা স্বাধীন মানুষের মতো ব্যবহার করেছি না উচ্ছৃঙ্খল বর্বরের মতো! লোকের ধারণা স্বাধীনতা জিনিসটা বিনা শর্তে পাওয়া গেছে, বিনা শর্তে ভোগদখল করা যাবে। সেটা ভুল। ওর একটা অলিখিত শর্ত আছে।'

'কী সে শর্ত?' প্রশ্ন করলেন পত্রনবীশ।

'শর্তটা হচ্ছে এই যে, সম্বৎসরে একটা দিন হৈ-হুল্লোড় করতে পারো, কিন্তু বাকী তিনশো চৌষট্টি দিন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। যারা বারো মাস উত্তেজনার নেশায় নাচছে তাদের দম থাকলে তো তারা পনেরোই অগাস্ট উৎসব করবে। এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে তিন বছর পরে শোকসভা করতে হবে হয়তো। করতে হবে স্বাধীনতা হারানোর জন্যে।'

'তাহলে তো আপদ যায়।' সিতাংশু বললেন, 'এ আজাদী ঝুটা হৈ।'

'না, না। এতদূর আমি যাব না। এ আজাদী সাচ্চা', পত্রনবীশ বললেন, 'কিন্তু এ অঙ্গহানি আমি সইতে পারছিনে। দিন দিন অসহনীয় হচ্ছে।'

'তোমার একার নয়, ভাই। আমাদের সকলের।' বিমলেন্দু বললেন।

'আমার ভাই যখন জাপান যায়', স্বয়ম্ভূ বলতে লাগলেন, 'তখন লক্ষ করে ডিসিপ্লিন জিনিসটা জাপানীদের মজ্জাগত। অথচ চীনাদের তা নয়। সেইজন্যে জাপানীরা সংখ্যাল্প হয়েও যুদ্ধে জিতছিল, চীনারা সংখ্যাধিক হয়েও হারছিল। আমাদের ইতিহাসেও এর বহুতর প্রমাণ আছে। মুষ্টিমেয় মুসলমান যে পাঁচশো বছর হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করতে পারল তার মূলে তাদের সহজাত ডিসিপ্লিন। ইংরেজদের তো আঙুলে গোনা যায়। দু'শো বছর তারা হিন্দু-মুসলমানের উপর রাজত্ব করে গেল। তার মূলেও সেই ডিসিপ্লিন। ইংরেজের ডিসিপ্লিন মুসলমানকেও লজ্জা দেয়। হিন্দুকে তো দেয়ই।'

পত্রনবীশ কী বলতে যাচ্ছিলেন, বিমলেন্দু বললেন, 'আঃ, বলতে দাও।'

'আমরা যে অবশেষে স্বাধীন হয়েছি এও সেই ডিসিপ্লিনের পুণ্যবলে।' বলে চললেন স্বয়ম্ভূ, 'মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যখন আটটি প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের মধুচক্র থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ায় কংগ্রেস, তখন বড়লাট লিনলিথগো ভেবেছিলেন মৌমাছি কদ্দিন চাক ছেড়ে থাকবে। আইনসভার সদস্যদের মাইনে বন্ধ করে দিয়ে মনে করলেন, এবার তো ফিরে যেতেই হবে। কিন্তু এক বছর গেল, দু'বছর গেল, আড়াই বছর গত হতে চলল। সবাই তখন জেলে। ক্রিপস্ এলেন দৌত্য করতে। জেলখানার দ্বার খুলে গেল। কিন্তু মধুচক্রে ফিরে গেল না কংগ্রেস। ফিরে গেল জেলখানায়, তার আগে জ্বালিয়ে গেল দাবানল। কোটি কোটি টাকার প্রলোভন স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করল। কেটে গেল আরো তিন-চার বছর। কোন্ দেশের ইতিহাসে কোন্ পার্টি ক্ষমতা হাতে পেয়েও মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে সাত বছর অজ্ঞাতবাস বরণ করেছে?'

'সে কংগ্রেস আর নেই।' আক্ষেপ করলেন বিমলেন্দু, 'সে ডিসিপ্লিন

আর নেই। সে ত্যাগস্পৃহা আর নেই। যে দীপ নিবে গেছে সে আর জ্বলবে না।'

'তার জন্যে আফসোস করে কী হবে!' স্বয়ম্ভূ বললেন, 'ডিসিপ্লিন যদি আমাদের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গ হয়ে থাকে তাহলে একদিন কংগ্রেসকে দিয়ে যার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তেমনি আর কাউকে দিয়ে তার প্রমাণ দেওয়া যাবে। নদীর জল চিরদিন একই খাতে প্রবাহিত হয় না। খাতের জন্যে দুঃখ করব না, দুঃখ করব নদীর জন্যে, যদি দেখি প্লাবনের আতিশয্যে প্রবাহ শুকিয়ে এসেছে।'

'তাই কি!' আত্মগতভাবে অস্ফুট স্বরে বললেন বিমলেন্দু।

'আমার ভয় হয়, তাই। উচ্ছৃঙ্খলতাকে কঠোর হস্তে দমন না করলে আমাদের স্বাধীনতার পরমায়ু বেশি দিন নয়। পাকিস্তানের কী আসে যায়? স্বাধীনতার জন্যে সে তো ষাট বছর ধরে সাধনা করেনি! তার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিযোগিতায় নেমে আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা হারাই আর সেও যদি হারায় তার স্বাধীনতা তাহলে আমাদের ষাট বছরের সাধনা ব্যর্থ। তার তেমন কোনো ব্যর্থতা নেই।'

এ কথা শুনে সকলেই কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপরে পত্রনবীশ ধীরে ধীরে মুখ খুললেন, 'তুমি কি বলতে চাও আমাদের এ স্বাধীনতা পাকা নয়?'

'না, পাকা নয়। পাকা হবে যদি একে আমরা সংযমের বাঁধন দিয়ে বেঁধে রাখতে পারি। কিন্তু লক্ষণ ভালো নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক দল লোক চরম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছে, অথচ তাদের নিন্দা করার মতো সৎসাহস আমাদের কারুর নেই। দেখেশুনে মনে হয়, আমরা রাজধর্ম পালন করার অযোগ্য। রাজা হবার শখ ষোলো আনা, অথচ অপ্রিয় হবার ভয়ও আঠারো আনা। যেই মুখ ফুটে কিছু বলতে যাই অমনি পাঁচজনে তেড়ে আসে। বলে, পাকিস্তানের পাল্টা দিতে হবে। তা যদি আমরা না করি, তবে আমরা রাজ্য রাখতে পারব না। আমরা ক্লীব। এখন এই অমানুষদের সঙ্গে তর্ক করব কী? এরা যে এদের স্বাধীনতা আজ থেকেই হারিয়ে বসে আছে। ঘটনা দু'দশ বছর পরে ঘটে, তার কারণ ঘটে দু'দশ বছর আগে। এদের চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারি এরা স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান মনে করে প্রতিহিংসাকে। কেউ আপত্তি করলে বলে ক্লীব।'

পত্রনবীশ বললেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিতে কেউ কি চায়? তবে সহ্য করারও একটা সীমা আছে। কিছু যদি না করি তাহলে ঘটনার স্রোত আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।'

স্বয়ম্ভূ বললেন, 'যারা তাকে আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে দেয় তারা এমন একটা শক্তিকে ডেকে আনে যে শক্তি তাকে আয়ত্তের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারে। ইংরেজ বা মার্কিন বা আর-কেউ একদিন এসে হাজির হবে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে। মাঝখান থেকে কাটা পড়বে স্বাধীনতা। বৃথা হবে ষাট বছরের সাধনা।'

সিতাংশু বললেন, 'তখন বিপ্লব ঘটবে।'

'পাগল!' স্বয়ম্ভু অস্থির হয়ে বললেন, 'বিপ্লবের ডিসিপ্লিন এর চেয়েও কঠিন। বিপ্লবী শাসনতন্ত্র কোনোরকম উচ্ছৃঙ্খলতা একদিনের জন্যেও বরদাস্ত করে না। সে তার সমস্ত শক্তি সংহত করে প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে শেষবার কুস্তি লড়তে। তুমি কি মনে করো কমিউনিস্টদের হাতে শাসনভার পড়লে তারা হিন্দু-মুসলমানের হিংসা-প্রতিহিংসা চব্বিশ ঘণ্টা চলতে দেবে? কখনো না।'

আলোচনা যে লাইনে চলছিল সেটা বিমলেন্দুর পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। বিনুর আসার কথা ছিল। ততক্ষণ আসর জমানোর জন্যে তিনি বললেন, 'হাঁ, ডিসিপ্লিন বড়ো ভালো জিনিস। পাল্টা-পাল্টির প্রশ্ন তুলে যারা ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করতে উৎসাহ দেয় তারা স্বাধীনতার শর্ত ভঙ্গ করে। আমি কিন্তু ভাবছিলুম অন্য কথা। যেখানে যাই সেখানে দেখি সকলের মুখ অন্ধকার। যার সঙ্গে কথা হয় সেই বলে, কোথাও কিছু একটা বিগড়েছে। এই যে এতক্ষণ ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে লেকচার শোনা গেল এও সেই বিগড়ানোর খবর। কিন্তু সারা ভারতের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি। তবে কেন সারা ভারতের সর্বত্র অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার ছায়া? তাই বলছিলুম এটা দুর্বৎসর। আমাদের গ্রহের দোষ।'

এমন সময় বিনু এসে পড়ল। বিমলেন্দু তাকে অভ্যর্থনা করে বললেন, 'প্রকৃতিদেবীও আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন। অন্যে পরে কা কথা!'

এই নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর বিমলেন্দু বললেন, 'তোমরা তো যার যা বলবার তা বলেছ। এখন বিনুর বক্তব্য শোনা যাক। এবারকার স্বাধীনতা দিবসে তেমন কোনো উন্মাদনা দেখা গেল না কেন, বলতে পারো, বিনু?'

বিনু বলল, 'এ প্রশ্ন এই প্রথম শুনছিনে। যেখানে যাই সেখানে শুনি ওই একই জিজ্ঞাসা।'

'এখন তোমার কী উত্তর?'

'আমার উত্তর', বিনু বলল, 'তোমাদের অজানা নয়। কতবার ও-কথা বলব? ত্রিশ বছরের তপস্যার শেষভাগে তাপস যখন সিদ্ধির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে তখন যদি সিদ্ধির বদলে অপসিদ্ধি ঘটে তাহলে যা হয় আমাদের বেলা তাই হয়েছে। ক্লাইমাক্সের বদলে য়্যাণ্টি-ক্লাইমাক্স্। দেশ স্বাধীন হয়েছে কেউ অস্বীকার করবে না। যদি করে তো সেটা অভিমানের কথা। কিন্তু এর জন্যে গান্ধীর মতো নেতার ত্রিশ বছরব্যাপী নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল না। স্বাধীনতার সংগ্রামে যদি আর-কেউ সেনাপতি হয়ে থাকতেন তাহলে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোনো অসঙ্গতি ঘটত না। আমাদের প্রতিবেশী বর্মা সিংহল পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয়েছে, তাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এমন অসঙ্গতি ঘটেনি। কেবল আমাদের বেলায় এ অসঙ্গতি। না, অসঙ্গতি বললে কম বলা হয়। অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে একটা ছেদরেখা পড়েছে। তাল কেটে গেছে। সুতো ছিঁড়ে গেছে। খেই হারিয়ে গেছে।'

বিনু আরো কয়েক রকম উপমা খুঁজছিল। বিমলেন্দু বললেন, 'বুঝেছি।'

'বুঝলে তো! ব্যক্তির জীবনে এরকম কিছু ঘটলে তার অসুখ করে। মানসিক অসুখ থেকে কায়িক অসুখ। ত্রিশ বছর একভাবে চলছে, তারপরে হঠাৎ আরেক রকম। তাও বাইরের চাপে নয়। অবস্থা বিপর্যয়ে নয়। নিজের ভিতরে যে কামনা ছিল, যাকে এতদিন দাবিয়ে রাখা হয়েছিল, সে এখন অশাসিত অবারিত। হঠাৎ মেনকার মুখ দেখে বিশ্বামিত্রের মনে যে ভাব এসেছিল সেটা বিশ্বামিত্রের ভিতরে সুপ্ত ছিল। বিশ্বামিত্র স্বয়ং তা জানতেন না। জানতেন দেবরাজ ইন্দ্র। এ ক্ষেত্রে ব্যবসাদার ইংরেজ। তারা স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্যে তপস্যা চলছিল এ সে স্বাধীনতা নয়, সে স্বাধীনতাকে ইংরেজ ভয় করে বলেই এ স্বাধীনতাকে পাঠিয়েছে। এ স্বাধীনতা আমাদের লোভ দেখিয়েছে, লোভে পড়ে আমরা ভ্রষ্ট হয়েছি। যার জন্যে এতকাল তপস্যা করে এসেছি সে যে কোথায় মিলিয়ে গেছে তার পাত্তা নেই। আর যে তার সাক্ষাৎ পাব সে ভরসাও নেই। কে তার জন্যে আরো ত্রিশ বছর তপস্যা করবে? যিনি করতেন তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে খাঁটি আছেন যে দু'চারজন তাঁদের কাজ হবে নিজেদের বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখা। কঠিন কাজ। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে পথ চলতে হবে। সাথীর উপর নির্ভর করলে হতাশ হতে হবে। দল গঠন করে কাজ নেই। বিশ্বাস গঠন করো।'

বিমলেন্দু বললেন, 'বিনু, সকলেই আমরা ত্যাগের শেষ সীমায় এসে পোঁছেছি। গান্ধীবাদীরাও বাদ যান না। গান্ধীজী যেদিন শহীদ হলেন সেই দিনই একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। সেটা ত্যাগের যুগ। তারপর থেকে ত্যাগের আর-কোনো নতুন দৃষ্টান্ত নেই, মহত্তর দৃষ্টান্ত নেই। যে আবহাওয়ায় আমরা বাস করছি সেটা ত্যাগের নয়, দলাদলির। গান্ধীবাদীরা দলাদলি থেকে সরে থাকতে চান, উত্তম। কিন্তু নতুন কোনো ত্যাগের দৃষ্টান্ত না দেখলে লোকে তাঁদের দিকে তাকাবে কেন? শুধু তাঁদের বিশ্বাসের একনিষ্ঠতা দেখে ক'জন আকৃষ্ট হবে?'

বিনু বলল, 'আপাতত কাউকে আকর্ষণ না করাই ভালো। নীরবে নিজের কাজ করে যাওয়াই যথেষ্ট। ত্যাগের অনেক রকম অভিব্যক্তি আছে। কেউ যদি পরের জন্যে আর কিছু না করে, কেবল সুতো কাটে, সেও এক হিসাবে ত্যাগ করে। কেউ যদি পরের জন্যে হাল লাঙল ধরে চাষ করে, সেও এক হিসাবে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখায়। দেশে এখনো সেবাকর্মীর অভাব হয়নি, তাদের সংখ্যা আগের চেয়ে কম হলেও খুব কম নয়। অভাব ঘটেছে বজ্রকঠোর বিশ্বাসের। বিশ্বাস যাদের আছে তাদেরও বিশ্বাসের জোর তেমন নেই। সেইজন্যে আমি ত্যাগের চেয়ে বিশ্বাসের উপর ঝোঁক দিতে চাই।'

সিতাংশু বললেন, 'বিনু, তুমি কি মনে করো গান্ধীবাদের কোনো ভবিষ্যৎ আছে? আমার তা মনে হয় না। বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাস।'

বিনু বলল, 'মার্ক্সের মৃত্যুর পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাটল, তার পরে এল

রুশ বিপ্লব। সেই পঞ্চাশ বছর মার্ক্সবাদীদের কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। তাঁদের অনেকেই মার্কসের উপর খোদকারী করে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মেরেছিলেন। ভবিষ্যৎ নেই তাঁদেরই যাঁরা গান্ধীর উপর খোদকারী করছেন।'

সিতাংশু বললেন, 'দেশ কি তা বলে পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করবে?'

বিনু বলল, 'ব্যক্তির জীবনে পঞ্চাশ বছর খুব বেশি দিন। কিন্তু জাতির জীবনে এমন কী বেশি! দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ইতিমধ্যে বিশ্বামিত্রের দল কী করতে চান করুন। অন্যান্য দলেরও কেরামতি দেখা যাক। গান্ধীবাদীদের ডাক পড়বে সকলের শেষে। ততদিন তাঁদের ধৈর্য ধরতে হবে। সংখ্যায় কিছু আসে যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী যেদিন আসেন সেদিন তিনি ছিলেন একক।'

সিতাংশু বললেন, 'না, দেশ ততকাল অপেক্ষা করবে না। গান্ধীবাদীদের বাদ দিয়েই ভাবতে হবে। এ যুগ তাদের যুগ নয়।'

'তাহলে যুগটা কাদের?' জিজ্ঞাসা করলেন বিমলেন্দু।

'যারা ভালো মানুষ তাদের নয়। যারা ডানপিটে তাদের। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের দিকে চেয়ে দেখ। যেমন ডানপিটে ইঙ্গ-মার্কিন দল, তেমনি ডানপিটে রুশ-চীন দল। এদেশেও তাদের জুড়ি আছে। দরকার হলেই তারা মারামারি কাড়াকাড়ি বাধাবে। গান্ধীবাদীদের মানবে কে?' উত্তর দিলেন সিতাংশু।

'না, না, এ আমাদের আধ্যাত্মিক দেশ। এখানে ওসব হবে না।' বিমলেন্দু বললেন, 'গান্ধী নেই, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ রয়েছেন।'

'পনেরোই অগাস্ট তাঁর আবির্ভাব দিবস।' পত্রনবীশ বললেন।

'কিন্তু তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক দেশের নেতৃত্ব করতে দেরি করছেন কেন? এখন তো গান্ধীজী নেই।' বললেন সিতাংশু।

'গান্ধীজী নেই, কিন্তু তাঁর ছায়া ঘুরছে দিল্লীর রাজপথে। লগ্ন এখনো অনুকূল হয়নি। অন্ধকার যতই নিবিড় হবে ততই নিকট হয়ে আসবে তাঁর অভ্যুদয় ক্ষণ। আমরা আশা করছি তিনি এসে আমাদের অঙ্গহানি দূর করবেন।' পত্রনবীশ বললেন।

'তার মানে', সিতাংশু শুধালেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ?'

'সেটা তোমাদের অনুমানের উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো।'

'বুঝেছি।' সিতাংশু বললেন, 'কিন্তু তাহলে পাকিস্তানের দোস্ত ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হবে! তোমরা যদি এতে রাজী থাক আমরাও রাজী। উপলক্ষ যাই হোক না কেন, ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গে এক হাত লড়তে হবে। ওরাই তো প্রতিবিপ্লবের মূর্ত প্রতীক।'

পত্রনবীশ এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। চুপ করলেন।

বিমলেন্দু বললেন, 'থাক, থাক, ওসব যুদ্ধ-বিগ্রহে কাজ নেই। আধ্যাত্মিক শক্তি যখন প্রবল হবে তখন বিনা যুদ্ধেই যুদ্ধের ফল হবে। মুনিঋষিরা অভিশাপ দিয়ে কাজ হাসিল করতেন। গান্ধীজী করতেন অনশন দিয়ে।

শ্রীঅরবিন্দ করবেন যৌগিক প্রক্রিয়ায়।'

স্বয়ম্ভূ বললেন, 'তামাশা রাখ। ডিসিপ্লিন, কঠোর ডিসিপ্লিন ভিন্ন উদ্ধারের পথ নেই। প্রথমে ডিসিপ্লিন, তার পরে প্রয়োজন হলে সংগ্রাম।'

বিমলেন্দু হাসলেন? 'তার মানে অন্তহীন ত্যাগ। কে আজ তার জন্যে প্রস্তুত। দুঃখ তো আমার ওইখানে। ত্যাগের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমরা, সেইজন্যে এমন অবসন্ন, নিরুদ্যম, হতাশ।'

(১৯৫০)

গান্ধীজন্ম

'যে যুগে আমরা বাস করছি', বন্ধু বললেন, 'সে যুগ শুরু হয়েছে স্বাধীনতার বহু পূর্বে। সারা হবে স্বাধীনতার অনেক পরে। স্বাধীনতা হচ্ছে মাঝখানকার একটা অধ্যায়।'

'কী মনে করে ও-কথা বললে?' জিজ্ঞাসা করল বিনু।

'ইতিহাস পড়তে পড়তে মনে এল ও-কথা। ইংলণ্ডের শক্তির মূলে তার শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার। আমেরিকার শক্তির মূলেও তাই। রাশিয়ার শক্তির মূলেও তাই। এদের প্রত্যেকের ইতিহাসে একদিন-না-একদিন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটেছে। আগে ইংলণ্ডের, তার পরে আমেরিকার, তার পরে রাশিয়ার। ইংলণ্ডের আঁচলে বাঁধা থাকলে আমেরিকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটত না, সেইজন্যে আমেরিকা ইংলণ্ডের আঁচল থেকে আপনাকে মুক্ত করল। জারের কবলে থাকলে রাশিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটত না, সেইজন্য রাশিয়া আপনাকে জারের কবল থেকে উদ্ধার করল। ভারত যে আপনাকে ইংলণ্ডের নাগপাশ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটানো। এটা যদি ধনিকদের নেতৃত্বে ঘটে তো ভালোই, নয়তো শ্রমিকদের নেতৃত্বে ঘটবে। কিন্তু এটা ঘটবেই। এ যদি না ঘটে তবে আমাদের স্বাধীনতার কোনো মানে হয় না। স্বাধীনতা মানে প্রাচীন কালে ফিরে যাবার স্বাধীনতা নয়।'

'তা তো নয়ই। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলউশন বলতে ইংলণ্ড আমেরিকায় তথা রাশিয়ায় যা বোঝায় তা তো যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি। শিল্প-বাণিজ্যে যে যত বেশি অগ্রগণ্য যুদ্ধের জন্যে সে-ই তত বেশি প্রস্তুত। যুদ্ধ একদিন বাধবেই। বাধবে কি, বেধে গেছে। তখন ওরা পরস্পরকে ধ্বংস করতে করতে এমন এক জায়গায় পৌঁছবে যেখানে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কেন তা হলে আমরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের দিকে পা বাড়াব?'

'পা বাড়াব কি, পা বাড়িয়ে রয়েছি। আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন গত দুই মহাযুদ্ধের মরশুমে আরম্ভ হয়ে গেছে। যুদ্ধকে তুমি এত ভয় কর কেন? যুদ্ধ চিরকাল থাকবে। যুদ্ধ এমন কিছু ধ্বংস করে না যার পুনর্গঠন নেই। মানুষও আবার জন্মায়।'

বিনু বলল, 'যুদ্ধ চিরকাল ছিল, এ কথা মানি। কিন্তু যুদ্ধ চিরকাল থাকবে, এ আমি মানব না। যুদ্ধের পিছনে এমন কোনো শাশ্বত নিয়ম কাজ করছে না যার দরুন যুদ্ধ চিরকাল বাধবেই। ধরো, সামনের মহাযুদ্ধে যদি আমেরিকা জয়ী হয় তাহলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস আর-কোনো নেশনের হবে না। অথবা যদি রাশিয়া জয়ী হয় তাহলে তার সঙ্গে যুদ্ধে নামবার আস্পর্ধা আর-কোনো দেশের হবে না। যুদ্ধ চিরকাল থাকবে, এটা একটা ভুল ধারণা। তবে ন্যায়ের জন্যে সংগ্রাম চিরকাল থাকবে।'

বন্ধু বললেন, 'তুমি দেখবে সামনের মহাযুদ্ধও শেষ নয়। তারপরে আরও আছে। আমার তো মনে হয় না যে এই পরম্পরার কোনো আদি ছিল বা অন্ত আছে। মানুষ যতদিন ক্লান্ত থাকে ততদিন শান্তির মন্ত্র আওড়ায়। কান্তি-মোচনের পর বলে, যুদ্ধং দেহি। ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তা সে জানে। ধ্বংসের পরে আসে পুনর্গঠনের পালা। নতুন সৃষ্টি পুরাতন সৃষ্টিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। এমনি করেই প্রগতি হয়। তুমি যদি যুদ্ধের বিরোধিতা কর, তা হলে প্রগতির বিরোধিতাই করবে।'

'আমি বিশ্বাস করি না যে মানুষের স্বভাব কোনোদিন বদলাবে না। আমরা যারা গান্ধীজীকে দেখেছি, চিনেছি, ভালোবেসেছি, তারা বিশ্বাস করি যে মানুষমাত্রেরই একদিন অন্তঃপরিবর্তন হবে। সে দিন হয়তো দশ বিশ বছরের মধ্যে নয়, হয়তো দু'চার শতকের মধ্যে নয়, মানুষের ইতিহাসে দু'চার শতক এমন কিছু বেশি সময় নয়। কিন্তু আসবেই একদিন। আসবে গান্ধীজীর মতো বহুজনের আত্মদানে। তাঁর মতো প্রেমিক ও শহীদ যদি লাখে লাখে উদয় হয় তাহলে সামনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী অন্তঃপরিবর্তন সম্ভবপর। তখন যে বহিঃপরিবর্তন হবে তা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব। সে প্রগতির তুলনায় তোমাদের এ প্রগতি নিষ্প্রভ। আমরা সেই প্রগতির ধ্যান করি যে প্রগতি মানুষকে আরো উচ্চ স্তরে তুলে দেবে। যা শুধু প্রগতি নয়, যা ঊর্ধ্বগতি।'

'প্রেমিক ও শহীদ লাখে লাখে উদয় হয় না, ভাই। হবেও না। লাখে লাখে দূরের কথা, হাজারে হাজারে নয়। এই ত্রিশ বছরে ত্রিশটিও দেখা গেল না। সামনের পঞ্চাশ বছরে পঞ্চাশটি দেখলে আশ্চর্য হব। তুমি বাস্তববাদী নও বলেই অমন প্রগতির ধ্যান করছ। মানুষ চিরকাল যা করেছে চিরকাল তাই করবে, মারামারি হানাহানি সত্ত্বেও এগিয়ে যাবে, ধ্বংসস্তূপের উপর নবীন সৃষ্টি গড়ে তুলবে। আবার ভাঙবে, আবার গড়বে। এমনি করেই প্রগতির পরিচয় দেবে।'

বিনু বলল, 'তুমি ইতিহাস পড়েছ, কিন্তু ইতিহাস তৈরি করনি। আমরা ইতিহাস তৈরি করব। যা কোনোদিন হয়নি তাই একদিন আমাদের দ্বারা হবে।'

'রাজা অশোকও ভাবতেন ও-কথা। তাঁর ভাবনা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হলো। পড়ে আছে গুটিকয়েক শিলালিপি। পণ্ডিত ভিন্ন আর কেউ তার পাঠোদ্ধার করতে পারে না। গান্ধীজীর ভাবনা, তোমাদের ভাবনা একদিন নিশ্চিহ্ন হবে। রেখে যাবে খানকয়েক পুঁথি, কেউ যা পড়বে না।'

'কে জানে, হয়তো তাই হবে।' বিনু বলল নিরাসক্ত ভাবে, 'সব নির্ভর করছে অন্তঃপরিবর্তনের উপরে। গান্ধীজীর আমরণ সাধনার পরেও তোমার অন্তঃপরিবর্তন হয়নি, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কেবল তোমার কেন, তাঁর যাঁরা শ্রেষ্ঠ সহকর্মী তাঁদেরও হয়নি। আরো হাজার হাজার প্রেমিককে শহীদ হতে হবে এর জন্যে। যতদিন তারা তৈরি না হয়েছে ততদিন ইতিহাস তৈরি করব বললেই ইতিহাস তৈরি হবে না। ততদিন ইতিহাস তার জানা রাস্তায় চলবে। যুদ্ধ, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব, ক্লান্তি, শান্তি, পুনরায় যুদ্ধ ইত্যাদি।'

'কিন্তু অজানা রাস্তার যে কোনো ঐতিহাসিক নজির নেই। তোমরা যা আশা করছ তা আকাশকুসুম। সেইজন্যে অত সহজে হতাশ হচ্ছ। আমার মতো যদি ইতিহাস পড়তে তাহলে ইতিহাস তৈরি করার খেয়াল ছেড়ে দিয়ে জানা রাস্তায় চলতে। জানা রাস্তায় অতখানি প্রেরণা নেই, কিন্তু এটা নির্ভরযোগ্য। এই যেমন আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হবেই। ধনিক নেতৃত্বে যদি না হয়, তবে শ্রমিক নেতৃত্ব হবে।'

'আমি কিন্তু অতটা নিশ্চিত নই। যেসব দেশে ধনিক নেতৃত্ব সেসব দেশে ডিপ্রেসন শুরু হয়ে গেছে। ডিপ্রেসন থেকে রক্ষা পাবার অন্য উপায় নেই দেখে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাতে বহু বেকারকে কাজ দেবার সুবিধে। বহু বেকারকে বধ করারও সুবিধে। যেসব দেশে শ্রমিক নেতৃত্ব সেসব দেশে বেকার নেই, কিন্তু যারা বেকার হতে পারত তারা বেগার দিতে বাধ্য হয়। সেখানেও সেই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি। আমাদের দেশে এখন ধনিক নেতৃত্ব। তাই ডিপ্রেসন। তাই বেকারকে কাজ দেবার জন্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি। যদি শ্রমিক নেতৃত্ব হয় তাহলে শ্রমিকদের অনেকে বেগার দেবে। চলতে থাকবে যুদ্ধের প্রস্তুতি। দুটোর যে-কোনো একটা পথে চলতে গেলে দেখবে পথের শেষে যুদ্ধ। সুতরাং ধ্বংস। গত দুই মহাযুদ্ধে ধ্বংসের ধাক্কা সামলাতে হয়নি বলে তোমরা শুধু ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি। এবার ফাঁদও দেখবে। তখন তোমরাই তোমাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঠেকাবে।'

'ধ্বংসকে তুমি এত ভয় কর কেন ?' বন্ধু বললেন, 'ধ্বংস যখন হবে তখন হবে। তার আগে দেশটা সমৃদ্ধ হোক, কলকারখানায় ছেয়ে যাক। মানুষগুলো অন্ধকার থেকে আলোকে আসুক। হয় মার্কিনের মতো, নয় রুশের মতো জীবন্ত হোক। মরবে একদিন মহাযুদ্ধে, তা বলে জ্যান্ত মানুষের মতো বাঁচবে না !'

'আমিও চাই যে তারা জ্যান্ত মানুষের মতো বাঁচে।' বিনু বলল, 'কিন্তু তারা কি বাঁচতে ও বাঁচাতে চায় ? তারা চায় মারতে ও মরতে। নেশাখোর যেমন নেশা না হলে বাঁচে না, এরা তেমনি হিংসা না হলে বাঁচে না। এরা হিংসাখোর। এই হিংস্র প্রাণীদের নখদন্ত বিজ্ঞানের কল্যাণে অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেছে। তাই দিয়ে এরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করবে, নির্বংশ করবে। এর ফলে প্রগতি হয়তো কিছু হবে। সমাজের গড়ন হয়তো কিছু বদলাবে। যারা পায়ের তলায় ছিল তারা হয়তো মাথার উপর চড়বে। কিন্তু অনেক মরে-বরে যে ক'জন

অবশিষ্ট থাকবে তারা আর-একটা যুদ্ধের আশঙ্কায় দিন গুনবে, যদি না এক পক্ষ সম্পূর্ণভাবে বিশ্বজয়ী হয়।'

'কী হবে না হবে তা এখন থেকে ভেবে কাজ নেই। শুধু এইটুকু ভাবলে চলবে যে আজকের দুনিয়ায় বাস করতে হলে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ইংলণ্ড গেছে, আমেরিকা গেছে, রাশিয়া যাচ্ছে, চীন যাবে, ভারত যাবে। এর দরুন যদি যুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, যেতে হবে ধ্বংসের ভিতর দিয়ে। বুকের পাটা শক্ত করতে হবে। তা নয়, কেবল গান্ধী গান্ধী বলে অরণ্যে রোদন ও মান্ধাতার আমলের চরকায় সূত্র কর্তন! এমন করে কি প্রগতি হয়?'

'বেশ তো, তোমাদের হাতে ক্ষমতা, তোমরা ইচ্ছা করলে দেশটাকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে, যুদ্ধের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে পারো। তবে আমাদের নৈতিক সমর্থন আশা কোরো না। আমরা যদি দেখি যে তোমরা অপরের উপর বলপ্রয়োগ করছ না, অপরের সম্মতি পাচ্ছ, তাহলে কিছু বলব না। নয়তো প্রতিবাদ করব। প্রতিবাদ একদিন প্রতিরোধে পরিণত হবে, যদি কন্‌স্‌ক্রিপসন চালাতে যাও, যদি বেগার খাটাতে চেষ্টা কর, তখন হয়তো দেখবে শত শত প্রেমিক শহীদ হতে উদ্যত। গান্ধীর রক্ত শুকিয়ে যায়নি। ভারতের মৃত্তিকাকে উর্বর করেছে। এ মাটিতে আরো অনেক প্রেমিক, আরো অনেক শহীদ জন্মাবে। শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছাই জয়ী হবে, তাদের ধ্যানই মূর্তি ধরবে। প্রথমে অন্তঃপরিবর্তন, তার পরে বহিঃপরিবর্তন।'

'অন্তঃপরিবর্তন!' বন্ধু হাসলেন। 'ওটা তোমাদেরই হওয়া উচিত। দেশটাকে তোমরা মধ্যযুগের ঘাটে বেঁধে রাখতে চাও। তাকে বর্তমান যুগের মাঝ দরিয়ায় ভাসতে দেবে না। প্রতিবাদ করবে, প্রতিরোধ করবে, কিন্তু গতি-রোধ করতে পারবে কি? দেখা যাক, ক'জন গান্ধীবাদী বুকে গুলি খায়!'

'কুকুরকে বদনাম দিয়ে গাছে ফাঁসি দেবার প্রবাদ আছে। তেমনি গান্ধী-বাদীদের মধ্যযুগীয় বলে বদনাম দিয়ে বিদায় করা হবে। কিন্তু আসলে তারা মধ্যযুগীয় নয়। তারাও এ যুগের লোক। মধ্যযুগে গান্ধীর মতো কেউ কোনো দেশে জন্মাননি। তখন হিংসা নামক নেশাটা জনগণের মধ্যে ছড়ায়নি। বড়ো বড়ো কলকারখানার জন্যে ছলে বলে কৌশলে অগণিত শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়নি। মধ্যযুগ নয়, বর্তমান যুগই গান্ধীজীর যুগ। এ যুগের ভাগ্যবিধাতারা যদি হিংসার নেশাটাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে না দিতেন তাহলে গান্ধীজমের প্রয়োজন হতো না। প্রয়োজন হতো না তাঁর আবির্ভাবের, যদি অগণিত শ্রমিককে তাদের গ্রাম থেকে, তাদের ঘরবাড়ি থেকে, তাদের প্রিয়জনের কাছ থেকে ভুলিয়ে এনে, ছিনিয়ে এনে কলকারখানার আশেপাশে নজরবন্দী করা না হতো। তাদের অপর একটা জীবিকা ছিল, অনেক ক্ষেত্রে তাদের জীবিকাকে ধ্বংস করা হয়েছে যাতে তারা কলকারখানায় কাজ নিতে বাধ্য হয়। হঠাৎ মনে হয় প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হলো, কিন্তু অন্যায় উপায়ে ধ্বংস করা হয়েছে। রাষ্ট্র প্রতিকূল না হলে প্রতিযোগিতায় ধ্বংস করা সহজ নয়। রাষ্ট্র অনুকূল হলে তো নয়ই। এ যুগের

ভাগ্যবিধাতারা নিজেদের দুষ্কৃতির দ্বারা ডেকে এনেছেন গান্ধীকে, যেমন কংস ডেকে এনেছিল কৃষ্ণকে। রাবণ ডেকে এনেছিল রামকে।'

'বাজে বকছ', বন্ধু হেসে উড়িয়ে দিলেন, 'কিন্তু মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া ভিন্ন তোমাদের আর কী করণীয় আছে?'

'আমরা মধ্যযুগের লোক হলে তো মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার কথা উঠবে? আমরা এই যুগেরই সন্তান। আমরাও এগিয়ে যেতে চাই, পেছিয়ে যেতে নয়। কিন্তু আমাদের অগ্রগতি অন্তঃপরিবর্তনের ভিতর দিয়ে, শান্তির ভিতর দিয়ে। আমরা চাই যে-যার নিজের ঘরবাড়িতে নিজের প্রিয়জনের সঙ্গে থেকে কাজ করুক, একজনের কাজ আর-এক জনের কাজের পরিপূরক হোক, একজন ছাতা তৈরী করুক, আর-একজন তৈরি করুক জুতো, আর-এক জন মাছ ধরে নিয়ে আসুক, আর-এক জন আনুক নিজের ক্ষেতের ধান, সকলে মিলে একটা সমাজ করুক, যে সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তারা প্রত্যেকে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী, কেউ কারো প্রতিযোগী নয়। একজনের বা একটি গোষ্ঠীর লাভের জন্যে উৎপাদন করা হবে না, উৎপাদন করা হবে সকলের প্রয়োজন মেটাতে। কেউ কোনোরকম উপস্বত্ব পাবে না, পাবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা প্রয়োজনীয় ভোজ্য ও ভোগ্য। যারা কায়িক শ্রমের চেয়ে মানসিক শ্রমে স্বভাবত পটু তারা মানসিক শ্রমের দ্বারা সহযোগিতা করবে। তারা বুদ্ধিমান বলে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবে, এটা চলবে না। যারা স্বভাবত সাহসী ও বলবান তারা আর পাঁচজনকে ভয় দেখিয়ে শাসন ও শোষণ করবে, এমনটি হতে দেওয়া হবে না। তারা আর পাঁচজনকে রক্ষা করবে, সেইভাবে সহযোগিতা করবে। যারা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করার কৌশল জানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বভাবসিদ্ধ, তারাও করবে সহযোগিতা। তারা আর পাঁচজনের পরিশ্রমের ফল দিয়ে নিজেদের ভাণ্ডার ভরাবে না। এমন যে সমাজ এর শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান আপনা হতেই হবে। পুলিশ লাগবে না। যদি লাগে তবে অল্পসংখ্যক। বাইরে থেকে একদিন আক্রমণ আসতে পারে এই আশঙ্কায় একটা সৈন্যদল খাড়া রাখতে হবে না। দরকার হলে স্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহ করে বিপদের সম্মুখীন হওয়া যাবে। নয়তো সত্যাগ্রহ করা যাবে।'

'এ স্বপ্ন আজকের নয়।' বন্ধু হেসে বললেন, 'আদিকাল থেকে যেখানে যত ইউটোপিয়ান জন্মেছে সকলে দেখেছে এই স্বপ্ন বা এর রকমফের। রূঢ় বাস্তব তাদের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। কারণ মানুষকে তারা যতটা নিঃস্বার্থ মনে করেছে মানুষ ততটা নয়। নিজেদের নিঃস্বার্থতা দিয়ে তারা আর পাঁচজনের নিঃস্বার্থতার পরিমাপ করেছে। সেটা ভুল। গান্ধীজীর বেলাও সেই ভুল ঘটেছে। তবে একটা জায়গায় তিনি তাঁর পূর্বগামী স্বপ্নদ্রষ্টাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। সেটা সত্যাগ্রহ বা সাত্ত্বিক প্রতিরোধ। তাকে আমরা সকলেই ভয় করি। এ দেশ যদি আবার পরপদানত হয় তাহলে সত্যাগ্রহীদের সাত্ত্বিক প্রতিরোধকে তারা ভয় করবে। ইতিহাসে এই একটা নতুন জিনিস দেখলুম। এই জন্যে গান্ধীজন্মের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অহিংস সমাজ! হায় বন্ধু, সে

আশা দুরাশা !'

'আমাদের আর কোনো দুরাশা নেই, ঐ একটি দুরাশাই আছে। মানুষ বাঁচে আশা নিয়ে। আমরাও বাঁচব। গান্ধীজী আমাদের মনে আশা জাগিয়ে দিয়ে গেছেন, উপায় দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা তাঁকে ভুলব না। তিনি যদি ভুল করে থাকেন তবু সেই ভুলও আমাদের পক্ষে শ্রেয়। তোমরা ঠিক করে যাও, আমরা ভুল করে যাই। তার পর ইতিহাস বিচার করবে কোন্ পথে প্রগতি।'

(১৯৫০)

জমি কার

ভদ্রলোক পূর্ববঙ্গের জোতদার। বাড়ীতে সাম্যবাদী ইস্তাহার পেয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বহু দুর্ভোগের পর তিনি মুক্ত হন। তার পরে কলকাতা চলে আসেন। বিনু তাঁর পুরাতন আলাপী। দেখা করতে এসেছেন বিনুর সঙ্গে।

বললেন, 'ভারতবর্ষের মাটিতে কমিউনিজম গজাবে এ কখনো আমি বিশ্বাস করিনে। ইস্তাহার রেখেছিল আমার ছেলে। আজকালকার ছেলেদের উপর মা-বাপের এক্তার নেই। অকারণে ভুগতে হলো এ বয়সে আমাকে।'

বিনু তাঁকে সহানুভূতি জানাল। তার পরে বলল, 'রুশদেশ সম্বন্ধে ডস্টয়েভস্কি ওকথা লিখেছিলেন। চীনদেশের বিদ্বানদেরও ধারণা ছিল অনুরূপ। তবু দেখা যাচ্ছে রুশ চীন লাল হয়ে গেছে। কোন্‌খানকার মাটিতে কী গজায় না গজায় সে সম্বন্ধে কেউ কিছু জোর করে বলতে পারে না এ যুগে। নইলে আপনার ছেলে রাখে সাম্যবাদী ইস্তাহার !'

'তা হলে কি প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ বলে কিছু থাকবে না ? রাষ্ট্র সব কিছু চালাবে ? চালাতে চাইলে কি চলবে ?'

'প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের কথা বলছেন ? বলুন দেখি, গত দেড়শো বছর জমিদার কিংবা তালুকদার কিংবা জোতদার জমিতে ক'টাকা ঢেলেছেন ? জমি থেকে যত টাকা উঠিয়েছেন তার সিকির সিকি জমির উন্নতির জন্য ব্যয় করেছেন কি ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না।'

'তাহলে দেখুন, জমিতে টাকা ঢালতে কেউ রাজি নয়। চাষীর টাকা থাকলে সে হয়তো টাকা ঢালত কিন্তু তার টাকা নেই। তা ছাড়া তার আশঙ্কা জমির খাজনা বৃদ্ধি হবে। কিংবা জমি বেহাত হয়ে যাবে। সেই ভয়ে সে টাকা থাকলেও ঢালতে নারাজ। কী করে তাহলে আশা করেন যে প্রাইভেট এণ্টার-প্রাইজের উপর জমির ভার ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্র-নায়করা নিশ্চিন্ত হবেন ? এই যে খাদ্যসংকট ঘনিয়ে আসছে এটা যখন আর একটু ঘনাবে, যখন বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি বন্ধ হবে, তখন প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের উপর বরাত দিয়ে

বসে থাকলে দেশের লোক না খেতে পেয়ে মারা যাবে। তখন অধিকতর ফসল ফলাতে হলে জমিতে টাকা ঢালতে হবে। রাষ্ট্রই ঢালবে সে টাকা। সুতরাং রাষ্ট্রই হুকুম করবে কোন্ জমিতে কী চাষ করা হবে, কত ফসল ফলাতে হবে, রাষ্ট্রকে দিতে হবে কত, জমিদারের প্রাপ্য কত, চাষীর প্রাপ্য কত। একবার রাষ্ট্র আসরে নামলে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের দফা রফা।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কি তার পক্ষপাতী?'

বিনু বলল, 'না, আমি তার পক্ষপাতী নই। কিন্তু কেউ যদি টাকা না ঢালে তবে জমির উন্নতি হবে না, জমির উন্নতি না হলে ফসলের পরিমাণ বাড়বে না, ফসলের পরিমাণ না বাড়লে রেশনের পরিমাণ বাড়বে না, রেশন প্রথা উঠে যাওয়া তো দূরের কথা। কে টাকা ঢালবে? জমিদার? তালুকদার? জোতদার?'

'না।' ভদ্রলোক স্বীকার করলেন যে সেরকম মতিগতি তাঁদের নেই।

'চাষীর হাতে টাকা থাকলে তো সে ঢালবে। আর থাকলেও সে ঢালবে কেন, যদি জমির উপর তার স্বত্ব আমেরিকার বা ফ্রান্সের মতো সর্বময় স্বত্ব না হয়? তাহলে দাঁড়াচ্ছে রাষ্ট্রকেই টাকা ঢালতে হবে। যে টাকা ঢালবে সে সুদে-আসলে উশুল করবে। এই তো নিয়ম!'

ভদ্রলোক মেনে নিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর-কোনো বিকল্প নেই কি?'

'আছে। কিন্তু সেটা আপনার ভালো লাগবে না। সেটা শ্রুতিমধুর নয়।'

'তবু শুনি।'

'বিকল্প হচ্ছে, লাঙল যার জমি তার। তার উপরে যতগুলো স্বত্ব আছে সব স্বত্ব লোপ করা। এমন কি রাষ্ট্র যে ল্যাণ্ড রেভিনিউ আদায় করে তাও লোপ করতে হবে। ঠিক যেমন আমেরিকায় বা ফ্রান্সে।'

'আমার যে আড়াইশো বিঘা জমি আছে, আমি কোথায় দাঁড়াব?'

'আপনি সপরিবারে যতটা পারেন চাষ করবেন। বাকীটার মমতা কাটাবেন। নয়তো আপনি রাজি হয়ে যান টাকা ঢালতে। জমির উন্নতি করতে। ফসলের পরিমাণ যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করতে।'

তিনি মাথা নাড়লেন, 'সে আমি পারব না।'

'পারবেন না তো!' বিনু হেসে বলল, 'তা হলে যে পারবে সে-ই একদিন জমির মালিক হবে। দেশের লোক খেতে না পেলে দেশের সরকার যত রকম উপায় আছে সব রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখবে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার মতো স্টেট ফার্ম বা কলেকটিভ ফার্ম করবে। অথবা আমেরিকার মতো, ফ্রান্সের মতো চাষীকেই মালিক বলে ঘোষণা করবে। খেসারতের দাবি অবশ্য উঠবে। কিন্তু যে দলের হাতে গবর্নমেণ্ট থাকবে সে দল খেসারৎ দিতে রাজি হবে কি না বলা যায় না, দিলেও কতটুকু দেবে তাও বলা যায় না। মোট কথা, চাষবাসের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করলে চাষীরা জমির উন্নতির জন্যে টাকা ঢালবে না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'টাকা থাকলে তো টাকা ঢালবে। সাধারণ চাষীর হাতে টাকা জমে না।'

বিনু ভেবে বলল, 'সেইজন্যে আমার আশঙ্কা হয় যে চাষীর হাতে জমি যাবে না, যাবে রাষ্ট্রের হাতে। তবে উত্তর প্রদেশের উদাহরণ দেখে আশাও হয় যে চাষীর হাতেই যাবে। চাষীরা যদি একজোট হয়ে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করে তাহলে সকলে মিলে টাকা ঢালবে, সকলে মিলে শ্রম ঢালবে। সেইভাবে জমির উন্নতি হবে, ফসলের পরিমাণ বাড়বে।'

'সমবায়!' ভদ্রলোক বললেন, 'সমবায়ের যে নমুনা দেখা গেল এদেশে তার পরে অতি বড়ো আশাবাদীরও আশা নেই ওর উপর।'

'ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে চাষবাসের আশ্চর্য উন্নতি দেখিয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে চাষ করে। যা উৎপন্ন হয় তা সকলে মিলে ভাগ করে নেয়। চেষ্টা করলে এদেশেও সেটা সম্ভব?'

'এদেশে!' ভদ্রলোক বিশ্বাস করলেন না, বললেন, 'সম্ভব হবে না।'

'তা যদি সম্ভব না হয় তবে অগত্যা রাষ্ট্রকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে। তখন রাষ্ট্রই চালাবে চাষবাস। যারা চাষ করবে তারা রাষ্ট্রের ফরমাসে করবে, নিজের মর্জিতে নয়। খাদ্যসংকট দূর হতে পারে এই উপায়ে, রাশিয়া তার নজির।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কিন্তু সেটা কি ভালো হবে? উদ্‌যোগিতা বা পুরুষকার বলে কিছু থাকবে না? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম?'

'আমিও সে কথা বলে থাকি। কিন্তু সমাধান আর কীভাবে হতে পারে, গোড়াতেই যদি আপনি ধরে নেন যে প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের মতো সংঘবদ্ধ চাষ এদেশে সম্ভব নয়? চাষীরা যদি সংঘবদ্ধ না হয় তাহলে তাদের হাত থেকে জমি ক্রমে রাষ্ট্রের হাতে চলে যাবেই। আধপেটা খেয়ে এ দেশের লোক কদ্দিন বাঁচবে, কদ্দিন খাটবে? কী করে দেশের কাজকর্ম চলবে? খাদ্যসংকট আর একটু তীব্র হলেই কথা উঠবে জমিতে হস্তক্ষেপ করবার। অথবা চাষীকে সংঘবদ্ধ করবার।'

'রাশিয়ার ইতিহাসে পড়েছি কলেকটিভ ফার্মের সূচনা কেমন করে হলো। আমার ছেলে আমাকে অনেক বই পড়তে দিয়েছে। তবু কমিউনিস্ট বানাতে পারেনি।'

'কলেকটিভ ফার্ম ওরাও চায়নি। ওরাও চাষীকে জমি দিয়েছিল। কিন্তু খাদ্যসংকট যখন ভয়াবহ হলো তখন ওরা হস্তক্ষেপ করল।'

ভদ্রলোক বললেন, 'হাঁ, একটা কিছু করা দরকার। তবে কী করা দরকার তা মাথায় আসছে না। আমরা কি তবে ধ্বংসোন্মুখ?'

বিনু বলল, 'সমাজের যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেটা করলে ধ্বংসোন্মুখ হবার ভয় থাকে না। এই খাদ্যসংকটে সমাজের যা প্রয়োজন তা প্রচুর এবং পুষ্টিকর খাদ্য। প্রতিদিন আমরা এর অভাব অনুভব করছি। যাদের অবস্থা খারাপ তারা তো একবেলা না খেয়ে আছে। আর-একবেলা আধপেটা খায়। তাও পুষ্টিকর নয়। এ সংকট বেশিদূর গড়ালে গবর্নমেণ্ট বদলাবে। হয়তো

বিপ্লব ঘটবে। ফরাসী বিপ্লব বলুন, রুশ বিপ্লব বলুন, খাদ্যসংকটেই তার সূচনা। সুতরাং সময় থাকতে সতর্ক হতে হবে। প্রত্যেকটা উপায় পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে শেষ উপায় হচ্ছে চাষীর হাতে জমির সর্বস্বত্ব সমর্পণ, তবে আপনাকে হাল লাঙল নিয়ে মাঠে নামতে হবে। আর যদি সেরা উপায় হয় স্টেট ফার্ম বা কলেকটিভ ফার্ম তা হলে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের নামে জিভ কাটলে চলবে কেন ?'

'তা বটে।' ভদ্রলোক সায় দিলেন।

এর পরে বিনু বলতে লাগল, 'অবশ্য এই যথেষ্ট নয়। উৎপাদনের সমস্যা মিটলেও বিনিময়ের সমস্যা অত সহজে মিটবে না। চাষীর হাতেই যদি চাষের দায়িত্ব থাকে তবে সে যে টাকাটা ঢালবে সেটা সুদে আসলে আদায় করে নিতে চাইবে। কিন্তু সে তার উৎপন্ন শস্যের জন্যে যে মূল্য প্রত্যাশা করবে সে মূল্য দিতে হয়তো কর্তারা কার্পণ্য করবেন। ইনফ্লেশনের ভয় আছে। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে কাপড় কেরোসিন ইত্যাদি যেসব জিনিস চাষীদের দরকার সেসব জিনিস কম দামে তাদের যোগানো। কিন্তু কম দামে যোগানো দূরের কথা, পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগানো সহজ নয়। এত কলকারখানা আমাদের নেই, বাইরে থেকে আমদানি করতে গেলে ডলারের অভাব। এসব জিনিস একদিন বাধ্য হয়ে গ্রামে গ্রামে উৎপাদন করিয়ে নিতে হবে কুটীরশিল্পের দ্বারা। অবশ্য কেরোসিন নয়, করোগেট নয়। এ ছাড়া আমি আর-কোনো ন্যায়সঙ্গত উপায় দেখছিনে। চাষীদের কাছ থেকে কম দামে ফসল কেড়ে নিয়ে আসা অথচ তাদের কম দামে কাপড় ইত্যাদি যোগাতে না পারা আমার বিবেচনায় ন্যায়সঙ্গত নয়। বর্তমান খাদ্যসংকটের এটাও একটা কারণ। চাষী রাগ করে খাদ্যশস্যের আবাদ কমিয়ে দিয়েছে, তার বদলে পাট তামাক লাগিয়েছে। তাতে বিনিময়ের সুবিধা।'

ভদ্রলোক বললেন, 'এসব আমার জানা ছিল না। অনেক নতুন কথা শোনা গেল। আসব আর-এক দিন।'

(১৯৫০)

হাতির খোরাক

সুশীতলের দিকে ফিরে অধ্যাপক বললেন, 'ভায়া, অত অধীর হলে চলবে কেন ? এই ক'বছরে যেসব পরিবর্তন আমরা দেখেছি তা নিয়ে বড়ো একখানা ইতিহাস লেখা যায়। বিদেশী শাসন রহিত হলো, এ কি কম সময়সাপেক্ষ কাজ ! আর কেউ কি এ কাজ আরো কম সময়ে পারত ! বিখ্যাত একজন বামপন্থী নেতা বলেছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের একশো বছর পূর্ণ না হলে দেশ স্বাধীন হবে না। এখন শুনছি তার দশ বছর আগে স্বাধীন হতে গিয়ে বিভক্ত হয়েছে এবং সেটা একটা অপরাধ। হয়তো তাই। অসময়ে স্বাধীন হতে গেলে একটা-না-একটা বিভ্রাট ঘটে। যেমন নাবালকের বেলায় তেমনি নেশনের বেলায়।

আমরা যে হিন্দু-মুসলমান মিলে একটা আস্ত নেশন হইনি এটা এককালে স্বীকার করতে বাধত। এখন স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। সেইজন্যে মনে হয় আরো দশ বছর সবুর করলে নেশন হিসাবে আমরা অখণ্ড হতুম, তার পরে স্বাধীন হতুম। সময় সংক্ষেপ করতে গিয়ে যা হবার তা হয়েছে। এ নিয়ে মন খারাপ করা মিছে।'

নেপালদা বললেন, 'দশ বছর কেন, একশো বছর সবুর করলেও হিন্দু-মুসলমান মিলে আস্ত একটা নেশন হতো না। যা হবার নয় তার জন্যে স্বাধীনতা পেছিয়ে যেত এটা অসহ্য। সেইজন্যে আমরা দেশবিভাগে রাজি হয়েছি।'

অধ্যাপক বললেন, 'তা হলে দেখা যাচ্ছে দোষ ইংরেজের নয়। দোষ আমাদের। এর সুযোগ নিয়ে ইংরেজ এতদিন রাজত্ব করে গেল। ভবিষ্যতে আর কেউ নেবে এর সুযোগ, কেননা স্বাধীন হয়েছি বলে তো আমরা এক হইনি। ঐক্যের অভাব আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। তবে তার আকার-প্রকার বদলেছে।'

নেপালদা বললেন, 'কিন্তু ওসব পুরোনো কাসুন্দী ঘেঁটে কী হবে! সুশীতল যে প্রশ্ন তুলেছে তার উত্তর কই? বন্যা ও ভূমিকম্প কি এই দেশটাকেই ইজারা নিয়েছে? বেছে বেছে এই দেশেই হয়? পাকিস্তানের লোক পেটভরে খেতে পায়, আমরা কেন পাইনে?'

অধ্যাপক বললেন, 'সেইজন্যেই তো বলছি অত অধীর হলে চলবে কেন! অসময়ে স্বাধীন হয়েছ, দেশটাকে খণ্ড খণ্ড করেছ, অনুতাপের লেশমাত্র লক্ষণ নেই, তোমাদের অন্নাভাব হবে না তো হবে কার! কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলো পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে, তাই ওরা পেটভরে খেতে পাচ্ছে। শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলো তোমাদের ভাগ্যে, তাই তোমরা ওদের চেয়ে অগ্রসর।'

নেপালদা বললেন, 'কাপড় উধাও। কাগজ অদৃশ্য। সব জিনিসের দাম আগুন। অতএব আমরা অগ্রসর।'

অধ্যাপক বললেন, 'ওদের চেয়ে অগ্রসর। ওদের তুলনায় অগ্রসর।'

সুশীতল বলল, 'অগ্রসর হয়েছি বলে কি অনাহারে মরব? এই আমার প্রশ্ন।'

অধ্যাপক বললেন, 'না, অনাহারে মরবে কেন? আমেরিকা থেকে গম আসছে, ইরাক থেকে খেজুর এসেছে। পাকিস্তানের সঙ্গেও চুক্তি হয়েছে, ওরা খাদ্য পাঠাবে।'

সুশীতল বলল, 'তা সত্ত্বেও মফঃস্বলের বাজারে ধান চাল আক্রা। এখন থেকে এই, ভাদ্র আশ্বিনে মানুষ কী খেয়ে বাঁচবে? আগে বাঁচলে তো তার পরে অগ্রসর হবে?'

অধ্যাপক মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'কঠিন প্রশ্ন। তবে আমার বিশ্বাস আমেরিকা কিছু পাঠালে রাশিয়াও কিছু পাঠাবে। চীন ইতিমধ্যে পাঠিয়েছে।'

নেপালদা হেসে বললেন, 'নিরপেক্ষ থাকছি কি সাধে! গাছেরটা খাচ্ছি,

তলারটা কুড়োচ্ছি। দুনিয়ার লোক আমাদের চাঁদা করে খাওয়াবে। আমরা কোনোদিকে ঝুঁকব না। দাঁড়িপাল্লা সমান রাখব।'

সুশীতল বলল, 'কিন্তু রাশিয়া যদি কিছু না পাঠায় তাহলে আমেরিকার কাছ থেকে কিছু নেওয়াটা কি উচিত হবে? নিলে মনের ঝোঁকটা কি মার্কিনের দিকে যাবে না?'

অধ্যাপক বললেন, 'কতকটা। তবে তার ফলে আমাদের নিরপেক্ষতার ইতর-বিশেষ হবে না। তেমন যদি দেখি তো খাদ্য আমদানি বন্ধ করে দেব।'

নেপালদা বললেন, 'তার পরে অনশন।'

অধ্যাপক বললেন, 'কেন, অনশন কেন? দামোদর পরিকল্পনা, ময়ূরাক্ষি পরিকল্পনা সমাপ্ত হলে খাদ্যের অনটন থাকবে না। অনাবাদী জমির আবাদ হবে। ভালো গোরু, ভালো সার, ভালো বীজ—এর প্রত্যেকটির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সময় দাও, সোনা ফলবে।'

বিনু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। নেপালদা বললেন, 'বিনু, তুমি নীরব যে!"

বিনু বলল, 'আমি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি।'

সুশীতল বলল, 'কী নিয়ে বোঝাপড়া?'

বিনু বলল, 'সে অনেক কথা। তোমাদের যদি ধৈর্য থাকে তাহলে শোনাতে পারি। কিন্তু ধৈর্য থাকবে না, ঠিক জানি।'

অধ্যাপক বললেন, 'আমি বাধা দেব না, তুমি বলে যাও।'

নেপালদা বললেন, 'আমি যদি বাধা দিই সেটা ধৈর্যহানির জন্যে নয়, কৌতূহলের জন্যে। আমাকে ভালো করে না বোঝালে আমি কিছু বুঝতে পারিনে। বুদ্ধিশুদ্ধি কম।'

সুশীতল বলল, 'আমি যদি বাধা দিই সেটা তর্কবিতর্কের নিয়ম অনুসারে। বিনা বিচারে আমি কিছু মেনে নিতে পারিনে।'

বিনু বলল, 'আচ্ছা, তাহলে শোন। চাষীরা যে ফসল ফলায় তার বিনিময়ে তারা পায় টাকা। টাকার বিনিময়ে পায় কাপড়চোপড় ছাতাজুতো আয়না-চিরুনি ঘটিবাটি হাঁড়িপাতিল তেল নুন লকড়ি। কিন্তু টাকার বিনিময়ে এসব জিনিস পাওয়া আজকাল কঠিন। সেইজন্যে তারা বলে, আরো টাকা দাও। আরো টাকা পেলে আশা করে আরো জিনিস পাবে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আরো টাকা ছড়ালে আরো দাম বাড়বে, জিনিস যা পাওয়া যাচ্ছে তার বেশি পাওয়া যাবে না। একে তো উৎপাদন কম, তার উপর গ্রামের চেয়ে শহরের ক্রয়শক্তি বেশি, সুতরাং বেশির ভাগ জিনিস শহরের ভাগে পড়ছে। শহরের সংখ্যা ও শহরের লোকসংখ্যা বহুগুণ হয়েছে। সুতরাং শহর যা কিনে রাখছে তার পরে গ্রামের কেনবার যোগ্য জিনিস সামান্যই অবশিষ্ট থাকছে। সেই সামান্য জিনিস পড়ছে গ্রামের ভাগে। চাষী দেখছে সে যা দিচ্ছে তার তুলনায় সে যা পাচ্ছে তা অত্যন্ত কম। যদি দ্রব্যবিনিময় প্রথা প্রচলিত থাকত তাহলে চাষী কিছুতেই এত কম জিনিসের বদলে এত বেশি ধানচাল ছাড়ত না। মুদ্রা-বিনিময়

প্রথার কারসাজিতে ভুলে সে কাচের দামে কাঞ্চন ছাড়ছে।'

সুশীতল বলল, 'এবার আমাকে বাধা দিতে হবে।'

বিনু বলল, 'আগে সবটা শোন। প্রথম কয়েক বছর ওরা খুব লাভ করেছিল। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই ওদের লোকসান হচ্ছে। ওরা ঠকে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারছে না কেন ঠকছে, কে ঠকাচ্ছে। ঠকাচ্ছে শহর। হাতীর মতো তার খোরাক। উপরন্তু হাতীর মতো তার হাওদা চাই, সজ্জা চাই। গ্রামগুলো যেন পিঁপড়ে আর শহরগুলো যেন হাতী। পিঁপড়ের মুখের গ্রাস যাচ্ছে হাতীর পেটে, অথচ হাতী তার বদলে ছাড়ছে না পিঁপড়ের সাজ-পোষাক। পিঁপড়ে আশা করেছিল দেশ স্বাধীন হলে তার বরাত ফিরে যাবে, কিন্তু সাদা হাতীর রং কালো হয়েছে বলে তার খোরাক তো কমেনি, পোষাক তো কমেনি, বরং কিছু বেড়েছে। কালো হাতী যদি হোলি খেলতে খেলতে লাল হাতী হয় তাহলেও তার খোরাক কমবে না, পোষাক কমবে না, বরং আরো বাড়বে। পিপীলিকার অতীত অন্ধকার, বর্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সে যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই থাকবে। যদি না—'

সুশীতল বাধা দিয়ে বলল, 'যদি না পিঁপড়েরা হাতী হয়ে ওঠে!'

বিনু নিচু গলায় বলল, 'অথবা হাতীরা পিঁপড়ে।'

নেপালদা গরম হয়ে বললেন, 'হাতী কখনো পিঁপড়ে হয় না। হতে পারে না।'

অধ্যাপক সায় দিয়ে বললেন, 'ইতিহাসে নজির নেই।'

বিনু বলল, 'নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে।'

সুশীতল তর্ক করল, 'সভ্য মানুষের ইতিহাস, না অসভ্য অর্ধসভ্য মানুষের?'

বিনু বলল, 'আমিও সে কথা ভাবছি কিছুদিন থেকে। সেইজন্যে জোর গলায় এসব কথা বলছিনে। দেখছি দেশ এখনো মধ্যযুগের মায়া কাটাতে পারছে না। গান্ধীবাদী বন্ধুরা পল্লীগ্রামে চরকার পুনঃপ্রবর্তন করতে গিয়ে লক্ষ করছেন জাতিভেদ পুনঃপ্রবর্তন করা হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যদি জাতিভেদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করা হবে না, হবে পুরাতন ইতিহাসের রোমন্থন। মনুসংহিতার সমাজ ফিরে আসবে, যে যার জাতব্যবসা নিয়ে থাকবে, অসবর্ণ বিবাহ চলবে না, এই যদি হয় বিকেন্দ্রীকরণের পরিণাম তাহলে আমাদের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে, আমাদের নতুন কিছু দেবার নেই, আমরা প্রাচীনকালের ফসিল। আমি যে নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখতে চাই সে সমাজে জাতিভেদ থাকবে না, মানুষকে জন্ম অনুসারে ভাগ করা হবে না। কে বামুনের ছেলে, কে বাগদির ছেলে কেউ জানবেও না, কেউ জানাবেও না। তা যদি না হয় তবে কাজ নেই বিকেন্দ্রীকরণে। শহরগুলো আছে বলে তবু আধুনিক যুগের হাওয়া গায়ে লাগছে। আমি আমার দেশকে যেমন ভালোবাসি তেমনি ভালোবাসি আমার যুগকে। দেশ আমার জননী, যুগ আমার জনক।'

সুশীতল খুশি হয়ে বলল, 'তাহলে তুমি আমাদের দিকে!'

বিনু বলল, 'যুগ সম্বন্ধে যখন ভাবি তখন আমি তোমাদের দিকে। কিন্তু দেশ সম্বন্ধে যখন ভাবি তখন গান্ধীবাদীদের দিকে। আমি আধুনিক যুগ থেকে আরো আধুনিক যুগে যেতে চাই, সেই সঙ্গে শহর থেকে যেতে চাই গ্রামে।'

নেপালদা বললেন, 'কী করে সেটা সম্ভব ?'

অধ্যাপক বললেন, 'পিছু হটতে হটতে কেউ সামনের দিকে এগোতে পারে ?'

বিনু বলল, 'সেইজন্যেই তো নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি। ভাবছি এখন বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলব না। বললে হয়তো দেশের লোক মনু পরাশরের যুগে ফিরে যেতে চাইবে। মনু পরাশর তাঁদের যুগের জন্যে যেসব আইন করেছিলেন এরা শুনেছি নিজেদের যুগের জন্যে সে সব আইন বলবৎ রাখবে। যারা সব সময় পিছনপানে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে তাদের কাছে যদি বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলি তাহলে তারা বুঝবে না যে এটা নতুন সমাজের সুরে বাঁধা। আগে তারা আধুনিক হোক, তার পরে তাদের শোনাব আধুনিকতর সমাজের কথা।'

নেপালদা বললেন, 'কিন্তু কথায় কথায় আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি। কেন আমরা খেতে পাচ্ছিনে, এই আমার প্রশ্ন। এর কী উত্তর ?'

বিনু বলল, 'এর উত্তর চাষীরা টের পেয়েছে যে বিনিময়ের বাজারে তারা ঠকে যাচ্ছে। তাই আর মন দিয়ে চাষ করছে না। উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ভালো সার, ভালো বীজ বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। লাভের আশা না থাকলে কেন তারা পয়সা খরচ করবে ? বিনা মূল্যে সরবরাহ করলে ফসল বাড়তে পারে। জলসেচ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কেউ কি দাম দিয়ে দামোদরের জল নেবে ? নেবে, যদি বিনামূল্যে পায়। মোট কথা চাষীকে সবরকমে সাহায্য করতে হবে। তাহলে ফসল বাড়বে।'

নেপালদা বললেন, 'কিন্তু সরকারের এত টাকা কোথায় ?'

বিনু বলল, 'অন্যান্য খাতে খরচ কমাতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয় তবে জমিদারি হাতে নিতে হবে। যে টাকাটা জমিদারের ঘরে যাচ্ছে সেটা সরকারের ঘরে যাবে। সেখান থেকে চাষীর ঘরে।'

অধ্যাপক বললেন, 'কিন্তু খেসারৎ ?'

বিনু বলল, 'খেসারৎ নয়, পেনসন। তাতে যদি ওরা নারাজ হয় তাহলে দেশের লোককে খাওয়ানোর ভার ওদের হাতেই তুলে দাও। ওরাই গবর্নমেণ্ট গঠন করুক। কিছুদিন চালিয়ে দেখুক চলে কি না। ওদের দায়িত্বহীনতার দাওয়াই হচ্ছে ওদের হাতে শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা।'

অধ্যাপক বললেন, 'কিন্তু ওটা কি গণতন্ত্রসম্মত হবে ?'

বিনু বলল, 'নাই-বা হলো। শ্যাম রাখব, না কুল রাখব ?'

সুশীতল খুশি হয়ে বলল, 'এই যে, তুমি দেখছি আমাদের দিকে।'

বিনু বলল, 'তোমরা কি এ বিষয়ে একমত ?'

নেপালদা বললেন, 'আরে না, না। তা কি হয় !'

অধ্যাপক বললেন, 'ওটা গঠনতন্ত্র বিরোধী। গণতন্ত্র বিরোধী।'

বিনু হেসে বলল, 'আমি জানতুম। সোজা রাস্তা নেই, সুশীতল। খাদ্য–

সংকট দিন দিন আরো তীব্র হবে। আমেরিকার কাছে চাঁদা করে, রাশিয়ার কাছে চাঁদা করে যত দিন চলে চলবে। তারপর হয় অন্তঃপরিবর্তন, নয় বড়ো রকম একটা বিপর্যয়।'

সুশীতল উল্লাসে অধীর হয়ে বলল, 'তার মানে বিপ্লব। তুমি আমাদের দিকে।'

বিনু হেসে বলল, 'বিপ্লব মানে তো লাল হাতীর তাণ্ডব। পিঁপড়েরা হাতীর পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যাবে যে।'

নেপালদা গম্ভীরভাবে বললেন, 'এসব হাসি-তামাশার বিষয় নয়। জীবন-মরণের প্রশ্ন। কাচ্চা-বাচ্চাদের নিয়ে যে কী কষ্টে আছি সে আমি জানি আর জানে আমার স্ত্রী। কোথায় আমাকে একটু আশ্বাস দেবে, না লাল হাতীর তাণ্ডবের ভয় দেখাচ্ছ!

অধ্যাপক বললেন, 'না, না, ভয় দেখাবে কেন? আমার মনে হয় বিনু একটা কিছু হাতে রেখেছে, হাতে রেখে বলছে। সেইজন্যে অত হাসি। বিনু বলো দেখি, এর কোন সমাধান আছে কিনা!'

বিনু বলল, 'যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান। যদি আমার কথা মেনে নাও যে বিনিময়ে মুশকিল তাহলে বিনিময়েই আসান। বিনিময়টা যাতে চাষীর অনুকূল হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। চাষীকে আরো টাকা না দিতে পারো আরো পণ্য যোগাও। তাহলে সে তোমাকে আরো অন্ন যোগাবে।'

অধ্যাপক বললেন, 'টাকা যা দিচ্ছি তার বেশি দেওয়া যায় না।'

বিনু বলল, 'তার মানে পণ্য যা দিচ্ছি তার বেশি দেওয়া যায় না। বেশ, তা হলে অন্ন যা পাচ্ছি তার বেশি পাওয়া যায় না।'

নেপালদা বললেন, 'আমি কিন্তু বুঝতে পারলুম না।'

বিনু তাঁকে বুঝিয়ে বলল, 'যে টাকা আপনি চাষীকে দিচ্ছেন সে টাকা দিয়ে সে কাপড় কিনছে মনে করুন। সে বলছে আরো টাকা দিন, তাহলে আরো কাপড় কিনব। আপনি বলছেন, না, আর টাকা পাবে না, আর কাপড় কিনবে না। তখন সে বলছে, আর কাপড় কিনব না তো আর ধান বেচব না। আপনি তাহলে যা খেতে পাচ্ছেন তার বেশি খেতে পাবেন না। এই যা পাচ্ছেন এও পাচ্ছেন প্রোকিওরমেণ্টের কল্যাণে। প্রোকিওরমেণ্ট না থাকলে এটুকুও পেতেন না। এই টাকায় এর বেশি পাওয়া তো দূরের কথা!'

নেপালদা বললেন, 'তুমি তা হলে কী করতে বলো?'

বিনু বলল, 'প্রোকিওরমেণ্ট যদি রাখতে হয় তবে শুধু ধানচালের বেলা কেন? কাপড়চোপড় বাসনকোসনের বেলা কেন নয়? প্রোকিওরমেণ্ট আছে বলে আপনার টাকার ক্রয়শক্তি যত হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি হয়েছে। তাহলে প্রোকিওরমেণ্টকে আরো ব্যাপক করে চাষীর টাকার ক্রয়শক্তি আরো বেশি করুন। চাষীর আবশ্যক দ্রব্য প্রোকিওর করতে বলুন। বিনিময়ে সে যদি কিছু বেশি পায় তাহলে চাষবাস মন দিয়ে করবে। আরো ফসল ফলাবে। নিজে খাবে, আপনাকে খাওয়াবে।'

অধ্যাপক বললেন, 'সর্বনাশ! কলকারখানায় প্রোকিওরমেণ্ট! কলওয়ালারা পাড়া মাথায় করবে না? আকাশ ফাটাবে না?'

নেপালদা বললেন, 'তা কি হয়?'

বিনু হেসে বলল, 'হাতীর খোরাকের বেলা প্রোকিওরমেণ্ট। পিঁপড়ের পোষাকের বেলা তা কি হয়!'

সুশীতল বলল, 'এই হাতী পিঁপড়ের মামলা দেখছি সহজে মিটছে না।'

বিনু বলল, 'না, সহজে মিটবে না। ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। কপালে দুঃখ আছে। কিন্তু যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান। বিপদের মধ্যেই উদ্ধারের সংকেত রয়েছে।'

অধ্যাপক বললেন, 'এখন আমি বুঝতে পেরেছি তুমি যা বলতে চাও। চাষী যা উৎপাদন করছে ও চাষীর জন্যে যা উৎপাদন করা হচ্ছে উভয়ের মধ্যে একটা সমতা থাকা চাই। আজকের দিনে সেই সমতা নষ্ট হয়েছে। কিন্তু কেন নষ্ট হলো? কবে থেকে নষ্ট হলো?'

বিনু বলল, 'মুদ্রাস্ফীতির দরুন নষ্ট হলো। যুদ্ধের সময় থেকে নষ্ট হলো। যুদ্ধের গোড়ার দিকে চাষীর লাভ হচ্ছিল বলে সে টের পায়নি। শেষের দিকে সে ভাবতে আরম্ভ করে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সে দাবি করে কণ্ট্রোল তুলে দাও। তার সে দাবি এখনো ছাড়েনি। দেশে যদি বড়ো বড়ো শহর না থাকত, শহরের লোককে খাওয়ানোর দায়িত্ব না থাকত, তাহলে চাষীর মুখ চেয়ে কণ্ট্রোল উঠিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু তার তো উপায় নেই।'

অধ্যাপক বললেন, 'কণ্ট্রোল উঠে গেলে সর্বনাশ।'

নেপালদা আঁতকে উঠলেন, 'আবার মন্বন্তর হবে।'

সুশীতল ঘাড় নাড়ল, 'না, অত বড়ো ঝুঁকি আমরাও নেব না।'

বিনু বলল, 'সমতা ফিরে না এলে যে দশা হবে সেটা তিলে তিলে সর্বনাশ, তিলে তিলে মন্বন্তর। সেটা যদি তোমাদের সহ্য হয়, তাহলে আমার কিছু বলবার নেই।'

অধ্যাপক বললেন, 'আমি কিন্তু ভাবছি মুদ্রাস্ফীতির কথা। নষ্টের গোড়া যদি হয় ইনফ্লেশন তাহলে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে হবে। কন্ট্রোল উঠিয়ে দিয়ে কী হবে, ইনফ্লেশন বন্ধ করো। তাহলে দেখবে সমতা ফিরে এসেছে।'

বিনু বলল, 'তার মানে কী জানো? তার মানে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে হবে। সৈন্যদল ভেঙে দিতে হবে। এত পুলিশ থাকবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হবে অহিংসার। বিরোধ যদি বাধে তবে তার মীমাংসা হবে অহিংস পদ্ধতিতে। এক পক্ষ তৈরি থাকবে মার খেয়ে মার ফিরিয়ে না দিতে। অথচ কাপুরুষের মতো নয়, ক্লীবের মতো নয়। দেশ যদি এর জন্যে তৈরি থাকত তাহলে মুদ্রাস্ফীতি এত দিনে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় সব দেশই তটস্থ। আমাদের দেশও।'

নেপালদা বললেন, 'যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত না হয়ে উপায় নেই। উপায় যা ছিল তা গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেয়েছে। অহিংসার মর্যাদা বুঝত

বন্দোবস্ত করতে পারব। রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণের ভার দিয়ে বেচাকেনা আমরা সমবায়ের উপর, ব্যবসাদারের উপর ন্যস্ত করতে পারি। তারাই রেশন অনুসারে বণ্টন করবে।

পানীয় জলের মতো পানীয় দুধ যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে। রাষ্ট্র যদি এ দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেয় আমি দু'হাত তুলে আমার ডবল ভোট দেব। মোটা ভাত খেয়ে শিশুরা বাঁচবে না, বাঁচলেও তাদের পুষ্টির অভাব ঘটবে। আমরা এখনো ময়রার দোকান খোলা রেখেছি, নিজেরাই সন্দেশ রসগোল্লা গিলছি। শহরের বা গ্রামের শিশুদের জন্যে আমাদের মাথাব্যথার কথা কোনো পত্রিকায় পড়িনি, সভায় শুনিনি।

দুধের সরবরাহ করতে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে যে দেশে দুগ্ধবতী গাভীর অপ্রতুল। দীর্ঘকাল রেশনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। দুধ, ঘি, মাখন, ছানা, দই এসব নইলে আমার মতো নিরামিষাশীরা আধমরা হয়ে কারুর কোনো কাজে লাগবে না। অন্তত নিরামিষাশীদের খাতিরে এগুলো রেশন করা দরকার হবে।

তারপরে মাছ মাংস। জনকয়েক ভাগ্যবান যদি এসব টাকার জোরে ছোঁ মেরে নেন তা হলে বহু লোকের পুষ্টিকর আহার জোটে না। পুষ্টির অভাব ঘটলে উৎপাদনও নিম্নমুখী হবে। এক্ষেত্রেও রেশনের প্রয়োজন হতে পারে। গ্রামের লোক যদি ঘরে ঘরে মুর্গী ছাগল পোষে, গ্রামের পুকুরগুলোয় যদি জোট বেঁধে মাছ ছাড়ে ও পালা করে পাহারা দেয়, তা হলে রেশন যা করবার তা ওরা নিজেরাই করবে। বণ্টনের ভার রাষ্ট্রকে নিতে হবে না। কিন্তু শহরের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে মুর্গী ছাগল পোষা, মাছ ছাড়া ও পাহারা দেওয়া খুব সোজা নয়। ছোট ছোট শহরে এ পরীক্ষা চলতে পারে। বড় বড় শহরে পদ্মার মাছ, সমুদ্রের মাছ আমদানি করা ছাড়া উপায় নেই। তেমনি বাইরে থেকে মুর্গী ছাগল ইত্যাদি।

ডাল তরকারি রেশন করা দরকার হতে পারে। তেল নুন লকড়ি রেশন করা চাইই। যেখানে লকড়ি মেলে না সেখানে কয়লা। কিন্তু ঘুঁটে পোড়ানো বন্ধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে গোবরের গতিবিধির উপর প্রখর দৃষ্টি দরকার। গোবর হচ্ছে মাটির খোরাক, আগুনের নয়। আগুনের খোরাক কয়লা বা লকড়ি। কিন্তু লকড়ি সম্বন্ধেও সাবধান হবার সময় এসেছে। চোখের সামনে বড় বড় গাছগুলোকে কাটা হয়ে চালান হতে দেখছি। এরকম চলতে থাকলে দেশে অনাবৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। তখন ভেউ ভেউ করে কাঁদলে কী হবে! এখন থেকেই গাছ লাগাতে হবে। প্রত্যেক গ্রামের চারদিকে একটুখানি অরণ্য সৃষ্টি করা উচিত। যাকে জঙ্গল বলে তা নয়। জঙ্গল তো আপনি গজায়। আমরা চাই ফরেস্ট। যা বৃষ্টিকে টানবে, মাটির পলিকে ধুয়ে যেতে দেবে না, শিকড় দিয়ে আটকাবে, প্রয়োজনমাত্র জ্বালানী কাঠ যোগাবে। আবার আমাদের আরণ্যক হওয়া অপরিহার্য হয়েছে।

এই কৃষিপ্রধান দেশে অন্ন সম্বন্ধে আমাদের তেমন উৎকণ্ঠা নেই, উৎকণ্ঠা

শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যে। কৃষির উন্নতি তা বলে উপেক্ষা করা যায় না, খরচ করতে হবে কৃষির পিছনেই সবচেয়ে বেশী। কৃষি বলতে গোপালনও বোঝায়, মৎস্যপালনও, মুর্গীপালনও। যেসব পণ্ডিত কৃষিকে গৌণ স্থান দেন তাঁরা বুঝতে পারেন না যে উৎপাদকের খোরাকে টান পড়লে উৎপাদনেও ঘাটতি ঘটবে। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে। অতএব কৃষি আগে, তারপরে শিল্প।

শিল্পের মধ্যে কোনটা মুখ্য কোনটা গৌণ তা নিয়েও পণ্ডিতদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ। তাঁরা ভাবছেন ভারী ভারী শিল্পের কথা। আমরা ভাবছি হালকা শিল্পের কথা। ভাতের পরেই মানুষ খোঁজে কাপড়, কাপড় ভারতের মেয়েরা ঘরে বসেই সরবরাহ করতে পারে। দাও তাদের তুলো, তুলো ধোনার সরঞ্জাম, চরকা ও তাঁত। মণিপুরে ও উত্তর আসামে মেয়েরাই ঘরে ঘরে সুতো কাটে, কাপড় বোনে, এক হাতে খাওয়ায়, আরেক হাতে পরায়। যে কাজ মেয়েরা ঘরে বসেই পারে সে কাজ কেনই বা মিল ফ্যাক্‌টরিতে করাতে হবে, কেনই বা মিল ফ্যাক্‌টরির জন্যে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করানোর জন্যে আরো ভারী ভারী কারখানা দরকার হবে? গোড়া কেটে আগায় জল যে কিসের অর্থনীতি তা তো মন বোঝে না। এটা কি তা হলে অর্থনীতি নয়, কুসীদপ্রীতি? না যন্ত্রতন্ত্রে অগাধ বিশ্বাস, প্রগতির নামে ভানুমতীর খেল?

বণ্টনের কথা হচ্ছিল। বণ্টনে এক প্রকার সাম্য আসবে যদি ভাত ও কাপড় এই দুটোকে সকলের সহজলভ্য করে তোলা যায়। কৃষির পিছনে সবচেয়ে বেশী খরচ করতে হবে, তারপরে তাঁত চরকা ও তুলোর পিছনে। মেয়েদেরকে গ্যারাণ্টি দিতে হবে যে তাদের উৎপন্ন সুতো ও কাপড় রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করবে, ক্রয় করে দেশময় রেশন করবে। কিন্তু একটা অংশ মেয়েরাই ফিরে পাবে মূল্যের বদলে বা মূল্য হিসাবে।

আগে খোরাক, তার পরে পোষাক, তার পরে বাসা। দেশে বাসস্থানের অকুলান নেই, তবু কোটি কোটি লোক কুঁড়েঘরে বা গাছতলায় থাকে। গাছতলা কথাটা আমার কল্পনা নয়। কিছুদিন আগে রোজ চোখে পড়ত। সম্প্রতি বৃষ্টি নেমেছে, প্রবাসী দিন-মজুরের দল নিজেদের গ্রামে ফিরে গেছে। বর্ষা ঋতুর পর ওরা আবার কাজকর্মের চেষ্টায় বেরোবে, তখন গাছতলাই ওদের আশ্রয়। ভাগ্যে গাছগুলো আপনাআপনি গজিয়ে এত বড় হয়েছে, আমরা তাদের ক'টাই বা লাগিয়েছি!

পথে পথে গাছ লাগাতে হবে আশ্রয়ের জন্যে। কুয়ো খুঁড়তে বা পুকুর কাটাতে হবে, নলকূপ বসাতে হবে পানীয় জলের জন্যে। সরাই খুলতে হবে, সত্র খুলতে হবে পুষ্টিকর খাদ্যের জন্যে। ধর্মশালা বা মণ্ডপ তৈরি করাতে হবে গাছতলার চেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের জন্যে। কয়েক মাইল অন্তর হাসপাতাল রাখতে হবে চিকিৎসার জন্যে।

এসব হলো মিনিমাম। এর কমে কোনো সভ্য জাতির চলে না। এ ধরনের আয়োজন একদা এদেশে ছিল। যা দু'হাজার বছর আগে ছিল তা আজ নেই।

এর থেকে প্রমাণ হয় না যে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে সভ্য। সভ্যতা কেবল জনকয়েকের ঊর্ধ্বগতি নয়, জনসাধারণের জীবনযাত্রার একটা মিনিমাম আদর্শ। তার নীচে নামলে সভ্যতার কোনো মানে হয় না। ভারতের দু'একটি প্রদেশ আফ্রিকার মতো ছায়াচ্ছন্ন। অন্যান্য প্রদেশেও এমন অঞ্চল আছে যেখানে মানুষ এক বেলা খায়, ঘরছাউনির খড় জোটাতে পারে না, সপরিবারে একখানি ঘরে রাত কাটায়, শীতে হি হি করে কাঁপে ও ধুনী জ্বালিয়ে যতটা পারে গরম হয়। বৃষ্টিতে ঘর ভেসে যায়, স্যাতস্যাঁতে মেজের উপর ঘুমোয়, মশারি নেই, মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হলে নাচার। এদের জন্যে প্রাসাদ গড়তে বলছিনে। কিন্তু ইটের মেজের উপর পুরু মাটির দেয়াল ও খাপরা বা টালি বা তক্তা বা টিন বা খড়ের শক্ত চাল চাই। একখানার জায়গায় চারখানা ঘর চাই। কিছু আসবাব, অন্তত কয়েকটা মশারি চাই। কিছু বাসন, অন্তত কয়েকটা ঘটিবাটি চাই। অবশ্য পাতায় খাওয়া একটা মহান আদর্শ, কিন্তু আমাদের মিনিমাম অত নীচে নামবে না। আমরা জাতকে জাত থালায় খাব। এবং সে থালা ঠুনকো এলুমিনিয়ামের নয়। অন্তত কাঁসার।

দীনতম দিনমজুরেরও চারখানা ঘর থাকবে, এক সেট বাসনকোশন থাকবে, এক সেট আসবাব থাকবে। আর থাকবে বাগানের জন্যে খানিকটে জমি, সেখান সে সপরিবারে তরিতরকারি ফলাবে, সম্ভব হলে কিছু শস্য। তার নিজের গোরু মোষ থাকবে, অন্তত একটা গাই। সম্ভব হলে, ছাগল মুরগী।

এসব সম্ভব হবে না যদি গোচারণের জমি না থাকে এবং যদি সে জমিতে ঘাস না থাকে। এ ভার নিতে হবে রাষ্ট্রকে অথবা রাষ্ট্রের নির্দেশে গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎকে। গ্রামে যদিও পতিত জমির অভাব নেই তবু সে-সব জমিতে গোরুর পেট ভরে না, সে যায় ক্ষেতে বাগানে পেট ভরাতে, মার খেয়ে খোঁয়াড়ে পড়ে। মানুষের জন্যে যেমন সরাই ও সত্রের কথা বলেছি তেমনি গোরুর জন্যে গোচারণের মাঠ ও মাঠভরা ঘাস নিত্য মজুত থাকবে।

গোচারণের জমি হবে সর্বসাধারণের সম্পত্তি। তেমনি অধিকাংশ দীঘি পুকুর সর্বসাধারণের নির্বাচিত গ্রাম্যপঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিতে হবে। যাদের পুকুর তারা যদি যত্ন নিত তা হলে আমি এ প্রস্তাব করতুম না, বরং বলতুম নতুন করে পুকুর কাটা হোক সর্বসাধারণের জন্যে। কিন্তু যেখানে বসে লিখেছি সেখানে ডোবা পুকুর দীঘি সায়র অজস্র। কিন্তু যত্ন নেয় না কেউ। এসব যদি সর্বসাধারণের তরফ থেকে খরিদ করা যায় তা হলে মালিকদের আপত্তি করা সাজে না। তারা অবশ্য দাম পাবে। দাম কিন্তু একদিনে দেওয়া হবে না, বছর বছর কিস্তিতে কিস্তিতে দেওয়া হবে।

অরণ্যের কথা আগে বলেছি। অরণ্যও হবে সর্বসাধারণের সম্পত্তি, তার রক্ষণাবেক্ষণ পঞ্চায়েতের হাতে। সেখানে যদি বন্য প্রাণী বাস করে তবে শিকার করার অধিকার সকলের কিম্বা পঞ্চায়েৎ যাকে ছাড়পত্র দেবে তার। লকড়ি কাটার অধিকারও সকলের, কিন্তু পঞ্চায়েতের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে।

অরণ্যের সঙ্গে বৃষ্টির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন সমস্যা বোধ হয় অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি। এখন থেকে ভাবতে হবে কী করে বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বৃষ্টি যদি না হয় তা হলে জলসেচের ব্যবস্থা নিখুঁত হওয়া চাই, নইলে উৎপাদনে ঘাটতি পড়বে, আমাদের প্রত্যেকের রেশন কমবে। জলসেচের ব্যবস্থা যেমন নিখুঁত হবে তেমনি নিখুঁত হবে জলনিকাশের ব্যবস্থা। কারণ অতিবৃষ্টি তো মাঝে মাঝে হয়, জলপ্লাবনে ফসল ডুবে যায়। উৎপাদনে ঘাটতি পড়ে। জলসেচ ও জলনিকাশ এ দুটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক-মতো না দিতে জানলে আমাদের রেশন নিয়ে টানাটানি, সুতরাং প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি।

তা ছাড়া জলনিকাশ যদি উচিতমতো না হয়, মশামাছিতে দেশ ছেয়ে যায়, মশা ও মাছি যেসব রোগের বাহন সেসব রোগে মানুষ ভোগে ও মরে। জলনিকাশ বলতে শুধু বৃষ্টির জল নয়, নিত্য ব্যবহার্য জলও বোঝায়। আমাদের অনেক শহরে জলনিকাশের ব্যবস্থা বীভৎস। বড় বড় পাকা বাড়ী, তার আশেপাশে পঙ্কিল নর্দমা, তাতে মলমূত্র গেঁজে উঠেছে ও গন্ধ ছাড়ছে, যারা বাড়ীতে বাস করে তাদের কেবল চিঠি লেখাই সার, মিউনিসিপ্যালিটি হয় নিষ্ক্রিয় নয় নিরুপায়। এসবের পরিবর্তন বা প্রতিকার না হলে আকাশে কেল্লা গড়া ব্যর্থ হবে। শহর ও গ্রামগুলোর জলনিকাশ ও মলনিকাশ অশন বসন ও আশ্রয়েরই মতো জরুরি।

এই ভাঙা দেশকে ভালো করে ভেঙে গড়তে হলে কোটি কোটি মানুষকে পেটে-ভাতে খাটতে হবে, যাকে বলে বেগার দেওয়া। আধুনিক পরিভাষায় কন্‌সক্রিপশন (conscription)। দু'রকম কন্‌সক্রিপশন আছে। সিভিল ও মিলিটারী। গণজাগরণের অর্থই হলো কোটি কোটি স্ত্রীপুরুষ নতুন করে বাঁচার জন্যে স্বেচ্ছায় কন্‌সক্রিপশনের লাঞ্ছনা সইবে। দরকার হলে লক্ষ লক্ষ পুরুষ ভারতের সীমান্তগুলিতে স্বেচ্ছায় মোতায়েন হবে শত্রুকে রুখতে, বেতন নেবে না, নেবে পেটের ভাত, পরণের কাপড়। কোটি কোটি পুরুষ চাষ করবে লাভের জন্যে নয়, নবজীবনের জন্যে। টাকা নেবে না, নেবে পেটের ভাত, পরণের কাপড়। কোটি কোটি নারী চরকা কাটবে লাভের জন্যে নয়, নবজীবনের জন্যে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষক ডাক্তার ধাত্রী নার্স এগিয়ে আসবে বেগার দিতে, নামমাত্র পারিশ্রমিক নিয়ে।

দীর্ঘকাল ত্যাগের তপস্যা করতে হবে চল্লিশ কোটিকে। তারপরে আসবে ভোগের সময়। অতিভোগের নয়, অনর্জিত ভোগের নয়, অর্জিত ও পরিমিত ভোগের নূতন জীবন।

(১৯৪৪)

স্বাধীনতা দিবসের চিন্তা

আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। প্রথমেই প্রণাম করি পুরুষোত্তম গান্ধীকে যাঁর তপস্যা না হলে এই অসাধ্যসাধন সম্ভবপর হতো না। তাঁর মতো যাঁরা তপস্যা করেছেন ত্যাগ করেছেন প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সকলকেই নমস্কার করি।

এই দিনটি আমার কাছে চরম জয়ের তথা পরম পরাজয়ের দিন। উর্বশী যেমন "উঠেছিল মন্থিত সাগরে ডানহাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে" এই দিনটিও তেমনি উদয় হলো একসঙ্গে জয়োল্লাস ও পরাভববেদনা নিয়ে। একে ফিরিয়ে দিতে গেলে স্বাধীনতাকেও ফিরিয়ে দিতে হতো। দিয়ে লাভ কী হতো? সত্যি কি আমরা আরো কিছুদিন সবুর করলে এ ছাড়া অন্য কোনো রকম স্বাধীনতা পেতে পারতুম যাতে শুধু অমৃত থাকত, গরল থাকত না? দশ বছর অপেক্ষা করলেও কি দেশবিভাগ এড়ানো যেতে পারত? না, যতই ভাবি ততই উপলব্ধি করি, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পাঁচ দশ বছরে এতদূর শক্তিশালী হতো না যে অবিভক্ত ভারতে ব্রিটেনের একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে পারত। কিম্বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্র মুসলিম সম্প্রদায়বাদ এতদূর হীনবল হতো না যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হাতে একচ্ছত্র রাজত্ব সঁপে দিয়ে নির্বিবাদে ইতিহাসের মঞ্চ থেকে প্রস্থান করত। আপস করতেই হতো একদিন না একদিন, এক শর্তে না এক শর্তে। হয়তো দেশ বিভক্ত হতো না, কিন্তু প্রত্যেকটি মন্ত্রীমণ্ডল বিভক্ত হতো। আপস করব না বললেই যে নিজের শক্তি পরের শক্তিকে পরাস্ত করত তা নয়। তার জন্যে গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হতো। ব্রিটেনের বল না কমলে, মুসলিম সম্প্রদায়বাদের বল না কমলে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বল না বাড়লে এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর ষোল আনা জয়ী হতে পারত না। চার আনা পরাজয় মেনে নিতেই হতো। গৃহযুদ্ধের পরেও।

ভারতের চার আনা সমর্পণ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অবশিষ্ট বারো আনায় একচ্ছত্র হয়েছে। এও বড় কম নয়। যে অঞ্চল সমর্পণ করা হয়েছে তার মুসলমান অধিবাসীদের ধারণা তারাও স্বাধীন। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই না করেই স্বাধীন। তাদের আনন্দে আমরা আনন্দ বোধ করি। ধীরে ধীরে তারা হৃদয়ঙ্গম করবে যে তাদের স্বাধীনতা সিরাজউদ্দৌল্লার স্বাধীনতা নয়, মীরজাফরের স্বাধীনতা। পলাশীর যুদ্ধের পাল্টা যুদ্ধে জয়লাভ নয়, পলাশীরই রকমফের। পরে যখন তাদের চৈতন্য হবে তখন তারা পাকিস্তান থেকে ক্লাইভের বংশধরদের হটাবে। আপাতত হটিয়েছে হিন্দুদের। ক্রমে তাদের প্রতীতি হবে যে সব হিন্দুই শোষক নয়। যারা পাকিস্তানের অর্থ পাকিস্তানেই ব্যয় করবে, পাকিস্তানের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করবে, বহু লোকের অন্ন যোগাবে তাদের জন্যে পাকিস্তানের দ্বার খোলা। আর যারা

নিঃস্ব চাষী মজুর শ্রেণীর খেটে খাওয়া লোক তাদের প্রতি বিদ্বেষ তো আন্তরিক নয়। সেটা উপরের প্ররোচনায়। সে বিদ্বেষ ক্ষয়ে আসছে। আর কয়েক বছর পরে তার চিহ্ন থাকবে না।

এই পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যাকে বলা হয় তার সঙ্গে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ মেশানো ছিল, খাদ্যের সঙ্গে যেমন ভেজাল। মুসলিম পুনরুত্থানবাদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ কোনো দিনই ষোলো আনা জয়ী হতো না। সে শক্তি তার ছিল না, নেই, হবেও না। ইতিহাস যাকে হাজার বছর আগে মেরে রেখেছে সেই ভূত যদি বেঁচে ওঠে তা হলে দেখবে ইতিহাস যাকে দু'শো বছর আগে মেরে রেখেছে সে ভূত তার চেয়েও জ্যান্ত। ভূতের সঙ্গে তলে তলে হাত মিলিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আপনাকে তার দুর্বলতার শরিক করেছে। যারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ তারা একই শিবিরে হিন্দু পুনরুত্থানবাদকে আনাগোনা করতে দেখে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেনি। যে দোকানে বিশুদ্ধ গব্যঘৃত বিক্রি হয় তার পাশের দোকানে বনস্পতি বিক্রি হতে দেখলে সহজেই সন্দেহ হয়। তারপরে যদি দেখা যায় দুই দোকানের মাঝখানে চোরা দরজা দিয়ে লোক চলাচল করছে তা হলে সন্দেহ দাঁড়ায় অবিশ্বাসে। অতীত ভারত ফিরে আসবে এই যদি হয় ভাবী ভারতের স্বরূপ তাহলে অতীত ভারতে যারা ছিল না ভাবী ভারতে তাদের স্থান হবে কী করে ? নিজেদের জন্যে তারা তো একটা স্থান চাইবেই। সে স্থানটুকু ছেড়ে দিতে হবে ভারতকেই। হিন্দু পুনরুত্থানবাদ পাকিস্তানের জন্যে দায়ী। অবশ্য পুরোপুরি দায়ী নয়। মুসলিম পুনরুত্থানবাদও দায়ী। আরো বেশী দায়ী।

আর এই যে পুনরুত্থানবাদ এ তো উচ্চশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কৌশল। প্রাচীন ভারত ফিরে এলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেরই সুবিধা। শূদ্রের দাসত্বের উপর তাদের পিরামিড তৈরি হবে। আর নারীর দাসীত্বের উপর। মধ্যযুগের ভারত ফিরে এলে ফিউডাল সমাজব্যবস্থা কায়েম হবে। জমিদার জোতদারের সুখস্বর্গ। ভূমিহীন চাষী ও দিনমজুরের নরকযন্ত্রণা। রায়তের বেগার খাটা। এসব বাদ দিয়ে হিন্দু গৌরব বা মুসলিম গৌরবের পুনরুদ্ধার করতে গেলে তা সম্ভব হবে কোন মন্ত্রবলে ! এই পাঁচ বছরে এই দুই ভূত আমাদের ঘাড় থেকে নেমেছে, তবে এখনও ঘর থেকে বিদায় হয়নি। ক্ষতি যা করেছে তা সাংঘাতিক। কেবল দেশ ভেঙে দেওয়া নয়, বুক ভেঙে দেওয়া, মন ভেঙে দেওয়া। গান্ধীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও ঘাতকের প্রতি সহানুভূতি লক্ষ্য করে আমার মন ভেঙে গেছে। তবে গোড়ুসে যে ভারতের চিত্ত জয় করতে পারবে না এটা ধ্রুব সত্য। গোড়ুসেপন্থীরাও পারবে না। এরা একদিন নির্মূল হবেই। আর পাঁচ বছর পরে দেখা যাবে এরা নির্বাচনে কল্কে পাবে না। সমাজ থেকেও এদের হটাতে হবে, শুধু রাজনীতি থেকে নয়। এক্ষেত্রে কোনো আপস নেই। ঘৃতের সঙ্গে বনস্পতির আপস ঘৃতের পক্ষে মারাত্মক।

এরা যেদিন সমাজ থেকে হটবে সেদিন মুসলমানের বিশ্বাস হবে যে সে ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ নয়, সে একই সমাজের ভিন্নধর্মী সভ্য। আগে তো সে একই রাষ্ট্রের ভিন্নধর্মী নাগরিক হোক। তারপরে পাকিস্তান থাকতে পারে, কিন্তু তার থাকা হবে অর্থহীন। ততদিন তার অস্তিত্বের অর্থ আছে। অকারণে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়নি। কেবল যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম সম্প্রদায়বাদের চালবাজি দেখি তা হলে স্থূলদৃষ্টির পরিচয় দেব। আছে গভীরতর অর্থ। ঘরে-বাইরে মুসলমানকে "দূর দূর" করব, অথচ মুসলমান-প্রধান অঞ্চলকে ভারতের আঁচলে বাঁধব দুই একসঙ্গে হয় না। হয় না বলেই পাকিস্তানের উদ্ভব ও স্থিতি। যতদিন না এই "দূর দূর" নীতি সমাজ থেকে রাষ্ট্র থেকে যাচ্ছে ততদিন অবিভক্ত ভারতের সম্ভাবনা নেই। পাকিস্তান তো আসবেই না, পণ্ডিচেরী গোয়া প্রভৃতি খ্রীষ্টান অধিকৃত অঞ্চলও আসবার নয়। এবং কাশ্মীর নিয়ে মাথাব্যথাও সারবে না।

এই স্বাধীনতা নিয়েই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এই অমৃতগরল নিয়ে। এই জয়পরাজয় নিয়ে। বিরাট সামাজিক পরিবর্তন চাই, এই যদি হয় আমাদের লক্ষ্য তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে শিল্পীকরণের পথ দিয়ে যেতে হবে। নইলে শুধু সদিচ্ছার দ্বারা জাতিভেদ যাবে না, নারীর দাসীত্ব শূদ্রের দাসত্ব যাবে না। অন্যায়ের স্থায়িত্বের পক্ষে যে অবস্থা অনুকূল তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে যে অবস্থা প্রতিকূল তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আপাতত বিকেন্দ্রীকরণ নয়। বিকেন্দ্রীকরণের সময় আসবে যখন এই সব পচা প্রাচীন প্রথা বিনষ্ট হবে তখন। নইলে আবার এরা মাথা তুলবে। তবে বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে যাঁরা তপস্যা করছেন তাঁদের তপস্যায় ছেদ পড়লে চলবে না। তাঁরা একমনে কাজ করে যেতে থাকুন।

(১৯৫২)

সেক্যুলার স্টেট

সেক্যুলার স্টেট-এর বাংলা কী ?

যে দু'একজন মন্ত্রী সরকারী নথিপত্রে বাংলাভাষা ব্যবহার করে থাকেন তাঁদের একজনকে লিখতে দেখা গেল, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। মুগ্ধ হলুম তাঁর ভাষাপ্রেম লক্ষ্য করে। নিজে কিন্তু ইংরেজীতে লিখলুম, সেক্যুলার স্টেট।

কেন ? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কী দোষ করল ? অন্তত লৌকিক রাষ্ট্র তো খবরের কাগজের দৌলতে বাজার-চলতি হয়ে গেছে। এর কোনোটা পছন্দ না হলে হাতের কাছে টেলিফোন তো ছিল, রাজশেখর বসু মহাশয়কে টেলিফোনে স্মরণ করলে খাপসই একটা পারিভাষিক শব্দ পেতে কতক্ষণ লাগত ? সংস্কৃত ভাষার অন্তহীন ধ্বনিভাণ্ডারে শব্দের অভাব কবে ঘটল ?

চেষ্টা করলে যে কোনো বিদেশী শব্দকে স্বদেশী ভাষায় অন্তরিত করা যায়। কিন্তু শব্দ যেখানে আসল নয়, অর্থ যেখানে আসল, আইডিয়া যেখানে আসল, সেসব জায়গায় বিদেশীর বদলে স্বদেশী ব্যবহার করলে ভাষান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভাবান্তর ঘটা বিচিত্র নয়। বিশেষত শব্দের পিছনে যদি বহু শতকের সংগ্রামের বা সংঘাতের ইতিহাস থাকে তবে তো প্রতিশব্দের মধ্যে সেই ঘাত-প্রতিঘাতের আভাসটুকুও মেলে না।

সেইজন্যে আমি সেক্যুলারের বাংলা ধর্মনিরপেক্ষ বা লৌকিক লিখতে রাজী নই। তা ছাড়া আরো কারণ আছে। খোদ সেক্যুলার কথাটি আমাদের কাছে নতুন। পাঁচ বছর আগে জবাহরলাল একদিন সেটি ব্যবহার করলেন। দেশ বিভাগের পূর্বাহ্নে। দেশ বিভাগের পরে গান্ধীজীকে সেটি ব্যবহার করতে দেখা গেল। এতদিন আমরা শুনে আসছিলুম যে স্বরাজ বলতে বোঝাবে রামরাজ্য। শুনলুম রামরাজ্য নয়, সেক্যুলার ডেমোক্রেসী বা সেক্যুলার স্টেট। রামরাজ্যের পাল্টা রহিমরাজ্যের চেহারা দেখে আমাদের নেতাদের তাক লেগে যায়। কে জানে রামরাজ্য হয়তো দু'দিন পরে হনুমদ্রাজ্যে পরিণত হতো। তাই রাতারাতি সেক্যুলার বিশেষণটি উড়ে এসে জুড়ে বসল। অভিধানে এর সঙ্গে আমাদের মুখ চেনা ছিল। কিন্তু জীবনে পরিচয় ছিল না। এই নবাগতের সঙ্গে আমাদের কিসের প্রয়োজন তাও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় নি। এর তাৎপর্য নিয়ে যখন তর্ক উঠল তখন এক একজন এক এক রকম ব্যাখ্যা দিলেন। গান্ধীজী তখন নেই। তাঁর এক বিশিষ্ট অনুচর নিজস্ব অভিমত জানিয়ে বললেন, ইংরেজীতে সেক্যুলার শব্দের অর্থ যাই হোক না কেন আমরা তো ও শব্দ অন্য অর্থে ব্যবহার করতে পারি।

এইখানেই বিপদ। ইংরেজীতে ডেমোক্রেসী শব্দের অর্থ যাই হোক না কেন স্টালিন তা অন্য অর্থে ব্যবহার করছেন। মাও সে তুং করছেন অন্য অর্থে। তেমনি আমাদের সম্পাদক ও রাজনীতিকরা যদি সেক্যুলার শব্দের অন্য অর্থ করেন তা হলে আশ্চর্য হব না। কিন্তু শঙ্কিত হব। কারণ সেক্যুলার শব্দটি খামোকা আসে নি। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এর প্রবেশ যদিও অকস্মাৎ তবু আকস্মিক নয়। হিন্দু মুসলমানের মাথা কাটাকাটি কি কেবল দেশ বিভাগের দ্বারা এড়াতে পারা যায়? এর স্থায়ী সমাধান হচ্ছে সেক্যুলার মনোভাব। যে মনোভাব ইউরোপে এসেছে বহু শতকের রক্তাক্ত সংঘর্ষের ফলে। যার অন্য অর্থ নেই।

কিন্তু কী এর প্রকৃত অর্থ?

এর উত্তর দিতে হলে দু'তিন হাজার বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে হয়। প্রথমত পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাস মায় আমেরিকার ইতিহাস। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস।

পশ্চিম ইউরোপের লোক যখন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে তখন ধর্মগুরু ও ধর্মসংঘের প্রতি তাদের সকলের আনুগত্য দেখে খ্রীস্টেনডম বা খ্রীস্টরাজ্য নামক ধারণাটি মানুষের মনে বসে যায়। রাজা একাধিক, কিন্তু পোপ এক।

রাষ্ট্র একাধিক, কিন্তু চার্চ এক। প্রত্যেক দেশেই পোপের অধীনস্থ ধর্মযাজকের দল একজোট হয়ে কাজ করে যায়, এক দেশ থেকে আরেক দেশে বদলি হয়, ল্যাটিন ভাষায় উপাসনা করে, ল্যাটিন ভাষায় নাম রাখে। চার্চের তুলনায় রাষ্ট্র অনেকটা ক্ষীণবল, রাজা অনেক সময় চার্চের হাতের পুতুল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চার্চ তার নিজের আদালত বসায়, বিচার করে, দণ্ড দেয়, আগুনে পোড়ায়, খাজনা আদায় করে। এমন এক সময় আসে যখন দেখা যায় পোপের হাতে কেবল নৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা নয়, রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতাও এসে পড়েছে। কেউ যদি বিধর্মী হয় তাকে তিনি কেবল সমাজচ্যুত করে ক্ষান্ত হবেন না, ধনে-প্রাণে ধ্বংস করবেন। পৃথিবীর চার দিকে সূর্য ঘুরছে কেউ যদি এই তত্ত্ব অস্বীকার করে বলে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে তা হলে আর রক্ষা নেই। অমনি বিধর্মী হয়ে গেল। চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা, সব কিছু ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এবং ধর্ম বলতে বোঝায় ধর্মগুরু ও ধর্মসংঘ। এবং তাঁদের হাতে ইহলোকের পরলোকের সব রকম যন্ত্রণার যন্ত্র।

হাজার বছর ধরে এই অদ্ভুত এক্সপেরিমেণ্ট চলল। এর ভালো দিক যে ছিল না তা নয়। মধ্যযুগের অসভ্যতার অন্ধকারে সভ্যতার দীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল চার্চ, যদিও তাতে অন্ধকার যায় নি। বহুচারী ক্ষত্রিয়দের এক বিবাহে বাধ্য করাও সামান্য কীর্তি নয়। প্রায় দু'হাজার বছর আগে রোমান চার্চ যা পেরেছে প্রায় দু'হাজার বছর পরেও দিল্লীর কংগ্রেস সরকার তা পারছেন না। হিন্দু রাজ, মোগল রাজ, ব্রিটিশ রাজও পারেন নি। করাচীর নয়া মুসলিম রাজ তো তার কাছ দিয়েও যাচ্ছেন না। কাজেই রোমান চার্চের কৃতিত্বের প্রশংসা করতেই হয়। তা সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের অর্ধেক দেশ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সামাজিক মানসিক বাচনিক স্বাধীনতার অভাবে। রেনেসাঁস তাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়। রেনেসাঁসের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি রেফর্মেশন। পোপের বিরুদ্ধে, রোমান চার্চের বিরুদ্ধে, ল্যাটিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পোপের রাজকীয় ক্ষমতাই তাঁর কাল হলো। গুরু মহারাজ যদি সত্যিকারের মহারাজ হয়ে ওঠেন তা হলে সত্যিকারের মহারাজের দল কি তা সহ্য করতে পারেন? ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরী যে প্রজাবন্ধু ছিলেন তা নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থেই তিনি পোপের শত্রু হন। তাঁর প্রজারা তবু তাঁকে সমর্থন করে। ইংলণ্ডের খ্রীষ্টানরা দেখতে দেখতে প্রোটেস্টাণ্ট হয়ে যায়। ক্যাথলিকরা হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অবাক কাণ্ড! কেবল ইংলণ্ড নয়, জার্মানী হল্যাণ্ড নরওয়ে সুইডেন ইত্যাদি বহু দেশ পোপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। নিজেদের এক একটা চার্চ খাড়া করে। সেখানেও শেষ নয়। সরকারী চার্চ প্রায় রোমান চার্চের মতো হস্তক্ষেপকারী বলে সরকারী চার্চ থেকেও বহু লোক নাম কাটিয়ে নেয়। তাদের ছোট ছোট সম্প্রদায় না মানে গুরু মহারাজকে না মানে রাজা মহারাজকে—অবশ্য ধর্মের ক্ষেত্রে।

এসব একদিনে হয়নি, বিনা দ্বন্দ্বেও হয়নি। ঘোরতর মারামারি কাটাকাটি

ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে চলে। আমরা আর কতটুকু রক্তারক্তি করেছি। মানুষের মাংস তো আর খাইনি। জার্মানরা নাকি তাও করে দেখেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই স্থির হলো যে ইংলণ্ডের মতো দেশে পোপের চেয়ে রাজা বড়, রাজার চেয়ে প্রজা বড়। প্রথম চার্লসের মাথা কেটে ও দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে ইংলণ্ডের লোক কেবল পোপকে নয় রাজাকেও সমঝিয়ে দেয় যে সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। প্রজাপ্রভাবিত রাষ্ট্রই হলো চার্চের চেয়ে বড়। প্রজাদের রাষ্ট্র ধীরে ধীরে অলক্ষিতে সেক্যুলার স্টেট হয়ে ওঠে। এক শতক পরে যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার মূলনীতি হয় সেক্যুলারিজম। তার কিছুদিন পরে যখন ফরাসী বিপ্লব ঘটে তখন সেক্যুলারিজমের জয়জয়কার। ইংলণ্ডে যা প্রচ্ছন্ন ছিল ফ্রান্সে তা প্রকট হলো। প্রজারা যদি নাস্তিক হয়, ধর্ম বলে কিছু না মানে, তা হলেও তারা রাজ্যের অধিকারী। রাষ্ট্র তাদের চিন্তায় বাক্যে ও আইনসঙ্গত কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবে না। চার্চ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো রকম পৃষ্ঠপোষকতা দাবী করবে না, বিশেষ অধিকার প্রত্যাশা করবে না। প্রজাদের কার কী ধর্ম, আদৌ কোনো ধর্ম আছে কিনা, এ প্রশ্ন উঠবে না। ধরে নিতে হবে যে ধর্ম তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। পাবলিক নয়, প্রাইভেট ব্যাপার। যার কোনো ধর্ম নেই সেও সরকারী চাকরি করতে পারে, সেনাপতি হতে পারে, সেও নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে, প্রেসিডেণ্ট হতে পারে, সেও দেশশাসন করতে পারে, প্রধান মন্ত্রী হতে পারে।

ফরাসী বিপ্লবের পর আরো এক শতক লাগল এ নীতি বলবৎ করতে। ফরাসীদের দেশে দ্রেফু নামে এক ইহুদী মিলিটারি অফিসার ছিলেন, তাঁর একমাত্র অপরাধ তিনি ইহুদী। ঐ অপরাধে তাঁকে সৈন্যবিভাগ থেকে বিদায় করা যায় না। মিথ্যা মামলা সাজানো হলো, তাও প্রকাশ্য আদালতে দায়ের করার মতো সৎসাহস ছিল না, সামরিক আদালতের বিচারে বা অবিচারে দ্রেফুর হয়ে গেল দ্বীপান্তর। দুনিয়ার লোক জানলো বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত দণ্ড হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের যাঁরা বিবেকী ব্যক্তি তাঁরা ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলেন নিরপরাধের সাজা হলে কেউ নিরাপদ নয়, নিরপরাধ এক্ষেত্রে ধর্মভেদের জন্যে দণ্ডিত, সুতরাং সেক্যুলার স্টেট বিপন্ন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এমিল জোলা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অপরিচিত এক ইহুদী অফিসারের পক্ষ নিয়ে বিশ্বের জনমতের সামনে নিজের দেশের রাষ্ট্রনায়কদেরই অভিযুক্ত করলেন, তখন রাগের চোট পড়ল জোলার উপরে। জোলার আত্মত্যাগ ব্যর্থ গেল না। শিক্ষিত ফরাসী মাত্রেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যেন একটি মানুষের প্রতি সুবিচার অবিচারের উপর একটি জাতির সুনাম দুর্নাম নির্ভর করছে। বারো বছর ধরে অবিরাম আন্দোলন চলে। দ্রেফুকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়।

দ্রেফু যদি ইহুদী না হয়ে ক্যাথলিক হয়ে থাকতেন তা হলে ব্যাপার এত দূর গড়াত না। বিপ্লবের দেশ ফ্রান্স, সেখানেও মানুষের ধর্ম সম্প্রদায় বিচার করে মামলার বিচার হয়। এই বারো বছরে ফ্রান্স তার আত্মাকে আবিষ্কার

করল। ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করল। সেক্যুলার স্টেট এই অগ্নিপরীক্ষায় সীতার মতো উত্তীর্ণ হলো। পশ্চিম ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ এ দিক দিয়ে জয়ী হয়েছে। রুশ বিপ্লবের পর রুশ পরিচালিত সোভিয়েট ইউনিয়নেও। আমেরিকার তো কথাই নেই। ফরাসী বিপ্লবের আগে আমেরিকার স্বাধীনতা, গোড়া থেকেই সেখানে সেক্যুলার স্টেট। নিছক ধর্মবিশ্বাসের দরুন সেখানকার কোনো প্রজা রাষ্ট্রের দরবারে ছোট বা বড় নয়, ধর্মাধিকরণে তো নয়ই। কে ক্যাথলিক, কে প্রোটেস্টাণ্ট, কে ইহুদী এসব বাছবিচার ঘরে চলতে পারে, বাইরে চলে না। বর্ণ-বিদ্বেষ অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা অপ্রাসঙ্গিক।

২

এবার ভারতবর্ষের ইতিহাস। পশ্চিম ইউরোপে যেমন এককালে একটিমাত্র ধর্ম ছিল, একজনমাত্র ধর্মগুরু ছিলেন, একটিমাত্র ধর্মসংঘ ছিল এ দেশে তেমন নয়। কোনো কালেই নয়। সাধারণত যাকে হিন্দুধর্ম বলা হয়ে থাকে তা একাধিক ধর্মের সমবায় বা সমন্বয় সেই আদি যুগ থেকে। হিন্দু পোপ বা হিন্দু চার্চ কোনো দিন কেউ কল্পনাও করেনি, তবে হিণ্ডুডম বলে একটা ধার করা বুলি কিছুদিন আগে শোনা যাচ্ছিল বটে।

ইসলামেও পোপের অনুরূপ বা চার্চের অনুরূপ নেই, তবে খলিফা বলে একজন ছিলেন, কিন্তু ভারতের সুলতান ও বাদশাহদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত কম ছিল যে সংঘর্ষের উপলক্ষ কোনো দিন ঘটেনি।

পোপ বা চার্চ না থাকলেও আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শ্রমণ উলেমা ছিলেন। এঁদের প্রভাব কেবল আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক ব্যাপারে নিবদ্ধ ছিল না, জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে প্রসারিত ছিল। এমন কোনো হিন্দু রাজার নাম জানিনে যিনি ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অস্বীকার করেছিলেন, এমন কোনো বৌদ্ধ নরপতির নাম জানা নেই যিনি শ্রমণপ্রাধান্য উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন, আকবরই বোধহয় একমাত্র মুসলমান সম্রাট যিনি উলেমাপ্রাধান্য কাটিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই একটা নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে পোপ হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। এর নাম সেক্যুলার স্টেট নয়।

অপরপক্ষে আমাদের রাজারাজড়াদের সংযত করাও আমাদের ব্রাহ্মণ শ্রমণ উলেমাদের সাধ্যের অতীত ছিল। তাঁরা যা খুশি করতে পারতেন, যাকে খুশি হত্যা করতে পারতেন, যতটা খুশি বিয়ে করতে পারতেন। তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতা ছিল অবাধ অপ্রতিহত। পোপ বা চার্চ থাকতে পশ্চিম ইউরোপে এই পরিমাণ স্বেচ্ছাচারিতা সহজ ছিল না। এ দেশের প্রজাশক্তিও রাজশক্তিকে নিয়মন করতে জানত না। ভারতের প্রজাশক্তি এই সম্প্রতি রাজশক্তির সঙ্গে লড়াই করে জিতেছে।

বস্তুত সেক্যুলার স্টেট-এর আদর্শ রাজতন্ত্রী আদর্শ নয়, ধর্মতন্ত্রী আদর্শ তো নয়ই। এটা ধর্মতন্ত্র ও রাজতন্ত্র উভয়ের পতনের উপর বা নিয়মনের

উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিলে তবেই সেক্যুলার স্টেট-এর প্রশ্ন উঠে। তর্কের খাতিরে উলেমাদের ব্রাহ্মণ ও সুলতানদের ক্ষত্রিয় বলে ধরে নিচ্ছি। ব্রিটিশ আমলের আগে আমাদের দেশে সেক্যুলার স্টেট-এর নামগন্ধ ছিল না। ইংরেজের নিজের দেশে প্রজাশক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার সেক্যুলার মনোভাব আসে, ইংরেজ এ দেশে তার পত্তন করে। লাটসাহেবদের সঙ্গে একদল যাজক এসেছিলেন বটে, কিন্তু শাসনের ব্যাপারে তাঁদের সংস্রব ছিল না। তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে আইন তৈরি বা আইন রদবদল হতো না। তাঁদের মুখ চেয়ে আদালতের বিচারকার্য হতো না। তাঁদের কথায় কেউ ফাঁসি যায়ও নি, কারো ফাঁসি বন্ধও হয় নি। তাঁদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বা একমাত্র ধর্ম এমন কোনো নীতি তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের দিয়ে চালু করাতে পারেন নি। সব ধর্মের সমান অধিকার এটা ব্রিটিশ শাসনেরই বিশেষত্ব। তার আগে দু'একজন হিন্দু রাজা বা মুসলমান সুলতান ব্যক্তিগতভাবে এ নীতি অনুসরণ করলেও রাষ্ট্রের দ্বারা এ নীতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবার সংবাদ আমি রাখিনে। একই অপরাধের জন্যে শূদ্র ফাঁসি যাচ্ছে বামুন ছাড়া পাচ্ছে বা অল্প সাজা পাচ্ছে এইটেই ছিল নিয়ম। উলেমা বা ফকির হলে তার সাতখুন মাফ। হাঁ, ইংরেজই সর্বপ্রথম এ নিয়ম উল্টে দেয়।

সেক্যুলার স্টেট-এর বনিয়াদ তা হলে দুটি। এক, প্রজাশক্তির অভ্যুদয়। দুই, সব প্রজার সমান অধিকার। প্রজাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি এনে তাদের দুর্বল করা চলবে না। দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে সাম্রাজ্য বাঁচানোর জন্যে ইংরেজ এই ভেদনীতির আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু আইনে আদালতে নয়। সেদিক থেকে ব্রিটিশ শাসন বরাবর সেক্যুলার ছিল।

ব্রিটিশ শাসন যখন শেষ হবার মুখে তখন একদল লোক হাঁক ছেড়ে বলল, আমরা চাই পাকিস্তান, তার মানে ইসলামী রাষ্ট্র। তা শুনে আরেক দল লোক তাল ঠুকে বলল, আমরা চাই হিন্দুস্থান, তার মানে হিন্দু রাষ্ট্র। কোথায় গেল গান্ধীজীর রামরাজ্য। রামরাজ্য যে হিন্দু রাষ্ট্র নয়, ইংরেজী 'কিংডম অফ গড'-এর ভাষান্তর, কে এ কথা বোঝে, কেই বা বোঝায়! বিদেশী শব্দের স্বদেশী প্রতিশব্দ যে কেমন বিপজ্জনক গান্ধীজীর রামরাজ্যই তার সেরা দৃষ্টান্ত। টলস্টয়ের বই থেকে গান্ধীজী ওটি নিয়েছিলেন। তুলসীদাসের পুঁথি থেকে নয়। কিন্তু যারা টলস্টয় পড়েনি, তুলসীদাস পড়েছে, তারা রামরাজ্য বলতে বুঝবে অযোধ্যার বর্ণাশ্রমী রাজ্য রামচন্দ্রের রাজত্ব। কোথায় কিংডম অফ গড আর কোথায় রামচন্দ্রের রাষ্ট্র!

রামরাজ্যের স্বপ্ন গান্ধীজীর মন থেকে মিলিয়ে গেল হিন্দু মুসলমানের খুনোখুনি দেখে। ভালোই হলো। কিংডম অফ গড প্রতিষ্ঠা করার সাধ মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম নয়। খ্রীষ্টধর্মের আদিপর্বের তাৎপর্য তো কিংডম অফ গড প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। কিংডম অফ গড থেকে এক ধাপ নেমে খ্রীষ্টেনডম, তার থেকে এক ধাপ নেমে পোপ সাম্রাজ্য ও মানুষের জ্ঞান-

বুদ্ধিচিন্তাবাক্য সব স্বাধীনতার দ্বারে অর্গল। হাজার বছর কেউ টুঁ শব্দটি করেনি, পাছে কিংডম অফ গড প্রজাপতির মতো উড়ে পালিয়ে যায়। তার পরে প্রতিবাদের ভাব জাগে। হঠাৎ একদিনে নয়। ধীরে ধীরে পাঁচশো বছর সময় নিয়ে। পাঁচশো বছর ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে অবশেষে জ্বলে ওঠে আগুন। এই অকরুণ অভিজ্ঞতার পর পশ্চিম ইউরোপের লোক আর কিংডম অফ গড-এর স্বপ্ন দেখে না। গত কয়েক বছরে হিন্দু মুসলমানের পিশাচ মূর্তি দেখে আমাদেরও সে স্বপ্ন ভেঙেছে। ভাঙা স্বপ্ন জোড়া লাগে না। তার বদলে পাওয়া গেল সেকুলার স্টেট-এর আদর্শ।

সেক্যুলার স্টেট-এর সূত্রপাত ব্রিটিশ আমলেই হয়েছিল। তবে আমাদের মনের উপর নয়। আমরা ওর মর্ম বুঝিনি, ওকে আপন করে নিইনি। এখন ইতিহাস আমাদের দু'খানা হাত কেটে নিয়ে আমাদের সমঝিয়ে দিয়েছে সেক্যুলার স্টেট কেন মূল্যবান। সবাই সমঝেছে তা নয়। তবু যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে সেটুকুর জন্যে কৃতজ্ঞ হতে হয়। পাকিস্তানেও এর ঢেউ পৌঁছেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনটা পশ্চিম ইউরোপের ল্যাটিনবিরোধী আন্দোলন ছাড়া আর কী? ঐভাবেই রেফর্মেশন সুরু হয়। শেষ যখন হবে তখন দেখা যাবে ইসলামী রাষ্ট্রের দালান ধ্বসে পড়েছে। ভগ্নস্তূপের নীচে থেকে উঁকি মারছে সেক্যুলার স্টেট-এর বটবৃক্ষ। তুর্কী যে পথে গেছে পাকিস্তানও যাবে সেই পথে।

তা হলে সেক্যুলার স্টেট-এর বাংলা কী? বস্তুটা কী আমি যতদূর বুঝি বোঝাতে চেষ্টা করলুম। নামটা কী হবে তা আপনারাই স্থির করুন। নামকরণের ভার আমার উপর নয়। যাঁদের উপরে তাঁরা যেন অভিধান মন্থন না করে ইতিহাস তল্লাস করেন।

(১৯৫২)

ভুল চিন্তার মাশুল

সম্প্রতি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বার বার দু'বার বললেন, "ভারতীয়, তার মানে হিন্দু", "হিন্দু, তার মানে ভারতীয়।"

হিন্দু কথাটির ব্যবহার তিনি প্রচলিত অর্থে করেছিলেন। মুসলমান খ্রীষ্টানকে বাদ দিয়ে। সুতরাং "হিন্দু, তার মানে ভারতীয়", "ভারতীয়, তার মানে হিন্দু" বার বার দু'বার এই উক্তি শুনে আমার মনে ধাঁধা লাগল। আমি ছিলুম সভাপতির আসনে। সভাপতিকে কিছু বলতে হয় বলে আমাকে কিছু বলতে হলো। আমি বললুম, "যে ভারতীয় সে হিন্দু, কোনো কোনো স্থলে এ ব্যবহার শুদ্ধ। কিন্তু সব সময় তা নয়। পার্থক্য আছে।"

অধ্যাপক অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। প্রশ্ন করলেন, "প্রাচীন ভারতেও ?"

আমি উত্তর দিলুম, "হাঁ, প্রাচীন ভারতেও। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে আর্যরা যখন ভারতে আসেন তার আগেই বেদ, অন্তত বেদের কতক অংশ, রচনা করা হয়ে গেছল। বেদ হিন্দুশাস্ত্র, কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থ কিনা সে বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে।"

তারপর আমাকে বাধ্য হয়ে এ কথাও বলতে হলো, "চিন্তায় যদি কোনো ভুল থাকে তার ফলে কর্মেও ভুল ঘটে। দেশবিভাগের মূলে রয়েছে এই ধরনের অশুদ্ধ চিন্তা। যারা হিন্দু তারাই যদি হয় ভারতীয়, তবে যারা হিন্দু নয় তারা অভারতীয়। তারা যদি অভারতীয় হয়ে থাকে তবে তারা ভারত রাষ্ট্রের বাইরে আলাদা একটা রাষ্ট্র দাবী করবেই, পাবেও। করেছে এবং পেরেছে। কী ভয়ানক মাশুল দিতে হয়েছে এর জন্যে !"

এ কথাও আমাকে বলতে হলো, "কিছুকাল থেকে লক্ষ করে আসছি ভারত ইতিহাসের কোন তারিখে ভারত পরাধীন হলো এ নিয়ে দুই দলের দুই মত। এক দল বলেন, সিরাজউদ্দৌল্লার পর থেকে পরাধীনতার আরম্ভ। আরেক দল বলেন, পৃথ্বীরাজের পর থেকে পরাধীনতা শুরু। গোটা মুসলিম আমলটাই পরাধীনতার যুগ। এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমাদের ষাট বছরব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল ইংরেজের হাত থেকে নয়, মুসলমানের হাত থেকেও মুক্তি পেতে। তা হলে মুসলমানকে ডাকি কেন সংগ্রামে যোগ দিতে, ডাকলেও কেনই বা সে যোগ দেবে ? যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের বলেছি পলাশী থেকেই পরাধীনতার সূত্রপাত। অথচ নিজেরা বলাবলি করে আসছি পৃথ্বীরাজের সময় থেকে পতনের সূচনা। শুনলে তাঁদের মনে কষ্ট হবে না ?"

এরপরে আরো বিশদ করতে হলো। হিন্দু নামক একটি সমাজ বা সম্প্রদায় ও ভারত নামক একটি দেশ বা নেশন এক জিনিস নয়। পলাশীর পূর্বে ভারত এক দিনের জন্যেও পরাধীন হয়নি। অন্য কোনো বিদেশী রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হরণ করেনি। পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্র তাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলেই গণ্য করে এসেছে। এর ব্যত্যয় ঘটে ইংরেজ আমলে। সুতরাং ভারতের পরাধীনতা আটশো বছরের নয়, দু'শো বছরের। ইতিমধ্যে যারা ভারতে রাজত্ব করেছে তারা অহিন্দু হতে পারে, কিন্তু অভারতীয় নয়। হিন্দুর হয়তো খুব দুর্দিন গেছে, কিন্তু ভারতের কী ক্ষতি হয়েছে ? তার ধনসম্পদ বিদেশে চলে যায়নি। সে দরিদ্র হয়নি। বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। বহু সাধু-সন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। পৃথিবীর লোক ভারতকে শ্রদ্ধা করে এসেছে। পলাশীর যুদ্ধেই ভারতের প্রথম পরাজয়। তার পূর্বের যে পরাজয় তা ভারতের নয়।

সভাভঙ্গের পরে ঐতিহাসিক আমাকে আড়ালে বললেন, "হাঁ, এইখানেই আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ। দিল্লীর সিংহাসনে একটিও হিন্দুকে বসতে দেওয়া হয়নি। একটিও নাম করবার মতো মন্দির তৈরি হয়নি। শত শত বছর ধরে এই চলে এসেছে।"

কয়েক সপ্তাহ পরে আর একজন অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে এই নিয়ে আমার আলোচনা হয়। তিনি বলেন, "ভারতের ইতিহাসে ১৭৩৯ সাল একটি স্মরণীয় তারিখ। যেমন স্মরণীয় ১৯৪৭ সাল। সেবার আলাদা হয়ে গেল আফগানিস্তান। এবার আলাদা হয়ে যায় পাকিস্তান। দু'শো বছর আগে সকলেই জানত আফগানিস্তানও ভারতের অঙ্গ। ভারতের এক অঙ্গের লোক যদি সারা দেশটাই অধিকার করে তা হলে কি সেটা বিদেশী কর্তৃক ভারত জয় বলে গণ্য হবে? অথচ এই ভুল ধারণাটা জাগিয়ে দিয়ে গেছে ইংরেজ ঐতিহাসিকের দল। আমাদের নিজেদের ঐতিহাসিকরাও সেই ভুল ধারণাটা জাগিয়ে রেখেছেন। পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈদেশিক আক্রমণ সূচনা করে না। গজনীর মাহমুদও বিদেশী আক্রমণকারী ছিলেন না। তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন। হিন্দুরাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়েছে।"

যেটা ইণ্টারপ্রোভিন্সিয়াল সেটাকে ইণ্টারন্যাশনাল বলে ভুল করা হচ্ছে দেখে আমার বন্ধু আক্ষেপ করলেন। এক প্রদেশের সঙ্গে আরেক প্রদেশের যুদ্ধ, এক প্রদেশ কর্তৃক সারা দেশ অধিকার, এসব আমাদের ইতিহাসে অসংখ্যবার ঘটেছে। কেউ কোনো দিন একে গুরুত্ব দেয়নি। নতুনের মধ্যে হয়েছে এই, কাবুলের সিংহাসনে হিন্দুর জায়গায় মুসলমান বসেছে। সেও বিদেশী মুসলমান নয়। তারপর সে রাজ্য বিস্তার করতে করতে দিল্লীর সিংহাসন নিয়েছে। কাবুল প্রদেশের লোক আগে হিন্দু ছিল। ধর্মান্তর গ্রহণ করে তারা অহিন্দু হয়েছে বলে কি অভারতীয় হয়েছে বলতে হবে? না, ১৭৩৯ সালের আগে ও-কথা বলা চলে না। তা হলে দাঁড়ায় এই যে, ভারতের রাজধানী ভারতের একাংশের লোক অধিকার করেছে। তাদের ধর্ম ভিন্ন বলে দেশ ভিন্ন নয়, অন্তত তখনকার দিনে তো ছিল না। তারা যদি বৌদ্ধ হয়ে থাকত তা হলে কি তাদের দিল্লীজয়কে কেউ ভারতের স্বাধীনতাহরণ বলত?

নাগা পাহাড়ের লোক কিছুদিন থেকে আলাদা একটা রাষ্ট্র দাবী করছে। একদিন হয়তো শুনতে পাবেন তারা কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষা নিয়ে নবীন বলে বলীয়ান হয়ে গোটা আসামটাই দখল করে ফেলেছে। তারপর হয়তো শুনবেন কলকাতার কমরেডরা তাদের ডেকে এনেছেন রাইটার্স বিল্ডিং থেকে কংগ্রেস কর্তাদের সরাতে। দমদমের যুদ্ধে তারা লেফটেনেণ্ট কর্নেল ঘোষ মৌলিককে পরাস্ত করে লালবাজার থেকে ঘোষ চৌধুরীকে হটিয়ে, চৌরঙ্গীর কংগ্রেস অফিস দখল করে অতুল্য ঘোষকে মার্ক্সীয় কলমা পড়িয়ে মনুমেণ্টের চূড়ায় লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। তখন কি সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা কেউ বলবেন, দেশ আবার পরাধীন হলো দেখছি!

না, দেশবাসীর কাছে দেশবাসীর বশ্যতাকে কেউ পরাধীনতা বলে না। পরাধীনতা হচ্ছে এক দেশের কাছে আরেক দেশের বশ্যতা বা এক নেশনের কাছে আরেক নেশনের বশ্যতা। যেমন ইংলণ্ড বা ইংরেজের কাছে। মুসলমান আমলে কোন দেশের অধীন হয়েছিল ভারত? কোন নেশনের অধীন? বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় যারা চাকার উপরে বসেছিল আজ তারা চাকার

নীচে। লাল রাশিয়ানদের থেকে ভিন্ন গোষ্ঠীর বলে সাদা রাশিয়ান নামে তাদের পরিচয়। তাদের হাতে ক্ষমতা নেই বলে কি তারা পরাধীন? দেশ যদি স্বাধীন দেশ বলে গণ্য হয় তা হলে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকই স্বাধীন, হলোই বা সে নিপীড়িত নিগ্রো বা উৎপীড়িত ইহুদী। হিন্দুদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল বলে ভারত হয়ে গেল পরাধীন এটা ইতিহাসের অপব্যাখ্যা। ভারত যেমন স্বাধীন ছিল তেমনি স্বাধীন রয়ে গেল পৃথ্বীরাজের পরাভবের পরেও। পলাশী পর্যন্ত। পলাশীর পরেও আইনের চোখে সে স্বাধীন থাকে দীর্ঘকাল। আইন অনুসারে পরাধীন হয় সিপাহী বিদ্রোহের পরে বাদশাকে যখন দিল্লী থেকে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সিংহাসনচ্যুত করা হয়। মহারানী যখন রাজ্যভার নেন। সেই দিনটির আগে আমরা কেউ কোনো দিন পরাধীন হইনি, কারণ আমাদের দেশ পরাধীন হয়নি। হবার মধ্যে হয়েছে বার বার শাসক পরিবর্তন, বিভিন্ন তাদের ধর্ম। কিন্তু কেউ তাঁরা বিদেশী ছিলেন না। এমন কি বাবরকেও বিদেশী বলা চলে না, যদি কাবুলকে ভারতের প্রদেশ বলে মনে রাখি। তিনি ভারতের বাইরে থেকে ভারত শাসন করেন নি। মহারানীর মতো। বহির্ভারতের কাছে ভারতের স্বার্থ বলি দেননি ব্রিটিশ শাসকের মতো। আর যদি বিদেশী হয়েই থাকেন তাঁরা তবে তা ক'দিনের জন্যে! এক পুরুষ যেতে না যেতে বিয়ে-থা করে এদেশী বনে যান। ইংলণ্ডেও এরকম কতবার হয়েছে।

ধর্ম আমাদের ইতিহাসবোধে যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে ব্রিটিশ আমলের পরাধীনতা তাকে জটিলতর করেছে। এখন স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরেও আমরা চিন্তার প্যাঁচ থেকে মুক্ত হতে শিখিনি। ভুল চিন্তা থেকে আসে ভুল কাজ। ভুল কাজ থেকে নানা বিপর্যয়। মাশুল দিতে হয় লক্ষ লক্ষ অভাগাকে। গত পাঁচ দশ বছরে যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে তার দায়িত্ব কেবল রাজনীতিকদের নয়, বুদ্ধিজীবীদেরও। ভুল করি আমরা, মাশুল দেয় ওরা।

(১৯৫২)

আমাদের ইতিহাস

আমাদের ইতিহাস নতুন করে লেখার সময় এসেছে। কেন, বলছি।

ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছি আমাদের ইতিহাসের তিনটি যুগ। প্রথমে প্রাচীন ও হিন্দু যুগ। মাঝখানে মোসলেম যুগ। পরিশেষে ব্রিটিশ যুগ। ছেলেবেলা থেকে এই যে সাম্প্রদায়িক ও বিজাতীয় ধারণা আমাদের মনে বদ্ধ-মূল হয়েছে এ যদি সত্য হতো তা হলে না হয় কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারা যেত, "ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।"

কিন্তু এ কি সত্য?

হিন্দু নামে একটি জাতি ছিল, সে জাতি আর নেই, এরকম যদি হতো তা হলে হিন্দু যুগ নামে একটা ঐতিহাসিক যুগের তাৎপর্য থাকত। কিন্তু তা তো নয়। হিন্দু তখনো ছিল, এখনো আছে, মাঝখানে পালিয়ে যায়নি। হিন্দুর সংখ্যা তখনকার চেয়ে বরং বেড়েছে। হিন্দুর অনুপাতও কমেনি, কারণ এখন যেমন মুসলমান আছে তখন তেমনি বৌদ্ধ ছিল শতকরা বিশ পঁচিশ জন। তা হলে হিন্দু যুগ বলার অর্থ কী? বোধ হয় অর্থ এই যে, তখনকার দিনে হিন্দুর হাতে ক্ষমতা ছিল, তার পরে মুসলমানের হাতে চলে যায়। এটাও একটা অর্ধসত্য বা অপসত্য। রাজাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, প্রজাদের হাতে নয়। সুলতানদের হাতে ক্ষমতা গেল, ভিস্তি, দরজী, বাবুর্চি-খানসামার হাতে নয়। এই যে হাত বদল, এটা রাজাতে রাজাতে, প্রজাতে প্রজাতে নয়। "রাজারা হিন্দু ছিলেন", এর মানে কি এই যে, "হিন্দুরা রাজা ছিলেন?" কিম্বা "সুলতানরা মুসলমান ছিলেন", এর মানে কি এই যে, "মুসলমানরা সুলতান ছিলেন?" তা নয়। অথচ এরকম একটা ন্যায়শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সংস্কার মানুষের মনে রাজত্ব করছে। এবং এর জন্যে দায়ী ইতিহাসের পুঁথি। "ক্ষমতা ছিল যাদের হাতে তারা হিন্দু, অতএব যুগটা হিন্দু", অথবা "ক্ষমতা গেল যাদের হাতে তারা মোসলেম, অতএব যুগটা মোসলেম", এ ধরণের যুক্তি তাদের মুখেই শোভা পায় যারা সাধারণ লোককে মনে করে লেজুড় আর রাজারাজড়াকে আসল শরীর। প্রজাতন্ত্রী ভারত এই রাজতন্ত্রী মনোভাব সহ্য করবে না। যদি করে তা হলে বুঝতে হবে প্রজাতন্ত্রের ভিত পাকা নয়। ইতিমধ্যেই এর দ্বারা যতদূর সম্ভব অনিষ্ট হয়েছে। স্বরাজকে হিন্দুরাজ বলে ভুল করে তার পাল্টা মোসলেম রাজ দাবী করা হয়েছে, দাবী হাসিল হয়েছেও। সাধারণ মুসলমান ঠাওরেছে সাধারণ হিন্দু তার প্রজা, সাধারণ হিন্দুও ঠাওরেছে সাধারণ মুসলমান তার প্রজা। এর জন্যে কি ঐতিহাসিকেরও দায়িত্ব নেই?

তারপর মুসলমানদের জন্যে আলাদা একটা যুগ নির্দেশ করা কেন? তারা কি একটা বিদেশী জাতি, বাইরে থেকে এসে ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছিল? তারা কি ভারতের সবটা দখল করতে পেরেছিল? আসলে তেমন কিছু ঘটেনি। এখন যাকে আফগানিস্থান বলা হয় তখনকার দিনে তার রাজা প্রজা সকলেই ছিল হিন্দু অথবা বৌদ্ধ। ওটা ভারতেরই একটা প্রদেশ ছিল, যেমন কাশ্মীর। সাধারণের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রসার হয়, ক্ষমতা চলে যায় নবধর্মে দীক্ষিত কয়েকটি সামন্ত পরিবারের হাতে। তারাই ক্রমে ক্রমে অন্যান্য প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করে। দিল্লীর সিংহাসন চলে যায় তাদের অধিকারে। দিল্লী যার ভারত তার, এরকম একটা সংস্কার আছে বটে। কিন্তু এর মূলে কতটুকু সত্য আছে? দিল্লীর সরকার হিন্দু যুগেও ভারত সরকার ছিল না, মুসলিম যুগেও সব সময় নয়, মাত্র কিছুদিন। কোনো দিন সারাভারত দিল্লীর শাসন মেনে নেয়নি, যারা মেনে নিয়েছে, তারাও অধিকাংশস্থলে প্রজা হিসাবে মেনে নেয়নি, নিয়েছে করদরাজা হিসাবে। ব্রিটিশ আমলে যেমন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এবং

ইণ্ডিয়ান স্টেট্‌স বলে দুটো আলাদা আলাদা ভাগ ছিল মুসলিম আমলেও তেমনি দুই স্বতন্ত্র অংশ। এক অংশ দিল্লীতে নজর পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। অপর অংশ দিল্লীর কর্মচারীদের দ্বারা শাসিত। মোটামুটি বলতে গেলে দক্ষিণ ভারত ছিল দিল্লীর নাগালের বাইরে, মধ্য ভারত দিল্লীকে নজর দিয়ে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল, উত্তর ভারত দিল্লীর শাসন স্বীকার করেছিল। মধ্যে মধ্যে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। কিন্তু ব্যতিক্রম তো অনেক সময় হিন্দুর পক্ষেও গেছে। বিজয়নগরের পক্ষে, মহারাষ্ট্রের পক্ষে।

ব্রিটিশ যুগ কথাটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সঞ্চার করে না, কিন্তু একটা স্বাধীন দেশের পক্ষে অপমানজনক। ব্রিটিশ যুগ আবার কী! আর পাঁচটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মতো ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এসেছিল বাণিজ্য করতে, দিল্লীর বাদশার সনদ পেয়ে রাজ্যশাসনও করেছিল। কোম্পানীর ক্ষমতা কি ব্রিটিশ জাতির ক্ষমতা? কোম্পানীর হাত থেকে রাণীর হাতে ক্ষমতা গেলে ব্রিটিশ জাতি হয়তো ক্ষমতার আধার হয়, কিন্তু সে আর ক'টা দিন! ইতিহাসের যুগ বিভাগে এক আধ শতাব্দীকে কেউ আমল দেয় না। সুতরাং ব্রিটিশ "আমল" যদিও সত্য, ব্রিটিশ "যুগ" একটু বাড়াবাড়ি। ইংরেজ যখন ছিল তখন ইতিহাস সেইভাবে লিখতে হতো, নইলে রাজভক্তির পরিচয় দেওয়া হতো না, কিন্তু আজ তার কোন প্রয়োজনও নেই, সার্থকতাও নেই।

তা হলে ইতিহাস কী ভাবে লেখা হবে? যুগ বিভাগ কি আদৌ থাকবে না? যদি থাকে তবে যুগ বিভাগের নীতি ও পদ্ধতি কীরূপ হবে?

আমি ঐতিহাসিক নই, ইতিহাসের ছাত্র। আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা হবে যদি এসব প্রশ্নের প্রামাণিক উত্তর দিতে উদ্যত হই। আমি যে উত্তর দিচ্ছি তা আমার নিবেদন মাত্র। কেউ যদি গ্রহণ করেন তবে সাম্প্রদায়িকতা ও বিজাতীয়তার মূলোচ্ছেদ হবে, আর আধুনিকতার গোড়া শক্ত হবে।

হাঁ, যুগ বিভাগ থাকবে। কিন্তু যুগ বিভাগের নীতি হবে ইউরোপের মতো কালানুসারী। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগ শেষ হয়ে যাবে গুপ্ত রাজবংশের সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠ শতাব্দীতে। আবার সেই রাজবংশের কথা উঠল। কিন্তু এক্ষেত্রে এটা মার্জনীয়। কেননা অজন্তার যুগ, কালিদাসের যুগ বললে সকলে বুঝবেন না। তারপর সপ্তম শতাব্দী থেকে মধ্য যুগ আরম্ভ। মধ্য যুগের সমাপ্তি আকবরের সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীতে। জাহাঙ্গীরের আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরা আসে। তাদের সঙ্গে আসে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্য, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, নতুন আইন-কানুন, নতুন শাসনব্যবস্থা, মুদ্রাযন্ত্র, বাষ্পীয় শক্তি। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে সূত্রপাত হলো আধুনিক জীবনযাত্রার, আধুনিক জীবনদর্শনের। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল, কিন্তু ধরুন যদি শাসনভার ইংরেজের হাতে না যেত, তা হলে কি জীবনযাত্রা নবাবী আমলের মতোই থেকে যেত? কখনো না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশ শাসনের ভার না নিলেও তার প্রভাব

পড়ত, তার মারফৎ ইউরোপের প্রভাব পড়ত, ইউরোপের মারফৎ আধুনিকতার প্রভাব পড়ত আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখায়। জাপানের মতো। শাহজাহান তো ইটালী থেকে স্থপতি আনিয়েছিলেন তাজমহলের জন্যে। আওরংজেবের রাজত্বে কলকাতা শহর পত্তন হয়। সারা সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে আধুনিক যুগের উপক্রমণিকা লেখা হয়। পলাশীর বহু পূর্বে।

ব্রিটিশ আমলের সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক ছিল বলে ব্রিটিশ অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতাও অপসরণ করেছে তা নয়। করবেও না। ভারত আধুনিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করেনি, ইংরেজ জাতির সঙ্গেও সংগ্রাম করেনি, করেছে ভারতের ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। ইউরোপের সঙ্গে আধুনিকতার সঙ্গে তার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছেও। যাঁহা পশ্চিম তাঁহা আধুনিক এরকম একটা সংস্কার কিছুদিন আগে ছিল বটে, এখন আর নেই। ওটা ভুল সংস্কার। পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকতে পারে, আধুনিকতার সঙ্গে নেই। আধুনিক যুগ শেষ হয়ে যায়নি, আরো অনেককাল চলবে।

(১৯৫২)

আমাদের লক্ষ্য

এই কয়েক মাস আমাকে দিনরাত ভাবতে হয়েছে। অক্ষরে অক্ষরে দিনরাত। দেশ বিভাগ কেন হলো, কী করে হলো, নিবারণের কোনো উপায় ছিল কিনা, বিকল্প কী ছিল, কতকাল এভাবে চলবে, ভাঙা দেশ জোড়া লাগবে কিনা, জোড়া না লাগলে ক্ষতি কী, লাগলেই বা লাভ কী, এমনি কত কথা। এর জন্যে আমাকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে গিয়ে ধাপে ধাপে এগোতে হয়েছে, খতিয়ে দেখতে হয়েছে কোন পদক্ষেপে ভুল ঘটল, তার কী বিকল্প ছিল। ভাবতে হয়েছে গান্ধীর দিক থেকে। লোকে যাঁর নাম জিন্না ব'লে জানে, আসলে যাঁর নাম ঝীণা, সেই ঝীণার দিক থেকেও। দেখছি ঝীণার দিক থেকেও বলবার আছে বিস্তর। ঝীণাকে আমি এককালে ষোলো আনা দোষ দিয়েছি, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক বিবেচনা করলে হিটলারকেও ষোলো আনা দোষী করা যায় না। ঝীণাকেই বা ষোলো আনা দোষের ভাগী করি কেমন করে? নিজের ও নিজের দলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ও ছাড়া আর কী করণীয় ছিল তাঁর? অস্তিত্ব রক্ষাই যদি মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য হয়।

চিন্তা করতে করতে এইখানে এসে পৌঁছেছি যে সারা দেশকে জোড়া দেওয়ার আগের কাজ যে কারণে দেশ ভেঙে গেল সেই কারণটাকে নির্মূল করা। তা যদি না করি তবে সেই একই কারণে দেশ ভেঙে যাবে বার বার। ইতিহাসে ঝীণারাও "সম্ভবামি যুগে যুগে"। দেশ যদি অবিভাজ্য হতো তাহলে এ দৃশ্য দেখতে হতো না যে, রাণাঘাট থেকে চুয়াডাঙ্গা যেতে আসতে

ছাড়পত্র লাগে, visa লাগে। এই যে আমরা বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান এক গালে চুন ও আরেক গালে কালি মেখে দুনিয়ার সামনে দু'কানকাটার মতো চলছি ফিরছি, দিল্লীর কাছে করাচীর কাছে কাঁদুনি গেয়ে বেড়াচ্ছি, বিহারের সিকিখানা পেলেও এর প্রতিকার হবে না।

মূল কারণ হচ্ছে ধর্ম অনুসারে মানুষকে খোপে পোরার অভ্যাস। গত বিশ ত্রিশ বছরের খবরের কাগজ ঘাটলে পদে পদে নজরে পড়বে, "হিন্দু মোটর চাপা পড়ে মারা গেছে", "মুসলমান চুরি করে ধরা পড়েছে"। অন্য কোনো দেশ হলে লিখত "মানুষ" বা "লোক"। কিন্তু আমরা মানুষের দিকে তাকালে দেখতে পাই তার টিকি অথবা দাড়ি। দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় কাপড় খুলে আরো কিছু দেখা হয়, যা সভ্য সমাজে দেখতে মানা। পাকিস্তান এক দিনে হয়নি, ছাড়পত্রও এক দিনে হচ্ছে না। এক দিনের আগে অনেক দিন গেছে, তখন কারো খেয়াল ছিল না যে এরকম হতে পারে। একটা লোক হিন্দু কি মুসলমান তা জেনে কার কী লাভ ? কেনই বা তুমি তা জানতে চাইবে, তোমার কাগজওয়ালা তোমাকে তা জানাবে কেন ? ইংলণ্ডের মতো দেশে কেউ কারো ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করে না, খোঁজ নেয় না। "আপনারা কি ক্যাথলিক না প্রোটেস্টাণ্ট" এ ধরনের জিজ্ঞাসা দস্তুরমতো অসভ্যতা। পথেঘাটে দোকানে বাজারে আপিসে আদালতে কেউ কাউকে ধর্মের পরিচয় দিতে বাধ্য করে না। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ব্যক্তির ধান ভানতে গিয়ে সম্প্রদায়ের শিবের গীত গাওয়া হয় না। আমাদের কিন্তু এটা দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বিশ্রী অভ্যাস ভুলতে হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হলে কার কী ধর্ম এ প্রশ্ন মুখে আনা চলবে না। মনে আনাও উচিত নয়। আমার বাড়ীতে রোজ সকালবেলা ডিম বেচতে ও মাঝে মাঝে চাল বেচতে যারা আসে তারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে। আমার সেকথা জানা জরুরি নয়। তবু আমার রান্নার লোকটি সেকথা আমাকে জানাবেই। "ঐ যে বুড়ো মুসলমান ও আজ এক টাকার ডিম দিয়ে গেছে।" "ঐ মুসলমান মেয়েটি আতপ চাল নিয়ে এসেছিল।" আরে বাপু, নাম কি ওদের নেই ? নাম বলো না কেন ?

এই যে ভেদবুদ্ধি এটা ইংরেজের সৃষ্টি নয়। এটা এসেছে জাতিভেদ থেকে। যারা চিরকাল বলে আসছে, "বাগদীবুড়ো এসেছিল" বা "তাঁতী-বৌ টাকা পাবে" তারাই নামের বদলে ধর্মের পরিচয় খোঁজে। এটা আমাদের বদ্ধমূল সংস্কার। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে কে বামুন কে বাগদী তা জানা হয়তো জরুরি, কিন্তু জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে তা জানতে ও জানাতে চাওয়া বেয়াদবি। গলায় একগাছা পৈতে ঝুলিয়ে ওটা জাহির করতে যাওয়া বর্বরতা। জজ্জ্বর মহাশয় আদালতে বসেছেন মামলা বিচার করতে, তাঁর জামার গলার বাইরে এক পৈতে। মানে, কিছুক্ষণ আগে তিনি কী একটা কাজ সেরে এসেছেন। তারপরে ভুলে গেছেন পৈতেটি শার্টের তলায় ঢাকা দিতে। বোধ হয় ইচ্ছে করেই ভুলেছেন। যাদের শার্ট নেই তাদের ক্ষমা করা যায়, কিন্তু যাদের শার্টও আছে, কোটও আছে, অথচ কোনো এক ফাঁক দিয়ে পৈতে উঁকি

মারছে তাদের একটু সমঝিয়ে দেওয়া ভালো যে, শার্ট কোটে তাদের অধিকার নেই, তারা ভদ্রলোক নয় !

যে দেশের লোক জীবনের প্রত্যেকটি কাজে কে কোন জাত কার কোন ধর্ম এই নিয়ে বাছবিচার করতে অভ্যস্ত তার শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, নইলে তার মাথায় এমনভাবে ঘোল ঢালা হতো না উল্টো গাধায় চড়িয়ে। ইতিহাস অকারণে মার দেয় না। মার যাদের পাওনা তারা এতকাল খায়নি বলে চিরকাল এড়াবে এর কোনো নজীর নেই। আরো খাবে, খেতে খেতে শিখবে। কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না, বাঁচাবে তাদেরই সৎকর্ম। ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে ইতিহাসের কাছে ছাড়া পাবে না। ওটা পণ্ডশ্রম। এমন কোনো হাতসাফাই নেই যা দিয়ে দুর্বলকে সবল করা যায়। দুর্বলের দুর্বলতা একভাবে না এক-ভাবে ফুটে বেরোবেই। দুর্বলতার গোড়া কোথায় তা কি বলে দিতে হবে ? ভেদবুদ্ধিই দুর্বলতার নিদান। একে নির্মূল করতে হবে, নইলে এই আমাদের নির্মূল করবে।

আবার ঝীণার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। নিজের ও নিজের দলের রাজ-নৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তিনি যা করেছিলেন তা ছাড়া আর কিছু করণীয় ছিল না তাঁর। থাকত, যদি তিনি অহিংসায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর কাছে সেটা প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং তাঁর দিক থেকে তিনি ঠিকই করেছিলেন বলতে হবে। কিন্তু তিনি ও তাঁর দল কি সারাদেশের সব মুসলমান ? সারা দেশের সব মুসলমানের সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্বরক্ষা কি ওভাবে হয় ? যতই দিন যাবে ততই মুসলমান সাধারণের মনে প্রশ্ন জাগবে, ঝীণা ও তাঁর দলের রাজ-নৈতিক অস্তিত্বরক্ষা কি সারাদেশের সব মুসলমানের সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্বরক্ষা ? নির্বিচারে নেতার নির্দেশ মেনে নেওয়া মুসলমানদের বদ্ধমূল সংস্কার। অন্ধ নিয়মানুবর্তিতার জন্যে তারা বিখ্যাত। কিন্তু ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে নেতা যদি ভুল নির্দেশ দেন তাহলে সেই ভুলের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় কোটি কোটি অনুবর্তীকে।

মুসলমানদের ধীরে ধীরে বোধোদয় হবে যে অখণ্ড মুসলমান সমাজ দ্বিখণ্ড হয়ে গেছে দেশবিভাগের ফলে। এখানকার মুসলমানকেও সেখানে যেতে হলে পাসপোর্ট নিতে হবে, ভিসা নিতে হবে। সব মুসলমানের যখন ঠাঁই নেই সেখানে তখন চার কোটি মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে ছয় কোটি মুসলমানের কাছ থেকে। ওরাও যে বিনা পাসপোর্টে বিনা ভিসায় আসতে পারবে তা নয়। দেশের মাঝখানে যে পাঁচিল উঠছে সেটা মুসলমান সমাজেরও মাঝখানে উঠছে। এখানকার মুসলমান ওখানকার মুসলমানকে বিয়ে করতে গেলেও পাসপোর্ট লাগবে। ওখান থেকে মেয়ে আসবে বাপের বাড়ী, তার জন্যে ভিসা লাগবে। সারাদেশের সব মুসলমানের সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্ব রক্ষার কথা কি ঝীণা ও তাঁর দলবল ভেবেছিলেন, না ভাবছেন ? এখনো যাদের ভুল ভাঙেনি তাদের ভুল ভাঙবে পাঁচ দশ বছর পরে। এই ছাড়পত্র প্রথাই মোহমুদ্গর।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সাধারণকে অভয় দেওয়াও চাই। অস্তিত্বরক্ষা মানুষমাত্রেরই কাম্য। হিন্দুপ্রধান অখণ্ড ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্বরক্ষা যতদিন ব্রিটিশ বেয়োনেটের উপর নির্ভর করত, ততদিন মুসলমানরা নিশ্চিন্ত ছিল। যেই দেখা গেল দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে, ব্রিটিশ বেয়োনেট থাকছে না, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে হিন্দু বেয়োনেটের খোশমেজাজের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয় তখনি তো পাকিস্তান একটা জীবনমরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। সেখানে মুসলিম বেয়োনেটের ছত্রচ্ছায়া। মজ্জাগত অবিশ্বাস ও ভয় যেখানে বর্তমান সেখানে অমন একটা সমাধানকেই মানুষ স্থায়ী সমাধান বলে ভুল করে। অবিশ্বাস ও ভয় ভেঙে গেলে তখন ভুল ভেঙে যায়। অবিশ্বাস ও ভয় ভেঙে দেবার দায়িত্ব কার? সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের। আকারে বৃহৎ ভারতের। হিন্দু শিখ বেয়োনেটের। যাদের হাড়ে হাড়ে ভেদবুদ্ধি তাদের প্রত্যেকের। এই দায়িত্ব আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করছি কিনা বুকে হাত রেখে বলার সময় আসছে। এ দায়িত্বে ফাঁকি দিলে ভাঙা দেশ আর জোড়া লাগবে না।

(১৯৫২)

অহিফেন

পথে যেতে যেতে ইরাণী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। দেখলুম তাঁর মুখে আজ অপূর্ব আভা। দেশ থেকে চিঠি এসেছে, তাঁর পিতার মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়, তিনি শহীদ হয়েছেন। মোল্লারা তাঁকে ছোরা দিয়ে হত্যা করেছে, যেহেতু তিনি বাহাই। গত একশো বছরের মধ্যে বিশ হাজার বাহাই শহীদ হয়েছেন। শহীদের রক্ত ব্যর্থ যায়নি। বাহাইরা এখন ইরাণের সবচেয়ে বড় মাইনরিটি। এক তেহরাণ শহরেই আটত্রিশ হাজার বাহাই আছেন। তাছাড়া দুনিয়ার সব দেশেই বাহাই ধর্মের প্রসার হয়েছে। জার্মানীতে আমেরিকায় কলকাতায় বাহাই কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

বাহাইরা প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করেন না। ক্ষমা করেন। বলেন, এ কাজ যারা করেছে তারা না বুঝে করেছে, তারা অজ্ঞ। তারা একদিন এর জন্যে লজ্জিত হবে।

"কিন্তু গবর্নমেণ্ট? রাষ্ট্র?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তাঁরাও কি আততায়ীকে ক্ষমা করবেন?"

"গবর্নমেণ্ট!" বন্ধু করুণ হেসে বললেন, "কিছুকাল আগে এক বাহাই ডাক্তার দীনদুঃখীদের সেবা করতে গিয়ে মোল্লার প্ররোচনায় নিহত হন। আততায়ীরা বুক ফুলিয়ে পুলিশের কাছে বলে এলো আমরাই মেরেছি। বিচারে তারা তো খালাস হলোই বরং যে দু'জন জুরর তাদের দোষী বলে

সাব্যস্ত করেছিলেন তাঁদের চাকরি গেল।"

"এই হলো ইরাণের হাল।" তিনি বললেন, "এ হাল কিন্তু রিজা শা'র আমলে ছিল না। মোল্লাদের তিনি কঠোরহস্তে দমন করেছিলেন। গত পাঁচ বছর যাবৎ প্রতিক্রিয়া চলছে।"

আমি চিন্তা করে বললুম, "এটা শুধু ইরাণে নয়, আমাদের এদেশেও। এমন কি ইউরোপেও। ক্যাথলিকরা এখন নতুন করে মাথা তুলছে। লিসবন থেকে বার্লিন পর্যন্ত ক্যাথলিক ধর্মের প্রাচীর তোলা হচ্ছে। কমিউনিজমকে রুখতে হলে ক্যাথলিক ধর্মের প্রাচীর চাই। তেমনি কায়রো থেকে করাচী পর্যন্ত উঠছে ইসলামের প্রাচীর। ঢাকা থেকে জাকার্তা পর্যন্ত। আমাদের হিন্দু ধর্মধ্বজরাও প্রাচীর তুলতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন, এক বছর আগেও সে কাজ পরম উৎসাহের সঙ্গে চলছিল। কিন্তু কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃত্ব থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার পর থেকে, বিশেষ করে গত নির্বাচনের পর থেকে, প্রাচীর তৈরী মুলতুবি আছে।"

বন্ধু এইবার প্রাণ খুলে বললেন, "অমন করে কমিউনিজমকে রুখতে যাওয়ার ফল কী হয়েছে ইরাণে? ইনটেলেকচুয়ালরা একধার থেকে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কমিউনিস্টরাই মোল্লাদের নিপাত করবে।"

এবার আমাকে বলতে হলো, "কিন্তু কমিউনিস্টরা কি কেবল মোল্লাদের নিপাত করবে? আপনাকে আমাকে করবে না? একটা মন্দকে দূর করতে আর একটা মন্দের সাহায্য নেওয়া উচিত নয়।"

শোকে তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত। আর তর্ক নয়। যথাসাধ্য সান্ত্বনা জানিয়ে বিদায় নিলুম। পিতার গৌরবে তিনি গৌরব বোধ করছেন। নয়তো সহ্য করতে পারতেন না এ আঘাত। ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিল ৩০শে জানুয়ারীর পর আমাদের। আমরা যারা বাপুকে হারাই। সেটা এক দল হিন্দু মোল্লার দুষ্কৃতি, যদিও একজন মাত্র হত্যাকারী।

ভারত বলো, পাকিস্তান বলো, ইরাণ বলো, ইজিপ্ট বলো অধিকাংশ প্রাচ্য দেশেই জনগণ ধর্মান্ধ। তাদের এই ধর্মান্ধতা যাতে শোষকদের কাজে লাগে তার জন্যে শোষকশ্রেণীর লোক চিরটাকাল চেষ্টা করেছে বলেই কমিউনিস্টরা ধর্মের প্রতি বিরূপ। যদিও দোষটা ধর্মের নয়, ধর্মান্ধতার। ধর্ম শোষকদের পক্ষে নয়, ধর্মান্ধতাই তাদের পক্ষে। কিন্তু স্বয়ং ধার্মিকরাও ধর্মান্ধতাকে ধর্মের স্থান দিয়ে থাকেন। সুতরাং কমিউনিস্টরাই বা না দেবে কেন? ধর্ম নয়, ধর্মান্ধতা যে জনগণের আফিম, এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নেই।

সেইজন্যে বর্তমান ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মের নাম দিয়ে দলগঠন ও রাজ্যশাসন কিছুদিন থেকে একটা ঘোর অমঙ্গল সূচনা করছে। কমিউনিজমকে এরা রুখতে পারবে, কি কমিউনিজম এদের খতম করবে তা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু জোর করে এইটুকু বলতে পারি, এরা যদি প্রবল হয় তবে গত চারশ' বছরের প্রোটেস্টাণ্ট সেক্যুলার লিবারল প্রোগ্রেসিভ ট্রাডিশন বিষম

একটা ধাক্কা খাবে। অতবড় ধাক্কা মার্কস লেনিনও দেননি। স্টালিনের কথা আলাদা।

জনগণকে অহিফেনমুক্ত করতে হবে। গান্ধীজী এটা চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বোধ হয় ভাবতে পারেন নি যে অহিফেন শব্দটার আরো একটা অর্থ আছে। এই অর্থটা আরো মারাত্মক। ধর্মান্ধতার অহিফেন গান্ধীহত্যার জন্যে দায়ী। কেবল গান্ধীহত্যার জন্যে নয়, সেই দিনই সেই সন্ধ্যাবেলাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মিষ্টান্ন বিতরণের জন্যে দায়ী। এমন একটা পূর্ব-নির্ধারিত শয়তানি ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় নি। কিন্তু জনগণ তখন আফিমের নেশায় বুঁদ। হিন্দু মারছে মুসলমানকে, মুসলমান মারছে হিন্দুকে, ধর্মের নামে চলছে আরো কত রকম অপরাধ। গান্ধীর জন্যে শোক করেই তাদের কর্তব্য সারা হয়ে গেল।

তার পর থেকে ভারতের অবস্থা কতকটা ইরাণের পথেই চলছিল, এই সম্প্রতি একটু মোড় ঘুরেছে। আফিম ছাড়ানোর ভারটা কমিউনিস্টদের জন্যে মুলতুবি না রেখে বা আফিম দিয়ে কমিউনিজম তাড়ানোর কথা না ভেবে আমরাই যেন অহিফেনমুক্ত হই ও জনগণকে করি।

(১৯৫২)

"শাশ্বত বঙ্গ"

জবাহরলাল তাঁর আত্মকাহিনী উৎসর্গ করেছেন এই বলে—'কমলাকে, যে আর নেই'। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের প্রবন্ধসংকলনে উৎসর্গপত্র নেই, কিন্তু গ্রন্থের নামটাই উৎসর্গপত্র। শাশ্বত বঙ্গকে, যে আর নেই, অথচ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যার বন্দনা-গান করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যাকে ভালোবেসেছিলেন, হাজার বছর ধরে যে ইতিহাসের ও ভূগোলের দৃষ্টিতে এক ছিল, এক ছিল হিন্দু-মুসলমানের চেতনায়, সে আর নেই, অথচ আছে জনকয়েক স্বপ্নদ্রষ্টার মানসে। তাঁরা হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, তাঁরা প্রেমিক, তাঁরা ধ্যানী। তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা ঘোষণা করে যাবেন, যদিও নিকট ভবিষ্যতে ভাঙা দেশ জোড়া লাগবে না। জোড়া লাগবে কি সুদূর ভবিষ্যতেও? আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় ভার্জিনিয়া প্রদেশ দু'ভাগ হয়ে যায়। গৃহযুদ্ধ কবে শেষ হয়েছে, নব্বই বছর পরেও দেখি পশ্চিম-ভার্জিনিয়া স্বতন্ত্র রয়ে গেছে। আশ্চর্য হব না, যদি পশ্চিম-বঙ্গের বেলা তাই হয়।

কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি কাজী সাহেবের 'গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে' পাঠ করে। এ প্রবন্ধ আগে আমার চোখে পড়ে নি। এর থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি ঃ—

"মুসলমান যদি সত্যই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে থাকে যে, যে কারণেই হোক হিন্দুর সঙ্গে তাঁর মিল কোনো দিন হয় নি কোনো দিন হবেও না, তবে তার

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই তাদের দুই পক্ষের জন্যই ভাল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন তাকে হতে হবে ন্যায়ানুমোদিত ও সার্থক পথে, অর্থাৎ দেশকে বিভক্ত করতে হবে এমনভাবে যাতে কোনো পক্ষেরই বেশী ক্ষতি না হয় আর দুই পক্ষেরই ভবিষ্যৎ যথাসম্ভব নিরাপদ হয়। বর্তমান যে ব্যবচ্ছেদ মুসলমান চাচ্ছে তা যেমন অসংগত তেমনি বিপদসংকুল, তার কারণ, যে হিন্দুকে মুসলমান বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না তারা প্রায় সমসংখ্যক রয়ে যাচ্ছে মুসলিম রাজ্যে। এর পরিবর্তে মুসলমানদের এমন বাসভূমির দাবি করা উচিত যেখানে অমুসলমান প্রায় কেউ থাকবে না, যারা থাকবে তারা থাকবে বিদেশী হিসাবেই। সেজন্য মুসলমানদের চলে যাওয়া উচিত ভারতবর্ষের এক প্রান্তে—ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তই এজন্য প্রশস্ত মনে হয়, যাঁরা পাকিস্তানের আদি উদ্ভাবয়িতা তাঁরাও এই ক্ষেত্রের কথাই ভেবেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যত মুসলমান নূতন বাসভূমির বাসিন্দা হতে চাইবে তাদের সবাইকে সে সুযোগ দিতে হবে। মুসলমানের এমন সংকল্প যদি হিন্দু ও জগৎ জানতে পারে তবে এর প্রতি তারা শ্রদ্ধান্বিত হবে মুসলমানের ঐকান্তিকতা ন্যায়বোধ ও ত্যাগস্বীকার দেখে। এর জন্য যদি মুসলমানকে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হয় তবে সেটিও জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। বলা বাহুল্য কেবল এমন একটা চরম ব্যবস্থার দ্বারাই হিন্দু আর মুসলমানের দীর্ঘকালের বিবাদের একটা সন্তোষজনক অবসান সম্ভবপর, অন্য ব্যবস্থায় বিচ্ছেদ পূর্ণাঙ্গ হবে না। তাই সামান্য কারণে বিবাদের সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়ে যাবে।"

এর পরে তিনি তাঁর সওয়াল পোর্সিয়ার মতো আরো পরিষ্কার করেছেন শাইলকের জন্যে ঃ—

"কিন্তু এমন চরম ব্যবস্থা কি ব্যাপকভাবে ভারতের মুসলমান কাম্য জ্ঞান করতে পারবে? মুসলিম নেতারা হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের যে ছবি দেশের সামনে জগতের সামনে ধরেছেন তা যদি সত্য হয় তবে মুসলমানদের পারা উচিত, কেননা অন্য কোনো প্রশস্ত পথ নেই। যদি সবাই না পারে তবে যারা পারে তারা গিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে স্বাধীন রাজ্য গড়ুক। কিন্তু যারা পারবে না তাদের এর পরে আর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কথা মুখে আনা চলবে না, কেননা হিন্দু ও মুসলমানের অতীত যাই-ই হোক, বোঝা গেল, মিলেমিশে না থেকে তাদের উপায় নেই। তাই এই মিলমিশের চর্চাই সম্মিলিত ভারতে করতে হবে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। হিন্দুর মুসলিম বিদ্বেষ আর মুসলমানের হিন্দু বিদ্বেষ সেখানে শুধু নিন্দনীয় নয়, দণ্ডনীয় বিবেচিত হবে। আর নতুন সম্মিলিত ভারত গঠিত হবে সাম্যবাদের ভিত্তির উপরে ঃ ধর্ম হবে ব্যক্তিগত ব্যাপার, ভারতবর্ষের নব-নাগরিকদের জাতি-ধর্মনির্বিশেষে বুঝতে হবে যে তাদের প্রাচীন ধর্মের একালের অর্থ ব্যাপক মনুষ্যত্ব-সাধন, তাই ধার্মিক হবার জন্যে তারা ফিরে যেতে চেষ্টা করবে না কোনো অতীত ব্যবস্থার দিকে, তাদের গতি হবে নব নব জ্ঞান ও কল্যাণ আহরণের অভিমুখে—সমস্ত জগৎকে সব মানুষের জন্য স্বর্গে পরিণত করার

কাজে ; অতীতের কোনো ধর্মব্যাখ্যা যদি এর পরিপন্থী হয় বুঝতে হবে তা ভুল ব্যাখ্যা।"

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে ওদুদ সাহেব পূর্ব-পাকিস্তান সমর্থন করেন নি। তিনি তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তিনি বলেছেন, "আমাদের নব-নেতাদের গভীর ভাবেই ভাবা উচিত বাংলার মুসলমানের সঙ্গে পাঞ্জাবের মুসলমানের অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটাতে গিয়ে দুয়েরই বিকাশ ব্যাহত করার মতো মহা-অনর্থ তাঁরা ঘটাবেন কিনা। এর উপর রয়েছে বাংলার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থিতি— বাংলার অতিগুরু নদনদী-সমস্যা যার দিকে মহাপ্রাণ আবুল হুসেন বিশ বছর পূর্বে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, বাংলার বৈজ্ঞানিকেরাও যার দিকে দেশের শাসক ও জনসাধারণ সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ত্রুটি করছেন না। এই একটি সমস্যাই হয়ত দেশের সর্বসাধারণকে দেখিয়ে দেবে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের মতো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে যারা এতটা সময় ব্যয় করতে পারে তারা কত বড় কৃপার পাত্র।"

হায়, এই কৃপার পাত্ররাই তুচ্ছ ব্যাপারকে উচ্চ ব্যাপারে পরিণত করে ওদুদ সাহেবের প্রবন্ধ রচনার কয়েক মাস পরে। এ প্রবন্ধ ১৯৪৬ সালের মে মাসে লিখিত। তারপরে কলকাতার দাঙ্গা, নোয়াখালির হাঙ্গামা, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ, গান্ধীহত্যা। ইংরেজ বিশ বছর আগে থেকে তার পলিসি স্থির করে রেখেছিল। হিন্দু-মুসলমানে বোঝাপড়া হলেই সে ভারতের শাসনভার ছেড়ে দেবে। বোঝাপড়া হবে এমনভাবে যাতে বাঁদরের হাতে পিঠে ভাগের নিষ্পত্তি থাকে। তাই শেষ পর্যন্ত হলো। ইংরেজ শাসনভার ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ব্যালান্স অব্ পাওয়ার নিজের হাতে রেখেছে। পাকিস্তান বলতে বোঝায় বাংলাদেশের বেশীর ভাগ। সেখানে বাঙালী বলে কেউ নেই। আছে পাকিস্তানী বলে নতুন একটা নেশন বা জাতি, ধর্মে মুসলমান। হিন্দু যারা আছে তারা সমান নাগরিক নয়, তারা জিম্মী। ভারতরাষ্ট্রে পশ্চিম-বঙ্গ নামে একটি রাজ্য আছে, সেখানকার অধিবাসীরা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গীয়। এখনো তারা অভ্যাসবশত বাঙালী বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু কিছুদিন পরে 'পশ্চিম' বিশেষণটা তাদের পরিচয়ের সঙ্গে জুড়ে যাবে। এক পুরুষ বা দু'পুরুষ বাদে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ঐতিহ্য পর্যন্ত আলাদা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বাংলার ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার আত্মবিশ্বাস সব কিছুরই ঘটেছে রক্তাল্পতা। শাইলক এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে গিয়ে বহু পরিমাণ রক্তস্রাব ঘটিয়েছে। কেবল কায়িক অর্থে নয়, মানসিক অর্থেই বেশী। পোর্সিয়ার সওয়াল কোনো কাজে লাগে নি।

তা হলে কি আমাদের কোনো আশা নেই ? আছে বৈকি। সেইজন্যেই তো এ গ্রন্থের নামকরণ "শাশ্বত বঙ্গ"। ইতিহাস-ভূগোলের বাংলাদেশ আর নেই, একজোড়া বিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য গড়ে উঠছে ; শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, বিরুদ্ধ। কিন্তু এহো বাহ্য। ভিতরে ভিতরে বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর একটা মিল আছেই, থাকবেই। সে মিল ধর্মগত নয়, মর্মগত। কাজী ইমদাদুল হক সাহেবের

বিখ্যাত উপন্যাস "আবদুল্লাহ্" সমালোচনা প্রসঙ্গে ওদুদ সাহেব লিখেছেন, "তবু আবদুল্লাহ্‌র মাতা, হালিমা ও রাবেয়ার অন্তরের যে মাধুর্যটুকুর সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচিত করিয়েছেন তা মনোরম। এই মুসলিম অন্তঃপুরিকাদের দিকে চাইলেই ভাল করে বোঝা যায়, বাংলার হিন্দু ও মুসলমান বাহ্যত যতই বিভিন্ন হোক বাস্তবিকপক্ষে তাদের বিভিন্নতা কত নগণ্য—নেই বল্লে হয়তো অত্যুক্তি হয় না।"

না, অত্যুক্তি হয় না। বাঙালীর মেয়ে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক তার স্বভাব ছাড়ে নি, ছাড়বেও না। গোলাপকে যে নামেই ডাক সে তেমনি মধুর। আমাদের মা-বোনের মুখের ভাষা কোনো দিন আরবী ফারসী হয় নি, সেই শাড়ীই পরে আসছে তারা বখ্‌তিয়ার বিন খিলিজির আমলের আগে থেকে। পাকিস্তানী ডিক্‌টেটরদের শস্ত্র ও শাস্ত্র এখানে ব্যর্থ। কোনো উপায়েই তারা আবদুল্লাহ্‌র মাতা, হালিমা ও রাবেয়াকে শরৎচন্দ্রের রমা বা বিন্দু বা পোড়াকাঠের থেকে আলাদা করতে পারবে না। তারা বাংলাদেশের হৃদয় পায় নি, পেয়েছে শরীরের একাংশ।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে। কাজী সাহেবের কাছে এঁরা সকলেই সমান আপন। নজরুলের চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আপন নন। কিন্তু কাজী সাহেবের পরম শ্রদ্ধার পাত্র রবীন্দ্রনাথ ও পরম প্রীতির পাত্র নজরুল। তাঁর সমসাময়িকদের অধিকাংশের মনোভাব তাঁর অনুরূপ। তবে তাঁর নিজের পথ ঠিক রবীন্দ্রনাথের বা নজরুলের পথ নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ওদুদ সাহেবের নিজস্ব একটা স্থান আছে ও থাকবে। একদা তিনি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। এই আন্দোলন গোঁড়া মুসলমানদের উষ্মার কারণ হয়েছিল। ষাঁড়ের সামনে লাল রুমালের মতো। তাঁর দুঃসাহসিকতার জন্যে তিনি বিপন্ন হয়েছিলেন বলে জানি। কিন্তু তাঁর ভিতরকার সত্যাগ্রহী বিপদের কাছে নত হয় নি। হজরত মোহম্মদ ও মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টান্ত তাঁকে নিঃশঙ্ক করেছে। কিন্তু তাঁর 'বুদ্ধির মুক্তি' সাধনায় যে দু'জন তাঁর গুরু বা মুর্শিদ তাঁদের নাম গ্যয়টে ও রামমোহন। এঁদের সঙ্গে তিনি অভিন্নহৃদয়। এক হিসাবে এঁদেরই কাজ তিনি করে যাচ্ছেন। 'সম্মোহিত মুসলমান' শীর্ষক তাঁর একটি পুরাতন রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃত করি ঃ—

"জীবনের অর্থই যেন আধুনিক মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার, আত্মা, আনন্দ, এ সমস্তের গভীরতার যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জগতের পানে সে তাকায় শুধু সন্দিগ্ধ আর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে—এর কোলে যেন সে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, একে যেন সে চেনে না। কেমন এক অস্বস্তিকর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সারাজীবন সে ভীত ত্রস্ত হয়ে চলেছে। মুসলমানের, বিশেষ করে আধুনিক মুসলমানের, এই অবস্থা লক্ষ্য করেই বলতে চাই—সে সম্মোহিত। সে শুধু পৌত্তলিক নয়; সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতারও চরম দশা বলা যেতে পারে—তার

মানবসুলভ সমস্ত বিচারবুদ্ধি, সমস্ত মানস উৎকর্ষ আশ্চর্যভাবে স্তম্ভিত। বর্তমান তার জন্য কুয়াসাচ্ছন্ন, দিগ্‌দেশবিহীন, অতীত ভবিষ্যৎ তার নেই। সময় সময় দেখা যায় বটে সে তার অতীতকালের বীরদের, রাজাদের, ত্যাগীদের, মনীষীদের কথা বলছে। কিন্তু এ শেখানো বুলি আওড়ানোর চাইতে এক তিলও বেশী কিছু নয়। জীবনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করবার দুর্নিবার প্রয়াসের মুখেই যে উচ্ছ্রিত হয় যুগে যুগে মানুষের বীরত্ব, ত্যাগ, শাস্ত্রজ্ঞান, মনীষা, তার প্রাচীন ইতিহাসে এর যোগ্য প্রমাণের অভাব নেই। হজরৎ ওমর ও ইব্‌নে জুবেরের মতো বীর-কর্মীদের, সাদী-ওমর-খাইয়ামের মতো মনীষীদের, গাজ্জালি-রুমির মতো সাধকদের জীবনের অন্তস্তলে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করলে এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনরহস্যের সেই গহনে উঁকি দেবে, এই সম্মোহিতের কাছ থেকে তা আশা করা কত দুরাশা! এ সমস্তই যে তার কাছে শুধু নাম—পঠন-অযোগ্য অক্ষরের মতো কালের পটে কতকগুলো আঁচড়। তার জন্য একমাত্র সত্য শাস্ত্রবচন। অথবা তাও ঠিক নয়, শাস্ত্রবচনের পিছনে যে সত্য-ও শ্রেয়ঃ-অন্বেষী মানব-চিত্তের স্পন্দনের অপূর্বতা রয়েছে শাস্ত্রবচনের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির সেই দ্বার তার জন্য যে রুদ্ধ। প্রকৃত সম্মোহিতের মতো তার জন্য একমাত্র সত্য প্রভুর হুকুম—স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী প্রভুর হুকুম। সেই প্রভুর হুকুমে কখনো কখনো ভবিষ্যতের অসংলগ্ন স্বপ্ন সে দেখে—কখনো 'প্যান ইসলাম' এর স্বপ্ন, কখনো এই তের শত বৎসরের সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত বর্তমান পরিবেষ্টন, যেন জাদুমন্ত্রে উড়িয়ে দিয়ে সেই তের শত বৎসরের আগেকার 'শরীয়ত'-এর হুবহু প্রবর্তনার স্বপ্ন।"

এই রচনাটির বিশ বছর পরে স্বপ্ন হয়ে উঠল বাস্তব। পাকিস্তান-রূপে।

সম্মোহিত মুসলমানকে দেশ ও কালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে শেখানোই ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই আন্দোলন কেবল মুসলমানকে নিয়ে ব্যাপৃত ছিল না। পাশের বাড়ীতে যে হিন্দু বাস করে তার সম্বন্ধে সজাগ ও সপ্রেম ছিল। কী করে তার সঙ্গে মিলন হবে এ বিষয়ে ভাবতে ভাবতে পঁচিশ বছর আগে ওদুদ সাহেব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, "হিন্দু ও মুসলমান মানুষকে এই দুই দলে ভাগ করে দেখা অসত্য—এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণভাবেই জাগ্রত হতে হবে। তা হলে সহজেই আমরা বুঝতে পারব, হিন্দু-মুসলমানের এই বিরোধের মূল শুধু এই দুই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের ভিতরেই প্রোথিত নয়। আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের মানুষ বহুকাল ধরে দুঃস্বপ্নে কাটিয়েছে—এমন দুঃস্বপ্ন দেখা মানুষের ইতিহাসে খুব নতুন নয়—নিজেদের শুধু হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখা সেই দুঃস্বপ্নেরই জের টেনে চলা। আমরা শুধু হিন্দু ও মুসলমান নই—আমরা মানুষ। সেই মানুষের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত সুখ, অনন্ত রূপ। সে আজ আমাদের সামনে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ রূপে এসেছে, মহাপ্রেমিক রূপে এসেছে, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান রূপে এসেছে। কিন্তু শুধু এই-ই তার চরম অভিব্যক্তি

নয়, ইতিহাসের ধারা এইখানে এসেই থেমে যায় নি। মানুষের নব নব দুঃখ, নব নব সুখ, নব নব রূপ, কালের পর্যায়ে পর্যায়ে আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। সে সমস্তের দিকে যদি আমরা না তাকাই, শুধু হিন্দু ও মুসলমান মানুষের এই কোনো একটা যুগের রূপকে তার চরম রূপ বলে মনে করি, তবে শুধু এই পরিচয়ই দেওয়া হবে যে, আমরা অন্ধ। আর অন্ধ চিরদিনই হাৎড়ে হাৎড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলে, অল্প সময়ের জন্যও বুক ফুলিয়ে রাজপথ দিয়ে চলবার অধিকার তার নেই।"

এ সম্বন্ধে তিনি আরো ভাবতে ভাবতে দশ বছর আগে যেখানে পৌঁছলেন তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'সংস্কৃতির কথা'য়। কিছু উদ্ধৃত করি ঃ—

"হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবন ভিন্ন আর কিছু যদি এদেশে সম্ভবপর না হয় তবে হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলমান-সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতি সেমীয়-সংস্কৃতি এসব কথা হয়ে পড়ে দায়িত্বহীন, এবং এসবের প্রচলন আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে যত কম হয় ততই মঙ্গল—ততই চিন্তার সৌখীনতা আমাদের ঘুচবে আর আমরা সত্যাশ্রয়ী হব। সার্থক সমাজ-সত্তার দিক দিয়ে বাংলার মুসলমান অথবা হিন্দু বাংলার অথবা বিশাল ভারতবর্ষের অংশ ভিন্ন যখন আর কিছু নয় তখন তার সাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা লাভের পথ এই বিশাল সত্তার সঙ্গে তার গূঢ় যোগ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই—ঝরনার সার্থকতা যেমন নদীর পুষ্টিসাধন করে—এ সত্য যত অকপট ভাবে স্বীকার করা যাবে ততই শক্তি ও শ্রী লাভের পথে আমরা অগ্রসর হব। আজকার অসার্থক সংস্কৃতি চিন্তার স্তর থেকে সার্থক সংস্কৃতি চিন্তার স্তরে উপনীত হতে হলে যেসব ধাপ আমাদের অতিক্রম করতে হবে তার কিছু নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে এইভাবে ঃ ১. দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না। ২. একান্ত বীভৎস না হলে কোনো সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে যে—যা প্রাচীন তা প্রাচীন বলেই বরণীয় নয়, বরণীয় তার বর্তমান কার্যকারিতার জন্যে। ৩. হিন্দু-মুসলমানের পোষাক ও নামের ব্যবধান থাকবে না অথবা অস্বীকার করা হবে। ৪. সামাজিক আদান-প্রদান—বিবাহ-আদি সমেত—সর্বত্র সহজ হবে। ৫. আইন সমস্ত দেশের জন্যে এক হবে।"

দশ বছর আগে ওদুদ সাহেব যে প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন তা যে কোনো একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর প্রত্যয়, যথা জবাহরলালের। একে বলা যেতে পারে সেক্যুলার মনোভাব। এই মনোভাবের প্রতিবাদ কেবল মুসলমান সমাজে নিবদ্ধ নয়, হিন্দু সমাজেও পরিব্যাপ্ত ছিল ও আছে। কাজী সাহেবের পাঁচটি প্রস্তাবের মধ্যে চারটি—শেষ চারটি কি হিন্দু জনমত নির্বিবাদে গ্রহণ করবে? ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়। জাতিগঠনও বটে। সে কাজের প্রায় সবটাই বাকী। ধর্মের গায়ে আঁচটি লাগবে না, সমাজের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, অথচ জাতিগঠন আপনা-আপনি হয়ে যাবে, এও একপ্রকার সম্মোহন। সম্মোহিত হিন্দুকে

এ কথা সমঝানো শক্ত। সে জাতিভেদও রাখবে, জাতিগঠনও করবে, যত রকম উল্টোপাল্টা উদ্‌ভট ব্যাপারের গোঁজামিলকে বলবে সমন্বয় বা যত পথ তত মত। শিবরাম চক্রবর্তী একবার লিখেছিলেন, আজকের জগৎ থেকে অতীতের বীজকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করতে হবে। বিশ বছর আগে এ কথা পড়ে আমি বিরক্ত হয়েছিলুম। কিন্তু এই বিশ বছরে আমার যে শিক্ষা হয়েছে তা প্রায় শিবরামের কাছাকাছি যায়। যা নিছক অতীত, যার মধ্যে চিরন্তনের বীজ নেই, তাকে প্রকৃতি তার নিজের হাতে ধ্বংস করে। মানুষ যদি তাকে আঁকড়ে ধরতে চায় তবে মানুষ নিজে বিনষ্ট হয়। হিন্দু বা মুসলমানের উপর ইতিহাসের পক্ষপাতিত্বের কারণ দেখিনে। ব্রিটিশশাসন এদেরকে একপ্রকার কৃত্রিম পরমায়ু দিয়েছিল। নইলে এতদিন এদের টিকে থাকার কথা নয়। হয় এরা বদলাবে, নয় এরা সরে যাবে। আজকের দুনিয়ায় এত লোকের খোরাক নেই যে যারা নতুন কিছু করবে না, দেবে না, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। কাজী সাহেবের প্রথম প্রস্তাব তাদেরই জন্যে যারা বাকী চারটি প্রস্তাবে রাজী। নারাজদের জন্যে প্রথম প্রস্তাবও নয়। প্রকৃতির কাছে আহার প্রত্যাশা করতে পারে কেবল সেই মানুষ যে প্রকৃতির অভিপ্রায় অনুসারে বিবর্তিত হতে প্রস্তুত। যে ধর্মের, যে সমাজের বিবর্তন নেই সে প্রবলের আশ্রয়ে থেকে দেড়শ' বছর যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়েছে, বিপ্লবের মুখে পড়ে নি। তা বলে চিরদিন এড়াবে, কোনো দিন পড়বে না, এ কি সম্ভব!

(১৯৫২)

সংস্কৃতির কথা

সংস্কৃতি শব্দটি বেশীদিনের নয়। ইংরেজী কালচার শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে এর সৃষ্টি। কালচার ও কালটিভেশন একই ধাতু হতে নিষ্পন্ন। সেইজন্যে মাটির সঙ্গে তার যোগ আছে। মাটি না হলে কালটিভেশন হয় না, সকলে এ কথা জানে। কিন্তু অনেকে এ কথা জানে না যে মাটি না হলে কালচার হয় না। সংস্কৃতি শব্দটির হাতে পায়ে মাটি লেগে না থাকায় অনেকের মনে হয়তো এরকম একটা ধারণা জন্মেছে যে সংস্কৃতি একটা আকাশকুসুম। প্রথমেই ভেঙে দিতে হবে এই ভ্রান্তি। ফুলমাত্রেই মাটির ফুল, মাটি বিনা ফল ফোটে না। সংস্কৃতিও একপ্রকার ফুল ফোটানো বা ফ্লাওয়ারিং। ওর জন্যে চাই দেশের মাটি, দেশের ভাষা, দেশীয় ঐতিহ্য। এমন কোনো সংস্কৃতির নাম জানিনে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো দেশের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। বিশ্লেষণ করলে দেখবেন ইসলামী সংস্কৃতি বলে যার পরিচয় আসলে তা আরব ইরানী তুর্কি সংস্কৃতি, তার অনুষঙ্গ কিছুটা গ্রীক সংস্কৃতি, কিছুটা প্যালেস্টাইনের ইহুদী সংস্কৃতি। ভারতে প্রচলিত ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গে

ভারতীয় সংস্কৃতির রং লেগেছে। সে রং এত পাকা রং যে মুছে ফেলার উপায় নেই। দেশ বাদ দিয়ে সংস্কৃতি হয় না। দেশকে স্বীকার করতেই হয়। এক দিন না এক দিন। সংস্কৃতির ফুল ফোটানোর জন্যে বাগানের দরকার মানতেই হয়। আরব থেকে ইরাণ থেকে কলম আমদানি করতে পারেন, কিন্তু মাটি জল হাওয়া আমদানি করা যায় না। সেটা যদি ভারতের না হয় তবে পাকিস্তানের হোক। পাকিস্তানের মাটি পাকিস্তানের জল পাকিস্তানের হাওয়া লাগুক মনের গায়ে। নইলে ফুল ফুটবে কী করে!

তারপর মাটি যেমন আবশ্যক তেমন আবশ্যক আলো। সূর্যের আলোর কল্যাণে ক্লোরোফিল না হলে গাছের পাতা সবুজ হয় না, আর গাছের পাতার সবুজ ধানের সবুজ ঘাসের সবুজ দেশ থেকে চলে গেলে মাটি দিয়ে তার অভাব দূর হবে না। কোনো দেশ যদি শত শত বছর ধরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে তা হলে সে বুড়ী হয়ে যায়, তার যৌবন হারিয়ে যায়। ভারতেরও তাই হয়েছিল দীর্ঘকাল বৃহৎ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে। জরাগ্রস্ত ভারতীয় সংস্কৃতি এই একশো দেড়শো বছরে অনেকটা যৌবনমন্ত হয়েছে। কিন্তু যথেষ্ট নয়। প্রতিদিন আমরা তারুণ্যের ক্ষীণতা অনুভব করছি। পাকিস্তানেও তারুণ্যের দৈন্য এখানকার মতোই। বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, সারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডার রসভাণ্ডার লুট করতে হবে। নইলে আমাদের মন সবুজ হবে না। পাণ্ডুর বিবর্ণ মন যে ফুল ফোটাবে তা আকাশকুসুম নয়, কিন্তু তা বলে তার মূল্য এমন কিছু নয়। ঐ মনসামঙ্গল বা সতী ময়না লিখে সংস্কৃতির গৌরব করা চলে না।

এরপরে আরো কথা আছে। আমাদের সংস্কৃতি ক্রমে সর্বসাধারণের হবে, দু'পাঁচজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের নয়। তাতে লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ যোগ দেবে, যারা এতকাল নিরক্ষর ছিল তারাও হবে পাঠক, লেখক, সমঝদার, পৃষ্ঠ-পোষক। সামনে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে। তাকে বলা যেতে পারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গ্রামে গ্রামে গানের দল নাচের দল নাটকের দল হবে, তাদের জন্যে অসংখ্য গান রচিত হবে, নৃত্য কল্পিত হবে, নাটক সৃষ্ট হবে। আগামী দিনের সংস্কৃতি যে আজকের মতো হবে না এ কথা সহজেই বোঝা যায়। তাতে প্রচুর ভালোর সঙ্গে প্রচুর মন্দও থাকবে। রুচিবিকৃতি থাকা খুবই সম্ভবপর। সেইজন্যে জনগণের রুচিগঠনের ভার নিতে হবে এখন থেকেই। নতুবা তখন যে সংস্কৃতির উদ্ভব হবে তাও গর্ব করবার মতো হবে না। কোয়ান্টিটি তো সব কথা নয়, কোয়ালিটি থাকলে তবেই হয় মূল্য। যা অসার তা অস্থায়ী। তা জনগণের বলে কি মহাকাল তাকে একটা স্বতন্ত্র পরমায়ু দেবে? সে বড় কঠোর বিচারক। সে কারো মুখ চেয়ে বিচার করে না। যার রস নেই তা কি পরিমাণের জোরে টিকবে? রসই শেষ কথা ও সার কথা। সুতরাং রসের সাধনাই করে যেতে হবে যেমন এ যুগে তেমনি সে যুগেও। যেন ছেদ না পড়ে এই সাধনায়।

সাধারণভাবে বলা হলো এসব কথা। পূর্ব-পাকিস্তানের জন্যে বিশেষ করে

বলতে হলে আর একটু জুড়ে দেওয়া চাই। পূর্ব-পাকিস্তান কারো লেজুড় নয়। না ভারতের, না পশ্চিম পাকিস্তানের, না ইসলামের। তার নিজস্ব একটা ধারা আছে। আঞ্চলিক ধারা। সে ধারা এখনো শুকিয়ে যায়নি, কখনো শুকিয়ে যাবে না। যতদিন পদ্মা মেঘনা থাকবে, যতদিন সমুদ্র থাকবে ততদিন আঞ্চলিক ধারাও থাকবে। আঞ্চলিক সংস্কৃতিও থাকবে। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকলে মিলে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে, বাড়িয়ে তুলবে ও জগৎসভায় ঠাঁই করে দেবে। পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের মধ্যে যেন ধর্মভেদ না জাগে। ও ছাড়া আর কোনো শত্রু নেই তাঁদের।

(১৯৫২)

সমাজের কথা

হাজার বছর আগে আমাদের দেশে রাষ্ট্র যাঁদের হাতে ছিল সমাজও ছিল তাঁদেরই হাতে। দেশীয় রাজ্যে এই অদ্বৈত ভাব এই সেদিনও দেখেছি। বরোদা প্রভৃতি রাজ্যে তাই সমাজ সংস্কার রাজার এক কথায় হয়েছে। কিন্তু যেসব প্রদেশ প্রথমে মুসলমানের অধীন ও পরে ইংরেজের অধীন হয় তাদের ঐতিহ্য অন্যরূপ। রাষ্ট্র যাঁদের হাতে পড়ল সমাজ যাতে তাঁদের হাতে না পড়ে তার জন্যে অনেক আটঘাট বাঁধতে হলো। রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ দাঁড়াল পরের ঘরের সঙ্গে নিজের ঘরের। এই দ্বৈতভাব আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে, তাই আইনের সাহায্যে সমাজ সংস্কারের প্রস্তাব উঠলে এখনো আমরা চিৎকার করে উঠি, "গেল সমাজ! গেল ধর্ম!" এটা আমাদের দ্বিতীয় স্বভাব। মনে থাকে না যে স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলুম এই দ্বৈত ভাবটাকে দূর করার জন্যেই।

এমন কোনো স্বাধীন দেশের নাম আমার জানা নেই যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পরকে দূর থেকে পরিহার করে। আমাদের দেশীয় রাজ্যেও এই পারস্পরিক বিরূপতা এতদিন পর্যন্ত ছিল না। রাজার হুকুমে প্রজার পদবী বদলে যেতে দেখেছি। বদলাতে বদলাতে এক অজ্ঞাতকুলশীল বালক হলো নীচুদরের ব্রাহ্মণ, তারপরে ধাপে ধাপে উঁচুদরের ব্রাহ্মণ। সমাজ এটা মেনে নিতে বাধ্য হলো। রাজার হুকুমে নতুন জাত সৃষ্টি হলো। সমাজ স্বীকার করে নিল। আমাদের দেশীয় রাজাদের দোষ অনেক ছিল। কিন্তু সমাজ সংস্কারের বেলায় তাঁরা ইংরেজের মতো ভীত কুণ্ঠিত দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। ইংরেজের এই সংস্কার-বিমুখতা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কদেরও স্পর্শ করেছে। শ্রীযুক্ত পাট্টাভি সীতারামাইয়া বলেন, হিন্দু সমাজের আইনকানুন বদলানোর অধিকার ভারতীয় পার্লামেণ্টের নেই। কার্যত তাই দেখা যাচ্ছে। তা হলে আমরা দেশীয় রাজাদের জুলুম এড়াতে গিয়ে অন্তত একটি ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলদের

পাল্লায় পড়েছি। অন্য কোনো স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের মুখে এই ধরনের উক্তি শোনা যায় না। স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায় এখনো আমাদের নেতারাই তা বোঝেননি। এঁরা রাজা হবেন, অথচ সমাজের ভয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবেন। সংস্কারের অভাবে সমাজকে অধঃপাতে যেতে দেবেন।

আমাদের রাষ্ট্র এখন আমাদের হাতে এসেছে। আমাদের সমাজও আমাদের হাতে। আমাদের ভয়ডর কাকে? সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বৈতভাব তবে কেন টিকে আছে? কার জোরে টিকে আছে? দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের অগ্রগতির বদলে পশ্চাদ্‌গতি হবে এই বা কেমন কথা? পার্লামেণ্টের যদি সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার না থাকে তবে রাজার স্থান পূরণ করবে কে? বল্লালসেন কি হস্তক্ষেপ করেননি?

ভারতের মতো চীনদেশের সমাজও নানা প্রাচীন প্রথার পেষণে চলৎশক্তি হারিয়েছিল। আশা করা গেছল কুওমিনটাং সমাজকে তার চলৎশক্তি ফিরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবে। কিন্তু দেখা গেল শক্তি বলতে কুওমিনটাং বোঝে সামরিক শক্তি। বল পরীক্ষার দিন সামরিক শক্তি তার কোনো কাজে লাগল না। ক্ষমতা চলে গেল কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে কমিউনিস্টরা ফতোয়া জারি করল—বাল্যবিবাহ বন্ধ হলো, পিতামাতার নির্বন্ধে বিবাহ করা চলবে না, স্বেচ্ছাবিবাহ প্রবর্তিত হলো। বিধবাবিবাহে কেউ বাধা দিতে পারবে না। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হলো। রক্ষিতাবৃত্তি ও গণিকাবৃত্তি উঠিয়ে দেওয়া হলো। গণিকালয় থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গণিকাদের লেখাপড়া শিখিয়ে হাতের কাজ শিখিয়ে অন্যান্য বৃত্তির উপযুক্ত করে তোলা হলো।

সমাজের অর্ধেক লোক তো নারী। অর্ধেক লোক যদি পঙ্গু হয়ে থাকে তা হলে সমাজ কী করে চলৎশক্তি ফিরে পাবে? আর সমাজ যদি পক্ষাঘাতে অসাড় হয় তা হলে রাষ্ট্র কী করে শক্তিশালী হবে? শুধু সামরিক শক্তি বাড়িয়ে? চিয়াং কাইশেক হয়তো তাই মনে করতেন, মাওৎ সে তুং তা মনে করেন না। তিনি যেমন শূদ্রশক্তির উদ্বোধন করে জয়যুক্ত হয়েছেন তেমনি নারীশক্তির উদ্বোধন করে জয়ের ভিত্তি দৃঢ়মূল করছেন। নারী ও শূদ্রের সমবেত শক্তি তাঁকে মহাশক্তিমান করেছে। তিনি যদি প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকতেন যে সমাজ-সংস্কারে হাত দেবেন না, সমাজ যেমন আছে তেমনি থাকুক, তা হলে সামরিক শক্তির অতিরিক্ত কোনো শক্তি তাঁর পিছনে থাকত না।

মহাস্থবির চীন এমনি করে পুনর্যৌবন লাভ করছে। দেখতে দেখতে সে এশিয়ার অগ্রগণ্য শক্তিধর হয়ে উঠল। আর কয়েক বছর পরে দেখা যাবে সে ভারতকে শিক্ষাদীক্ষায় ছাড়িয়ে গেছে, অন্নেবস্ত্রে অতিক্রম করেছে। এর কারণ সে সব রকম সামাজিক কুপ্রথার মূলে ধরে টান মেরেছে। আর্থিক অব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক কুপ্রথার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একটা না সরলে আরেকটা সরবে না। সমাজকে ঢেলে না সাজালে আর্থিক সুব্যবস্থা সুদূরপরাহত। সেইজন্যে সমাজের রূপান্তর ঘটাতে হয়। ধর্ম যদি পথরোধ করে দাঁড়ায় তা হলে

ধর্মকেও ঘা দিতে হয়। ধর্মকে যে আফিং বলা হয় তার কারণ ধর্ম নিজের এলাকার বাইরে গিয়ে সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে পরিবর্তনের পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

(১৯৫০)

গ্রন্থপঞ্জী

তারুণ্য

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রচ্ছদ—শ্রীমতী লীলা রায়
পাঁচ সিকা
গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সাতটি প্রবন্ধই ইংলণ্ডে প্রবাসকালে লিখিত। রচনাকাল ১৯২৮।
উৎসর্গ—আমার দেশের আমার কালের
তরুণ-তরুণীকে
নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন
প্রথম প্রকাশ ১৯২৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৫
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা নিচে দেওয়া হল।
প্রবন্ধ সমগ্রে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে। শুধু বানানগুলো বদলে আধুনিক করে দেওয়া হয়েছে।
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা
ভূমিকা

১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে "তারুণ্য" লেখা হয়। তখন আমি ইংলণ্ডে। ইচ্ছা ছিল প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরীক্ষা করে দেখব আমার মতবাদ বা আন্তরিক বিশ্বাস কী পরিমাণে বিবর্ত্তিত বা পরিবর্ত্তিত হয়েছে। পরীক্ষার মাপকাটি হবে "তারুণ্য"। বছর সাত আট পরে "তারুণ্য" পড়ে মনে হলো পূর্ববর্ত্তী মতবিশ্বাসের সঙ্গে আমার পরবর্ত্তী মতবিশ্বাস বহু বিষয়ে মিলছে না। সেইজন্য "তারুণ্য"র প্রথম চারটি প্রবন্ধের সঙ্গে আরো কয়েকটি রচনা জুড়ে "আমরা" নামে একখানি আলাদা বই বার করি। "তারুণ্য" যে আবার কখনো ছাপা হবে এ অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু বইখানার চাহিদা আছে বলে মনে হচ্ছে আমার প্রথম যৌবনের মর্ম্মবাণীর হয়তো কোনো মূল্য আছে। "তারুণ্য"র বর্ত্তমান সংস্করণ প্রথম সংস্করণের অনুবর্ত্তী হলেও স্থলে স্থলে লেখনীক্ষেপ করেছি।

২রা নভেম্বর ১৯৪৭ অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচিপত্র—তারুণ্যধর্ম / ধর্মস্য গ্লানিঃ / সৃষ্টির দিশা / প্রচ্ছন্ন জড়বাদ / একলা চল্ রে / যতি ও সতী / প্রতিমাভঙ্গ

আমরা

অন্নদাশংকর রায়
প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম্. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রচ্ছদ—কোন ছবি নেই, শুধু নামাঙ্কন।
দাম এক টাকা
উৎসর্গ—"চিত্রবহা"র
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সমধর্ম্মাকে
প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৬
সূচিপত্র—ক্ষয় ও পতন / আমাদের মধ্যযুগ / সংস্কার মুক্তি / পশ্চিম না আধুনিক / দেশরক্ষা / ভারতীয় মুসলমান / আদিম পাপ / জন্মস্বত্ব / জনসংখ্যা / জীবিকা / সাঙগা / কলকাতা।
বইয়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও প্রস্তাবিত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা নিচে দেওয়া হল—

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

১৯২৯ সালে ইংলণ্ডে "তারুণ্য" রচিত হয়।

এই বই "তারুণ্যে"র দ্বিতীয় সংস্করণ। এবার তিনটি পুরানো লেখার বদলে ছয়টি নতুন লেখা আছে। নতুন লেখাগুলি ১৯৩৫-৩৬ সালের।

নতুনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে পুরানো লেখার আকার ও নাম পাল্টে দেওয়া গেল। সমস্ত বইটার সুর অন্যরকম, তাই নতুন নাম রাখা হলো "আমরা"।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"তারুণ্য" থেকে নেওয়া চারটি প্রবন্ধ "তারুণ্য"কে ফেরৎ দেবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তার সঙ্গে কয়েকটি নতুন লেখা যোগ করে "আমরা"-র এই সংস্করণ প্রস্তুত হলো।

এখন থেকে এটি একটি স্বতন্ত্র বই, "তারুণ্য"-র থেকে স্বতন্ত্র।

প্রস্তাবিত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"তারুণ্য" লিখি ১৯২৮ সালের ইংলণ্ডে (১৯২৯ সালে নয়)।

"তারুণ্যে"র দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটি প্রবন্ধ বাদ পড়ে, কয়েকটি প্রবন্ধ সংযোজন করা হয়। নতুন করে নাম রাখা হয় "আমরা"।

"তারুণ্যে"র তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের নামরূপ অক্ষুণ্ণ রাখা স্থির হওয়ায় সংযোজিত প্রবন্ধগুলির সঙ্গে কয়েকটি কথোপকথন সংযোজন করে "আমরা"কে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক করা গেল।

এই স্বতন্ত্র পুস্তকটির প্রথমাংশ ১৯৩৬-৩৭ সালের লেখা (১৯৩৫-৩৬-এর নয়)। দ্বিতীয়াংশ ১৯৪২-৪৫-এর।

প্রবন্ধ সমগ্রে 'আমরা' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের বারোটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে।

জীবনশিল্পী

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই।
দাম পাঁচ সিকা
উৎসর্গ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পূজনীয়েষু
২৫শে বৈশাখ ১৩৪৮
প্রথম সংস্করণ ১৯৪১
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯
সূচিপত্র—জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ / "ফাউস্ট" / "সমর ও শান্তি" / বীরবল / রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন / চোখের দেখা / বিনু

বইয়ের কোনো সংস্করণেই কোনো ভূমিকা ছিল না।

ইশারা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলকাতা
প্রচ্ছদ—লেখকের ভাষায় "প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটি শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের"।
দাম এক টাকা
উৎসর্গ—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
পূজনীয়েষু
প্রথম প্রকাশ ১৩৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৩

বইয়ের ভূমিকাটি নিচে দেওয়া হল—

লেখকের কৈফিয়ৎ

এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন উপলক্ষে লিখিত। যদিও তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো যোগসূত্র নেই তথাপি তাদের একত্র গ্রথিত করা হলো এই জন্যে যে এখন পুস্তকাকারে প্রকাশ না করলে পরে হয়তো সেগুলি নিখোঁজ হতো।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটি শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের।

জীয়নকাঠি

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
এক টাকা চার আনা
উৎসর্গ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন, আই সি এস,
শ্রদ্ধাস্পদেষু
প্রথম প্রকাশ—১৩৫৫
সূচিপত্র—মনে মনে / সংকট ও সাহিত্য / রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান / কানাই ও বলাই / চিঠির কথা / জবাবদিহি / রম্যাঁ রলাঁ / কবিতা কেন উপেক্ষিতা / কথাসাহিত্য / পত্রলেখা / জবানবন্দী / আমাদের সংগ্রাম

বইয়ের ভূমিকাটি নিচে দেওয়া হল—

নিবেদন

গত মহাযুদ্ধের সময় একটি প্রশ্ন বার বার আমার কানে হানা দিত। সংকটকালে সাহিত্যিকের কর্তব্য কী। এই প্রশ্নের উত্তর আমি নানাভাবে দিয়েছি। কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে, কোথাও প্রত্যক্ষভাবে। এবার সেগুলিকে একসূত্রে গাঁথা গেল।

"মনে মনে" এই পুস্তকে স্থান পাবার দাবী রাখে না। বেচারি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে আর কোনোখানে জায়গা নেই বলে। এই রচনা বিশ বছর আগে "কালিকলম"-এ প্রকাশিত হয়। তার পরে অদৃশ্য হয়। কবিবন্ধু জগদীশ ভট্টাচার্যের আনুকূল্য না পেলে এর পুনঃপ্রকাশ ঘটে উঠত না। তাঁকে ও তাঁর ছাত্রকে ধন্যবাদ।

লেখাগুলির উপর মাঝে মাঝে কলম চালিয়েছি কিন্তু ছাপার ভুল নজর এড়িয়ে গেছে। "রম্যাঁ রলাঁ" প্রবন্ধটির শিরোনামায় রল্যাঁ কথাটি মুদ্রাকর-প্রমাদ। রলাঁ আমার অন্যতম গুরু, সুতরাং এই অশুদ্ধির জন্যে আমি লজ্জিত।

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
১৩ই ফাল্গুন ১৩৫৫

দেশকালপাত্র

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

এক টাকা চার আনা

উৎসর্গ—স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি (তে)

প্রথম প্রকাশ—১৩৫৫

সূচিপত্র—চেনাশোনা / গান্ধীজী / গান্ধীজীর লক্ষ্য / গান্ধীজীর পরীক্ষা / আমাদের স্বাধীনতা / হিংসা ও অহিংসা / ভারতের স্বরাজ / ভারতের ঐক্য / জাতীয় প্রায়শ্চিত্ত / অপসারণ / আবার এক হাজার বছর / মর্ত্ত্য হইতে বিদায় / রবীন্দ্রনাথের পরিচয় / রবীন্দ্রাদিত্য / বার্নার্ড শ / আজ এবং আগামী কাল

বইয়ের ভূমিকাটি নিচে দেওয়া হল—

নিবেদন

"চেনাশোনা" দশ বছর আগের ভ্রমণকাহিনী। যথাকালে লিপিবদ্ধ না হয়ে যুদ্ধের মাঝখানে স্মৃতিলিখিত হয়। শেষ হলে আলাদা একখানি বই হতো, কিন্তু নানা বিক্ষেপে স্মৃতির সুতো কেটে যায়। পরে আর জোড়া দেবার চেষ্টা করিনি।

"রবীন্দ্রাদিত্য" বিশ বছর আগে "কল্লোলে" প্রকাশিত হয়। কল্লোলযুগের অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধুবর ভূপতি চৌধুরীর সাহায্য না পেলে ওটি সংগ্রহ করা কঠিন হতো। "বার্নার্ড শ" প্রকাশিত হয় চোদ্দ বছর আগে "পরিচয়" পত্রে। ওটি পাওয়া গেল বিখ্যাত সাহিত্যিক অগ্রজপ্রতিম মণীন্দ্রলাল বসুর ভাণ্ডারে। এঁদের দুজনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা। অক্ষরবিন্যাস শ্রীমান্ অজয়াশঙ্কর রায়ের।

১৪ই চৈত্র ১৩৫৫ অন্নদাশঙ্কর রায়

'চেনাশোনা'-র কাটা সুতো পরে কিন্তু জোড়া দেওয়া হয়। তখন এর পরবর্তী অধ্যায়গুলি লেখা হয় ও একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিশেবে 'চেনাশোনা' আত্মপ্রকাশ করে।

প্রত্যয়

অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
মূল্য দেড় টাকা
উৎসর্গ—কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব
শ্রদ্ধাস্পদেষু

সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ
এক ও অভিন্ন।
সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ
অহিংস।

অন্নদাশঙ্কর রায়

৩০শে বৈশাখ ১৩৫৮
প্রথম প্রকাশ—১৩৫৮